KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher যোগেশ চন্দ্র সরখেল
Title প্রকৃতি	Size 6" x 9"
Vol. & Number ১৩/১-৮	Year of Publication : ১৩৪৩
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : সত্যচরণ লাহা	Remarks : 241-254 & 470-? Pages Missing

C.D. Roll No. KLMLGK

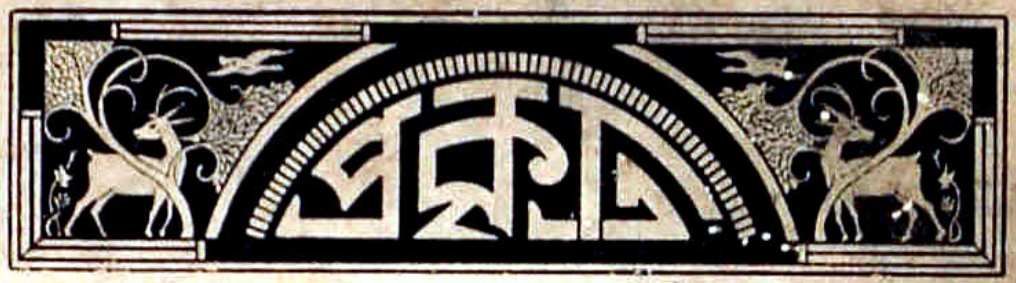

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

—:০:—

সচিত্র বৈজ্ঞানিক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীসত্যচরণ লাহা

১৩শ বর্ষ

১৩৪৩ সাল

কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিষয় সূচী

বিবিধ *
পুস্তক সমালোচনা ‡
সংবাদ চয়ন †

অ

*অভিনব কীটাণু আবিষ্কার ... ৭৭
*অভিনব তাস ... ২৪৪
†অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড নাফিল্ডের দান ... ৩১৮
*অগ্নিসহ কাঠ ও কাগজ ... ৪৫৭
*পরলোকে দেওয়ান বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার ... ৪৬৫

আ

আণুবীক্ষণিক প্রাণী ... ৩৩
আণবিক রহস্য ... ৯১
আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ১২৬
আকাশের কথা ... ৩২৩, ৪০৫
*আধুনিক গৃহে কোলাহল নিবারণের উপায় ... ১৫০
*আইনষ্টাইনের মতবাদের সমালোচনা ... ১৫৩
*আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞানের সাদৃশ্য ... ৩০৬
‡আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ ... ৩২১
*পরলোকে লেফটেনান্ট-কর্ণেল আর, নোল্‌স্‌ ... ১৬২
†অধ্যাপক আর্কুহার্টের বিদায় গ্রহণ ... ৪৭০
*আইনষ্টাইনের নূতন আবিষ্কার ... ৪৫৯

ই

*ইস্পাতের ভঙ্গুরতা ... ১৪৮
†ইংলণ্ড-জোহান্সবার্গ বিমানপ্রতিযোগিতা ... ২৪৭

উ

উত্তর বেহারে নরবলি ... ৫৪
উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ... ২৯১
*উদ্ভিদাদির ফলনে ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজনীয়তা ... ৩০১

এ

*এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের নূতন নাম ... ৮৪
†'এভারেষ্ট' জয়ের ব্যর্থ অভিযান ... ৮৮
†'এম-বি' শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা ... ২৪৫
*এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণের পুনঃ প্রচেষ্টা ... ৩১৫
†এসিয়াটিক সোসাইটির নূতন নামকরণ ... ৩১৬
*পরলোকে ডাঃ এফ, জে, এফ, শ' ... ১৬৩
†এভারেষ্ট অভিযানে তিব্বত সরকারের অনুমতি লাভ ... ৪৬৯
†এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ... ৪৭০

ক

ক্রমবিকাশ ... ৫৭
*কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা ... ৬৯
†কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "গাছঘর" প্রতিষ্ঠা ... ১৬৫
†কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ... ১৬৫
*কয়লা হইতে পেট্রোল প্রস্তুত ... ২২৭
*কৃত্রিম রেডিয়ম ... ২৪২
*কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যপ্রাণ 'ক' প্রস্তুতের চেষ্টা ... ৩০২
*কাগজপত্রাদি রাখিবার জন্য অভিনব কাচ নির্ম্মাণ ... ৩০২
*কৃত্রিম উপায়ে মাতৃদুগ্ধ রক্ষার ব্যবস্থা ... ৩০৫
†কৃষি গবেষণা কলেজের দিল্লীতে স্থানান্তর ... ৩১৯
*কাচ হইতে তন্তু-উৎপাদন ... ১৬০
*পরলোকে কৃষ্ণকুমার মিত্র ... ৩২০
†কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডি-এস্-সি ... ৪৭০
*কচুরিপানা হইতে রাসায়নিক দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা ... ৪৫৮

খ

*খাদ্যদ্রব্যে খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ... ৭৩
†খনিদুর্ঘটনার তদন্ত ... ৩১৮
‡খাদ্য-বিজ্ঞান ... ৩৯৭

গ

*গতিবেগের সীমানির্দ্ধারণ ... ৭৯
†প্রাণনিক্য বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা ... ৮৮
*গিরিশৃঙ্গ আরোহণকারীদের উপর উচ্চ স্তরের প্রভাব ... ১৫৯
†গিরিশৃঙ্গ আরোহণে ভারতীয় অভিযাত্রী ... ১৬৬
†গৃহপালিত পশুর পুষ্টিবিধান ... ১৬৭
*গৃহাদির কম্পন পরীক্ষা ... ৩০৪

চ

‡চর্ম্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ... ১৬৭

জ

জীববিদ্যাবিৎ ... ১৯৪
†ডাঃ জে, এইচ, হাটনের কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ ... ১৬৯
†জার্ম্মাণ একাডেমির উদ্যোগে নূতন গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠা ... ২৪৬
*আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মতিথি ... ৩১৬
†জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলপাইন ক্লাবের উদ্যম ... ৪৭১

ট

†টাটা কোম্পানীর ইস্পাত গবেষণাগার ... ৩১৯

ড

†'ডিস্কভারি' জাহাজ ক্রয়ে নিউজিলণ্ডবাসীর আগ্রহ ... ৮৮

ঢ

†ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চেন্সেলার ... ৩৯৫

ত

*তাপপরিমাণের সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ... ২৩২

দ

দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের ভাস্বর ছত্রাক ... ১
*দুগ্ধ হইতে পশম প্রস্তুত ... ৭৪
†দিবালোকের পরিমাণনির্ণয় ... ২৪৪
*পরলোকে দেবদেব মুখোপাধ্যায় ... ৪৬৬

ধ

ধাতুশিল্পের অভ্যুদয় ... ১৩৩
*কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্মানলাভ ... ১৬১
*ধাতু নির্ম্মিত ব্লটার ... ২৩৮
*ধূলি ও ব্যাধি ... ৩০৩

ন

*নবনিযুক্ত বড়লাট ও বিজ্ঞানের আলোচনা ... ৬৭
*নার্ভসমূহের চাঞ্চল্যনিরূপণ ... [illegible]

†নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের সমিতি প্রতিষ্ঠা … ৮৭
†নন্দাদেবী অভিযান … ৮৮
†নূতন খনিজ পদার্থের সন্ধান … ১৬৫
*নিম্ন জীবের অন্যোন্যজীবিত্ব … ২৩৩
*নন্দাদেবী গিরিশৃঙ্গে আরোহণ … ২৪০
*নিউট্রনের তরঙ্গ রূপ … ৩০০
*নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি … ৪৫৫
†নব-প্রস্তরযুগের বাসনপত্র ও লৌহযন্ত্র … ৪৬৯
*নোবেল-পুরস্কার বিতরণে জার্ম্মাণির অসন্তোষ … ৪৬১

প

পৃথিবীর যৌবন … ৪৩
*প্রকৃতির ত্রয়োদশ বর্ষারম্ভ … ৬৭
*পাটশিল্পসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা … ৭৭
*প্রকৃতির বিশিষ্টরূপ … ২৫১
*পরলোকে অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন মিত্র … ১৬১
পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসগঠনে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রভাব … ১৮৪, ২৬৫
পৃথিবীর পরিধিনির্ণয় … ২০২
*প্রকৃতির প্রতিশোধ … ২২৮
*'পত্রহরিৎ' সম্পর্কে গবেষণা … ২৩৬
†প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী তদন্তের ব্যবস্থা … ৩১৭
*পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেটের নূতন ব্যবহার … ৪৫৫
†পূর্ব্ব-প্রাচ্যের বন্য জন্তুর সন্ধানে অভিযান … ৪৬৮
†পাখীর সন্ধানে অভিযান … ৪৬৮
*পিকিনে আবার নরকপাল প্রাপ্তি … ৪৫৬
*প্রকৃতির ত্রয়োদশ বর্ষশেষ … ৪৬৭

ফ

*অধ্যাপক ফ্রয়েডের জয়ন্তী উৎসব … ৮২

ব

*বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পিপীলিকার সাহায্য … ৮২
*অধ্যাপক বীরবল সাহনি, এফ-আর-এস … ৮৩
†ব্রিটীশ এসোসিয়েশন ও ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার সম্মিলিত অধিবেশন … ৮৬
*বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে গবেষণা … ১৪৯

*বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ … ১৫০
*বাংলার জনসংখ্যা সমস্যা … ১৫৫
*বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব … ১৫৫
*বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনষ্টিটিউট সম্পর্কে তদন্ত … ১৫৭
†ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের আগামী বার্ষিক অধিবেশন … ১৬৪, ৩৯৬
†বাংলায় লণ্ঠনের কারখানা … ১৬৪
বর্ণবিভ্রম … ২১৭
*বিজ্ঞান ও অন্ধসংস্কার … ২২২
*বাংলায় মাছের চাষ … ২২৩
*বিদ্যুৎসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনা … ২২৬
*বিজ্ঞানশিক্ষার আদর্শ … ২৩১
*বিশ্বরশ্মির বৈশিষ্ট্য … ২৩৭
*বাষ্পাকারে ঔষধপ্রয়োগের ব্যবস্থা … ২৪২
*বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীর সলিলবৃদ্ধি … ২৪৩
†বিজ্ঞানে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ … ২৪৬
বঙ্গদেশের ভেষজ উদ্ভিদ্ … ২৪৯, ৩৩২
*বিজ্ঞান ও সমাজ … ২৯৯
*বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার … ৩০৯
†বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে আচার্য্য রায়ের প্রস্তাব … ৩১০
বারিমণ্ডল … ৩৪৬, ৪১৩
বেহারে ও বঙ্গে প্রচলিত কয়েকটী পূজা ও উৎসব … ৩৬১
†বিজ্ঞানে ডি-এস-সি উপাধিলাভ … ৩৬৪
বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানানুশীলন … ৪০১
বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ … ৪৪৭
*বিমানপোত নির্ম্মাণে মিশ্রিত ম্যাগনেসিয়ম ব্যবহার … ৪৬০
†কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন অধ্যাপক … ৪৬৮

ভ

*ভারতীয় রেলওয়ের লৌহবর্ম্ম সম্পর্কে গবেষণা … ৭১
†ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার চতুর্বিংশ অধিবেশন … ৮৬
*ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার চতুর্বিংশ অধিবেশন … ৩৭২
*ভারতে 'বেতার' সমস্যা … ২৯৫
†ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার জুবিলি উৎসবের ব্যবস্থা … ৩১৬

†ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলি উৎসব ... ১৬৫
†ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার আগামী অধিবেশন ... ৩২৪
ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে গবেষণা ... ২৮৯
*ভারতীয় কাষ্ঠ সম্পর্কে গবেষণা ... ৩০৮
*ভারতীয় শস্যের উন্নতিবিধান ... ৩০৯
†ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান ... ৩১৬
*অধ্যাপক ভাটনাগরের মহাহুভবতা ... ৩১৭
†ভেজাল ঔষধনিয়ন্ত্রণ ... ৩২০
†ভারতীয় ছাত্রের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ... ৩২৪
†ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ... ৩২৫
†ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নূতন ডিরেক্টর ... ৩২৫
ভারতবর্ষে শৃগাল পূজা ... ৪৪৫

ম

*মরুসাগর হইতে রাসায়নিক দ্রব্য আহরণ ... ৮০
*মৌমাছিপালনে বিদ্যুতের ব্যবহার ... ১৫৮
*মানব-বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ... ২২৫
†মৎস্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য বৃত্তি ... ২৪৫
†মেরু-প্রদেশগামী জাহাজ জলমগ্ন ... ২৪৫
†ম্যালেরিয়া এবং খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিকারিতা সম্পর্কে গবেষণা ... ২৪৬
*মোটরগাড়ী নির্ম্মাণে গোল আলুর ব্যবহার ... ৪৫৬
†কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ... ৪৬৮
*মেষের পশম ছাড়াইবার অভিনব উপায় ... ৪৫৯
*মদ্যপান ও মোটর দুর্ঘটনা ... ৪৬২

র

*পরলোকে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৮৫
*রেল ও মোটর প্রতিযোগিতা ... ২৩০
*রঙীন এলুমিনিয়ম ... ৪৫৮

ল

লাল পিপীলিকার জীবনেতিহাস ... ১৬৯
†লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্কিন্‌সনের দান ... ৩২৬

শ

*শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রনির্ম্মাণ ... ১৪৬

*শব্দমান যন্ত্র ... ১৪৮
*শাকসব্জী উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহার ... ২৩৫
†শর্করা শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা ... ৪৬৭

ষ

ষট্‌পদ প্রাণী ... ৯৭, ২০৪, ২৭৫
*'ষ্ট্রাটোস্ফিয়রে' বিষাক্ত গ্যাস ... ২৩৯
†নূতন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ... ৩১৬

স

সাহারা ... ৯
†সুবৃহৎ সিমেণ্ট প্রতিষ্ঠান ... ৮৭
সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদ্ ... ১১০, ৪৫৪
*সর্পবিষ সংগ্রহের প্রণালী ... ১৫২
*সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা ... ১৫৬
†স্ত্রীশিক্ষা সংস্কারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যম ... ১৬৬
*সৌরশক্তির ব্যবহার ... ২০২
স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ ... ২৯৪
*সিঙ্গাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের মাছ ... ৪৬২
*ভারতে সূর্য্যরশ্মিবিকীরণ সম্পর্কে গবেষণা ... ৪৬১
†নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব ... ৪৬৭
*সুসংবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ... ৪৫৩

হ

†ডাঃ হরেন্দ্রনাথ রায়ের নূতন পদলাভ ... ১৬৬
†হুগলী কলেজের নাম পরিবর্ত্তন ... ৪৭০

ক্ষ

ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নহে ... ৩৬০

লেখক সূচী

আলোচনা
পুস্তক সমালোচনা †

গ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
আণুবীক্ষণিক প্রাণী ... ৩৩
লাল-পিপীলিকার জীবনেতিহাস ... ১৬৯

অধ্যাপক শ্রীসিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম-এস-সি, বি-এল—
উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ... ১৪১
জীববিজ্ঞাবিৎ ... ১৯৪
বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানানুশীলন ... ৪০১

চ

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, এফ-আর-ই-এস—
ষট্‌পদ প্রাণী ... ৯৭, ২০৪, ২৭৫

জ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়—
সাহারা ... ৯
পৃথিবীর পরিধিনির্ণয় ... ২০০
বারিমণ্ডল ... ৩৪৬, ৪১৩

ধ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, এম-এস-সি—
• খাদ্যবিজ্ঞান ... ৩৯৭

ন

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম-আর-এ-এস্—
বঙ্গদেশের ভেষজ উদ্ভিদ্ ... ২৪৯, ৩৩২

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহা—
স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ ... ২৯৪

প

শ্রীপ্রফুল্লন ঘোষাল, এম্-এস-সি—
ক্রমবিকাশ ... ৫৭

কবিরাজ শ্রীপ্রিয়বন্ধু কাব্যতীর্থ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী—
• আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ ... ৩২১

ব

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—
সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদ্ ... ১১০, ৪৩৪

য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এস-সি—
ধাতুশিল্পের অভ্যুদয় ... ১৩৩

শ

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ—
উত্তর বেহারে নরবলি ... ৫৪
বেহারে ও বঙ্গে প্রচলিত কয়েকটী পূজা ও উৎসব ... ৩৬৪
ভারতবর্ষে শৃগাল পূজা ... ৪৪৫

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি—
• আণবিক রহস্য ... ৯১

স

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু, এম-এ, পি-এইচ-ডি—
দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের ভাস্কর ছত্রাক ... ১

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম-এস-সি—
পৃথিবীর যৌবন ... ৪৩
পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস গঠনে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রভাব ... ১৮৪, ২৬৫
আকাশের কথা ... ৩২৩, ৪০৫

শ্রীসুধীরকুমার বসু, বি-এস-সি—
আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ... ১২৬
বর্ণবিভ্রম ... ২১৭

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু—
ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নহে ... ৩৬০

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত, এম-এস-সি—
ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা ... ২৮৯

শ্রীসুবোধকুমার মিত্র, এম-এস্-সি, বি-এল্—
বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ... ৪৪৭

চিত্র সূচী

ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্র

আ

আণুবীক্ষণিক প্রাণী—

*চিত্র ১—ভর্টিসেলা ... ৩৪

*চিত্র ২—এপিষ্টাইলিস্ উপনিবেশ ... ৩৬

*চিত্র ৩—টিউবিফেক্স ধরণের একপ্রকার কীড়া; মুখখানা সবেমাত্র খুলিবার জন্য আয়োজন করিতেছে ... ৩৭

*চিত্র ৪—ষ্টেণ্টর গ্রামোফোনের হর্ণের মত মুখ হাঁ করিয়া আহারসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে ... ৩৮

*চিত্র ৫—লম্বা লেজবিশিষ্ট ষ্টেণ্টর ... ৩৯

*চিত্র ৬—রটিফার আহার সংগ্রহে ব্যস্ত ... ৪০

*চিত্র ৭—রটিফার শরীর প্রসারিত করিতেছে ... ৪১

*চিত্র ৮—সবুজ রং-এর সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক প্রাণী ... ৪২

দ

দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের ভাস্বর ছত্রাক—

*চিত্র ১— ... ২

*চিত্র ২— ... ৪

*চিত্র ৩— ... ৭

প

পৃথিবীর পরিধিনির্ণয়—

*চিত্র ১—প্রাচীন গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ এরাটস্থেনিস কর্ত্তৃক পৃথিবীর পরিধিনির্ণয় ... ২০২

ব

বারিমণ্ডল—

চিত্র ১—সমুদ্রের তলবাহী স্রোতের প্রমাণ ... ৪১৬

চিত্র ২—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কাটাল; অষ্টমীর জোয়ার; মুখ্য ও গৌণ জোয়ার ... ৪১৮

ল

লাল-পিপীলিকার জীবনেতিহাস—

*চিত্র ১—লাল-পিপীলিকারা পালিতা-মাঁদারের পাতা মুড়িয়া বাসা বাঁধিতেছে ... ১৭০

*চিত্র ২—পালিতা-মাঁদারের পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পত্র একত্র করিয়া লাল-পিপীলিকারা লার্ভার সাহায্যে সংযোগস্থান জুড়িয়া দিতেছে ... ১৭১

*চিত্র ৩—লাল-পিপীলিকারা বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য পাশাপাশি অবস্থিত আমের পাতাগুলিকে টানিয়া কাছে আনিতেছে ... ১৭২

*চিত্র ৪—কৃষ্ণকলির পত্র একত্রিত করিয়া লাল-পিপীলিকারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে; বাসার উপরের দিক লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দেওয়ার পর উহারা সেই ফাঁক বন্ধ করিতেছে ... ১৭৩

*চিত্র ৫—ক—উপর হইতে রাণী পিপীলিকার কীড়ার ক্রমপরিণতি দেখান হইয়াছে; নীচের দুইটি রাণীর পুত্তলি। ... ১৭৪

খ—উপরে রাণীর কীড়া, মধ্যে পুরুষ ও কর্ম্মীর কীড়া; নীচে কর্ম্মীর পুত্তলি। ... ১৭৪

গ—দক্ষিণের দুইটি পুরুষ ও বামের দুইটি রাণী পিপীলিকা ... ১৭৪

*চিত্র ৬—এক পাতা হইতে দূরে অবস্থিত অপর পাতা পর্য্যন্ত লাল-পিপীলিকারা শিকল নির্ম্মাণ করিয়াছে ... ১৭৪

*চিত্র ৭—সেলুলয়েডের কৃত্রিম পত্রনির্ম্মিত লাল-পিপীলিকার বাসা। লাল-পিপীলিকারা এই কৃত্রিম পত্র জুড়িয়া সূতা জড়াইয়া বাসা তৈয়ারী করিয়াছে। স্বচ্ছ সেলুলয়েডের ভিতর দিয়া বাসার ভিতরে পিঁপড়াদের কার্য্যকলাপ পরিষ্কারভাবে দেখা যায় ... ১৮১

*চিত্র ৮—জামের মুকুলগুচ্ছের চতুর্দ্দিকে সূতা বুনিয়া লাল-পিপীলিকারা উহার মধ্যে গাছ-উকুন প্রতিপালন করিতেছে ... ১৮২

ষ

ষট্‌পদ প্রাণী—

চিত্র ৩৭—ক=কেন্নো, খ=তেঁতুলে বিছা, গ=কাঁকড়া বিছা, ঘ=এঁটেলি ... ৯৮

চিত্র ৩৮—গাছ উকুন ... ১০০

চিত্র ৩৯—বিভিন্ন প্রকার কেটারপিলার ... ১০২

চিত্র ৪০—সরিষা প্রভৃতি কালো মেড়ীর জীবনী ... ১০৩

চিত্র ৪১—ক—মান্টিস্ পোকা ধরিয়া খাইতেছে। ... ২০১

খ—গাঙ্গইলাস, সাধারণতঃ ইহার সম্মুখের পা দুইটি মস্তক ও বক্ষের সহিত লগ্ন থাকে; মাথা নীচের দিকে ... ২০১

চিত্র ৪২—রেহুভিড্ খড়কুটো দিয়া নিজের দেহ আবৃত করিয়াছে ... ২০৮
চিত্র ৪৩—ক—কাঠিপোকা শুক্‌নো ডালের নীচে বসিয়া আছে ... ২১২
খ—এই পোকাকে পাতার গুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় ... ২১২
গ ও ঘ—কালিমা নামক প্রজাপতি ; যখন উড়ে ডানার উপরে হল্‌দে ও কালো রঙ দেখা যায় (গ)। যখন বসে ঠিক মনে হয় যেন একটা শুক্‌নো পাতা ডালে লাগিয়া আছে (ঘ)। ... ২১২
চিত্র ৪৪—ক্রাইসোপার জীবনী ... ২১৩
চিত্র -৪৫—ক, খ, গ, ঘ—চিঁড়া পোকা ; ঙ—কেটারপিলার ঘাসের পাতার টুকরা বাঁধিয়া ঘর করিয়াছে ; চ, ছ—তিলের পাতার পোকা ; জ—করবরির কেটারপিলার ... ২১৪
চিত্র ৪৬—ক—সাপের মাসী বিট্‌ল্ ; খ—ফরকিফিউলা ... ২১৫
চিত্র ৪৭—বোল্‌তা উইচিংড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছে ... ২৭৭
চিত্র ৪৮—হাত জাল ... ২৮১
চিত্র ৪৯— ... ২৮২
চিত্র ৫০—ক—মারণ টিউব, খ—মারণ বোতল ... ২৮২
চিত্র ৫১— ... ২৮৩
চিত্র ৫২— ... ২৮৪
চিত্র ৫৩— ... ২৮৫

স

সাহারা—
চিত্র ১—ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটস্থ শান্ত কটিবন্ধ ... ১০
চিত্র ২—শীতল সমুদ্রের উপরে মরীচিকা ... ২১
চিত্র ৩—আল্‌জীরিয়ার অন্তর্গত সাহারার একটি মরূদ্যান ... ২৫

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১৩শ বর্ষ গ্রীষ্ম ১ম সংখ্যা

দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের ভাস্বর ছত্রাক

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

ভারতবর্ষের বোটানিক্যাল সার্ভের অধীনস্থ দক্ষিণ ব্রহ্মে সিঙ্কোনা চাষের ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, টি, রাসেলের সৌজন্যে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে টেনাসেরিম প্রদেশ হইতে কয়েক খণ্ড ভাস্বর কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসংলগ্ন হারবেরিয়মের কিউরেটার শ্রীযুত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয় ব্রহ্মদেশে উদ্ভিদ আহরণ কার্য্যে গিয়া উপরোক্ত স্থান হইতে আরও কয়েক টুকরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কাষ্ঠের কতকগুলি *Lagerstroemia* sp. (N. O. *Lythraceae*) এবং *Pentace burmannica* (N. O. *Tiliaceae*) নামক মৃত বৃক্ষের অংশবিশেষ। কাষ্ঠখণ্ডগুলি যখন কলিকাতায় আমার হস্তগত হইল, তখন তাহাদের দীপ্তি প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। কাষ্ঠখণ্ড কয়েকটিকে তৎক্ষণাৎ আর্দ্র কার্পাস তুলা দ্বারা জড়াইয়া একটা পাত্রের মধ্যে অল্প পরিমাণ জলে রাখিয়া দিলাম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাহাদের দীপ্তিলাভ হইল এবং মাসখানেক পরে দেখা গেল তাহাদের কয়েকটির উপর *Pleurotus* sp.-এর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রাক উৎপন্ন হইয়াছে। এই ছত্রাকগুলি আগাগোড়া তেজোময় হইয়া উঠিল, অর্থাৎ ইহাদের ডাঁটা এবং উপরিভাগ ও নিম্নভাগ সমভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। কাষ্ঠের মধ্যে ছত্রাকের অণুসূত্রময় দেহাংশ তেজোময় হইয়া উঠিল, ফলে ছত্রাকের সূত্রাণুদ্বারা আক্রান্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলিও অন্ধকারে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই বিষয়ে বুলার-বর্ণিত ভাস্বর *Pleurotus*-এর দ্বাদশটি জাতির সহিত ইহার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ভাস্বর *Pleurotus*-এ শুধু ফলের অবয়বটিই উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু ইহার ফলাবয়ব ও দেহাংশ উভয়ই সমভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যেহেতু এই *Pleurotus*-এর সহিত অষ্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান এবং আমেরিকা

হইতে প্রাপ্ত *P. Candescens F. A. M.*, *P. Gardeneri* Berk., *P. illuminons* F. V. M., *P. lampas* Berk., *P. nidiformis Berk.*, *P. phosphoreus* Berk., *P. olearcus* DC., *P. japonicus* Kaw., *P. facifer* B. et C., *P. igneus* Rumph., *P. noctilucens* Lev. and P., *Prometheus* B. et C. প্রভৃতি ভাস্বর *Pleurotus*-এর বিবরণের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না, তন্নিমিত্ত নিম্নে চিত্রসহ (১নং চিত্র) এই জাতীয় *Pleurotus*-এর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

চিত্র—১

টুপী—বৃক্কাকার, কেন্দ্রস্থল নীচু, ১০×৮ মিলিমিটার, সম্পূর্ণ মসৃণ, ঈষৎ হরিদ্রাভ বাদামি রঙ কিনারায় আসিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। উপরিভাগ অতি সূক্ষ্ম বহির্মুখী পরস্পরমিলিত রেখা দ্বারা চিহ্নিত, প্রান্তভাগ ভিতরের দিকে কুঞ্চিত এবং টুপীটি বেশী পুরু নহে।

বোঁটা (stalk)—পার্শ্বস্থিত, ৮ মিলিমিটার দীর্ঘ, শ্বেতবর্ণ, উপরিভাগ স্ফীত, সম্পূর্ণ মসৃণ, নিরেট ও দৃঢ়।

টুপীর নিম্নভাগ—অতি শুভ্র, ফুলকাগুলি (gills) লম্ব ও অধোধাবক, প্রান্ত অখণ্ডিত, কেন্দ্রস্থিত সূত্রাণুগুলি সমান্তরালভাবে ছড়ান।

বেসিডিয়া অর্থাৎ রেণুদণ্ডাধার—১২ হইতে ১৬ × ৬ হইতে ৮ মিউ (মিউ=১/২৫৪০০ ইঞ্চি)। রেণুগুলি সাদা, ডিম্বাকৃতি, ২ হইতে ৩ × ৪ হইতে ৫ মিউ। Cystidia কিছুই নাই। একবার সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইলে ছত্রাকগুলি পরে আর্দ্র অবস্থাতেও সাধারণতঃ পুনর্জীবিত হয় না।

উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও শোধিত (sterilised) কাচের ফলকের উপরিস্থিত রেণুস্তর হইতে কয়েকটি রেণু শোধিত শলাকা দ্বারা (aseptically) অতি সন্তর্পণে মল্ট-এক্সট্রাক্ট এগার (malt extract agar) পরিপূর্ণ টিউবে রক্ষিত হইল। এই টিউবগুলি কক্ষের সাধারণ বিকীর্ণ আলোক ও তাপে রাখা হইয়াছিল। তিন চারি দিনের মধ্যে কতকগুলি শুভ্র ও সূক্ষ্ম ছত্রাণু বাহির হইল এবং প্রায় আরও দিন দশেকের মধ্যেই উহারা টিউবের ভিতর তির্য্যকভাবে অবস্থিত ক্ষেত্রসমূহকে (media) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার পর উহা হইতে ছত্রাণু গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিশোধিত পাত্রে (যথা—প্লেট, ত্রিকোণাকার ফ্লাস্ক, বিশোধিত টিউব) বপন করা হইল। আর কতকগুলি ছত্রাণু রু-টিউবের মধ্যে বিশোধিত আলুখণ্ডের উপর বপন করা হইল। পরে আরও কতকগুলি ছত্রাণু রু-টিউবের ভিতর বিশোধিত ভাস্বর কাষ্ঠের উপর বপন করা হইল; ঐ টিউবের সঙ্কীর্ণ অংশে একটু জল রাখা হইয়াছিল। ফলাবয়বের (sporophore) পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র অংশ হইতে অণুকোষ (tissue-culture) লইয়া রুটি এবং মল্ট-এক্সট্রাক্ট এগারের ক্ষেত্রে ছত্রাক জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াও বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। শতকরা ১ ভাগ পেপটোন্ এবং ২ ভাগ গ্লুকোজ্ দ্বারা প্রস্তুত তরল মিডিয়মে কালচার-এর (culture) বৃদ্ধি প্রধানতঃ তরলাংশের নীচেই অনুষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে মিডিয়ম বাদামি বর্ণ ধারণ করে। এই সমস্ত কৃত্রিম কালচারে ছত্রাকসূত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক সাদা বর্ণ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা হইতে একপ্রকার কোমল সবুজ রঙের আলো বাহির হয়। অধ্যাপক স্যার সি, ভি, রামনের নির্দ্দেশক্রমে ডাঃ পি, কৃষ্ণমূর্ত্তি এই নির্গত আলোকরশ্মি সম্পর্কে কোয়ার্টজ স্পেক্‌ট্রস্কোপ দ্বারা যে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় এই আলোকরশ্মিগুলির অধিকাংশই সবুজ অংশে হরিতাভ অঞ্চলে অবস্থিত থাকে (৫৪০০ হইতে ৫০০০ Au)। যখন শুভ্র ছত্রাকসূত্র ৩০ হইতে ৪০ দিবসের মধ্যে কালচার টিউবসমূহে বাদামি রঙ ধারণ করে তখন আর উহা হইতে কোন আলো নির্গত হয় না। শুভ্র সূত্রাণু স্থানে স্থানে প্রথম বাদামি রঙ ধারণ করে; সম্পূর্ণ কালচারের গাঢ় বাদামি রঙে পরিণত হইতে দীর্ঘ সময়ের (প্রায় দুই মাস) প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম উৎপাদনে টাটকা রুটির ক্ষেত্র (medium) পুনঃ পুনঃ বদলাইয়া দীপ্তি দুই বৎসরেরও অধিক কাল বজায় রাখা গিয়াছে। ছত্রতন্তুকে বিশোধিত সূচির দ্বারা বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং পুরাতন সূত্রাণুর উপর নূতন শুভ্র সূত্রাণু উৎপন্ন হয়। কাচের পাত্রে রুটির ক্ষেত্রে সূত্রাণুগুলি পরে শ্বেতবর্ণের তরল বিন্দু নিঃসরণ করে। এই শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ ক্রমে বাদামি রঙে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। পুরাতন কালচারসমূহে সূত্রাণুগুলি মাঝে মাঝে ঘনভাবে জমাট বাঁধে এবং তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট clamp (যোজক) দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় উহারা ক্ষেত্রের তলদেশে প্রসারিত হয় এবং স্থানে স্থানে বাদামি রঙ

ধারণ করে। এই অবস্থাতেও শুধু শুভ্র অংশসমূহ হইতেই আলো নির্গত হয়। দুই বৎসরের মধ্যেও এই সমস্ত রুটির ক্ষেত্রে কোন ফলাবয়ব এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরিশোধিত কাষ্ঠখণ্ডের উপরিভাগে ছয় হইতে আট মাসের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলাবয়ব দৃষ্ট হইয়াছিল (২নং চিত্র)। গৃহমধ্যস্থিত তাপে বিশোধিত আলুখণ্ডের উপরে এবং রুটির ক্ষেত্রে ইহার দেহাংশের বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

চিত্র—২

ভাস্বর *Mycena tintinnabulum* n. sp.-এর কালচার সম্পর্কে বোথের (Bothe) অভিজ্ঞতাও প্রায় এইরূপ। পার্থক্য শুধু এই তিনি যে নমুনা লইয়া কাজ করিয়াছেন তাহার আলো সবুজবর্ণ না হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল এবং কৃত্রিম কালচার করিয়া তিনি কোনরূপ ফলোদ্গম দেখিতে পান নাই।

কৃত্রিম উৎপাদনে ছত্রাকের দীপ্তির উপর সূর্য্যকিরণের ফল কিরূপ হয়, তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত কাচনল ও কাচপাত্রের কার্পাস-ছিপি (cotton plugs) খুলিয়া দিয়া এবং না খুলিয়া উভয় প্রকারেই কাচনল ও পাত্রস্থিত সূত্রাণুগুলিকে প্রত্যক্ষ সূর্য্যকিরণে রাখা হইয়াছিল। একমাত্র ছিপিখোলা অবস্থাতেই সূর্য্য কিরণ লাগিবার ফলে দীপ্তি কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পায় দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি সাধারণতঃ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। রুটির ক্ষেত্রে কাচনলে উৎপন্ন সূত্রাণুগুলি মাস দেড়েকের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া দিলেও দেখা গিয়াছে উহাদের দীপ্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে তাপদায়ক যন্ত্রের (Incubator) অভ্যন্তরে ২২° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও টিউবের মধ্যে ভাস্বর ছত্রাকের সূত্র প্রবিষ্ট (inoculate) করাইয়া দেওয়ার মাসেকের

ভিতরেই আলোর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের দীপ্তি নিরবচ্ছিন্ন (continuous) এবং ছত্রাকের পূর্ব্ব দীপ্ত অবস্থা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র —হার্ভে (Harvey) বীজাণু (bacteria) এবং সাধারণ ছত্রাক সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা ডুয়ার্স হইতে *Sterculia* sp. নামক বৃক্ষের যে সন্দীপক কাষ্ঠ পাইয়াছিলাম তাঁহার সহিত ইহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উক্ত কাষ্ঠের এক বিবরণ Die Naturwissenschaften (1-1930) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ কাষ্ঠে আলোর ছটা সবিরাম গতিতে বাহির হইত এবং সূর্য্যকিরণ দ্বারা জীবন্ত সূত্রাণুর সাধারণ উত্তেজনার উপরই দীপ্তি নির্ভর করিত। জোনাকির আলো সম্পর্কে পার্কিনের অভিজ্ঞতাও এইরূপ। জোনাকির আলো রাত্রিবেলাই থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠে। পার্কিনের সিদ্ধান্ত এই যে বাহিরের এই আলো সম্ভবতঃ রাসায়নিক সন্দীপনের (phosphorescence) প্রণালী অনুসারে সঞ্চয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নহে, ইহার প্রয়োজন স্বাভাবিক অবস্থা সতেজ করিবার জন্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত কাষ্ঠখণ্ডের ছত্রাক হইতে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সূত্রাণুতে কোনরূপ আলোর উদ্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন ক্ষেত্রে সূত্রাণু হইতে শেষ পর্য্যন্ত ফলোদ্গম না হওয়ায় ছত্রাকটির স্বরূপনির্দ্দেশও সম্ভবপর হয় নাই। মলিস্ (Molisch) বর্ণিত অজ্ঞাত ছত্রাক X-এর মতই উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত দেহাংশ মাত্রে রহিয়া গেল।

ছত্রাকের পক্ষে উহার দীপ্তির কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে তাহার কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, অন্ধকারের মধ্যে ইহার দীপ্তি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পরিণামে বরং ইহার ক্ষতিই সাধন করে। সম্প্রতি গুরভিটস্ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জানাইয়াছেন যে. বহুবিধ কোষ ও কোষস্তর হইতে কোষবিন্দু-বিভাজক অদৃশ্য রশ্মিসমূহ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে এবং তাহা বর্ণচ্ছত্রের বেগুনী-বহির্ভূত (Ultra-violet) রশ্মিস্থলে নিপতিত হয়। তাঁহাদের মতে যে স্থলে কোষগুলি অতিমাত্রায় বিভাজনশীল, পোষণ-নিরত কিংবা স্নায়বিক কর্ম্মরত অথবা যান্ত্রিক ক্রিয়ারত তাহারাই রশ্মিবিকীরণের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎস। পটোজ্‌কী (Potozky) ও ব্রুণষ্টাইন (Braunstein) এইরূপ বলিতে চাহেন যে একপ্রকার রাসায়নিক দহন কার্য্য হইতে গুরভিটস্ (Gurwitsch) বর্ণিত কোষবিন্দু-বিভাজক (Mitogenetic) রশ্মির মত সমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেগুনী-বহির্ভূত রশ্মি নির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং গুরভিটসের রশ্মিবিকীরণকে একপ্রকার রাসায়নিক দহন কার্য্য মনে করা যাইতে পারে। আলোচ্য ছত্রাকটির সম্পর্কেও এইরূপ দেখা যায় যে অক্সিজেনপ্রাপ্তির উপরই প্রধানতঃ উহার দীপ্তি নির্ভর করে, যদিও গুরভিটসের রশ্মিবিকীরণের সহিত পার্থক্য

এই যে, এই সদীপক ছত্রাকের আলোকরশ্মিসমূহ বেশীর ভাগই বর্ণচ্ছত্রের সবুজ অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কালক্রমে গুর্‌ভিটসের রশ্মিবিকীরণ সাধারণভাবে সমর্থিত হয়, তবে আমরা ছত্রাকের দীপ্তি সম্পর্কে একটা ভালরূপ ব্যাখ্যার আশা করিতে পারি।

প্রাণীজ আলো সম্পর্কে হার্ভের প্রণালী মতে এই *Pleurotus*-এর সূত্র হইতে প্রদীপ্ত অবস্থায় পাচক পদার্থ (enzyme) বাহির করিবার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কোষের বাহিরে (extracellular) এবং কোষের ভিতরে (intracellular) উৎপন্ন দুই প্রকারের পাচক পদার্থ মিশ্রিত করাতেও কোন প্রকার আলোর উদ্ভব হয় নাই।

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতির প্রতি সদীপক *Pleurotus*-এর আচরণ বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত সদীপক পত্র এবং বোঁটার আচরণেরই অনুরূপ। এই বিষয়ে Nature (January 30, 1926) পত্রিকায় আমি বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

পরিশেষে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই প্রদেশের খাণ্ডেলা হইতে আমি কয়েকটি মৃত কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্ত হই। কাষ্ঠখণ্ডগুলি ভিতরে ভিতরে ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত কাষ্ঠ সংগৃহীত হইবার প্রায় চারি মাস পরে পুণা আবহাওয়া আপিসের মিঃ কে, জে, কাব্রাজী (Mr. K. J. Kabraji) উহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। যাহা হউক ঐ কাষ্ঠখণ্ড যখন আমার হস্তগত হয়, তখন তাহার দীপ্তি প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুই তিন দিন পরিস্রুত জলদ্বারা সিক্ত করিয়া রাখার পরেই উহার দীপ্তি ফিরিয়া আসিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার ঢালু প্রদেশে বিশেষতঃ ২০০০ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ পর্ব্বতের শিখরে এরূপ সদীপক পল্লব সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি। উপরোক্ত সদীপক পল্লবের ভিতরকার দিক হইতে একটি টুকরা অতি যত্নে কালবিলম্ব না করিয়া কাচের পাত্রের মধ্যে পরিশোধিত রুটির ক্ষেত্রে (medium) বপন করা হইল। একই ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক বপনে দেখা গেল এক সপ্তাহের মধ্যেই রুটির বহির্ভাগ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া শ্বেত ছত্রাকসূত্রের (*Mycelium*) আবির্ভাব হইয়াছে। রু-কাচনলের মধ্যে সঙ্কুচিত অংশে সামান্য একটু জল দিয়া বিশোধিত সদীপক কাষ্ঠের উপর পৌনঃপুনিক উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়াতে এ পর্য্যন্ত আলোর উদ্ভব বা ফলোদ্গম হয় নাই। সুতরাং এই অবস্থায় সদীপক ছত্রাকটিকে সনাক্ত করিতে পারা যায় নাই। বক্সা ডুয়ার্স হইতে প্রাপ্ত সদীপক *Sterculia* কাষ্ঠের মত এই সমস্ত সদীপক পল্লবকেও সূর্য্যরশ্মিতে রাখিয়া দিলে ইহাদের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়।

দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ছত্রাকতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কৃষ্ণদাস বাগচি মহাশয়

১৯৩৪ সালের জুন মাসে যুক্ত-প্রদেশের চাক্‌রাটা অরণ্য হইতে রোডোডেণ্ড্রণ আর্ব্বোরিয়াম বা আরু নামক প্রসিদ্ধ গাছের কতকগুলি রুগ্ন শিকড় সংগ্রহ করেন। ঐ শিকড়গুলি একপ্রকার ছত্রাকদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি শিকড়ের আক্রান্ত অংশ হইতে সূত্রাণু গ্রহণ করিয়া মল্ট-এক্সট্রাক্ট এগার ক্ষেত্রে উহার পৌনঃপুনিক উৎপাদন করেন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উহার একটি উপচারা (sub-culture) গত বৎসর জানুয়ারি মাসে পাঠাইয়া দেন। ঐ ছত্রাকে রেণুদণ্ড এবং মূলাকার সূত্রকন্দ ছিল। এইরূপ মূলাকার সূত্রকন্দ ডাক্তার বাগচি ঐ অঞ্চলের চীরবৃক্ষ (Pine), দেবদারু (Deodar), পাঙ্গুদার (Abies) এবং চিত্রল (Spruce) বৃক্ষের মৃত কাষ্ঠে অনেক

চিত্র—৩

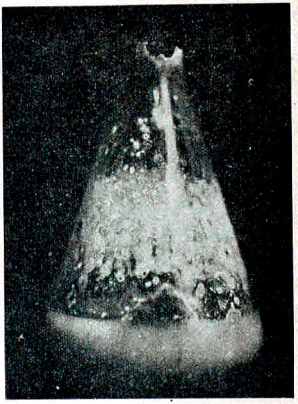

দেখিয়াছেন। প্রেরিত কাষ্ঠের সূক্ষ্ম ফালিতে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় আমি মূলাকার সূত্রকন্দ দেখিতে পাইয়াছি, উহারা কাষ্ঠময় অংশের মধ্যে প্রোথিত কতকগুলি ছত্রাকের গুটিকা (sclerotia-like bodies) হইতে নির্গত হইয়াছিল। আমি উহা হইতে ত্রিকোণাকার কাচের পাত্রের মধ্যে বিশোধিত রুটির ক্ষেত্রে অনেকগুলি উপচারা

তৈয়ারি করিয়াছিলাম। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষেত্রের উপর মূলাকার সূত্রকন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া গেল। স্থানে স্থানে উহারা বাদামি রঙ ধারণ করিয়া গুচ্ছাকারে জন্মিয়াছিল, প্রথমে সাদা থাকিয়া পরে উহারা বাদামি রঙের হয়। এই মূলাকার সূত্রকন্দগুলি তরুণ অবস্থায় অন্ধকারে মৃদু নীলাভ-সবুজ আলো বিকীরণ করে। কৃষিক্ষেত্রের নিম্নপৃষ্ঠে রজ্জুর মত মূলাকার কন্দও দেখা গিয়াছিল। ইহারা বড় হইলে আর আলো বিকীরণ করে না এবং স্পষ্টই বাদামি হইয়া যায়। আমাদের পরীক্ষাগারে কাচপাত্রের মধ্যে কৃত্রিম চাষে এখনও ইহার ফলোদ্গম হয় নাই। অন্ধকারে আলোকবিকীর্ণকারী মূলাকার সূত্রকন্দগুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া মনে হয় ইহারা আর্মিলেরিয়া (Armillaria) বংশজাত। উহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সচরাচর পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে ফলোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যে সব কাচের পাত্রে এই পরীক্ষাধীন ছত্রাকের পুনরুৎপাদন করা হইয়াছে তাহার একটির আলোকচিত্র (৩নং চিত্র) এইখানে প্রদত্ত হইল। ছত্রাকটি কাচপাত্রের ভিতরে প্রাচীর বাহিয়া উপর দিকে উঠিয়াছে। অন্ধকার কক্ষে ইহার বিক্ষিপ্ত আলোকের সম্মুখে সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাল ছয় ইঞ্চি দূরে ৪·৫ লেন্সযুক্ত ক্যামেরা রাখিয়া 'সুপার প্যান্‌ক্রোমেটিক প্লেট'-এর উপর ইহারই নিজ আলোয় ইহার ছবি তোলা হইয়াছিল।

সাহারা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

ভূমণ্ডলের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অনেকগুলি মরুভূমি দেখা যায়। উহাদের মধ্যে একমাত্র মঙ্গোলিয়ার গোবি বা সামো (চীনাদের শুষ্ক সমুদ্র) ব্যতীত বাকিগুলি ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটে* অবস্থিত। বিষুবরেখার উত্তরে প্রায় ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশ হইতে দক্ষিণে প্রায় ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত ভূভাগে গ্রীষ্মের প্রাধান্য খুব বেশী। সেইজন্য ঐ অঞ্চলকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে। এই গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর সীমার নাম কর্কট ক্রান্তি এবং দক্ষিণ সীমার নাম মকরক্রান্তি। কর্কটক্রান্তির নিকটে এশিয়ায় রাজপুতানার মরু, সিন্ধু প্রদেশের থর, পারস্যের লবণ-মরু, আরবের মরুভূমি; আফ্রিকায় লিবিয়ার মরু ও সাহারা এবং উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকোর মরু অবস্থিত। আর মকরক্রান্তির নিকটে অষ্ট্রেলিয়ার মরু, দক্ষিণ আফ্রিকায় কালাহারি মরু এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আটাকামা মরু বিদ্যমান।

ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটেই এত মরুভূমি হওয়ার কারণ কি? জল ও রৌদ্র ব্যতিরেকে কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। সুতরাং বৃষ্টির অভাবেও উচ্চক্ষেত্র সমূহ বৃক্ষলতাদি শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে। আবার কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে দৃশ্যতঃ মরুময় প্রদেশও শস্যশ্যামল না হইতে পারে, এমন নহে। পাঞ্জাবের অনেকগুলি দোয়াব এক্ষণে প্রণালিকা সিঞ্চনের (irrigation) ফলে ঊর্ব্বর গোধূমক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবেই পূর্ব্বোক্ত ভূভাগ সমূহ অনুর্ব্বর মরুভূমির আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটস্থ প্রদেশে বৃষ্টি কম হয় কেন? উক্ত ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটে বায়ু নিশ্চল থাকে অর্থাৎ দূরবর্ত্তী সমুদ্র হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ পূর্ব্বক বায়ুপ্রবাহ ঐ দুই কটিবন্ধে (belts) ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় না। সেইজন্যই ঐ দুই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের একান্ত অভাব ঘটে।

ঐ দুই অঞ্চলে বায়ু নিশ্চল অর্থাৎ স্থির থাকার কারণ কি? পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, ঐ দুই প্রদেশে ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুর চাপ খুব বেশী। সেই কারণে ঐ সব স্থান হইতে অল্প বায়ুচাপযুক্ত বিষুবমণ্ডল ও মেরুমণ্ডলের দিকে বায়ুপ্রবাহ অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহাদের একটির নাম বাণিজ্য বাতাস এবং অপরটি বিপরীত বাণিজ্য বাতাস নামে অভিহিত।

ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটে বায়ুর চাপ অধিক হয় কেন? বিষুববৃত্তের নিকটস্থ ভূভাগে

সৌরকর ন্যূনাধিক লম্বভাবে পড়ে। তাহার ফলে ঐ অঞ্চল অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয়। আবার ঐ উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে তত্রত্য বায়ু উষ্ণ হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা হইয়া উর্দ্ধে উঠে। সুতরাং ঐ অঞ্চলে বায়ুচাপ কমিয়া যায়। তজ্জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বাতাস আসিয়া উহার স্থান পূর্ণ করে। আবার উহারাও উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া উর্দ্ধাকাশে উঠিতে বাধ্য হয়। তখন পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের শীতল ও ভারী বাতাস আসিয়া উহাদিগকেও উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দেয়। বিষুববৃত্তের নিকটস্থ ভূপৃষ্ঠে নিয়ত এইরূপ বায়ুস্রোত বহিয়া থাকে।

যে উষ্ণ ও হাল্‌কা বায়ু উর্দ্ধাকাশে উঠে, উহার কিয়দংশ উত্তর মেরু এবং বাকি অংশ দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। উদ্ধাকাশের বায়ু শীতল। সুতরাং ঐ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উপরোক্ত উষ্ণ বায়ু শীতল এবং ভারী হইতে বাধ্য হয়। বিশেষতঃ উর্দ্ধাকাশ

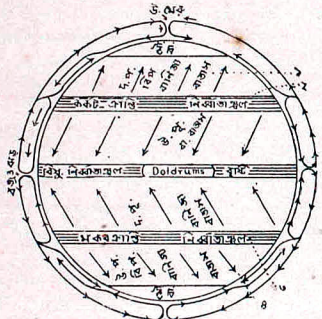

চিত্র—১
ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটস্থ শান্ত কটিবন্ধ (Belts of calm)

দিয়া উহা যতই মেরুর দিকে অগ্রসর হয়, ততই উহার তাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। কাজেই উহার অধিকাংশই ক্রমশঃ নীচে নামিতে নামিতে ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটে ভূপৃষ্ঠের উপরে আসিয়া পুঞ্জীভূত হয়। এই কারণেই ঐ সব অঞ্চলে বায়ুর চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটে বায়ুর চাপ অত্যধিক হওয়ায় দূরবর্ত্তী সমুদ্রাদির উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বাতাস বহিবার অবসর পায় না।

তাহাতে ঐ সব স্থান নির্ব্বাত প্রদেশে পরিণত হয়। আবার উর্দ্ধাকাশ হইতে যে বায়ু ভূপৃষ্ঠের দিকে নামিয়া আসে, উহাও ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া বহে না, খাড়াভাবেই নামিয়া থাকে। সেইজন্যও ঐ দুই শান্ত "কটিবন্ধে" (Belts of calm) বায়ু চলাচল হইতে পারে না। ফলে ঐ দুই অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের সহিত অন্যত্র হইতে মেঘ আসিয়া বৃষ্টিদান করিবার অবসর পায় না। সেইজন্যই ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটেই নির্ব্বাত প্রদেশে এত অধিক মরুভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাহারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও অত্যুষ্ণ মরুভূমি। ইহা আফ্রিকার উত্তরাংশে অবস্থিত। এই বিস্তৃত মরুভূমির পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহাসাগর; পূর্ব্বসীমা লোহিত-সাগর; উত্তর সীমা ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশ সমূহ অর্থাৎ মরক্কো, এলজিরিয়া ও লিবিয়া। মিশরের অনেক অংশ ইহারই অন্তর্ভুক্ত। আর দক্ষিণ সীমা—সুদানের তৃণক্ষেত্র ও মোটামুটি ১৫° উঃ অক্ষাংশ। নীলনদের উভয় পার্শ্বস্থ হরিৎক্ষেত্রসমূহ ও লোহিত সাগর না থাকিলে ইহা আরব, পারস্য ও থর মরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারিত। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইহার বালুকারাশি ভূমধ্যসাগরের বেলা ভূমিতে গিয়া শেষ হইয়াছে।

অবস্থান ও সীমা

সাহারার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ১২,০০০ মাইল। ইহার আয়তন ২০ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের প্রায় ৪ গুণ এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপের আয়তনের সমান।

আয়তন

সাহারা নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় বিরাট সমতলক্ষেত্র নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে কত কত পর্ব্বত, কত কত গহ্বর ও গিরিসঙ্কট বিদ্যমান। কোথাও ইহার বালুকারাশি ধূসর বর্ণযুক্ত, কোথাও বা রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের প্রস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি করিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও শুষ্ক মৃত্তিকা ও কর্দ্দম বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্র বায়ুতাড়িত বালুকা-রাশির তীক্ষ্ণ সংঘর্ষণের ফলে মসৃণ হইয়া গিয়াছে।

নৈসর্গিক বৈচিত্র্য

সাহারার অধিকাংশ স্থানই বালি-পাথর (Sand-stone) এবং চুণাপাথরে (Lime-stone) পূর্ণ। এই সকল প্রস্তর শায়িতভাবে বিন্যস্ত। তজ্জন্য সাহারার অভ্যন্তরস্থ কি উচ্চ মালভূমি, কি অত্যুচ্চ সমতল এবং নিম্ন ভূভাগ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পর্ব্বতমালা ও সাহারার মধ্যে কয়েকটি লবণাক্ত হ্রদ বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক কালে সাহারা যে তথাকথিত আধুনিক ভূমধ্যসাগরের তলদেশে বিরাজ করিত কিন্তু ভূমিকম্পাদির ফলে এখন উচ্চ ভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ঐ সকল লবণাক্ত হ্রদই উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উহারাই তখন অতিশয় গভীর সমুদ্রতল ছিল; পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সমুদ্রের জলরাশি সরিয়া যাওয়ায় উহারা এখন হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কোন কোন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার কৃত্রিম খালের সাহায্যে ঐ সকল হ্রদকে সমুদ্রের লবণজলে পরিপূর্ণ করিয়া সাহারার অধিকাংশ স্থানকে নূতন ও বৃহত্তর ভূমধ্যসাগরে রূপান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন যে উহার ফলে এই অঞ্চলের জলবায়ুর বিষম তীব্রতা হ্রাস পাইবে এবং অনেক স্থানকে উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই আকাশ-কুসুম কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কেন না সাহারার অধিকাংশ স্থানই ক্ষুদ্র সমতল হইতে অনেক উচ্চ; কোন কোন স্থান আবার পর্ব্বত সমান উন্নত। উপরোক্ত হ্রদগুলির তলদেশও সমুদ্র সমতল হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে সাহারা বারিবিন্দুশূন্য বালুকাপূর্ণ এবং বৃক্ষলতাদি বিহীন এক বিরাট অনুর্ব্বর ক্ষেত্র মাত্র। কিন্তু ফরাসী পরিব্রাজক ফুরো (M. Foureau) এবং জার্ম্মাণ পরিব্রাজক হার-ভিচার (Herr Vischer) এই ভ্রান্ত ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আল্‌জিরিয়া প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ বিস্‌ক্রা (Biskra) নগর হইতে দক্ষিণ মুখে এবং পরবর্ত্তী জন ত্রিপোলি বন্দর হইতে চাদ (Chad) হ্রদ পর্য্যন্ত অনুচরবর্গসহ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহারা বলেন যে সাহারা বৈচিত্র্যবিহীন একটি একঘেয়ে বালুকাময় মরুভূমি নহে। ইহা বরঞ্চ প্রস্তরীভূত সমুদ্র বিশেষ; জলের পরিবর্ত্তে ইহার সর্ব্বত্র বালুকা ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ। ইহার এক এক স্থানে পানীয় জলের অবশ্য অভাব নাই। ঐ সকল স্থানে খর্জ্জুর ও বাব্‌লা জাতীয় কণ্টকময় গুল্মাদি জন্মে। অল্প সংখ্যক লোক এই সকল উর্ব্বর স্থানে অতি কষ্টে বসবাস করিয়া থাকে। এই সকল স্থানের নাম মরুদ্যান (Oasis)। বিস্‌ক্রা এইরূপ একটি মরুদ্যান মাত্র। ইহার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে সাহারাকে নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় সমভূমি বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলেই পরিব্রাজক বুঝিতে পারেন যে তিনি "চোরাবালি" বা কাদার "দলদলির" মধ্য দিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছেন। কোথাও বা বিস্তৃত ফাটল (cracks) বিদ্যমান; কোথাও আবার উচ্চ পর্ব্বত দণ্ডায়মান। কোন স্থানে 'বালিয়াড়ি' বা বালুকাস্তূপ রহিয়াছে। উহাদের অনেকগুলি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পর্ব্বতসমূহ অপেক্ষাও উচ্চ। উহাদের উপর হইতে দেখিলে সাহারার অনেক স্থানকেই সত্য সত্য চক্ষুর পীড়াদায়ক একঘেয়ে প্রশান্ত সমতল বলিয়াই অনুমান হয় বটে; মনে হয় যেন সম্মুখে কোথাও কোন পর্ব্বতাদির চিহ্নমাত্রও নাই। ঐ সকল বালুকা পর্ব্বতের উপরিভাগ সাধারণতঃ সমতল বিশেষ। সাহারার কোন কোন স্থানে শুষ্ক নদীখাত (Ravines) বিরাজ করিতেছে। অনেক স্থানই শুষ্ক মৃত্তিকা ও কঙ্করে পরিপূর্ণ। দেখিতে অনেকটা পিঙ্গল বা কটা রঙের। তবে মাঝে মাঝে লাল বালি-পাথর, নীল বা ঈষৎ লাল প্রস্তর, শ্বেত বা সবুজ শিলাস্তর, সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের শিলাখণ্ড (black basalt), ক্ষয়িত লাভা প্রভৃতি বিদ্যমান। প্রভাতকালে উদীয়মান এবং সন্ধ্যাকালে অস্তগামী সূর্য্যের রঙীন কিরণ এই সকল বিচিত্রবর্ণের পাষাণের উপরে পতিত হইয়া মনোহর

উজ্জ্বল বর্ণের উৎপত্তি ঘটায়। ফলতঃ পরিব্রাজকগণ সাহারার একঘেয়ে বালুকা প্রান্তরের বর্ণনা বড় একটা প্রদান করেন নাই, বরঞ্চ ইহার অভ্যন্তরস্থ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গসমূহ, উহাদের দুরধিগম্য খাড়া পার্শ্বদেশ, বাত্যাতাড়িত বালুকাকণা দ্বারা ঘষিত ও খণ্ডিত পর্ব্বত গাত্র, গোলাকার প্রস্তরখণ্ড সকল, সূর্য্যকিরণে বরফের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লবণ-পর্ব্বত সমূহ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের তুষার নদী সকল দ্বারা খনিত খাত সকলের গোলকধাঁধা এবং লোহিত পর্ব্বতগাত্রে সদ্য ক্ষতের ন্যায় রক্তবর্ণ শিলাসমূহেরই বর্ণনা প্রদান করিয়া থাকে। মনে হয় যেন কোন বিরাটকায় জহ্নুমুনি এক নিশ্বাসে সাহারা সমুদ্রের সমগ্র জলরাশিকে শোষণ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইজন্য উহার তলদেশের বিচিত্র শোভা এখন দর্শকের নয়নপথে পতিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। ফলতঃ লবণ ও ক্ষার পূর্ণ শুষ্ক ভূভাগগুলিকে দিনের উজ্জ্বল আলোকে সাহারার সুন্দর শস্যক্ষেত্র বলিয়া ভ্রম হয়। আবার পর্ব্বত গাত্রের স্থানে স্থানে সৈন্ধব লবণের খনি দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে চোরা বালির বিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়া চলিবার সময় পথিকের হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। কখন কখন উষ্ট্র পর্য্যন্ত উহার মধ্যে প্রোথিত হইয়া প্রাণ হারায়।

সাহারার পৃষ্ঠদেশ কোথাও সমুদ্র সমতল হইতে গড়ে ৬০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত; আবার উহার কোন অংশ গড়ে ৫ হাজার ফুট উচ্চ। উহার মধ্যভাগে টিবেষ্টি (Tibesti) পর্ব্বত

পর্ব্বত ও মালভূমি

অবস্থিত। ইহার মৃত-আগ্নেয়গিরিশৃঙ্গ কুশী (Kussi) প্রায় ১১ হাজার ফুট উচ্চ। প্রাগৈতিহাসিক কালে একটা জলাঙ্ক সাহারাকে দ্বিধা বিভক্ত করিত। ইহার পশ্চিমদিকের নদী সকল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে এবং পূর্ব্বপ্রান্তের নদীগুলি ভূমধ্যসাগরে প্রবাহিত হইত। এখন অবশ্য ইহাদের অস্তিত্ব নাই কিন্তু প্রাচীন খাত সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জলাঙ্ক বর্ত্তমান ইংরাজাধিকৃত সুদানের কর্ডোফান জেলা হইতে টোয়াট-খাত (Tuet depresion) পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্বকোণ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। এই জলাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই; তবে ইহার প্রধান প্রধান অংশ উত্তরে টাডেমায়ট্ (Tademayt), টাসিলি আস্‌গার্ (Tasili Asgar), মুইডির (Muidir) এবং আহনেট্ (Ahnet) মালভূমি নামে খ্যাত। ইহাদের দক্ষিণে বৃহৎ আহাগ্‌গার পর্ব্বতশ্রেণী (Ahaggar mountains) প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চ। এয়ার (Air) মালভূমিটি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর; ইহা নাইজার নদী এবং চাদ হ্রদের মধ্যে অবস্থিত। টাসিলি পর্ব্বত হইতে টিবেষ্টি পর্ব্বতমালা দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ক্রমনিম্ন হইয়া উর্ব্বর বোর্কু (Borku) এবং এন্নেডি (Ennedi) অঞ্চলে মিশিয়া গিয়াছে।

সাহারার মধ্যভাগস্থ এই উচ্চ জলাঙ্কের উভয় পার্শ্বে গভীর বালুকারাশি অবস্থিত। ইহারই উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রসিদ্ধ লিবিয় মরু (Libyan desert)—প্রকৃতপক্ষে একটি বালুকাময় মালভূমি। এই মরু পূর্ব্বদিকে নীলনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে মনুষ্য পদচিহ্নবিহীন শত শত মাইল দীর্ঘ বালুকা প্রান্তর বিদ্যমান; তবে মাঝে মাঝে এখানে

সেখানে বাত্যাতাড়িত বালুকাস্তূপ (windbuilt-dunes) এবং বারিবিন্দুহীন অসংখ্য নিম্নভূমি দৃষ্ট হয়। এই মরুর পশ্চিমদিকে জনমানবহীন লাল মালভূমি (Hammada el Homra Red Plateau) ৮ ত্রিপোলি বন্দর হইতে পণ্যবাহীদল ইহারই উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

সাহারার উত্তর-পশ্চিমদিকে অপরিজ্ঞাত ও মানববসতিহীন "এলজুফ" (El Juf) বা বৃহৎ খাত বিদ্যমান। আর ইহারই পূর্ব্বদিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। এই সকল পর্ব্বতের অদূরে বিখ্যাত লবণ খনির আধার টাণ্ডেনি (Tandeni) খাত রহিয়াছে।

সাহারার অধিকাংশ স্থানই বালুকাস্তূপ দ্বারা আবৃত। টিবেষ্টি মালভূমি প্রায় এক হাজার মাইল জুড়িয়া অবস্থিত। ইহার কোন কোন স্থান প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চ। ইহারই স্থানে স্থানে অত্যল্প বৃষ্টিপাত হয়।

সাহারার মধ্যে কোন নদী নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র সারি নদী সুদানের মধ্য দিয়া চাদ্হ্রদে পড়িতেছে। বাহর-এল-ঘজল Bahr-el-Ghazel) নদী বৃটিশ সুদানের পশ্চিমদিক হইতে পশ্চিমমুখে চাদ্হ্রদে পড়িতেছে। বাহর-এস-সালামৎ (Bahr-es-Salamat) নদী ডারফুর মালভূমির পশ্চিমাংশের জল লইয়া সারি নদীতে পড়িতেছে। পশ্চিম সাহারা ও এলজিরিয়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি নদী দৃষ্ট হয়। উহারা অবশ্য নগণ্য।

নদী

সাহারার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি হ্রদ রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে চাদ (Chad) হ্রদই প্রধান। সাহারার যে সকল অংশ সমুদ্র সমতল অপেক্ষা নিম্ন সেই সকল স্থানেই লবণময় হ্রদ দেখা যায়। সারি নদীর লবণাক্ত জল চাদ্হ্রদে জমায় উহা লবণাক্ত হইয়াছে।

হ্রদ

সাহারার ন্যায় অতি-বিস্তীর্ণ ভূভাগে আকস্মিক বৃষ্টিপাতকে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে হয়; কেন না এখানে বৃষ্টি বড়ই দুর্লভ। ৫।৭ বৎসর অন্তর সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাত হয় মাত্র। তবে কখন কখন পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে কাল-বৈশাখী ঝড়জল দেখা দেয় বটে। কোন কোন পর্ব্বতের উপরে অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। আবার কোন কোন পর্ব্বতশৃঙ্গ যে সময় সময় তুষারাচ্ছন্ন না হয় এমন নহে। তবে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবেই এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ড সাহারা অর্থাৎ মরুময় হইতে বাধ্য হইয়াছে।

জলবায়ু

একই অক্ষাংশে অবস্থিত হইয়া বাঙ্গালা দেশ বৃষ্টিবহুল কিন্তু সাহারা বারিবিন্দুবিহীন হইল কেন? বৃষ্টিপাতের জন্য বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। অতএব যে সকল স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাহারা হয় সমুদ্রতীরে না হয় জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের পথে অবস্থিত। বাতাবর্ত্তের পথে অবস্থিত স্থান সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে থাকিলেও সেখানে বেশী বৃষ্টিপাত হয় না;

বৃষ্টিপাত

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ভাগ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ফলতঃ কোন একটি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, যথা :—

(১) বায়ুপ্রবাহের দিক :—

যখন জলীয় বাষ্পপূর্ণ গরম বাতাস শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন তাপক্ষয়ের ফলে উহার অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প জমিয়া জলকণায় পরিণত হয় এবং ঐ সকল জলকণা একত্রীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। এইজন্য গরম দেশ হইতে শীতল দেশের দিকে প্রবাহিত বিপরীত-বাণিজ্যবাতাস প্রচুর বৃষ্টি আনয়ন করে। দক্ষিণ ইউরোপে এই কারণেই যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

আবার শীতল অঞ্চল হইতে গরম অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হইলে বায়ুস্থিত জলকণা তাপাধিক্যের ফলে পুনরায় জলীয় বাষ্পাকার ধারণ করে। বাণিজ্যবায়ুপ্রবাহ হইতে বিষুবরেখার উপরিস্থ সমুদ্রে এইজন্যই বৃষ্টিপাত হয় না। সাহারা অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত অতীব কম, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

(২) অরণ্যানী :—

সুবিস্তৃত গভীর অরণ্যানী তাপবিকিরণে বাধা প্রদান করে। সেইজন্য সেখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সাহারাঞ্চল অরণ্যানীশূন্য। সুতরাং এখানে ভূপৃষ্ঠ তাপবিকিরণে কোনরূপ বাধা পায় না। কাজেকাজেই এখানকার বায়ুমণ্ডল বৃষ্টিহীন ও শুষ্ক।

(৩) ভূমির প্রকৃতি :—

যদি কখনও সাহারার কোন অংশে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, ঐ জল সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না। কারণ ঐ অঞ্চল মোটামুটি সমতল; তাহার ফলে সামান্য জল অনেকটা স্থানের উপরে ছড়াইয়া পড়ে। আবার বালুকার পক্ষে এঁটেলো মাটির ন্যায় জল ধারণ করাও সম্ভবপর নহে। এই সব কারণে সাহারা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

৪। পর্ব্বতের অবস্থান—

জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন তাপাধিক্যের ফলে হাল্কা হইয়া ঊর্দ্ধাকাশে উঠিতে থাকে, তখন তত্রত্য বায়ুর চাপ অনেক কম বলিয়া বাষ্পপূর্ণ ঐ বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পায়। ঊর্দ্ধাকাশের স্বাভাবিক শৈত্য সংস্পর্শে ঐ বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে উহার জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার হ্রাস পায়। সুতরাং পরিত্যক্ত অতিরিক্ত বাষ্প জমিয়া মেঘের সৃষ্টি করে। যখন কোন একটি উচ্চ পর্ব্বতমালা বায়ুপ্রবাহের গতিপথে সমকোণে অবস্থিত হইয়া উহার গতিরোধ করে, তখন পর্ব্বত প্রাচীরে ঐ বায়ুপ্রবাহ প্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে বাধ্য হয়। সুতরাং পর্ব্বতের ঐ পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। হিমালয়ের দক্ষিণগাত্র ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে এইজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসের ফলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়। বোম্বাই সহরের নিকটে বৎসরে প্রায় ২৬০ ইঞ্চি, আর আসামের চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে

বৎসরে গড়ে প্রায় ৫০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু হিমালয় পার হইয়া যখন ঐ গ্রীষ্ম মৌসুমী বাতাস উত্তর চীনের দিকে চলে, তখন উহা প্রায় বাষ্প-বিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে চীনের উত্তর অঞ্চলে মঙ্গোলিয়ার মধ্যে গোবি বা সামো (চীনের শুষ্ক সমুদ্র) মরুভূমির উদ্ভব হইয়াছে।

উপকূলস্থিত পর্ব্বত প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতার ফলে ভারত মহাসাগর হইতে আগত উত্তর-পূর্ব্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস সাহারা অঞ্চলে পৌছিতে পারে না। গিনি উপসাগরের বাতাস সাহারা অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই উপকুলস্থিত পর্ব্বত-গাত্রে অধিকাংশ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। এই সব কারণেই সাহারা অঞ্চল জলকণাবাহী বায়ুপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত। সাহারা অঞ্চলে সাধারণতঃ উত্তর-পূর্ব্ব বাণিজ্যবাতাস বহিয়া থাকে। বলা বাহুল্য উহা স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া শুষ্ক।

আবার সাহারার বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর সূর্য্যকিরণে অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে উহার সংস্পর্শে তত্রত্য বায়ুও উষ্ণ হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও হাল্কা হইয়া উর্দ্ধাকাশে উঠিয়া যায়। সুতরাং ঐ স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুর চাপ কম হয়। সেইজন্য ভূমধ্য সাগরের উপর হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বাতাস সাহারার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু কোন উচ্চ পর্ব্বতের বাধা না পাওয়ায় ঐ বাতাস উর্দ্ধাকাশে উঠিয়া বৃষ্টি দান করিবার সুযোগ পায় না। বরং উহার জলকণাসমূহ সাহারায় আসিয়া তত্রত্য তাপাধিক্যের ফলে পুনরায় বাষ্পাকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ভূমধ্যসাগর হইতে প্রবাহিত বাতাসও সাহারা বক্ষে বৃষ্টি দান করিবার সুযোগ পায় না। লিবিয়া এবং গিডি* অঞ্চলেও বৃষ্টি না হওয়ার ইহাই কারণ।

আবার আটলাস পর্ব্বতের সম্পূর্ণ বাধার ফলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস সাহারা অঞ্চলে পৌছিবার পূর্ব্বেই একরূপ বাষ্পহীন হইতে বাধ্য হয়। হিমালয়ের বাধার ফলে গোবি অঞ্চল যেরূপ মরুময় হইয়াছে, আটলাস পর্ব্বতের প্রতিবন্ধকতার দরুণ উত্তর সাহারাও সেইরূপ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

সাহারার জলবায়ু ভীষণ তীব্র "extremes, extremes by change more fierce" দিনের বেলায় কি উচ্চ ভূভাগ, কি নিম্ন সমতল সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে প্রায় অগ্নিতুল্য হইয়া উঠে। কেননা তখন সৌরতাপ ১৫০° ডিগ্রী অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। উত্তপ্ত বালুকার উপরে ধান দিলে খৈ হইয়া পড়ে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম তাপও ১২০° পর্য্যন্ত হয় না। ইহা হইতেই সাহারার রৌদ্রের তাপ কিরূপ প্রচণ্ড হয়, তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়।

* উচ্চ উচ্চ বালুকাস্তূপ বা বালিয়াড়িকে গিডি (Gidi) বলে। লিবিয়া প্রদেশের দক্ষিণে এই সব স্তূপ অধিক থাকায় ঐ অঞ্চলকেও সংক্ষেপে "গিডি" অঞ্চল বলা হয়।

কিন্তু রাত্রিকালে আকাশ সাধারণতঃ নির্ম্মল থাকে বলিয়া দিবা ভাগের ঐ প্রচণ্ড তাপ সম্পূর্ণ বিকীর্ণ হইয়া যায়। এমন কি উচ্চস্থানে তাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ সঙ্ঘাতাঙ্কের (freezing point) অর্থাৎ ৩২° ফারেনহাইটের কয়েক ডিগ্রী নিম্নে নামিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে ভূপৃষ্ঠ যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, তত শীঘ্র তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল হইয়া থাকে। এইজন্যই সাহারা দিনের বেলায় যেরূপ ভীষণ উত্তপ্ত, রাত্রিকালে সেইরূপ ভীষণ শীতল হইয়া পড়ে। দিবা ও রাত্রির এই তাপ পার্থক্য ভীষণ কষ্টদায়ক মনে হয়।

দিবা ভাগের প্রচণ্ড উত্তাপে সাহারাস্থিত পর্ব্বতগাত্র ভীষণ উত্তপ্ত হয়। তাহার ফলে উহার গাত্রস্থ শিলা সমূহ প্রসারিত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু রাত্রিকালে

অত্যধিক তাপ ও শৈত্যের প্রভাব

আবার অত্যধিক তাপক্ষয়ের ফলে ঐ সকল পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলা (rock) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ দিনের বেলায় পার্ব্বত্য শিলাখণ্ডসকল প্রসারিত এবং রাত্রিকালে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়। দিনের পর দিন এই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন চলিয়া থাকে। ইহার ফলে পার্ব্বত্য শিলাগাত্র নিয়ত আল্‌গা হইয়া পড়ে ও ফাটিতে বাধ্য হয়। মোজার গার্টার (garter) নিয়তঃ খোলা ও পরার ফলে আল্‌গা হইয়া যায় ও পায়ের সঙ্গে ঠিক লাগিয়া থাকে না। পর্ব্বতগাত্রস্থ শিলাস্তরও ঐরূপ আল্‌গা হইয়া থাকে। তাহার ফলে উহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খণ্ডে ভগ্ন হইয়া যায়। কখন কখন ঐ সকল শিলাখণ্ড উচ্চ পর্ব্বতগাত্র হইতে খসিয়া নিম্নে পড়ে ও সেই আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বালুকায় পরিণত হয়। সাহারাতে যে সকল ঝড় বহে, উহার আঘাতেও ঐ সকল আল্‌গা শিলাখণ্ড সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে ও নিম্নস্থ পাষাণের উপরে পড়িয়া চূর্ণীকৃত হয় এবং বালুকাকণার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বালুকারাশির বৃদ্ধি ঘটিতেছে বলিয়াই সাহারা অত বালুকাময় হইয়াছে। এই সকল বালুকা অবশ্য একই ধরণের নহে। মোটা ও মিহি সকল রকমের বালুকাই কোথাও স্তরবিন্যস্ত ভাবে, আবার কোথাও বা তরঙ্গাকারে স্তূপীকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইয়া থাকে। ঝড়ের সঙ্গে উড়িয়া আসিয়া বালুকারাশি কোথাও কোথাও স্তূপীকৃত না হয় এমন নহে। এই সব কারণে সাহারা বক্ষে এত উচ্চ উচ্চ বালুকাস্তূপ বা বালির পাহাড়ের উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন স্তূপ সহস্রাধিক ফুট উচ্চ। কখন কখন এই

বালিয়াড়ি

সকল বালিয়াড়ি (sand dunes) মাধ্যাকর্ষণের টানে একই স্থানে আবদ্ধ থাকে; কোন কোনটিকে নিম্নোক্ত ঝরণার জলে আবদ্ধ রাখে। আবার কোন কোনটি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়। সেইজন্য আজ যেখানে সমতলভূমি, কাল হয়ত সেখানে উচ্চ বালুকাস্তূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার আজ যে স্থানে উচ্চ উচ্চ বালুকার পাহাড় বিদ্যমান, কয়েকদিন পরে সেই স্থানই সমভূমিতে পরিণত হইয়া

যায়। এই সকল বালুকাস্তূপের পৃষ্ঠদেশ এত আল্‌গা যে জীবজন্তু, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত উহার মধ্যে অতি সহজেই তলাইয়া যাইতে পারে। ইহাদের যে পার্শ্বে ঝড় আসিয়া লাগে, সেই দিক্ অবশ্য ক্রমোচ্চ হইলেও বিপরীত পার্শ্বে অনেকস্থলেই খুব খাড়া বা গহ্বরযুক্ত হয়।

দিবাবসানে সাহারা রক্ষে প্রায়ই ঝড় দেখা দেয়। এই ঝড় নানা দেশ পর্য্যন্ত যায়। সাহারার এই উষ্ণ ঝড়কে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে। সিশর দেশে ইহার নাম খাম্‌সিন। আটলাণ্টিক উপকূলে ইহা হার্ম্মাটান নামে কথিত, লিবিয়া অঞ্চল হইতে প্রবাহিত উষ্ণ ঝড়কে সিসিলি ও ইতালীর লোকেরা সিরকো বলিয়া থাকে; তুরস্কদেশে ইহারই নাম সেসিয়াল; স্পেনে সোলানো, আরব ও সিরিয়া অঞ্চলে ইহাই সাইমুম নামে পরিচিত।

বালুকা-ঝড়

অন্যান্য দেশে জলীয় বাষ্প কুয়াসার আকারে যেরূপ বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে সাহারায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকাকণা সেইরূপ বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া সূর্য্যকে মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টজ্জ্বল ও জ্যোতিহীন দেখায়। আবার প্রবল ঝড়ের সময় করকার ন্যায় কঙ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে। হতভাগ্য অনেক পথিক উহার ফলে অর্দ্ধপ্রোথিত হইয়া পড়ে। অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ইহার হস্তে পড়িয়া দারুণ কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ক্যানন-টিষ্টরাম (Canon Tristram) বালুকা-ঝড়ের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "প্রবল ও তীক্ষ্ণ ঝড় বহিয়া বায়ুমণ্ডলকে বালুকা দ্বারা সম্পূর্ণ পরিগর্ভিত (saturated) করিয়া ফেলে। তাহার ফলে আমাদের দেহের লোমকূপ সমূহ অগ্নিতুল্য বালুকাকণা দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল; আমাদের শরীর ফুলিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল—বালুকাস্তরের সূতীক্ষ্ণ কণা সকল যেন আমাদের ত্বক ভেদ করিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে চক্ষু লাল হইয়া উঠিল; যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিলাম। আর যেন চক্ষু মেলা যায় না। কি আকাশ, কি বায়ুমণ্ডল সর্ব্বত্র যেন বালুকাকণায় ওতপ্রোত হইয়া গেল। আমরা ভাতের সঙ্গে বালুকা চর্ব্বণ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের শুষ্ক রুটিও বালুকাকণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা দূষিত হইয়া গেল। কাজেই আমরা বালুকাময় ঐ ঘোলা জলই পান করিতে বাধ্য হইলাম। রুটি কাটিবার উদ্দেশ্যে ছুরিখানাকে খুলিতে গিয়া দেখি উহা কর্ কর্ করিতেছে। আমার পেন্সিলটা পর্য্যন্ত কাগজের উপর খর্ খর্ করিতে থাকে। বন্দুকের ছিদ্র পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের তামাক পর্য্যন্ত বালুকার জন্য ভারী হইয়া পড়ে। কাফিপাত্রগুলাও বালুকার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। আমাদের দাড়িগোঁফ পর্য্যন্ত বালুকায় ভরিয়া উঠে ও আমাদিগকে অদ্ভুত দেখায়।"

প্রবল ঝড়ের সময় কখন কখন লাল বালুকারাশি ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইয়া বহু দূরে নীত হয়। এমন কি সুদূরবর্ত্তী আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া চলিবার সময় অনেক

জাহাজের উপরে সাহারার লাল বালুকাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই একই কারণে ইতালীদেশে কখন কখন "রক্তবৃষ্টি" (blood-rain) দেখা দেয়। আবার কোন কোন সময় সাহারার উত্তপ্ত ভীষণ ঝড় আট্‌লাস পর্ব্বতস্থিত অরণ্যানীকে বিনষ্ট করিয়া সুদূরবর্ত্তী উচ্চ আল্‌পস্ পর্ব্বতকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করতঃ জার্ম্মাণিতে গিয়া পৌঁছে।

গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের অবসান ঘটিলে যখন সর্ব্বজীবের ভীতি উৎপাদক বালুকা-ঝড় বহিতে আরম্ভ করে, তখন অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকারাশি অতীব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিক গুমট গরমে পূর্ণ হইয়া যায়; দেখিতে দেখিতে আকাশ পাতাল বালুকা-কণায় আবৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন ঐ প্রবল ঝটিকা ভীষণ শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। হতভাগ্য পথিক বালুকার অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া পড়ে এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঝড়ের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হয় ও মুখমণ্ডলকে আবৃত করিয়া রাখে—পাছে অত্যুষ্ণ বালুকাকণা পরিগর্ভিত ঐ শুষ্ক বাতাস নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতঃ শ্বাসনালীকে শুষ্ক করিয়া ফেলে ও প্রাণনাশ ঘটায়। হতভাগ্য পথিকের বাহন উষ্ট্রটি প্রাণের দায়ে অগ্নিতুল্য বালুকারাশির উপরে অনেক সময় বসিয়া পড়ে ও বালুকা সরাইয়া উহার মধ্যে নাসিকা প্রোথিত করিয়া মরার মত পড়িয়া থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঐ মারাত্মক ঝড় অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্যত্র চলিয়া যায়। পথিক ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে ঐ ঝড়ের অবসানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে।

আবার কখন কখন ঝড়ের সঙ্গে বালুকাস্তম্ভ (sand-spouts) দেখা দেয়। তখন উহাকে সত্যসত্যই আগুনের স্তম্ভ বলিয়া মনে হয়। ঘূর্ণায়মান ঐ সকল বালুকাস্তম্ভের সম্মুখে পড়িলে পথিক বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে ও কখন কখন ঐ অগ্নিতুল্য বালুকার মধ্যে সমাধিলাভ করিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করে। ফলতঃ ঐ সকল বালুকাস্তম্ভের মধ্যে পড়িলে মৃত্যু একরূপ অনিবার্য্য।

ঐ ভীষণ বালুকা-ঝড় চলিয়া গেলে পথিক ও উহার বাহন উষ্ট্রটিও গা ঝাড়া দিয়া উঠে। মনে হয় যেন শরীর একেবারে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম হয়। উষ্ট্র তখন জলের জন্য ছটফট করে; পথিক চামড়ার মশকে রক্ষিত পানীয় জলের সন্ধান করিতে বাধ্য হয়। কখন কখন তাহার বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক সযত্ন রক্ষিত পানীয় জলটুকু পর্য্যন্ত বাষ্পাকার ধারণ করতঃ অদৃশ্য হইয়া যায়।" তখন উষ্ট্রসহ তৃষ্ণার্ত্ত পথিক পানীয় জলের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় কোন্ দিকে যাইবে খুঁজিয়া পায় না। এমন সময়ে অকাল মৃত্যুর সঙ্গিনী মায়াবিনী মরীচিকা সম্মুখস্থ অদূরবর্ত্তী শুষ্ক বালুকা প্রান্তরকে সুশীতল জলাশয় প্রতিপাদন করিয়া উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। হতভাগ্য ভ্রান্ত পথিক উষ্ট্রসহ ক্রমাগত মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অবশেষে তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্তদেহে সাহারা প্রান্তরে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইতে বাধ্য হয়; তৃষ্ণার জ্বালা

চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়। এইরূপে কতশত হতভাগ্য ব্যক্তি যে সাহারাবক্ষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে?

মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে দূর হইতে উহাকে স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় দেখায়। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগগণ জলপানের আশায় তদভিমুখে যত ধাবিত হয় ঐ দৃশ্যও ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। এইরূপে জলের আশায় ধাবিত হইতে হইতে অবশেষে হতভাগ্য জীব ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া অসমসাহসে মরুপৃষ্ঠে শুইয়া পড়ে ও অকালে প্রাণ হারায়। অনেক অজ্ঞ ও পথভ্রান্ত পথিক সাহারা প্রভৃতি দুর্গম মরুভূমিতে এইরূপে প্রতারিত হয়। মৃগগণের তৃষ্ণা বর্দ্ধক বলিয়া ইহা মৃগতৃষ্ণিকা বা মরীচিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মরীচিকা কি?

মরীচিকা অবশ্য একটা দৃষ্টি ভ্রম বিশেষ। জলাশয়ের নিকটে খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ থাকিলে উহাদের প্রতিবিম্ব ঐ শান্ত জলাশয়ের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয় এবং নিম্নমুখী দেখায়। জলাশয়ের অদূরস্থ গাছপালার উল্টা ছায়া অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। এইজন্য লোকে যখন দিক্‌চক্রের উপরে দূরে খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের শ্রান্তি-হর কুঞ্জবন ও অতিথিবৎসল পল্লীবাসিগণের পর্ণকুটির এবং পল্লীগ্রামের নিম্নমুখী প্রতিচ্ছায়া দর্শন করে, তখন সম্মুখে অদূরে জলাশয় ও পল্লীগ্রাম রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম করে। উত্তপ্ত মরুভূমিতে, বিশেষতঃ সাহারা অঞ্চলে এইরূপ মৃগতৃষ্ণিকা অনেক সময়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের জানা থাকিলেও উহার উৎপত্তির কারণ খুব বেশী পূর্ব্বে নির্ণীত হয় নাই।

কিরূপে উৎপন্ন হয়?

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যখন মিশর দেশ আক্রমণ করেন, তখন বৈজ্ঞানিক মঞ্জ্ (Monge) তাঁহার সঙ্গে যান। সেখানকার মরুভূমিতে মঞ্জ্ স্বচক্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করেন ও উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলেন।

আমরা সকলেই জানি ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরিস্থ বায়ু উর্দ্ধাকাশের বায়ুরাশির চাপপ্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা ঘন, আর যে বায়ু যত উচ্চে অবস্থিত উহা তত হাল্‌কা। সূর্য্যোদয়ের পর হইতে মরুভূমির বালুকারাশি তাপ সংগ্রহ করিতে থাকে; দিবা দ্বিপ্রহরে তাপের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মধ্যাহ্নকালে অগ্নিতুল্য ঐ বালুকারাশির সংস্পর্শে মরুপৃষ্ঠস্থ বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও তাহার ফলে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হাল্‌কা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ হাল্‌কা বায়ুস্তরের উপরিস্থ বায়ু একটু উচ্চে থাকায় তত উত্তপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং ততটা পাৎলাও হইতে পারে না। † ইহার উপরের বায়ু আবার আরো কম পাৎলা অর্থাৎ বেশী ঘন। এইরূপে মরুপৃষ্ঠস্থিত বায়ু মধ্যাহ্নকালে উর্দ্ধ-দিকে ক্রমান্বয়ে ঘন হইতে ঘনতর থাকে।

† ইহা অবশ্য নিম্নের বায়ুস্তরের কথা। অনেক উর্দ্ধের বায়ু কিন্তু অন্যান্য স্থানের বায়ুর ন্যায় ক্রমশঃ হাল্‌কা হইয়া থাকে।

সূর্য্যালোক স্বভাবতঃ সরল পথেই চলে; তবে বিভিন্ন দ্রব্য বা ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব (density) বিশিষ্ট একই পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার সময় উহা বাঁকিয়া থাকে। ইহাকে আলোকরশ্মির রিফ্রাক্‌শান্ (refraction) বা দিক্ পরিবর্ত্তন বলে। যে পদার্থ যত ঘন, উহার মধ্য দিয়া চলিবার সময় আলোকরশ্মি তত বাঁকিয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে উষ্ণ পাৎলা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া চলিবার সময় আলোকরশ্মি কম বাঁকে; আর অধিকতর ঘন বায়ুস্তর ভেদ করিবার সময় বেশী বাঁকিতে বাধ্য হয়। মরুস্থানের উপরিস্থ খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ ও গৃহচূড়া হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ক্রমাগত বিভিন্নরূপে হাল্‌কা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া চলিবার সময় নিয়তঃ বাঁকিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে আর নিম্নের বায়ুস্তর ভেদ না করিয়া প্রতিফলিত হয় ও উর্দ্ধদিকে বাঁকিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ঘন হইতে ঘনতর বায়ুস্তর ভেদ করিতে করিতে উল্টাদিকে ঠিক একইভাবে বাঁকিতে বাঁকিতে চলে ও অবশেষে দর্শকের চক্ষুর উপরে আসিয়া পড়ে। কাজেই ঐ আলোকরশ্মিকে বৃক্ষাদির নিম্নস্থ মৃত্তিকার নীচ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য কোন জলাশয়ের ভিতরের উল্টা ছায়ার ন্যায় বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব যেন মরুভূমির মৃত্তিকার তলদেশে রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়।

আবার মরুপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ু অগ্নিতুল্য বালুকা সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া কাঁপিতে থাকে; দূর হইতে ভ্রম হয় যেন জলাশয়ের জল নড়াচড়া করিতেছে। এইরূপে প্রকৃত জল ও জলের মধ্যস্থ উল্টা ছায়া দর্শনে অভ্যস্ত ব্যক্তির মনে বারিবিন্দুবিহীন উষ্ণ মরুবক্ষকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

সাহারা ও অন্যান্য উষ্ণ মরুবক্ষেই যে মরীচিকার নৃত্য দেখা যায়, তাহা নহে। শীত প্রধান সমুদ্রের উপরেও গ্রীষ্মকালে অনেক সময় বহু দূরস্থিত জাহাজের নিম্নমুখী

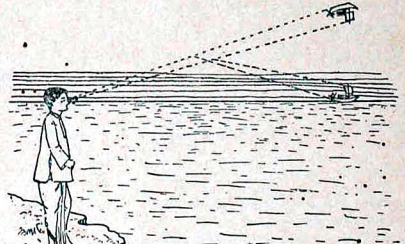

চিত্র—২

শীতল সমুদ্রের উপরে মরীচিকা

প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। তত্রত্য সমুদ্র পৃষ্ঠস্থিত গরম বায়ু ও ঊর্দ্ধাকাশের অপেক্ষাকৃত শীতল এবং তজ্জন্য অধিকতর ঘন বায়ুস্তর ভেদ করিবার সময়েই আলোকরশ্মির এইরূপ গতি বিপর্য্যয় ঘটে। তাহার ফলে বহুদূরবর্ত্তী জাহাজের উল্টামুখী প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা রাজ্যের সীমায় সুপিরিয়র, হিউরন, মিশিগান, ইরী এবং অন্টারিও নামে পাঁচটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুস্বাদু জলের হ্রদ রহিয়াছে। ইরী (Erie) হ্রদের উপরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো বন্দর অবস্থিত। ইহা হইতে ৬০ মাইল দূরে অন্টারিও হ্রদের উপরে কানাডা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্টারিও প্রদেশের রাজধানী ও বন্দর টরোন্টো নগর বিদ্যমান। বলা বাহুল্য অনেক সময়েই উহার জেটীতে একাধিক জাহাজ ভিড়িয়া থাকে। একবার গ্রীষ্মকালে ঐ টরোন্টো সহরের বাড়ীঘর, জেটী এবং জাহাজাদির ঊর্দ্ধাকাশস্থিত উল্টাছবি বাফেলো বন্দর হইতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সমুদ্র বা প্রশস্ত হ্রদের উপরিস্থ বায়ু অবশ্য স্থির এবং সমস্তরে বিন্যস্ত (in even layers) থাকা আবশ্যক*।

উত্তপ্ত সাহারা বক্ষে কেবলমাত্র যে প্রাণঘাতী আলোক মরীচিকা তৃষার্ত্ত পথিকদিগকে বিভ্রান্ত করে তাহা নহে; শব্দ মরীচিকাও আরবীয় পথাবাহীদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। রাঁচি সহরের এক পার্শ্বে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় রহিয়াছে। ঐগুলির নিকটে কোনরূপ শব্দ করিলে ঐ শব্দ এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্য ঐগুলিকে প্রতিধ্বনি পাহাড় (echo hills) বলে। রাঁচিতে যেরূপ দূরবর্ত্তী পাহাড়ে শব্দের প্রতিধ্বনি দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রুত হয়, সাহারার উপরেও সেইরূপ বহুদূরস্থিত বন্দুকের শব্দ গরম হাওয়াতে চতুর্দ্দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। আরব দস্যুগণ হতভাগ্য কাফ্রী পল্লীবাসীদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে হতাহত করে এবং বন্দী করিয়া উহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং বন্দুকের ধ্বনি ঐ অঞ্চলে আগন্তুক দস্যুগণের চক্ষুর নিমেষে মারাত্মক আক্রমণের দ্যোতক মাত্র।

শব্দ মরীচিকা

আবার প্রবল বাত্যাতাড়িত বালুকা ও কর্করাদি শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডে বা নগ্ন পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া শোঁ শোঁ, ঘস্ ঘস্, টপ্ টপ্ ইত্যাদি শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ

* A similar phenomenon (i.e. mirage) is occasionally seen over the sea in still hot weather. The image of a distant ship appears in the sky, sometimes inverted sometimes upright. An American news paper lately recorded the appearance to the citizens of Buffalo of a sky picture of the city of Toronto, with its quay and steamers 60 miles across Lake Toronto. In all such cases, the air must be still and in even layers. The total reflection takes place in one of the light uppermost layers and the image is inverted if the layers from the different parts of the objects cross on the way.

An Elemeptery course of Physics edited by Rev. J. C. P. Aldous, M. A. Page 536.

সকল শব্দ তরু গুল্মাদিহীন নগ্ন বালুকাস্তূপে বা বালিয়াড়ির মধ্য দিয়া চলিবার সময় আঘাত প্রতিঘাতের ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সকল অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইলে পথিকগণের মানসপটে মরু দস্যুগণের হঠাৎ আক্রমণ ও সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া উঠে। অসভ্য কাফ্রীগণ অনেক সময় ঐ সকল উচ্চ হইতে উচ্চতর অব্যক্ত ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে ভূতপ্রেতের শব্দ অনুমান করিয়াও শঙ্কিত হইয়া পড়ে†।

এই সব উপসর্গ ভিন্নও যাহারা ক্ষেত্রে সহসা বায়ুমণ্ডলের ভীষণ অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে —আকস্মিক ঝড় দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকাজনক বৈদ্যুতিক ফুরণ আরম্ভ হয়। তাহাতে কি পথিক, কি পল্লীবাসী, কি উষ্ট্রাদি জীবজন্তু সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ফরাসী পরিব্রাজক ফুরো (M. Fourcau) এয়ার (Air) মালভূমি অঞ্চলের আকস্মিক কাল বৈশাখী ঝড়ের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এয়ার মালভূমিতে প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণ কালে আকাশমণ্ডল সহসা ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ফুরণ হইতে আরম্ভ করে; কড় কড় হড় হড় গুড় গুড় ইত্যাদি বজ্রাঘাতের শব্দে আকাশ পাতাল শব্দায়মান হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিরোধ করিয়া বালুকা-ঝড় (sand-storms) বহিতে সুরু করে এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিয়া তোলে। পরিশেষে মাত্র কয়েক বিন্দু বৃষ্টিপাত হইয়া ঐ বিভীষিকার অবসান ঘটে। গ্রীষ্মকালে দিনের পর দিন এইরূপ প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কখন কখন আবার মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া শুষ্ক খালবিল নদীখাতসমূহকে অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া তোলে কিন্তু ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ —চিরবাঞ্ছিত বৃষ্টিজল—অত্যল্পকাল স্থায়ী হয়; কারণ পর দিবস যাইতে না যাইতেই খালবিলাদি পূর্ব্ববৎ শুষ্ক মূর্ত্তি ধারণ করে; কেন না সাহারার গভীর বালুকাস্তর ঐ জলকে আদৌ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই এয়ার বা আসবেন মালভূমি সাহারার মধ্যস্থলে, চাদ হ্রদের উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

কাল বৈশাখী ঝড় জল।

প্রতি বৎসর বাঙ্গালাদেশে গড়ে প্রায় ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। আর সাহারা বক্ষে বাৎসরিক বৃষ্টির গড় পরিমাণ মাত্র ২ ইঞ্চিরও কম। ইহা হইতেই সাহারায় কিরূপ জলাভাব তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়।

† There is a mirage of sound as well as of sight, When the report of a gun reveberates long and loudly between naked cliffs, and the rattle of sand upon parched stems comes echoing through the dunes magnified as by a microphone into a mysterious dreemming or droning which the Arabs take for an omen of death.

The New World of To-day. by Monerieff Vol. V. Africa, page 78-79.

সাহারার প্রান্তবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে এবং টিবেষ্টি প্রভৃতি পর্ব্বতশিখরেও এয়ারাদি উচ্চ মালভূমিতে গ্রীষ্মকালে প্রায়ই অপরাহ্ণ সময়ে মেঘ গর্জ্জন ও সেই সঙ্গে সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। ঐ জলের কিয়দংশ তত্রত্য অগভীর লবণ হ্রদে ও পর্ব্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐসকল স্থানে থাকিতে থাকিতে অল্পকালের মধ্যেই উহা পানের অযোগ্য হইয়া উঠে। বাকী অংশ ভূগর্ভে শোষিত হয়।

মরুদ্যান

ঐ জলের অংশ বিশেষ আবার শৈলময় অভেদ্য গভীর নিম্নস্তরে পৌঁছিয়া সেইস্থানেই সঞ্চিত হয় ও ঘুরিয়া ফিরিয়া মালভূমি বা পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে ঝরণার সৃষ্টি করে। আবার কোথাও কোথাও লোক গভীর কূপ খনন পূর্ব্বক ঐ জল সংগ্রহ করিয়া পানাদি কার্য্যে লাগায়। যে স্থানেই এইরূপ সুস্বাদু পানীয় জল সংগৃহীত হইতে পারে, সেইস্থানেই শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দেখা দেয়, খর্জ্জুর ও বাব্‌লা প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মে ও পল্লী গড়িয়া উঠে। এই সকল স্থানের নাম মরুদ্যান। ইহারাই মরুসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশেষ। সমুদ্র মধ্যে জাহাজসকল যেরূপ এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যায়, সাহারাবাসী বণিকেরাও সেইরূপ এক মরুদ্যান হইতে অন্য মরুদ্যান দিয়া গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে। এই মরু সমুদ্রে পালিত উষ্ট্রই জাহাজের কার্য্য করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাহারার বালুকা প্রান্তরে সুস্পষ্ট পথ থাকে না। ঝড়ের সময় বালুকারাশি উড়িয়া বণিকসঙ্ঘ ও উষ্ট্রগণের পদচিহ্ন আবৃত করিয়া ফেলে; পথ চলাচল কষ্টকর হইয়া উঠে। কখন কখন হতভাগ্য বণিক ও উষ্ট্রের মৃতদেহ এবং অস্থিপঞ্জর বালুকা প্রান্তরে পথ্যবাহীদিগকে কিছুকালের জন্য পথ প্রদর্শন করে। অবশ্য পরবর্ত্তী প্রবল বালুকা-ঝড় ঐ সকল চিহ্নকেও সময় সময় ঢাকিয়া দেয়। তখন পথ নির্ণয় করা অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও জলাশয়ের তীরেই পথিকদিগের বিশ্রাম স্থান—চটি—হইয়া থাকে। পণ্যবাহিগণ ঐসকল স্থানে আবশ্যকমত খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করে। কিন্তু কখন কখন ঐসকল স্থানের পঙ্কিল অল্পজল অধিকতর লবণাক্ত হইয়া পানের অযোগ্য হইয়া যায় অথবা বালুকার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। পথশ্রান্ত তৃষ্ণাক্লিষ্ট শুষ্ককণ্ঠ পথিকগণ আপনাপন শূন্য মশকগুলিকে পানীয় জলে পূর্ণ করিবার জন্য যখন উহাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া পঙ্কিল জলও দেখিতে পায় না, তখন তাহাদের যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; ঐ হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনার অতীত হইয়া থাকে।

আবার অনেক মরুদ্যানের মধ্যে এমন স্থানও রহিয়াছে, যেখানে জলাশয় স্পষ্ট না থাকিলেও মৃত্তিকা বেশ সরস থাকে। সেই কারণে ঐরূপ স্থানেও তৃণগুল্মাদি জন্মে এবং কণ্টকাকীর্ণ ঐসকল গুল্মের মধ্যেও বিচিত্র বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পসমূহ ফুটিয়া দর্শকের চক্ষুকে আনন্দ দান করে। কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য ফলবান বৃক্ষের মধ্যে মরুদ্যানে নানা জাতীয় খর্জ্জুর বৃক্ষই সুন্দররূপে জন্মে। মরুভূমি মধ্যে পুষ্পিত ঐসকল খর্জ্জুর

কুঞ্জের ছায়ার নিম্নে বিবিধ শস্য ও ফলমূল ক্ষেত্র, শাক্‌সব্জীর বাগান দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। কোন কোন স্থানে ঐরূপ সবুজ ক্ষেত্র ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত থাকে; দেখিলে 'ননদাঙ্গে পুষ্পে ভরা' আমাদের এই বঙ্গভূমির কথাই মনে পড়িয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে সরু সরু কৃত্রিম খালের সাহায্যে বহুদূর হইতে জল জোগান

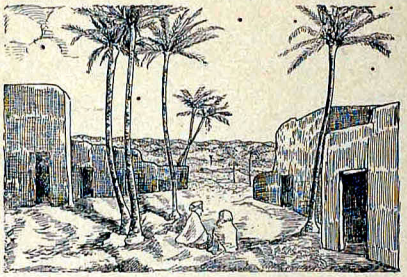

চিত্র—৩
আল্‌জীরিয়ার অন্তর্গত সাহারার একটি মরুদ্যান

হয়। এখানে আগাছারও অভাব হয় না। এই সকল মূল্যবান শস্যক্ষেত্র একদিকে কাফ্রীদিগকে খাদ্য ও অর্থ প্রদান করে, আবার অন্যদিকে উহারাই নানাজাতীয় পীড়ার আবাসস্থল। সাহারার মধ্যে উত্তপ্ত বালুকার দোষে চক্ষুর পীড়াই সমধিক হইয়া থাকে। অবশ্য জ্বর জ্বালারও অভাব নাই।

উৎপন্ন দ্রব্য ত্রিবিধ যথা—(১) উদ্ভিজ্জ, (২) খনিজ এবং (৩) জীবজ। উদ্ভিজ্জ আবার বনজ ও কৃষিজ ভেদে দুই প্রকার। মধ্য আফ্রিকা এবং পশ্চিম উপকূলের অতিকায় বেওবাবাদি বড় বড় বৃক্ষের ন্যায় কোন গাছ সাহারার মধ্যে জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। মরুদ্যানে কেবল নানাবিধ বন্য বাব্‌লা ও কাঁটাগাছ জন্মে। উহাদিগের আঠা গঁদ একটা প্রধান পণ্য।

বনজ উদ্ভিদ

কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে নানা প্রকারের খেজুর গাছই প্রধান। সাহারাবাসিগণের প্রধান খাদ্য খেজুর। তবে কোন কোন মরুদ্যানে তুলা, তামাক, থরমুজা, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতিরও চাষ আছে। খর্জ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় ভূমধ্যসাগর তীরস্থ নানাজাতীয় ফলও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

কৃষিজ উদ্ভিদ

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ মরু মধ্যে সুবর্ণাদি খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া

গিয়াছে। কিন্তু সাহারার সর্ব্বাংশ আজিও ইউরোপীয় সভ্য জাতিসমূহের একরূপ অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। কালে যে এইখানেও

খনিজ দ্রব্য

মূল্যবান খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এখানে যথেষ্ট সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। শুষ্ক হ্রদের নিকট যথেষ্ট কর্কচ লবণ মিলে।

মরূদ্যানের মধ্যে যে সকল স্থানে বন্য বৃক্ষাদি যথেষ্ট জন্মে, উহার আশে পাশে বিবিধ বন্যপশু ও হিংস্র জন্তু লুক্কায়িত থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জলপানের উদ্দেশ্যে যখন কোন বন্যপালিত পশু বাহির হয়, হিংস্র জীবগণ ঐসময়ে অদূরস্থ ঝোপ

বন্য জন্তু

ঝাপের মধ্য হইতে সশব্দে লাফাইয়া পড়ে ও উহাদিগকে বধ করে। বনানীপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে বন্য দুই এক জাতীয় বাঁদর বাস করে। সিংহ বড় একটা দেখা যায় না।

মরূদ্যানে পালিত পশুর মধ্যে মেষ, ছাগ ও উষ্ট্রই প্রধান। মরু অঞ্চলে উষ্ট্রই লোকের প্রধান বাহন ও ভারবাহী পশু। ইহা ১৪।১৫ মণ বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া আরোহীসহ উপর্যুপরি ৩।৪ দিন বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়াও প্রত্যহ ২০।২৫

পালিত পশু

মাইল হিসাবে বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে পারে। ইহার পদতলের গঠন আল্‌গা, বালুকার উপর দিয়া চলিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার সাহায্যে উত্তর আফ্রিকা ও সুদান অঞ্চলের মধ্যে বেশ ব্যবসায় বাণিজ্য চলে।

গোদুগ্ধের অভাবে যেমন আমাদের শিশুরা বাঁচিতে পারে না, অথবা পরিপুষ্ট হয় না, সাহারায় মরুময় অঞ্চলের শিশুরাও সেইরূপ উষ্ট্রের দুগ্ধপান করতঃ জীবন রক্ষা করে। উহার মাংস মুসলমান অধিবাসীদিগের পক্ষে একটা পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্য। উহার চর্ম্ম দ্বারা বাসোপযোগী তাঁবু এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলপাত্র প্রস্তুত হয়। গভীর কূপ হইতে চর্ম্ম নির্ম্মিত মশক সাহায্যে জল উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য দক্ষিণ সাহারায় ককুদযুক্ত বৃষও ব্যবহৃত হয়। লোকে উষ্ট্রের লোম হইতেও একপ্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করে। ফলতঃ উষ্ট্র সাহারা অঞ্চলের অত্যাবশ্যক ও মূল্যবান পশু—মরু সমুদ্রে তরণী বিশেষ (ship of the desert)। উহার অভাবে এই সুবিশাল নির্জ্জন বালুকা প্রান্তর—"আরবগণের বারিহীন সমুদ্র"—পার হওয়া একান্তই অসম্ভব। বিশ্বস্রষ্টার কি অসীম দয়া; তিনি দুর্গম মরুপ্রান্তরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহাকে অতিক্রম করিবার উপযোগী জীবেরও সৃজন করিতে বিস্মৃত হন নাই। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ দীর্ঘপদযুক্ত কদাকার উষ্ট্র মরুবাসিগণের কি মহৎ উপকারই সাধন করিয়া থাকে। উহা অনায়াসে উত্তপ্ত মরুভূমি পার হইতে পারিলেও, কখন কখন সাহারা প্রান্তরে চালকসহ প্রাণ না হারায় এমনও নহে।

ফরাসী পরিব্রাজক ফুরো (M. Foureau) এল্‌জীরিয়া হইতে এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া

সাহারা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই একটি ভিন্ন বাকী সমুদয় উষ্ট্রই পথিমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়।

মরূদ্যানে উটপক্ষীও (ostrich) প্রতিপালিত হয়। ঘোড়ার ন্যায় উহার পৃষ্ঠের উপরে লোকে আরোহণ করিয়া থাকে। শীতকালে অত্যধিক শৈত্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় অনেক জাতীয় পক্ষী ইউরোপ হইতে সাহারায়

পক্ষী

আগমন করিয়া থাকে। জল পিপি, ও অন্যান্য অনেক প্রকার জলচর পক্ষী মরূদ্যানে আসিয়া জোটে। গিনি-মোরগ, ঘুঘু, পায়রা ও বিবিধ গায়ক-পক্ষী পর্ব্বতের উপরে দেখা দেয়। দাঁড়কাকসকল উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বসিয়া "ক-ক" শব্দে আকাশ মুখরিত করে। আর শকুনি, গৃধিনী, চিল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীসমূহ তৃষ্ণার্ত্ত হতভাগ্য পথিক ও উষ্ট্রাদি জীবজন্তুর মৃতদেহ ভক্ষণের লোভে স্থানে স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

এখানে এক জাতীয় সোণালী রঙের টিকটিকি দেখা যায়। উহারা বহুরূপীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে আপনাপন গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও

সরীসৃপ।

উহারা স্বজাতীয় ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীর বিশেষের কবলে ধৃত ও ভক্ষিত হইয়া থাকে। সাহারায় মারাত্মক বিষধর সর্পের আদৌ অপ্রতুলতা নাই।

এক জাতীয় গিরগিটি মৃত্তিকা খুঁড়িয়া উহার মধ্যে আপন দেহকে লুক্কায়িত রাখে। উহাকে ইংরাজীতে বালুকা মৎস্য (Sand fish) বলে। হ্রদের কর্দ্দম মধ্যে এক শ্রেণীর ভেক বাস করে।

প্রস্তরাদির নিম্নে বিষাক্ত মাকড়শা দেখিতে পাওয়া যায়। আরববাসী এবং কাফ্রীগণ ঐ সকল বিষাক্ত জীবদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ দেখিতে বড়ই

কীট।

ভালবাসে। সেইজন্য তাহারা কোন একটিকে অপর একটির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। কখন কখন অগ্নিকুণ্ডে বিষাক্ত কাঁকড়া বিছুকে ফেলিয়া দিয়া ঐ হতভাগ্য কীটের মৃত্যুযন্ত্রণা দর্শনকরতঃ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বালুকার মধ্যে পিপীলিকাভুক্ মৃৎ-কুম্ভীর (antlions) যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কণ্টকময় বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষশাখায় নানা জাতীয় পিপীলিকার বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারার উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণকালে পথিকগণ এক প্রকার শ্বেতকায় শামুক দেখিতে পায়। উহারা গুল্মাদিকে আবৃত করিয়া রাখে। উহারা কাফ্রীগণের পক্ষে অতি উপাদেয় খাদ্য।

পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন-মক্ষি (dragon-fly) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরাঞ্চলে উই এবং অন্যান্য পিপীলিকারও অভাব নাই। কখন কখন শস্যক্ষেত্র সকল

পতঙ্গ

অসংখ্য পঙ্গপালের দ্বারা অচিরে ভক্ষিত ও নষ্ট হইয়া যায়। সাহারায় হ্রদের জলে বিবিধ প্রকার মৎস্য বিচরণ করিয়া থাকে।

এখানে যে সকল জীব বসবাস করে ইহাদের গাত্রের বর্ণ অনেকটা ঐ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের বর্ণেরই অনুরূপ। এই সুবিধার ফলে জীবগণ অনেকটা আত্ম-গোপন করিতে পারে। তাহাতে শিকার ধরার পক্ষে অনেক সাহায্য হয়। আবার আত্মরক্ষার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। বালুকা প্রান্তর হইতে ঊর্দ্ধাকাশে উড্ডীন না হওয়া পর্য্যন্ত ভরতপক্ষীকে (lark) সহসা দেখা যায় না। মরুবাসী আরব ও কাফ্রীগণ এক জাতীয় বাজপক্ষী দ্বারা অন্যান্য পক্ষী শিকারের বিশেষ পক্ষপাতী। সেইজন্য তাহারা এক জাতীয় ঠিকরে বাজপক্ষী পুষিয়া থাকে। ঐ সকল সুশিক্ষিত বাজপক্ষী ইঙ্গিত মাত্র উড্ডীয়মান ভরত ও অন্যান্য অনেক পাখী শিকার করে। কিন্তু উহাদের গলদেশে সুতার বাঁধন থাকায় ধৃত পক্ষী সকলকে ভক্ষণ করিতে পারে না; সেইজন্য উহাদিগকে প্রতিপালকের নিকটে ধরিয়া আনে। চীন দেশের অনেক জেলে ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর মোহনার নিকটে বাস করে। উহারা এক প্রকার পাণকৌড়ী (পক্ষী বিশেষ) পোষে। ঐ সকল পক্ষীর গলদেশে দড়ির ফাঁস বাঁধিয়া ৮।১০টিকে নৌকায় লইয়া মাছ ধরিতে যায়। পাণকৌড়ীগুলা মধ্যে মধ্যে জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে ও অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ সন্তরণের পর মৎস্য শিকার পূর্ব্বক নৌকায় উড়িয়া আসে। গলার ফাঁসের জন্য ধৃত মৎস্যকে গিলিতে পারে না। জেলেটি মৎস্যটিকে কাড়িয়া লইয়া পাত্র মধ্যে রক্ষা করে। তখন পাণকৌড়ীটি জল মধ্যে প্রবেশ করে ও মৎস্য লইয়া প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। অতএব চীনা জেলেদের মৎস্য শিকার এবং কাফ্রীদিগের পক্ষী শিকার অনেকটা একই উপায়ে সাধিত হয়।

গাত্রবর্ণ

সাহারার মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মরুস্থান রহিয়াছে। উহারা সাধারণতঃ কোন পর্ব্বত বা জলাশয়ের নিম্নদেশেই অবস্থিত থাকে। উত্তর সাহারার টাফিলেট ও টোয়াটগাত্তের এবং তিম্বক্তুর মধ্যে কয়েকটি মরুদ্যান (oases) দেখা যায়। ঐরূপ এক দিকে ত্রিপোলি রাজ্য, অন্য দিকে চাদ হ্রদ এবং কানোর মধ্যে কারওয়ার মরুস্থান অবস্থিত। এই সকল মরুস্থানের মধ্য দিয়াই বণিকসঙ্ঘ যাতায়াত করে। তবে এই সকল পথ এখন অনেকটা অব্যবহার্য্য হইয়া আসিতেছে। এমেডি অঞ্চল বালুকা-ঝড়ের প্রকোপে ক্রমশঃ মরুময় হইয়া আসিতেছে।

পল্লী ও নগর

এই সব মরুস্থানের মধ্যে কোন কোনটি এত বিস্তৃত যে উহার মধ্যে বহু সংখ্যক পল্লী তো দূরের কথা অট্টালিকা ও মসজিদ্ গৃহযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ অনেক সুরক্ষিত নগরী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপোলি হইতে সুদানে যাইবার পথে অবস্থিত এগেডেস (Agades) এইরূপ একটি সহর।

মরুস্থানের নগরগুলি সাধারণতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে।

ক্যানন্ ট্রিষ্ট্রাম (Canon Tristram) আল্জীরিয়ার দক্ষিণস্থিত কয়েকটি নগরের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মৌচাকের ন্যায় সহস্র ছিদ্র বিশিষ্ট একটি মৃত্তিকা

নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা এক একটি নগরী রক্ষিত। শত্রুগণ হঠাৎ আক্রমণ না করিতে পারে ইহাই ঐ প্রাচীরের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন দিল্লী নগরীতেও এইরূপ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পিকিন নগরীও নাকি এইরূপে রক্ষিত। এই প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে স্রোতহীন অগভীর পরিখা বিদ্যমান। অনেক প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও কেল্লার চতুর্দ্দিকেও সেইরূপ পরিখা বা গড়খাই দেখা যায়। প্রাচীরের মধ্যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ সকল অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে চতুষ্কোণ মসৃজিদটি আকারে ও উচ্চতায় বৃহত্তম। নগরের প্রান্তভাগে মৃৎপ্রাচীরের গোলক ধাঁধা, খর্জ্জুর বৃক্ষের বন ও ইতস্ততঃ গৃহযুক্ত বালুকাস্তূপ বিদ্যমান। নগরের মধ্যস্থলে ফাঁকা মাঠ, উহাতে হাট বাজার বসে। Mr. Bayle St. John ত্রিপোলিরাজ্যের দক্ষিণস্থিত সাহারার মধ্যে মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের অভিযান পথ অনুসরণ করেন। তিনি এমনের মন্দির (Amman's temple) এবং অদূরস্থ সিয়া (Siwah) রাজ্য দর্শন করেন। ঐ রাজ্যের রাজধানী অর্দ্ধ লবণ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। উহার গৃহগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে মধুচক্রের ন্যায় গঠিত। ঐগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে দিবা দ্বিপ্রহর সময়েও আবৃত পথ মধ্যে বিনা লণ্ঠনে চলাচল একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে। দক্ষিণ সাহারায় এগেড্স্ নগরীতে ফরাসী পরিব্রাজক ফুরো (M. Foureau) প্রস্তর ও কর্দ্দম নির্ম্মিত গৃহ দর্শন করেন। উহাদের কোন কোনটি দ্বিতল ছিল। তবে উহাদের অধিকাংশই ভগ্নদশায় উপনীত। সহরটিতে পূর্ব্বে নাকি ৭০ হাজার লোকের বসবাস ছিল কিন্তু এক্ষণে মাত্র কয়েক সহস্র লোক অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। ঘরোয়া যুদ্ধই যে সাহারার নগর সমূহের ধ্বংসের একমাত্র কারণ তাহা নহে; ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতিও ইহার অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে সুদান হইতে উঠ পাখীর প্রচুর পালক সাহারা পার হইয়া ভূমধ্যসাগর পথে ইউরোপে রপ্তানি হইত, কিন্তু এক্ষণে উক্তমাশা প্রদেশ দিয়াই উহা অধিক পরিমাণে বিদেশে যাইতেছে। মূল্যবান দন্তের জন্য মধ্য আফ্রিকার বন্য হস্তীদিগকে একরূপ নির্ম্মূল করা হইয়াছে। সুতরাং হস্তীদন্তের ব্যবসায়ও একরূপ লোপ পাইয়াছে। ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতি সকল আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানকে অধিকার করায় আমমাংসভোজী নরখাদক কাফ্রীগণ গভীর বন্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিমে সেনিগাম্বিয়া রাজ্যের ফরাসী বন্দরসমূহ আর পূর্ব্ব দিকে নীলনদ পথে সুদানের বাণিজ্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্ব্বোপরি দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উত্তরে সিমারের রাইয়ো নগর পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে, উহা দেশীয় উষ্ট্র চালিত ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি করিতেছে। সুতরাং সাহারা মরুস্থানের অনেক নগরের ধ্বংস অনিবার্য্য।

সাহারার মধ্যস্থিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগরী লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত। উহাদের মধ্যে কোন কোন রাজ্য এক একজন দলপতির দ্বারা কার্য্যতঃ না হইলেও অন্ততঃ নামে—শাসিত হইয়া থাকে। আবার কোন রাজ্য সাধারণতন্ত্র বিশেষ।

তবে এক্ষণে সাহারার অধিকাংশ স্থানই ফরাসীদিগের অধিকৃত। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট

শাসন প্রণালী

বালুকা প্রান্তরের মধ্য দিয়া হাল্‌কা মোটর রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সব পথ দিয়া মোটর রেলগাড়ী চলাচল করিতেছে। অনেক ষ্টেশনে দূরবর্ত্তী মরুস্থান হইতেও গাড়ী গাড়ী পানীয় জল আনয়ন পূর্ব্বক অধিবাসিগণকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলতঃ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নগরীগুলিকে রেলপথ দ্বারা একত্র সংযুক্ত করিয়া দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতিই জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং উত্তরকালে সাহারার উন্নতি হওয়া অসম্ভব নহে।

সাহারায় যাযাবর জাতির সংখ্যা কম নহে। অধিবাসিগণ সাধারণতঃ অসভ্য। সেইজন্য আদমসুমারির (census) সময় লোক গণনা নিভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

অধিবাসীর সংখ্যা

তবে অনেকে অনুমান করেন সাহারার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ লোক বাস করিয়া থাকে।

ইহারা শঙ্করজাতীয়। ইহাদের মধ্যে বার্ব্বার জাতির সংখ্যাই সমধিক। তবে দক্ষিণের নিগ্রো এবং আগস্তুক আরবগণের রক্ত যে উহাদের সহিত মিশ্রিত হয় নাই এমনও নহে।

গাত্রবর্ণ

কোন কোন নগরে ইহুদীগণ বাস করিয়া থাকে। প্রখর সূর্য্য কিরণে উহাদের গাত্রবর্ণ কাফ্রীদিগের ন্যায় কাল হইয়া গিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ পূর্ব্বপুরুষগণের স্বদীকারবার ও ধাতু দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। এল্‌জীরিয়া সীমান্তস্থিত পরিশ্রমী ও শান্তপ্রকৃতির বেণী ম'জাবগণ সাহারার "জু" (Jews of the North) নামে পরিচিত।

এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ বিশ্বাসঘাতক ও অসভ্য। সুতরাং অরক্ষিত ও অসাবধান বিদেশীয় পথিকগণ উহাদের হস্তে প্রায়ই প্রাণ হারায়। মধ্য সাহারার উচ্চ আহাগ্‌গার মালভূমির উপরে ও চতুর্দ্দিকে টৌরেগ (Touregs) নামে যে সকল জাতির বাস উহারা মরুদস্যু। ঐজাতীয় যোদ্ধৃবৃন্দ কৃষ্ণবর্ণ অথবা শ্বেত বোরকায় (veils) আপাদ মস্তক দিবারাত্রি আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। উহারা কাহাকেও নিজ নিজ মুখ দর্শন করিতে দেয় না। যদি কখন সলজ্জভাবে ঐ মুখাবরণ সরাইয়া লয়, তখন দেখা যায় যে উহাদের বদন মণ্ডলে ক্রূশের চিহ্ন রহিয়াছে, ঐ চিহ্ন উহাদের ঢাল এবং তরবারির বাঁটের উপরেও অঙ্কিত থাকে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে মধ্যযুগে ইউরোপীয় যে সকল খৃষ্টান যোদ্ধা জেরুজেলেমকে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusades) ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদেরই দুই একজন আফ্রিকায় আসিয়া বসবাস করে। উহাদেরই বংশধরগণ এক্ষণে টৌরেগ দস্যুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহারা দীর্ঘকায়, উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ দলবদ্ধভাবে লুণ্ঠন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল যোদ্ধাদিগকে বার্ব্বার জাতি সমূহের বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির

পদমর্য্যাদা অনেক উচ্চ। টিবেষ্টি পাহাড়ের টিবুজাতি উহাদেরই অনেকটা অনুরূপ বটে, তবে উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকায় কাফ্রীরক্তের সংমিশ্রণ সমধিক বলিয়া মনে হয়। টিবেষ্টি পাহাড়ের উত্তরপূর্ব্বদিকে লিবিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া নীলনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে জীব ও উদ্ভিদের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং ঐ অঞ্চলে মানবের বাস যে অতি কম, ইহা সহজেই অনুমেয়। নীলনদের পশ্চিম প্রান্তস্থ এই মরুভূমিতে বহু সংখ্যক আরববাসিগণের অপ্রত্যাশিত বস্ত্রবাস দৃষ্ট হয়। বার্ব্বারী রাজ্য সমূহের প্রান্তভাগে অথবা সুদান প্রান্তে ইহাদের সংখ্যাই সমধিক। সাহারার পশ্চিম উপকূলে—আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে জনমানব শূন্য প্রান্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থান স্পেনরাজ্যের নামতঃ অধীনে স্থিত। ইহার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন ক্রমাগত চলিলেও স্থায়ী অধিবাসীদিগের "গৌর্ব্বী" (Gourbis) নামক পর্ণ কুটিরের কথা ত দূরে থাকুক, এমন কি সতত ভ্রমণশীল যাযাবর জাতির তাঁবু পর্য্যন্তও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। উপকূলপ্রদেশের এইরূপ নির্জ্জনতার কারণ কি? অনেকে অনুমান করেন যে ইউরোপীয়গণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত কাফ্রীগণ ইউরোপীয় কোন পরিব্রাজকের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্র দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে। তবে যদি ইহারা বুঝিতে পারে যে হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা ঐ পরিব্রাজককে বিনাশপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে, তবেই উহারা ঐ অঞ্চলে রহিয়া যায়। ঐ সব অঞ্চলের যে সব যায়গা এক্ষণে জনমানব শূন্য মরুভূমি মাত্র, সে সব স্থানেও যে পূর্ব্বে লোকের বসতি ছিল পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহ, গোরস্থান ও মস্‌জিদাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

সাহারাবাসিগণ সাধারণতঃ অসভ্য; লুণ্ঠন ও যুদ্ধবিগ্রহ উহাদের নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান। অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা অপর পল্লী ও রাজ্যকে অধিকার করা এখানে

যুদ্ধবিগ্রহ

ধনোপার্জ্জনের একটী পন্থামাত্র। এই ভয়ে অনেক রাজ্য একত্র মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মধ্য সাহারার নিম্ন সমতলের তোয়াত রাজ্যগুলি (Twat group) সম্মিলিত রাজ্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকে অনুমান করেন যে এই সম্মিলিত রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার হইবে। আবার কোন কোন মরুস্থানে এমন সকল পল্লী রহিয়াছে, যাহারা নিয়ত পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া থাকে। কোন কোন পল্লীর লোকেরা স্থলদস্যু বিশেষ। পণ্যবাহীদিগকে সহসা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পণ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই উহাদের

ব্যবসায়

প্রধান ব্যবসায়। ফলতঃ সুদান ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থিত রাজ্য-সকলের মধ্যে কষ্টসাধ্য ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা লুটতরাজই কাফ্রীদিগের অধিকতর কাম্য। প্রতিবেশীর গবাদি পালিত পশু হরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সকল দস্যু অরক্ষিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার জন্য শত শত মাইল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

লোকেরা অসভ্য হইলেও আরবীয় দস্যুগণের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি সদাচার দৃষ্ট হয়। ইহারা সাধারণতঃ শত্রুর পানীয় জলের কূপ বিষাক্ত করে না। কোন পল্লীর

সদাচার

পুরুষগণ লুণ্ঠনোদ্দেশ্যে অন্যত্র চলিয়া গেলে, অরক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে উহারা অসহায় অবস্থায় আক্রমণ করে না; বরং রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ পল্লীর পুরুষগণ ফিরিয়া না আসা-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। ইহাতে তাহারা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তথাপি কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় ও অধর্ম্ম-যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। পরাজিত শত্রুর প্রতি অযথা অত্যাচার করে না। এই সব বিষয়ে উহারা তথাকথিত বহু সভ্যজাতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত—ছলে বলে কৌশলে শত্রু জয় করা এই সকল বীর দস্যুগণের পক্ষে একান্ত হেয়। পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে ইহারা পুরুষ পরম্পরায় এই সংস্কার লাভ করিয়াছে।

পণ্যবাহী বণিক সঙ্ঘ কর প্রদান করিলে ইহারা তাহাদিগকে সকল প্রকারে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় দলবদ্ধভাবে বণিকগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া থাকে। তাহাতে অল্প সংখ্যক দস্যু সহসা আক্রমণ করতঃ কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারে না।

শিক্ষা

উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আরবীয় লিখন ও পঠন কিছু কিছু প্রচলিত দেখা যায়; তবে কোরাণই উহাদের প্রধান পুস্তক; অন্য পুস্তক বিশেষ নাই।

পণ্যদ্রব্য

সাহারার উত্তরাঞ্চলস্থিত রাজ্যসমূহ হইতে কাপড়চোপড়, বন্দুক, দিয়াশলাই (matches), চা প্রভৃতি আমদানি হয় এবং দক্ষিণস্থ সুদান অঞ্চল হইতে তুলা, চাউল, চিনি, মধু ইত্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে।

মুদ্রার মধ্যে অষ্ট্রীয়ার মেরিয়া থেরেসা ডলার (Austria Maria theresa dollars) সমধিক প্রচলিত। প্রাচীন রোমক মুদ্রাও কোথাও কোথাও চলিয়া থাকে। অনেকস্থলে এক্ষণে ফরাসী মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। তবে সৈন্ধব লবণের ডেলা ও কাপড়ের টুক্‌রাই সাধারণতঃ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ আদিম বিনিময় প্রথাই এখনও পর্য্যন্ত সাহারার মধ্যে অধিকতর প্রচলিত রহিয়াছে।

ত্রিপোলি রাজ্যের অনেক দক্ষিণে লিবিয়া মরুপ্রান্তরের মধ্যেই কুফারা মরুস্থানে যে সকল মুসলমান কাফ্রী বাস করে, উহারা নাকি ইউরোপীয় খ্রীষ্টান জাতিসমূহের বিষম শত্রু; কেন না ইউরোপীয়গণই আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া মুসলমান জাতি ও ধর্ম্মের অবনতি ঘটাইয়াছে। সেইজন্য কি ইংরাজ, কি ফরাসী সকলেই অল্পাধিক সন্দিগ্ধ-নেত্রে উহাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।* প্রেমের দ্বারাই মানুষ বশ হয়, বাহুবলে কখনই

* Their (of the Senoussi sects) leading principle seems hatred of the Christians, who have made such inroads on Moslem supremacy in North Africa...........their leaders show a cromwellian trust in powder, if it be true that for some time past they had been accumulating in their mysterius retreat a store of modern firearms and even canon.

,, The New World of Today by Moncrieff, Gresham, Vol. V. Africa, page 84.

নহে—একথা বিজেতাগণ ভুলিয়া যান কেন? অনেকে বলে, এই ভয় অমূলকমাত্র, কেন না একটি ইংরাজ মহিলা (Mrs. Forbes) ঐ সব ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান সঙ্ঘের (The Senoussi sect or fraternity) রাজধানী লিবিয়ায় কেন্দ্রস্থিত—তাজ (Taj) সহরে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়াছেন।

আণুবীক্ষণিক প্রাণী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কিছু দিন হইতে *Palaemon* গণভুক্ত এক প্রকার কুচোচিংড়ির ভ্রূণের ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। এই প্রকার কুচোচিংড়ি সাধারণতঃ আধ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। এই কুচোচিংড়ির ডিমগুলিকে মায়ের বুক হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত 'স্লাইডের' উপর জলের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষা করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কোন কারণে আলোর তেজ মন্দীভূত করিতেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত বস্তু নজরে পড়িল। দেখিলাম হাতলশূন্য ঘণ্টার আকৃতিবিশিষ্ট কি একটা বস্তু যেন ঘুরিতে ঘুরিতে অকস্মাৎ দ্রুতবেগে এক দিক হইতে অপর দিকে ছুটিয়া গেল। অতি তীব্র সংহত আলোকে কেবল চিংড়ির ডিমের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয় এতদিন অন্য কিছুর উপর নজর পড়ে নাই। এই প্রাণীগুলির শরীর অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তীব্র আলোর সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদিগকে প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকন্তু পুস্তকলব্ধ জ্ঞান ছাড়া ইহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হয় নাই। যাহা হউক, 'স্লাইডের' উপর সেই অদ্ভুত প্রাণীটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলাম ঠিক ঘণ্টার মত আকৃতিবিশিষ্ট প্রায় ৭।৮টা প্রাণী 'স্প্রিং'এর ন্যায় জড়ানো লম্বা লম্বা বোঁটার সাহায্যে কয়েকটা ডিমের গায়ে আটকাইয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত ইহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী! এই আণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলি ভর্টিসেলা (*Vorticella*) নামে পরিচিত। নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ঘণ্টাটীর গোল মুখখানি গুটাইয়া কতকটা ফুলের কুঁড়ির আকার ধারণ করে। লাউ, কুমড়ার আকর্ষণী সূত্র যেমন 'স্প্রিং' এর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে—এই ঘণ্টাকৃতি 'ভর্টিসেলার' লম্বা বোঁটাও ঠিক সেইরূপ কুণ্ডলী পাকাইয়া ছোট হইয়া থাকে। আহার করিবার সময় আস্তে আস্তে জলের উপরের দিকে ভাসিয়া উঠিবার কালে 'স্প্রিং'এর কুণ্ডলী খুলিয়া বোঁটাটা ক্রমশঃ লম্বা হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত মুখটীও বিস্তৃতভাবে খুলিয়া যায়। তখন মুখের চতুর্দ্দিকে শরীরের সমকোণে পাতলা পর্দ্দার মত একটা মুস্ত্র প্রসারিত হইয়া থাকে। মুখের চতুর্দ্দিকে খাড়াভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেকগুলি শুঁয়া আছে, সেগুলিকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলন করিতে থাকে। সেই আন্দোলনের ফলে সম্মুখের

দিকে জলের মধ্যে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি হয় এবং এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু উহার মুখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। শরীরমধ্যস্থ একটী গোলাকার শূন্য স্থলের অনবরত তালে তালে সঙ্কোচনপ্রসারণের ফলে ভক্ষ্য বস্তু ভিতরে প্রবেশ করে। 'ভর্টিসেলা'-গুলি এক বোঁটায় একটী করিয়া থাকে। ইহাদের বহু শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। কোন কোন গণভুক্ত 'ভর্টিসেলার' আবার এক বোঁটায় ছুইটী, তিনটী বা ততোধিক প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি এমন দেখিয়াছি যাহারা একসঙ্গে দুই বোঁটায় দুইটী করিয়া জোড়া

চিত্র—১
ভর্টিসেলা

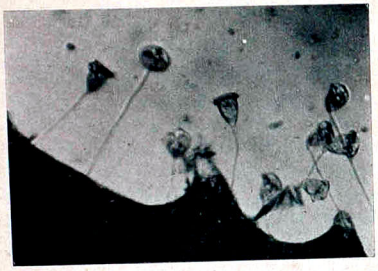

বাঁধিয়া আছে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় আরও কয়েক প্রকারের ভর্টিসেলা নজরে পড়িয়াছে। উহাদের কাহাকেও দেখিতে যেন ঠিক একটী গাঁদা বা কদম ফুলের মত—একটী বোঁটার মাথায় কতকগুলি প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন পাপড়ির মত একত্রিত হইয়া ফুলের আকার ধারণ করিয়াছে। আবার কাহাকেও দেখিয়া যেন মৌসুমী ফুল 'কর্ন্‌ ফ্লাওয়ারের' কথা মনে পড়ে। ইহারা কেহই সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে না। প্রায়শঃই একস্থানে থাকিয়া আহার ক্রিয়া চালাইতে থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় ইহাদের অনেকেই অন্য কোন বৃহত্তর প্রাণীর শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই প্রাণীগুলি যেখানে যায় ইহারাও সেই সব নূতন নূতন স্থানে আহার সংগ্রহ করিবার সুযোগ পায়। সময় সময় ইহারা অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে একটানা সাঁতার দিয়া চলিয়া যায়। তখন্‌ লম্বা বোঁটাটা কিন্তু বেঙাচির লেজের মত সাঁতার কাটিতে মোটেই সহায়তা করে না। বোঁটাটা তখন একটা শক্ত লম্বা সূতার মত হইয়া থাকে মাত্র। সাঁতার দিতে দিতে আশ্রয় করিবার উপযুক্ত কোন কিছু লেজে ঠেকিলে প্রান্তভাগের সূক্ষ্ম নখর দ্বারা

অমনি তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে। এই লম্বা বোঁটাটার জন্য সাঁতার কাটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে ইহাদিগকে বেশ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ দেখা যায় কোন কারণে ইহারা যখন বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে তখন ভয়ানক দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চক্ষের নিমেষে অন্যত্র ছুটিয়া যায়। এই ঘণ্টাকৃতি ভর্টিসেলারা সাধারণতঃ একটী ফাটিয়া এক বোঁটায় দুইটীতে পরিণত হয়। এই পরিণতি ঘটিতে প্রায় আধ ঘণ্টা হইতে কখনও কখনও দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। তৎপরে বোঁটা হইতে খসিয়া জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে কিছু সময় ঘোরাঘুরি করিয়া কাটায়। অবশেষে একস্থানে স্থির হইয়া থাকে—তখন নূতন বোঁটা গজায় এবং প্রকৃত জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়।

চিংড়ির ডিমের গায়ে ভর্টিসেলা দেখিয়া, একটী বাচ্চা চিংড়িকে জীবন্ত অবস্থায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখিয়া লক্ষ্য করিলাম ভর্টিসেলার অনুরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য প্রাণী চিংড়িটার শুঁড় ও লেজের দিকে পিঠের উপর আটকাইয়া আহারসংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ভর্টিসেলাগুলি প্রত্যেকে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু চিংড়ির গায়ের প্রাণীগুলি যেন এক একটী পত্রশূন্য বৃক্ষের অসংখ্য শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে হয় যেন সূক্ষ্ম সূত্রের মত পত্রশূন্য বৃক্ষের প্রত্যেকটী ডালে চায়ের পেয়ালার মত এক একটী গতিশীল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এরূপ এক একটী গাছে প্রায় শতাধিক পেয়ালার আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী দেখা যায়। ইঁহাদিগকে এপিষ্টাইলিস (*Epistylis*) নামক প্রাণীদের উপনিবেশ বলা হয়। প্রাণীগুলি অনবরতই আহার সংগ্রহের জন্য মুখ হাঁ করিয়া থাকে। মুখের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি শুঁয়া আছে, সেগুলিকে পর পর অতিদ্রুত কম্পিত করিয়া জলের মধ্যে একটী ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে। জলের ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উহার মুখের কাছে আসিলেই তাহাদিগকে ভিতরে টানিয়া লয়। কিছুক্ষণ পরে পরে সকলে প্রায় একই সঙ্গে লাউ, কুমড়ার আকর্ষণী সূত্রগুলির মত বন্ধন-সূত্রগুলিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝপাং করিয়া নীচের দিকে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; ফোটা ফুলগুলি যেন একসঙ্গে বুজিয়া গিয়া নীচের দিকে গুটাইয়া যায়। তথাকথিত গাছপালার আর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরেই আবার আস্তে আস্তে ডালপালা বিস্তার করিয়া যেন ফুলগুলি ফুটিয়া ওঠে। এইরূপ ব্যাপার অহরহঃ চলিতে থাকে। এক একটী চিংড়ির গায়ে এরূপ অসংখ্য এপিষ্টাইলিস্‌ উপনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেন চঞ্চল ফুলগাছের জঙ্গল ঘিরিয়া রহিয়াছে। সময় সময় লক্ষ্য করিয়াছি—প্যারামিসিয়মের (*Paramœcium*) মত অতি ক্ষুদ্র এক জাতীয় প্রোটোজোয়া (Protozoa) দলে দলে ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ইহারা এত দ্রুতবেগে ছুটাছুটী করিয়া এপিষ্টাইলিসগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে যে, ইহাদের অনেকে বিব্রত হইয়া বোঁটা ছিঁড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিকে বোঁ করিয়া ছুটিয়া

পালাইয়া যায়। বোঁটা ছিঁড়িবার পর ইহাদের অদ্ভুত গতিভঙ্গী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ক্ষুদ্রকায় প্রোটোজোয়াগুলি ইহাদিগকে আক্রমণ করতঃ শরীরের পাতলা চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোন অংশে একটু ছিদ্র হইলেই এপিস-

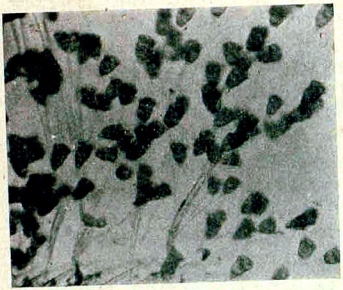

চিত্র—২
এপিষ্টাইলিস্ উপনিবেশ

ষ্টাইলিসের দেহাভ্যন্তরের সমস্ত পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার মত বাহির হইয়া পড়ে। এপিষ্টাইলিস্ উপনিবেশের সমস্ত ফুলগুলি এইভাবে বিনষ্ট হইলেও শাখাপ্রশাখাসমন্বিত সূত্রবৎ গাছগুলি অবিকৃতভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

যে কুচোচিংড়ির কথা বলিয়াছি উহারা সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদসমূহের মধ্যেই বসবাস করিয়া থাকে। পরিষ্কার জলে ছাড়িয়া দিলেও উহারা লতাপাতার মধ্যেই আসিয়া জড়ো হয়। চিংড়ির গায়ে এই জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব দেখিয়া স্বতঃই মনে হইল যে ইহাদের আবাসস্থল জলজ উদ্ভিদসমূহের মধ্যেও ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইবে। জল ঝাঁজির (Hydrilla) একটী পাতার ক্ষুদ্রাংশ কাটিয়া লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখিয়া অতি তীব্র আলোক প্রয়োগ করিলাম। দুই একটী বৃহদাকার প্যারামিসিয়ম ছাড়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু দেখিতে পাইলাম না। তারপর নীল আলো জ্বালিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই দেখি—অদ্ভুত ব্যাপার! এপিষ্টাইলিস্ জাতীয় কোন প্রাণীর সন্ধান না পাইলেও কয়েকটী ভীষণদর্শন আণুবীক্ষণিক জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। Tubifex ধরণের এক অদ্ভুত জানোয়ার পাতার তলা হইতে পরিষ্কার জলের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার গলা বাড়াইয়া দিল। তারপর মুখখানা বিস্তৃত করিয়া

পিণ্ডাকৃতি ছয়টা লম্বা লম্বা ঠোঁট বাহির করিল এবং মাথাটাকে এদিক ওদিক দোলাইয়া খাবার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল।

চিত্র—৩
টিউবিফেক্স ধরণের এক প্রকার কীড়া
মুখখানা সবেমাত্র খুলিবার আয়োজন করিতেছে।

পাতার তলার দিক হইতে জেলীর মত পিণ্ডাকার একটা পদার্থ নড়িতেছে দেখিতে পাইলাম। একটু পরেই দেখি, পিণ্ডাকার গোটা তিনেক প্রাণী আস্তে আস্তে ঠিক মুণ্ডরের মত হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আরও অনেক লম্বা হইবার পর মুণ্ডরের মত মাথার মোটা দিকটা হঠাৎ যেন ফুলের পাপড়ির মত খুলিয়া গেল। ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা গ্রামোফোনের চোঙ্। চোঙের মুখটা চতুর্দ্দিকে সমান গোল নহে। শালুক পাতার মত একদিকে জোড়মুখে ভিতর দিক পর্য্যন্ত কর্ত্তিত। ইহারা মুখটা চোঙের মত হাঁ করিয়াই চতুর্দ্দিক হইতে বাঁকা বাঁকা কতগুলি সূক্ষ্ম শুঁয়া বাহির করিয়া পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলন করিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে জলের মধ্যে একটী ঘূর্ণিপাকের উৎপত্তি হয়। সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া

অনেক দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু ও আণুবীক্ষণিক প্রাণীসমূহ ছুটিয়া উহার মুখ-গহ্বরের কাছে আসে। সেই সময়ে দেহাভ্যন্তরে অনবরত 'পাম্পিং'-এর মত ভিতরের দিকে শোষণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। দুই একটা ক্ষুদ্রকায় প্রোটোজোয়াকে স্রোতের বেগে ছুটিয়া আসিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ শোষণক্রিয়ার ফলে ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে দেখিলাম। আহার সংগ্রহ করিবার সময় শুঁয়াগুলিকে পর পর দ্রুতবেগে কম্পিত করিবার ফলে দেখা যায় যেন মুখের চতুর্দ্দিকে একখানি চক্র ঘুরিতেছে। খানিকক্ষণ আহার সংগ্রহ করিবার পর উক্ত প্রাণীটী হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পিণ্ডাকারে পাতার নীচে ঢুকিয়া পড়িল। এই জাতীয় প্রাণীরা ষ্টেন্টর (*Stentor*) নামে অভিহিত। ষ্টেন্টরেরা শরীরের গোড়ার

চিত্র—৪
ষ্টেন্টর
গ্রামোফোনের হর্ণের মত মুখ হাঁ করিয়া আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে

দিকে সূক্ষ্ম নখরের দ্বারা কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে আটকাইয়া রাখিয়া মুখ হাঁ করিয়া কতকটা তিমি মাছের মত আহার সংগ্রহ করে। মুখ এদিক ওদিক ঘুরাইয়া চতুর্দ্দিকের খাদ্যনিঃশেষ হইয়াছে মনে করিলে অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সাঁতার কাটিয়া যাইবার সময় ইহাদের শরীর সম্পূর্ণ গুটায় না। জামরুলের বোঁটার দিকের অংশ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেলে দেখিতে যেমন হয়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সাঁতার দিয়া যাইবার সময় ইহাদিগকে অনেকটা সেইরূপ দেখায়।

সময় সময় ইহারা ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়, আবার কখনও বা মাঝখানে কোথাও নখ আটকাইয়া উহার চতুর্দ্দিকে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে।

আরেকটী ভিন্ন জাতির ষ্টেন্টরও পাতাটীর সঙ্গে ছিল। ইহার লেজের দিক পূর্ব্বোক্ত ষ্টেন্টর অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ লম্বা। ইহা কিন্তু গ্রামোফোনের 'চোঙের'

চিত্র—৫
লম্বা লেজবিশিষ্ট ষ্টেন্টর

মত মুখ খোলে না। আস্তে আস্তে পাতার নীচ হইতে গলা বাড়াইয়া মুখখানা অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া আসে এবং আধফোটা ফুলের কুঁড়ির মত মুখখানাকে আধাআধি খুলিয়া আহার টানিয়া লয়।

পাতাটীর সঙ্গে আরও গুটী দুই অদ্ভুত প্রাণী ছিল। এই প্রাণীদিগকে 'রটিফেরা' (*Rotifera*) বলা হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর লম্বা বোঁটাওয়ালা এঁচোরের মত। স্ত্রী রটিফেরার শরীর অনেকটা মোটা এবং গোলগাল ধরণের, কিন্তু পুরুষদিগের শরীর অপেক্ষাকৃত সরু ও লিক্‌লিকে। স্ত্রী রটিফেরা লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির ১৫ ভাগের

এক ভাগ এবং পুরুষেরা লম্বায় স্ত্রীদের প্রায় চার গুণ ছোট। ইহাদের দেহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। শরীরের মধ্যস্থল এলাচের মত আকৃতিবিশিষ্ট। লেজের দিকটা তিনটী অংশে বিভক্ত এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। টেলিস্কোপের মত এই

চিত্র—৬

রটিফার আহারসংগ্রহে ব্যস্ত

তিনটী অংশের একটী অপরটীর ভিতর ঢুকিয়া গুটাইয়া যাইতে পারে। লেজের শেষ প্রান্তে মুরগীর পায়ের নখের মত চারিটী নখর আছে। উহার সাহায্যে রটিফার কোন কিছুর গায়ে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার দিক কতকটা বড়মুখ হাঁড়ির গলার মত খাঁজকাটা। কোন কিছুতে পা আটকাইয়া লইয়া ইহারা গলার ভিতর হইতে একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাহির করে। এই যন্ত্রটীর সম্মুখভাগে পাশাপাশিভাবে দুইখানা গোলাকার চাকৃতি আছে। চলাফেরা করিবার সময় চাকৃতি দুইখানা সমেত সমস্ত যন্ত্রটী ভিতরে টানিয়া লয়। অন্য স্থানে গিয়া কোন কিছু আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রথমে মুখের ভিতর হইতে একটা নলের মত জিনিষ বাহির করে; পরে সেখান হইতে চাকৃতির আকারবিশিষ্ট যন্ত্রদুইটী প্রসারিত করিয়া খাইতে সুরু করিয়া দেয়। চাকৃতি দুইখানি বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গলার এক পাশ হইতে দেহের সমকোণে ঈষৎ বাঁকানো একটী লম্বা দণ্ড বাহির হইয়া আসে। চাকৃতি দুইখানার চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত প্রাণীদের মত অনেকগুলি সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম শুঁয়া আছে। উহাদিগকে পর পর আন্দোলন করিয়া জলের মধ্যে ঘূর্ণী উৎপন্ন করে এবং ঘূর্ণীর সঙ্গে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে ভিতরে শোষণ করিয়া লয়। শুঁয়াগুলি অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলিত

চিত্র—৭

রটিফার শরীর প্রসারিত করিতেছে

হয় বলিয়া মনে হয় যেন চাকৃতি দুইখানি বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। ইহারা অধিকাংশ সময়েই জোঁকের মত লেজের উপর ভর দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, কিন্তু দূরতর স্থানে যাইতে হইলে শুঁয়ার সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া একটানা অগ্রসর হয়। খাওয়ার সময় শরীরের অভ্যন্তরে ইঞ্জিনের 'পিষ্টনের' মত উর্দ্ধাধঃ গতিতে 'পাম্পিং' ক্রিয়া সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। স্ত্রী-রটিফেরা ডিম পাড়িয়া তাহা লেজের কাছে আটকাইয়া রাখে। কতকগুলি ডিম বড় আর কতকগুলি আকারে ছোট হয়। বড় ডিম ফুটিয়া স্ত্রী-শিশু এবং ছোট ডিম হইতে পুং-শিশু উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতকালে যে ডিম প্রসব করে সেগুলি গরম না পড়িলে ফোটে না এবং গরমের সময় ফুটিয়া স্ত্রী-শিশু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঐ এক টুক্‌রা পত্রাংশের মধ্যে আরও দুই শ্রেণীর রটিফেরা, এমিবা এবং বিভিন্ন রকমের প্রটোজোয়া দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শামুক, গুগ্‌লি, তেচোকো মাছি, বেঙাচি

প্রভৃতি যে সব প্রাণীকে আমরা জলজ উদ্ভিদের গায়ের শেওলা প্রভৃতি খাইয়া প্রাণধারণ করিতে দেখিতে পাই, প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা এই প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের দ্বারাই বেশীর ভাগ উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে।

'স্লাইড'খানিকে জল ও পাতা সমেত চার পাচ দিন রাখিবার পর পুনরায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম পূর্ব্বে যে কয় প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী উহাতে ছিল তাহাদের অনেকেই অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু তথায় অন্য কয়েক প্রকার নূতন রকমের প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন জাতির স্থির ও গতিশীল 'ডায়েটমের' সংখ্যাই বেশী। ইহাদের সম্বন্ধে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় উৎপন্ন হইয়াছে শেওলার মত সূক্ষ্ম সূত্রবৎ সবুজবর্ণের লম্বা লম্বা এক প্রকার প্রাণী। প্রথমে দেখিয়াই মনে হইল সূত্রবৎ সবুজ শেওলায় 'স্লাইড'খানাকে চারি পাশে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি আবার টুকরা টুকরা ভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। অনেকবার দেখার পরও ইহাদিগকে জটপাকানো শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ

চিত্র—৮

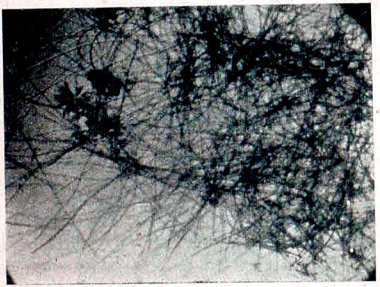

সবুজ রংএর সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক প্রাণী

ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নাই। অবশেষে একবার অনেকক্ষণ স্থিরভাবে তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম—জড়ানো জড়ানো সূত্রগুলি ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে সোজা হইতেছে। তারপরে দেখি, কেহ কেহ দড়িতে যেমন করিয়া পাক খায় ঠিক তেমনি ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাক খাইতেছে; কেহ কেহ আবার শরীর সোজা করিয়া এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া যেন কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। 'স্লাইডের' কোন কোন স্থলে দেখিলাম ইহারা

এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সংখ্যানির্দ্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কতকগুলি আবার ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের টুকরায় পরিণত হইতেছে। প্রত্যেকটী টুকরাও আবার ধীরে ধীরে অঙ্গসঞ্চালন করিতেছে। এই প্রাণীগুলি নিঃশেষে মরিয়া যাওয়ার পর সেই সবুজ রং-এর জলে আবার ছোট ছোট 'স্প্রিং'এর মত অসংখ্য প্রাণী দেখিতে পাইলাম। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে মাইক্রোস্কোপের শক্তি না বাড়াইয়া ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রায় ৫০০ গুণ বড় করিলে দেখা যায় যেন দুই তিন মিলিমিটার লম্বা একটু সূক্ষ্ম তার তিনটী প্যাচে 'স্প্রিং'-এর মত জড়ানো আছে। ঈষৎ অঙ্গসঞ্চালনের ফলেই 'স্প্রিং'টী 'স্ক্রু-প্রোপেলারের' মত জল কাটিয়া অগ্রসর হয়। খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই, অঙ্গসঞ্চালনের ব্যতিক্রমের ফলেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, যেই পথে আসিয়াছিল ঠিক সেই পথে হঠাৎ দ্রুতবেগে পিছাইয়া গেল। মোটের উপর ইহাদের গতিভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় চলাফেরার উপর ইহাদের কোন হাত নাই। সামনে ও পিছনে চলিতে পারে এরূপ একখানি মোটর চালকশূন্য অবস্থায় চালাইয়া দিলে যেমন হয় ইহাদের চলনভঙ্গীও কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর যৌবন

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া পৃথিবী বহু দিন পূর্ব্বেই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কিশোরী ধরিত্রীর কীর্ত্তিরেখা এখনও অতীতের বিস্মৃতি পঙ্কে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। তরুণ বয়সে পৃথিবী সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিয়া এমন কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছে যে তাহার নিদর্শন না রাখিয়া যাইবার কোনও উপায়ই তাহার ছিল না। ধরিত্রীর সেই অতীত আচরণের নিয়মসমূহ এখন আমরা অবগত হইয়াছি বটে, কিন্তু পৃথিবীর বাল্য ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার পক্ষে তাহার জন্মকালীন অবস্থাসম্পর্কে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ পৃথিবীর জন্মসময়ের প্রকৃত রূপ জানিতে পারিলেই তাহার বাল্য ও কৈশোরের ছবি অঙ্কিত করা সহজ হইবে। পৃথিবীর জীবননাট্যের পরবর্ত্তী দৃশ্যসমূহ তাহার প্রারম্ভিক দৃশ্যের উপর নির্ভর করে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে (প্রকৃতি, ১২শ বর্ষ, ২১১-২২১ পৃঃ) পৃথিবীর জন্মকাহিনী বর্ণনা করিবার সময়ে দুইটি প্রচলিত মতবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। লা-প্লাসীয় মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী জন্মকালে একটা উত্তপ্ত বাষ্পীয় পদার্থ মাত্র ছিল। উহাই কালক্রমে তরল ও পরে কঠিন আকার ধারণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

কিন্তু গ্রহাণুমতবাদ অনুসারে পৃথিবী আগাগোড়াই কঠিন। আমরা এই উভয় মতবাদ আলোচনা করিয়া পৃথিবীর যৌবন ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইব।

গলিত পৃথিবীর কাহিনী—লা-প্লাসের অনুবর্ত্তিগণের মতে ঘূর্ণ্যমান উত্তপ্ত বাষ্পের তাল ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরলাকার ধারণ করে। অতঃপর ভূ-পঞ্জরের পৃষ্ঠদেশ আরও ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যাওয়ায় পৃথিবী একটা কঠিন আবরণে আবৃত হইয়াছে। তাপমাত্রা যখন অত্যন্ত বেশী ছিল, তখন পৃথিবীবক্ষের সমস্ত জল—আজকাল যাহা আমরা নদনদী, সমুদ্র, হ্রদ, গাছপালা, জীবজন্তু ও মৃত্তিকাভ্যন্তরে দেখিতে পাই—সেই সমস্ত জলই বায়ুমণ্ডলে একটা বিস্তীর্ণ বাষ্পের আবরণীর ন্যায় বিদ্যমান ছিল। সেইরূপ, আজ যে বিশাল চুনের পাথর ও অন্যান্য কার্ব্বনেটের স্তূপে, কয়লার মধ্যে এবং জীবজন্তু ও বৃক্ষ-লতায় অঙ্গার দৃষ্ট হয়, সেই অঙ্গারও কার্ব্বন ডায়ক্সাইড (CO_2) রূপে বায়ুমণ্ডলে বিরাজ করিত। আমাদের বর্ত্তমান বায়ুমণ্ডলের পদার্থসমূহও সেই সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। উপরোক্ত জলীয় বাষ্পের পরিমাণই আমাদের বর্ত্তমান বায়ুমণ্ডলের ২০০ গুণ হইত, আর কার্ব্বন ডায়ক্সাইডের পরিমাণ হইত আধুনিক বায়ুমণ্ডলের ৫০ গুণ। পরে পৃথিবী যখন আরও শীতল হইল, বায়ুমণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প জমিয়া ক্রমশঃ মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করিল; স্থলভাগ হইতে নদনদীসমূহ সমুদ্রে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে যে বালুকা ও কর্দ্দম জমিয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ কঠিন হইয়া কঙ্কর ও প্রস্তরে পরিণতি লাভ পূর্ব্বক পৃথিবীর আদিম কঠিন আবরণের উপর প্রথম কিট্টাত্মক (sedimentary) পাহাড়ের সৃষ্টি করিল। সর্ব্বশেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন জীবনধারণের উপযোগী হইল, তখনই প্রথম জীব দেখা দিল। ইহাই লা-প্লাসীয় মতানুযায়ী পৃথিবীর যৌবনে পদার্পণ করিবার ইতিহাস।

বায়ুমণ্ডলে এত অধিক পরিমাণে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড্ ও প্রচুর মাত্রায় জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকায় প্রাচীন কালের আবহাওয়া যে অত্যন্ত উষ্ণ ও আর্দ্র ছিল তাহা স্বভাবতঃই কল্পনা করা যাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডল ক্ষয় পাওয়াতে আবহাওয়া শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভবিষ্যতের গর্ভে আবার কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া প্রাচীন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ একটি স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের পৃথিবীর পূর্ব্বে যে ২৫০টি বায়ুমণ্ডল ছিল, তাহার মধ্যে ২৪৯টি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—বাকী আছে শুধু একটি। কিছুদিন পরে তাহাও ধ্বংস পাইবে, তখন এই পৃথিবীবক্ষে কোনও জীবনের চিহ্নও আর থাকিবে না। এসম্পর্কে তাঁহারা চন্দ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার অন্তিম দশা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক দ্রুত গতিতেই ঘটিয়াছে। আর যে আবহাওয়া এক সময়ে উষ্ণ ছিল, তাহাই ক্রমশঃ শীতল

হইয়া অধুনা বেশ আরামদায়ক হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাও অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া যে বরফের যুগ গিয়াছে, সেই যুগের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, আমরা এখন বেশ আরাম ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন শীতের প্রকোপে ও বাতাসের অভাবে জীবন শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানে যে সমস্ত আধুনিক আবিষ্কার ঘটিয়াছে তাহাতে উক্ত কাহিনীর অধিকাংশ মতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ—পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত পৃথিবী যদি একটা উত্তপ্ত তরল অবস্থাতেই থাকিত, তবে ঘূর্ণনের ফলে উহা মসৃণ গোলাকার রূপ ধারণ করিত মাত্র। বড় বড় মহাদেশগুলি কেন যে এক দিকে ঘেঁসিয়া আছে বা বড় বড় মহাসমুদ্রের তলদেশগুলি কেনই বা সমুদ্রসীমা হইতে এত গভীর তাহার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। উচ্চ মহাদেশের পরিবর্ত্তে তখন সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া একটা বিরাট মহাসমুদ্রই বিরাজ করিত—স্থলভাগে তখন কোনও জীবন থাকিত না, মানুষও জন্মিতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ—পৃথিবী কঠিন আকার ধারণ করিবার সময় যে কঠিন প্রস্তর পৃথিবীর বক্ষ আবৃত করিয়াছিল, সেই আদিম প্রস্তরের সন্ধানও আমরা পাইতাম। কানাডা, ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের কঠিন প্রস্তরময় শৈলরাজিকেই উক্ত আদিম পাহাড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় বটে, কিন্তু অধুনা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে এই সমস্ত কঠিন প্রস্তরই (granite) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রস্তর নহে। মহাসমুদ্রের তলদেশে বালুকা ও কর্দ্দমের মিশ্রণরূপ যে আরও প্রাচীনতর পাহাড় আছে, তাহাদের অভ্যন্তরেই এই কঠিন প্রস্তরগুলি গলিত অবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এমন কোনও শৈলের কথা জানেন না, যাহাকে আদিম কঠিন স্তর বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

যদি প্রাচীন আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকিত আর পৃথিবী যদি ঘন মেঘাচ্ছন্ন বায়ু দ্বারা আবৃত হইত, তবে সেই যুগে গঠিত যে সমস্ত শৈল আজিও বিরাজ করিতেছে এবং তৎকালীন বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর আধুনিক প্রস্তরীভূত যে সমস্ত বস্তু রক্ষিত আছে, তাহাতেই উহার নিদর্শন পাওয়া যাইত। পৃথিবীর শৈশব কালীন আবহাওয়া যদি অত্যন্ত উষ্ণ থাকিত, তবে প্রাচীন শৈলরাজির মধ্যে তুষারক্ষেত্র সঞ্চিত কোনও বস্তুই পাওয়া যাইত না। আবার পুরাকালীন আবহাওয়া যদি অত্যন্ত আর্দ্রই থাকিত, তবে সেই সময়ের গঠিত শৈলস্তরে লবণ ও জিপ্সাম (Gypsum) সঞ্চিত থাকিত না; কারণ ঐ সমস্ত বস্তু শুদ্ধমাত্র সমুদ্র বা হ্রদ শুষ্ক হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও অতি প্রাচীন কালের শৈলে ও তুষারস্রোতের ফলে যে ক্ষয় হইয়াছে তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, অথচ সে সমস্ত শৈল

যে যে স্থানে আছে, সে সমস্ত স্থানের আবহাওয়া আজকাল খুবই চমৎকার। কাজেই আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীনকালের আবহাওয়া সকল সময়ের নিমিত্তই অত্যন্ত উষ্ণ ছিল না, কখন কখন উহা ঐ সমস্ত স্থানে আমাদের আজকালকার আবহাওয়া অপেক্ষাও অধিকতর শীতল ছিল। সেইরূপ, প্রাচীন শৈলের স্তরে সঞ্চিত লবণ ও জিপ্সাম এর স্তূপ আমাদিগকে এই নির্দ্দেশই প্রদান করে যে-সমস্ত অঞ্চলে আজকাল উহা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অঞ্চলও অতি প্রাচীন যুগে শুষ্ক আবহাওয়া উপভোগ করিয়াছে।

আজকাল শৈলস্তরে যে সমস্ত প্রস্তরীভূত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও আমাদিগকে গলিত পৃথিবীর কাহিনী বিশ্বাস না করিবার দিকেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। এই সমস্ত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু এমন আবহাওয়াতে জীবনধারণ করিবার উপযোগী ছিল যাহা আমাদের আধুনিক আবহাওয়ার মতই কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ ছিল। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সূচনাতে এই পৃথিবীতে যে জীবনধারণ করিবার মত অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের এই পৃথিবী যে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শীতল ও শুষ্ক হয় নাই উপরোক্ত প্রস্তরীভূত কঙ্কালরাশি সে কথাই নির্দ্দেশ করে। কাজেই গলিত-পৃথিবীর কাহিনী আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বিষাদময় করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, শৈলরাজির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও জীবিত বস্তুর কঙ্কালের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে আমাদের ভাবনা করার কোনও হেতু নাই। উহা সত্য দিগ্‌দর্শন নহে। কাজেই আমাদিগকে উক্ত গলিত পৃথিবীর কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া এমন কাহিনীর অনুসরণ করিতে হইবে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যাহার সামঞ্জস্য অধিক। গ্রহাণুমতবাদোক্ত পৃথিবী আমাদিগকে প্রকৃত সত্যনিরূপণে সহায়তা করে।

ধরিত্রীর মন্থর, কঠিন উৎপত্তির কাহিনীঃ—গ্রহাণুমতবাদ অনুসারে পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করিয়া জীবন-যাত্রা পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র প্রথম বস্তুটি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশ। উহা যে ঠিক কত বড় ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ সেই পৃথিবীর পরিমাণ আমাদের আধুনিক পৃথিবীর দশভাগের একভাগ ছিল—হয়ত বা বেশীও। এই মৌলিক অবস্থা হইতেই গ্রহাণুপতনের দ্বারা পৃথিবী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের সূচনাঃ—এই প্রথম ভূ-পঞ্জরের গোড়া হইতেই কোনও বায়ুমণ্ডল ছিল কিনা তাহা প্রধানতঃ উহার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। চন্দ্রের কোনও বায়ুমণ্ডল নাই, তাহার কারণ এত ক্ষুদ্র বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহার চতুর্দ্দিকে বাষ্পরাশি টানিয়া রাখিতে পারে না। মঙ্গলগ্রহের পরিমাণ পৃথিবীর এক দশমাংশ, তাহার বায়ুমণ্ডলও অত্যন্ত পাতলা। বিরাটগ্রহ বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলও বিশাল। কোনও গ্রহের বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ গ্রহটির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে—এই সত্যটিও গলিত-পৃথিবী-মতবাদের বিরুদ্ধে

অন্যতম যুক্তি। যদি পৃথিবীর মধ্যবস্তুটি আধুনিক পৃথিবীর এক দশমাংশ হইয়া থাকে, তবে সে সময়ে আজকালকার মঙ্গলের ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে অতিক্ষুদ্র একটা পাতলা বায়ুমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কারণ বায়ুমণ্ডলের বাষ্পসমূহ নানা ভাবেই সঞ্চিত হইতে পারে। প্রথমতঃ গ্রহাণুগুলি সমস্তই কিছু কঠিন পদার্থ ছিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ বায়বীয় পদার্থের অণুসমষ্টিই ছিল। উহারা তো সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলেই মিশ্রিত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে, উল্কাপিণ্ডসমূহ উত্তপ্ত হইলেই তাহাদের আয়তনের কয়েক গুণ পরিমাণ বিবিধ রকমের বায়বীয় পদার্থ প্রদান করিয়া থাকে। যদি প্রাচীন গ্রহাণুগুলি আধুনিক উল্কা-পিণ্ডগুলির ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে সেই গ্রহাণু-উপাদানে গঠিত পৃথিবীর মধ্যে আমরা বায়বীয় পদার্থপ্রদানকারী বস্তুর সন্ধান পাইতে পারি। যখন গ্রহাণুসমূহ পৃথিবী-বক্ষে পতিত হয়, তখন তাহাদের সঙ্ঘাতোৎপন্ন তাপ নিশ্চয়ই গ্রহাণু তথা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের বস্তুনিচয়ের মধ্য হইতে কতক পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকিবে। সঙ্ঘাতজাত উক্ত বায়বীয় পদার্থই ক্রমশঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। আবার আগ্নেয়গিরি হইতে স্রাব নিঃসৃত হইবার সময়ও কতক বায়বীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির সূত্রপাতঃ—গ্রহাণুসঞ্চয়ের দ্বারা পৃথিবীর কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুরুত্বও বাড়িতে আরম্ভ করে এবং সেই শক্তিই পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশকে সঙ্কুচিত করিয়া তাপ উৎপন্ন করে। এতদ্ব্যতীত ইউরেনিয়ম্, থোরিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি রেডিও-অ্যাক্টিভ্ পদার্থসমূহের ক্ষয় হেতুও তাপ জন্মিয়া থাকে। শিলা তাপের ক্ষীণ পরিচালক। কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্জাত তাপ ধীর গতিতেই বহির্দ্দেশে চলিয়া আসে, সুতরাং অভ্যন্তরপ্রদেশের তাপমাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কালক্রমে উক্ত তাপমাত্রা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, পৃথিবীর অন্তরপ্রদেশস্থ বিভিন্ন রকমের বস্তুসমূহের যে সমস্ত অংশ তৎকালসঞ্জাত চাপের ফলেই অতি সহজে দ্রবীভূত হইয়া যাইত, সেগুলি উক্ত তাপমাত্রাতেই তরল আকার ধারণ করে। কোথাও কোথাও গলিত শিলার ছোট ছোট থলি সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর প্রধান অংশ কঠিন থাকিয়া যায়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরলিত শিলা বাহিরের দিকেই সাধারণতঃ উঠিয়া আসিতে চাহে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, সাধারণ শিলা গলিয়া আকারে বাড়ে; কাজেই কঠিন অবস্থায় যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর হাল্কা হইয়া পড়ে। অপর কারণ এই যে, সঙ্কুচিত পৃথিবীর অন্তরপ্রদেশে যে সঙ্কোচনশীল শক্তির সৃষ্টি হইয়া আছে, তাহাই চিরন্তন ক্রিয়াশীল তরঙ্গশক্তির সহায়তায় তরল অংশকে বাহিরের দিকে নিষ্পেষিত করিয়া বহির্গত করিতে চাহে। কাজেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৈরিক স্রাবের থলিগুলি অতিকষ্টে উপরের দিক

অগ্রসর হয়। উহাদের অধিকাংশই ভূপৃষ্ঠে পৌছিবার পূর্ব্বে কঠিন হইয়া যায়। কিন্তু উপরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় তাহারা তাপ বহন করিয়া নিয়া আসে; কাজেই যেখানে আসিয়া তাহারা থামিয়া যায়, সেখানকার প্রস্তরকে তাহারা উত্তপ্ত করিয়া তোলে। ফলে, পশ্চাদাগন্তক গৈরিক স্রাবের পক্ষে পথ সুগম করিয়া রাখে এবং এইরূপে অধিকতর দ্রবণীয় পদার্থসমূহই ভূপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়, কম দ্রবণীয় বস্তুগুলি পশ্চাদ্দেশেই পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ তাপোৎপন্নকারী—কাজে কাজেই দ্রাবণকার্য্যে সহায়তাকারী স্বতঃকিরণবিসারী (radio-active) পদার্থগুলিরই ভূপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তবে উক্ত পদার্থসঞ্জাত তাপ ও উহাদের গলনশীলতার উপরেই তাহার পরিমাণ নির্ভর করে।

ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ ফাটল ও অন্যবিধ দুর্ব্বল স্থানে পৌছিতে পারিলেই গতি সহজ হইয়া আসে; সুতরাং গৈরিক স্রাবের কিয়ৎপরিমাণ যখন ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়, তখন তাহাই আগ্নেয়গিরিরূপে অথবা শান্তভাবে গৈরিক স্রোতরূপে বাহির হইয়া আসে। ভূপৃষ্ঠে প্রথম গৈরিক স্রাবের আবির্ভাবই আদিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টির সূচনা করে।

মহাসমুদ্রের আবির্ভাবঃ—পৃথিবীর বক্ষোদেশে যখন প্রথম গ্রহাণুসঞ্চয় আরম্ভ হয়, তখন সেই পৃথিবী যদি বর্ত্তমান পৃথিবীর মাত্র এক দশমাংশ হইয়া থাকে, তবে বেশী মাত্রায় জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখার মত ভারী সে ছিল না। কিন্তু যতই তাহার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাহার গাত্রে অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্পও সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল এবং যখনই ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমিয়া আসিল, তখনই এই জলীয় বাষ্পের কতকাংশ বৃষ্টির আকারে জমিয়া ঝরিয়া পড়িল। উক্ত বৃষ্টিজলের কতক আবার পরে বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল, কতক বা মাটিতে বসিয়া গেল; কিন্তু অনেকখানি জলই যেখানে গর্ত্ত পাইল, একত্রিত হইয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করিল।

এমন কি তৎকালে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ মসৃণ ছিল না, উচ্চ ও নীচ ভূমিময় ছিল। কেন এরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করা যাক। আজকাল মেরুপ্রদেশে যেমন ক্রমাগত তুষারকণিকা সঞ্চিত হইয়া বরফের পাহাড় সৃষ্ট হয়, আমাদের পৃথিবীও অনেকটা সেইরূপই গ্রহাণুরাজির স্তূপের দ্বারাই ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু গ্রহাণুসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। কারণ গ্রহাণু-উপাদানের অনেকটাই সূক্ষ্ম পদার্থের আকারে ছিল, কাজেই বাতাসের দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, আজকালকার প্রায় প্রত্যেক উল্কাটিই আকাশের গাত্রে একটা আলোর রেখার মত থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের সেই আলো নিবিয়া যায়। কারণ উল্কাটি উচ্চতর বায়ুমণ্ডলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বাষ্প ও সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হইয়া থাকে। এই ধূলিকণার অধিকাংশ দীর্ঘকাল বায়ুমণ্ডলে থাকিয়া বাতাস দ্বারা দূরদূরান্তে সঞ্চালিত হয়।

বৃষ্টি ও তুষারই বায়ুমণ্ডলের মধ্য হইতে ধূলিরাশি ও ধূমকণা ঝাঁটাইয়া পৃথিবীর বক্ষে

লইয়া আসে। আকাশ যখন ধূমজালে আচ্ছন্ন থাকে, তখন অনেক সময়ে নিকটবর্ত্তী দৃশ্যসমূহও দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ এক পশলা প্রবল বৃষ্টিপাতের পরে আকাশ সুনির্ম্মল হওয়াতে বহু দূরের গাছপালাও সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

সচরাচর বৃহত্তর ও গুরুতর গ্রহাণুরাশি বৃষ্টিপাতের দ্বারা কোনওরূপ বিচলিত হয় না, তাহারা প্রায় সমানভাবেই ভূপৃষ্ঠের উপর আসিয়া পড়ে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরমান গ্রহাণু-ধূলির সূক্ষ্ম কণাসমূহ অধিকতর ঘনবৃষ্টির দেশেই বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে; অথচ ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ পদার্থ আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই সূক্ষ্ম কণারাশির পরিমাণই বেশী। ফলে অধিকতর ঘনবৃষ্টি তথা অধিকতর গ্রহাণু-সঞ্চয়ের দেশগুলি সাধারণ অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি তথা কম সঞ্চয়ের দেশগুলি কতক পরিমাণে নীচু হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীবক্ষে যে জল সঞ্চিত ছিল তাহা প্রধানতঃ এই নিম্ন স্তরের প্রদেশই অধিকার করিল আর উচ্চ স্তরের দেশগুলি জলের উপর রহিল। কিয়ৎকালের নিমিত্ত অধিক জলের দেশ অর্থাৎ মহাসমুদ্র এবং অধিক স্থলের দেশ অর্থাৎ মহাদেশগুলির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পরবর্ত্তী অবস্থাতেও এই নির্ব্বাচক ক্রিয়া চলিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় তাহার ব্যাস খুব সম্ভবতঃ ৬০০০ হাজার মাইল ছিল। সেই অবস্থা হইতে উহা বর্ত্তমানে প্রায় ৮০০০ হাজার মাইল ব্যাসে আসিয়া পৌছিয়াছে।

কালক্রমে উক্ত সঞ্চয়নের ফল গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ একবার উহার সূত্রপাত হওয়ার ফলে, জল ও স্থলভাগ বায়ুচলাচল ও বৃষ্টিপতনের উপর স্বকীয় প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক আপনাদিগকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল অর্থাৎ জল জলই রহিল এবং স্থল স্থল। আবার জল ও স্থলদেশের উচ্চতার পার্থক্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরবর্ত্তী বৃদ্ধির অবস্থাতেও স্থলভাগেই জলভাগ অপেক্ষা অধিকতর গ্রহাণুবস্তু সঞ্চিত হইল এবং অধিকতর হাল্কা বস্তুগুলি জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগে অধিকমাত্রায় পতিত হইল।

ভূপৃষ্ঠকে প্রধানতঃ কয়েকটি স্থলভাগে ও জলভাগে বিভক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন নির্ব্বাচন-ক্রিয়াও কার্য্যকরী হইয়া উঠিল। স্থলদেশের শৈলরাজি বায়ুমণ্ডলের তাড়নায় ও অন্যান্য উপায়ে ক্ষয় পাইতে লাগিল, অথচ জলাবৃত শৈলরাশি এ সমস্ত অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইল। স্থলভাগের বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন ও কার্ব্বন-ডায়কসাইড কঠিন শৈলকে ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট করিয়া আলগা ধূলায় পরিণত করিল। সেই ধূলাকেই আমরা মাটি ও মাটির অন্তঃস্তর (subsoil) বলিয়া থাকি। এই জলবায়ুর কার্য্যে বৃষ্টির জলের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। বৃষ্টি সচ্ছিদ্র শৈলাবরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া নিঃসৃত হয় এবং সেই জলের অনেকটা পরে নদীপথে সমুদ্রে গমন করে। পৃথিবীর মাটি যদি শুদ্ধমাত্র বালুকা ও লবণের মিশ্রণ হইত, তবে জল লবণকে গলাইয়া কেবলমাত্র বালুকা অবশিষ্ট রাখিত। কালক্রমে অধিকাংশ লবণই সমুদ্রে গমন করিত, আর স্থলভাগের বালুকা লবণশূন্য হইত।

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে অনেকটা সেই প্রকারই ঘটে বটে, তবে অত সহজে নহে। ক্ষয়প্রাপ্ত শৈলের যে অংশ অতি সহজে জলে দ্রবীভূত হয়, তাহাই সমুদ্রে চলিয়া যায়; কিন্তু কম-গলা বস্তুসমূহ স্থলভাগেই থাকিয়া যায়। বিশেষ করিয়া সোডিয়ম, পটাশিয়ম, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম্-এর যৌগিক পদার্থ এবং লৌহের কোন কোনটি সমুদ্রে গমন করে। আর সিলিকা (quartz, sand etc.) ও এলুমিনিয়মের যৌগিক পদার্থগুলিই বিশেষতঃ স্থলভাগের উপরে থাকিয়া যায়। অবশ্য এই ধরণের বিভাগ কোনও ক্রমেই সম্পূর্ণ নহে।

যদিও জলে গলনশীলতার পার্থক্য দ্বারাই উপরোক্তরূপ বিশ্লেষণ হইয়া থাকে তথাপি উক্ত প্রক্রিয়ার ফলে ভারী বস্তুগুলিও অপেক্ষাকৃত হাল্কা বস্তু হইতে পৃথক হইয়া যায়। সমুদ্রগামী সোডিয়ম্, পটাশিয়ম্, ক্যালসিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়ম্-এর যৌগিক পদার্থসমূহ সাধারণতঃ গড়ে স্থলবাসী সিলিকা ও এলুমিনিয়মের যৌগিক পদার্থ অপেক্ষা ভারী। কাজেই কালক্রমে স্থলভাগের উপাদানসমূহ এই প্রকারে ক্রমশঃ ভারী বস্তু হারাইয়া হাল্কা হইয়া পড়ে, আর জলভাগ অধিকতর ভারী পদার্থ বেশী পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃই ভারী হইয়া উঠে। দ্রবীভূত পদার্থের কতক অংশ সমুদ্রে পৌছিয়াও গলিত অবস্থাতেই থাকে, যেমন সমুদ্রের জলে আজও আমরা লবণ, চূণ ও অন্যান্য পদার্থ দেখি। কিন্তু অধিকাংশ পদার্থই সমুদ্রের তলদেশে গাদের মত পড়িয়া থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কতক অংশ যখন প্রধানতঃ স্থল ও অপর অংশ প্রধানতঃ জল দ্বারা বিভক্ত হইল সেই সময় হইতেই পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাচক ক্রিয়ার সূচনা হইল। পৃথিবীর কলেবরের বহির্দ্দেশীয় ১০০০ হাজার মাইল নির্ম্মিত হইবার সময়ে স্থলদেশের উপর যে সমস্ত গ্রহাণু পতিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই অংশতঃ বায়ু দ্বারা পাচিত ও জলে লঘুকৃত হইয়া পড়িয়াছে; আর যে সমস্ত গ্রহাণু জলে নিপতিত হইয়াছে, তাহারা বায়ুর পীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর গাদের সঙ্গেই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। গভীর-ভাবে চাপা পড়ায় এই সমস্ত উপাদানের কতকাংশ স্থলদেশের নিম্নে, কতক বা মহাসমুদ্রের নীচেই গলিত হইয়া বহুবিধ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিয়াছে।

কাজেই ভূমণ্ডলের যে অংশ গোড়াতেই স্থলভাগ হিসাবে কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ ছিল, পৃথিবী বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে অংশের উপরে সামান্যরকম লঘুতর শৈলের স্তর জমিল, আর আদিতে যে অঞ্চলে জল সঞ্চিত ছিল তাহার উপরে অপেক্ষাকৃত গুরুতর শৈলের সৃষ্টি হইল। পরবর্ত্তী যুগে প্রায়-পূর্ণাঙ্গ পৃথিবীর বর্দ্ধিত গুরুত্ব যখন পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশ দৃঢ়ভাবে সংসক্ত করিয়া অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটাইল, তখন স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত-ভারী সমুদ্রের অংশগুলি অপেক্ষাকৃত লঘুতর স্থলভাগ অপেক্ষা বেশী বসিয়া গেল; ফলে সমুদ্রের তলদেশ আরও গভীর হইল, স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা আরও উচ্চে উঠিয়া গেল। এইভাবে কিশোরী ধরিত্রীর দেহে যৌবন রেখা ফুটিয়া উঠিল, মহাদেশ ও

মহাসমুদ্রের ব্যবধান বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর দেহ সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া উঠিল। অধুনা মহাদেশ-গুলি মহাসমুদ্রের তলদেশ হইতে গড়ে প্রায় ৩ মাইল উচ্চ।

প্রাণিজগতের সূচনাঃ—পৃথিবীর বক্ষে যখন যথেষ্ট পরিমাণে জল সঞ্চিত হইল এবং তাহার তাপমাত্রাও অনুকূল হইয়া আসিল, তখন প্রাণিজগতের আবাসের পক্ষে উহা উপযুক্ত হইল এবং জীবনধারণের পক্ষে পৃথিবী যোগ্য স্থান হইয়া উঠিল। ভূপৃষ্ঠে প্রথমে কিরূপে জীবের সৃষ্টি হইল, এই কঠিন সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ একথা প্রমাণ করিতে পারেন যে, জীবন্ত বস্তুর প্রাণধারণের পক্ষে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থার অস্তিত্ব একান্ত অবশ্যম্ভাবী, পৃথিবীর যৌবনোদ্গম ও বৃদ্ধি-প্রাপ্তিকালীন অবস্থাতে সেই সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। উপরোক্ত সমস্যা-সমাধানের পক্ষে ইহাই সূচনা; কাজেই আমরা অতি সহজে সে অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

জীবনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য কয়েকটি রাসায়নিক উপাদানেই জীবন্ত পেশীসমূহ প্রধানতঃ গঠিত। এই সমস্ত উপাদানের নাম—অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ফস্ফরাস্। ক্লোরিন, ক্যালসিয়ম্, ম্যাগনেসিয়ম্, সোডিয়ম্, পটাশিয়ম্ ও লৌহ প্রভৃতি আরও কয়েকটি উপাদানও প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহারা তত প্রধান নয়। আবার ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড আসিয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েকটি আশ্চর্য্য ধাতু ও যৌগিক পদার্থ থাকে যাহা আজকাল আমাদের পৃথিবীস্থিত শৈলে পাওয়া যায় না, অথচ যেগুলি জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। এই সমস্ত অদ্ভুত পদার্থগুলি হইল কারবাইড্ (Carbides), ফস্ফাইড্ (Phosphides), সালফাইড্ (Sulphides), নাইট্রাইড্ (Nitrides) ও নানাবিধ হাইড্রোকার্ব্বন। শূন্যাকাশে তাহারা স্থায়ীভাবে যেমন আছে, ঠিক তেমনই থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও জলের সংস্পর্শে তাহারা অস্থায়ী হইয়া পুনরায় নূতন পদার্থে পরিণত হয়। সর্ব্বজনপরিচিত ক্যালসিয়ম কারবাইডের গায়ে জল স্পর্শ করিলেই এসিটিলিন্ নামক একটা হাইড্রোকার্ব্বন প্রস্তুত হয়। কিন্তু ক্যালসিয়ম্ কারবাইডের পরিবর্ত্তে যদি ইউরেনিয়ম্ কারবাইড লওয়া যায়, তবে তাহার গায়ে জল লাগিলে মার্স গ্যাস, হাইড্রোজেন্ এবং ইথিলিন সংমিশ্রিত একটা বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যাইবে; এতদ্ব্যতীত বহুল পরিমাণে তরল ও কঠিন হাইড্রোকার্ব্বনেরও উদ্ভব হইবে।

পৃথিবীর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির অবস্থাতে তাহার স্থলভাগের বহির্দ্দেশ খণ্ড খণ্ড গ্রহাণুবস্তুর একটা শিথিল, অসংলগ্ন সমষ্টি ছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। তখন পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের অস্থায়ী যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। জল ও বাতাস পৃথিবীর এই সচ্ছিদ্র আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অঙ্গার, হাইড্রোজেন,

অক্সিজেন, কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড, ফস্ফরাস্ ও গন্ধকের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে। ফলে এই সমস্ত মৌলিক উপাদান অত্যন্ত তৎপরতার সহিত নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ছিদ্রের মধ্যেও দ্রবণের নিঃসরণ, কৈশিক আকর্ষণ, বাষ্পাকারে তিরোধান (evaporation), চর্ম্মান্তর্বাহীপ্রবাহ (osmosis) এবং সহায়ক ক্রিয়া (catalytic action) প্রভৃতির দরুণ অন্যান্য কার্য্যও চলিয়া আসিতেছে। এক সময়ে মহাসমুদ্রই প্রাণিজগৎ সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা মনে হয় না; কারণ যে একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের সমবায়ে জীবন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহা সমুদ্রে গলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তথায় অধিকতর স্থায়ী অবস্থাতেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সমুদ্রতীর ও স্থলভাগের সচ্ছিদ্র মৃত্তিকাতেই অস্থায়ী অবস্থাপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ জীবন্ত বস্তুতে পরিণতিলাভ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করিয়া জীবন সৃষ্টি করিয়াছে।

জীবন প্রথম কবে, কি ভাবে আরম্ভ হয়, সে কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। পার্থিব উপাদান ও জীবন্ত বস্তুর ব্যবধান এখনও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন জীবন সূচনা করিবার পক্ষে উপযোগী পদার্থসমূহ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আর তখন অবস্থাও এমন ছিল যে সে সমস্ত পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া বিশেষভাবে সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল।

পৃথিবীর যৌবনবিকাশ—মহাসমুদ্র ও মহাদেশগুলির ক্রমবিকাশ এবং জীবন্ত প্রাণিসমূহের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর গঠনকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখনকার গ্রহটির সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী ও সুপরিচিত ভূতাত্ত্বিক যুগের পৃথিবীর ক্রমশঃই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। যদিও সেই সময়ের পরে আরও গ্রহাণুপাতের দ্বারা পৃথিবীর ব্যাস আরও কয়েক শত মাইল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তখনও আধুনিক যুগের ন্যায় ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াদি পূর্ণোদ্যমেই চলিয়াছে। সুপরিচিত ভূতাত্ত্বিক যুগে নদীগুলি স্থলভাগ হইতেই সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে, আর স্থলদেশ ধৌত করিয়া মাটি ও বালি নিয়া সমুদ্রে ঢালিয়াছে; ধীরে ধীরে অথচ অশ্রান্তভাবে স্থলভাগের উপাদানসমূহ ধৌত হইয়া সমুদ্রের বুকে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এইভাবে এবং অন্যান্য সমতলতাবিধায়ক প্রক্রিয়ার ফলে মহাদেশসমূহ ক্ষয়িত হইয়া ক্রমশঃ অনুন্নত হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই কাজে বাধা না জন্মিত, তবে কালক্রমে মহাদেশগুলি এত নিম্নাভিমুখী হইত যে সমুদ্রের জলে সমস্ত দেশ পরিপ্লাবিত হইয়া স্থলবাসী জীবজন্তু ও গাছপালার জীবন শেষ করিয়া দিত অথবা তাহারা সমুদ্রে বাস করিতে অভ্যস্ত হইত। পৃথিবীতে আর মানুষ থাকিত না।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্থলভাগ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়িত হইয়া তথায় জীবনধারণ অসম্ভব

করিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই মহাদেশগুলি আবার উন্নত হইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। পৃথিবীর স্বভাব এত সুশৃঙ্খলিত যে স্থলভাগের কোনও অংশ গভীরভাবে ক্ষয়িত হইলেই আবার তাহা পূর্ণ হইয়া উঠে। উপাদানের অপচয় হেতু পৃথিবীর স্থল যখন লঘুতর হইয়া পড়ে, তলানি সঞ্চয়ের ফলে তাহার সামুদ্রিক অংশসমূহও তখনই ভারী হইয়া উঠে। জল ও স্থলভাগের সাম্যাবস্থার বিকৃতি ঘটে, কিন্তু পৃথিবীর শৈল-উপাদান অত্যন্ত শক্ত বিধায় পাহাড় ধ্বসিবার পূর্ব্বে অনেক দিন পর্য্যন্তই এই অসমতা চলিতে পারে। কিন্তু ভারকেন্দ্রীয় শক্তির বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অসংলগ্নভাবে সজ্জিত বস্তুর পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর একটা সাধারণ সঙ্কোচন উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই অবশেষে পৃথিবীর বহির্দ্দেশের অংশ ধ্বসিয়া যায়।

সঙ্কুচিত হইবার সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ একভাবে কাজ করে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সামুদ্রিক অংশসমূহ স্থলপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর গুরুভার শৈলে প্রস্তুত; আর স্থলভাগ বিধৌত হওয়ার ফলে সেখানকার বহুবিধ বস্তু আসিয়াও তাহাদিগকে আরও ভারী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু স্থলদেশের লঘুতর শৈলগুলির পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়িত হওয়ায় মহাদেশগুলি আরও ভারমুক্ত হইয়াছে। ভারকেন্দ্রীয় শক্তির চাপে সাধারণভাবে ধ্বসিয়া যাইবার কালে ভারী সামুদ্রিক অংশগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বসিয়া যায়; লঘু স্থলভাগসমূহ কম বসে, অথবা নিম্নগামী সমুদ্রের অংশগুলির একত্র সমাবেশের ফলে স্থলভাগ নিষ্পেষিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধ দিকে ভাসিয়া উঠে। সমুদ্রজল গভীরতর সমুদ্রের তলার দিকে চলিয়া যায়, মহাদেশগুলি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করে। এইভাবে স্থলবাসী জীবের প্রাণ রক্ষা হয় এবং স্থলভাগও জীবজন্তু ও গাছপালার ক্রমবিকাশের পক্ষে উপযুক্ত হইয়া উঠে।

স্থলভাগ নিষ্পীড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠার ফল তাহার সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক মাত্রায় ঘটিতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থলদেশের প্রান্তভাগ সঙ্কুচিত হইয়া পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিণত হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই সমস্ত সঙ্কুচিত প্রদেশের শৈলরাজি অতিরিক্তরূপে নিষ্পীড়িত হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, ফলে বড় বড় বস্তুর তাল স্তরভাঙ্গা সমতল ভূমির মধ্য দিয়া একে অন্যের উপর গড়াইয়া গিয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। যে অঞ্চলে পর্ব্বতশ্রেণী গঠিত হইতে থাকে, সেখানেই ঘন ঘন ভূমিকম্প ঘটিতে দেখা যায়। যে সমস্ত প্রদেশে এইরূপ ভূপৃষ্ঠস্থ শৈলরাজি বিচলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, সেই সমস্ত জায়গাতেই ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত শৈল সহজে বাহিরের দিকে আসিতে পারে; কাজেই সেই সমস্ত অঞ্চলেই আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি ও গৈরিক স্রোত প্রবাহিত হয়। এইরূপে খুব নিকট সম্পর্কিত ক্রিয়াদির মন্থর গতির ফলেই ভূপৃষ্ঠস্থ বৃহত্তর ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

উত্তর বেহারে নরবলি

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছে। যে সকল ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিবার জন্য সেই ব্যবসায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এমন কি চোর এবং তস্করদিগেরও উপাস্য দেবতা আছে। ভারতবর্ষীয় তস্কর এবং দস্যুগণেরও ঐরূপ বিশেষ উপাস্য দেবী আছে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে কোন স্থানে দস্যুবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহারা যদি উক্ত দেবীর পূজা করে এবং তিনি যদি সেই পূজায় সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে উহাদের যাত্রা সফল হইবে এবং অসন্তুষ্ট হইলে যাত্রা ব্যর্থ হইবে। এই পূজা উপলক্ষে উক্ত দেবীকে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও শস্য অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে এবং কখন কখন তাঁহার সম্মুখে পশুবলি দিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জনৈকা দেবীই এই সমস্ত ভারতবর্ষীয় চোর এবং দস্যুসম্প্রদায়ের রক্ষাকর্ত্রী। উত্তর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে তাঁহাকে কেবলমাত্র 'দেবী' বলা হয় এবং অপরাপর স্থানে তাঁহাকে 'কালী' অথবা তদর্থসূচক নামে অভিহিত করা হয়। বঙ্গদেশে কালীই চোর এবং দস্যুগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। যুক্তপ্রদেশে এবং পঞ্জাবে তস্করগণ তাঁহাকে 'দেবী' অথবা 'মাতা' নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। 'ঠগেরা' (Thugs) যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া উহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে মানস করিত, সেই ব্যক্তির গলদেশে একখানি রুমালের ফাঁসি লাগাইয়া উহাকে হত্যা করিত। ঠগেদের ব্যবসায় একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই ঠগ সম্প্রদায়ভুক্ত দস্যুরাও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেবীর অর্থাৎ মাতার অর্চ্চনা করিত এবং এই পূজাপ্রকরণ হইতেই তাহাদের যাত্রা সফল হইবে কি না তাহার সঙ্কেত বুঝিয়া লইত।

উত্তর বেহারের অন্তর্গত সারন জেলানিবাসী ডোমেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীভুক্ত ডোমেরা চৌর্য্য এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ডোমেরা শূকর পালন অথবা বাঁশের ঝুড়ি, ছাতা এবং পাখা প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় প্রভৃতি নির্দ্দোষ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহারা হিন্দুদিগের শবদাহ করিবার কাষ্ঠও যোগাইয়া থাকে। ইহার বিনিময়ে তাহারা শবের বস্ত্রাদি এবং কিঞ্চিৎ অর্থ পারিশ্রমিকস্বরূপ লাভ করে। হিন্দুদিগের ভোজেতে

যে সমস্ত ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পড়িয়া থাকে সেইগুলিও তাহারা লইয়া যায়। ইহারা কোনরূপ অপরাধমূলক কার্য্য করে না।

প্রথম শ্রেণীর ডোমেরা অর্থাৎ যে সকল ডোমেরা অপরাধমূলক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে 'মঘৈয়া' (Magahiya) ডোম' নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা দেখিতে খর্ব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কেশ রুক্ষ এবং দীর্ঘ। ইহাদের চক্ষু অনার্য্য জাতিদের চক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। ইহাদের আকৃতি এবং দৈহিক গঠন দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ইহারা কোন প্রাচীন আদিম জাতি হইতে সম্ভূত। ইহারা বিখ্যাত চোর এবং বদ্‌মায়েস এবং সিঁধেল চুরি ও সময়ে সময়ে ডাকাতিও করিয়া থাকে। কোনরূপ চাষবাস ইহারা করে না। যে সকল জীবিকার্জ্জনকারী কার্য্যে পরিশ্রমের আবশ্যক, পারত পক্ষে সে সকল কার্য্য ইহারা করে না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কখন কখন বাঁশের ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরী করা এবং অপহৃত দ্রব্যাদি হস্তান্তরিত-করণে সাহায্য করাই তাহাদের প্রধান কার্য্য। এই 'মঘৈয়া' ডোমদিগের এক অদ্ভুত রকমের উপাসনা পদ্ধতি (অর্থাৎ cult) আছে। ইহাদের উপাস্য দেবীর নাম 'সংসারী মাই'। চুরি অথবা ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইহারা এই দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই পূজা উপলক্ষে ইহারা স্বীয় দেহ হইতে রক্ত লইয়া উপাস্য দেবীকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে।

এই প্রথা সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ স্যার এইচ্, এইচ্, রিজ্‌লে তাঁহার *The Tribes and Castes of Bengal* শীর্ষক ইংরাজী গ্রন্থে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"নিয়মিতভাবে চুরি ও ডাকাতি করাই 'মঘৈয়া' ডোমদিগের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি ইহাদের উপাসনাপদ্ধতির উপরও এই অবৈধ ব্যবসায়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল 'মঘৈয়া' ডোমেরা সিঁধেল চুরি করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তাহাদেরও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এই উপলক্ষে 'সংসারী মাই' নাম্নী দেবীর অর্চ্চনা প্রচলিত। কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ বলেন যে এই দেবী কালীর অবতার মাত্র। (কিন্তু স্বয়ং স্যার এইচ্, এইচ্, রিজ্‌লের মত যে ইনি বহু আদিম নিম্নাসীর উপাস্য দেবী 'ধরিত্রী-মাতা'।) এই 'সংসারী মাই'র কোনরূপ প্রতিমা গড়া হয় না। এমন কি একটী মৃত্তিকাস্তূপও ইহার প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ম্মাণ করা হয় না। জমীর উপরে গোবরের লেপ দিয়া উহার উপরে একটী চক্র অঙ্কিত করা হয়। এই চক্রটীর ব্যাস এক বিঘৎ ও চারি আঙ্গুলি। এই চক্রের সম্মুখে উপবেশন করিয়া উপাসক স্বীয় ছুরিকার দ্বারা বাম হস্ত ক্ষত করে এবং ক্ষত স্থান হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া

অঙ্গুলির দ্বারা উপরোক্ত চক্রের কেন্দ্রস্থলে চারিটী রেখা অঙ্কিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে এই মন্ত্রটী বলিয়া থাকে :— (১) হে দেবি! রাত্রি যেন অন্ধকার হয় যাহাতে আমি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা করিতে পারি, (২) আমি যেন প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে পারি, (৩) আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যেন ধৃত না হয়।*

এক্ষণে নিম্নলিখিত প্রশ্নটী আলোচনার জন্য স্বতঃই উত্থিত হইতেছে :—'মধৈয়া' ডোমেরা কি প্রাচীনকালে দেবী 'সংসারী মাইকে' নরবলি প্রদান করিত? এক্ষণে যে উহারা উক্ত দেবীকে রক্ত-অর্ঘ্য প্রদান করে, উহা কি প্রাচীন নরবলি-প্রথার বিনিময়স্বরূপ দিয়া থাকে?

উক্ত প্রশ্নটীর সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে প্রাচীন কালের নরবলির বিনিময়েই 'সংসারী মাই'কে উক্ত রক্ত অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(১) 'মধৈয়া' ডোমদিগের আকৃতি ও দৈহিক বিশেষত্বগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহারা কোন আদিম ও অসভ্য জাতি হইতে উদ্ভূত।

(২) প্রায়ই দেখা যায় যে আদিম ও অসভ্য জাতিরা অশরীরী এবং প্রেতাত্মামূলক দেবদেবীরই উপাসনা করিয়া থাকে।

(৩) সচরাচর দেখা যায় যে এই প্রেতাত্মামূলক দেবদেবীগণ অনিষ্টকর এবং নর-রক্তের জন্য সর্ব্বদাই লোলুপ। এই জন্যই উক্ত দেবদেবীগণের আদিম ও অসভ্য উপাসকগণ নরবলি প্রদান করতঃ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিত।

(৪) ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত দেবদেবীগণকে নরবলি প্রদান করিবার জন্য নরনারী সহজেই পাওয়া যাইত। সুতরাং আদিম ও অসভ্য জাতিরা তাহাদের উপাস্য দেবদেবীগণকে সচরাচর এবং অনায়াসেই নরবলি দিত।

(৫) কিন্তু ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই নরবলি দিবার জন্য নরনারী পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। সেইজন্য উক্ত আদিম ও অসভ্য জাতিরা বাস্তবিক নরবলি দিবার প্রথাটী পরিত্যাগ করিয়া উহার বিনিময়ে স্বীয় দেহ হইতে নিঃসৃত রক্ত অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিবার প্রথা অবলম্বন করিয়াছে।

(৬) যে সময় হইতে বৃটীশগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে সেই সময় হইতেই 'মধৈয়া' ডোমরাও নরবলি দিবার প্রথাটী পরিত্যাগ করিয়া উহাদের উপাস্য দেবী 'সংসারী মাই'র প্রতিনিধি ভূমিতে অঙ্কিত চক্রটীকে রক্ত-অর্ঘ্য দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে উহারা বাম হস্ত ছুরিকার দ্বারা ক্ষত করিয়া উহা হইতে রক্ত গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা চক্রের কেন্দ্রস্থলে পাঁচটী রেখা অঙ্কিত করে।

* L. S. S. O'Malley প্রণীত *The Gazetteer of Saran* (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) নামক ইংরাজী গ্রন্থের ৪৭-৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) উপরে বলিয়াছি যে স্যার এইচ্‌, এইচ্‌, রিজলের মতে 'সংসারী মাই' একজন 'ধরিত্রী দেবী'। কিন্তু তাঁহার মত আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় 'সংসারী মাই' নরশোণিতলোলুপা কালীমাতার বা দেবীর আংশিক অবতার মাত্র নহে, কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তস্করেরা, দস্যুরা, অথবা অপরাপর লুণ্ঠনকারীরা কালীমাতা বা দেবীরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

'মধৈয়া' ডোমদিগের যে রক্ত-অর্ঘ্য দিবার প্রথা আছে, উহার সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত একটী প্রথার খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। উক্ত বঙ্গদেশীয় প্রথাটী এই যে, যখন কোন বঙ্গমহিলার স্বামী বা পুত্র গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন, তখন উক্ত মহিলা এই বলিয়া 'মানৎ' করেন যে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে তিনি কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরী কালীঘাটে গমন করিয়া কালীমূর্ত্তির সম্মুখে স্বীয় দেহ হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত লইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দেবীকে অর্ঘ্য দিবেন। বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পরলোগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার *Indo-Aryans* নাম্নক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১-১১২ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন যে এই প্রথাটী মধ্য যুগ হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে এবং ইহার উল্লেখ "কালিকা পুরাণে"ও পাওয়া যায়।

ক্রমবিকাশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

হরিণশৃঙ্গের ব্যষ্টিক্রম বাহির হইতেই সাধারণ দৃষ্টিতে মোটামুটি বুঝা যায়। হরিণশিশুর প্রথমাবস্থায় শিং থাকে না। পরে শিং-এর চিহ্নস্বরূপ তাহাদের মস্তকের উপর অস্থিগর্ভ কঠিন আবরণসম্বলিত উপাঙ্গের আবির্ভাব হইয়া ক্রমশঃ কিছু দিন পরে উহা ধীরে ধীরে সরলাকৃতি শৃঙ্গে পরিণত হয়। পরে আবার উহা হইতে দুই একটী করিয়া শাখা বাহির হয়। হরিণশিশু আরও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সেই শিং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া নানা শাখাপ্রশাখাযুক্ত হইয়া থাকে। শৃঙ্গের এই পরিণতি ও ইহার শাখাপ্রশাখাসম্বলিত আকারের বা গঠনের বৈচিত্র্যের উদ্ভব বুঝিতে হইলে হরিণের বংশসূত্র অবলম্বনে তাহার বংশপরম্পরাগত ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যুগযুগান্তর ধরিয়া বংসরের পর বৎসর ক্রমবর্দ্ধমান হরিণ দেশকালপাত্রভেদে জাতিগত বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়,—তাহার সরল রেখাকৃতি ক্ষুদ্র শিং দীর্ঘে

ধীরে কিরূপে জটিলতা লাভ করিয়া নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সুবৃহৎ জটিল শৃঙ্গের উৎপত্তিসাধন করে, জীবজগতের এই ব্যাপার কম রহস্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক নয়!

হরিণের ন্যায় গরু, মহিষাদিরও শিং ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়। এই শিং ছাড়া আমরা মৎস্যাদি ও পক্ষীর পুচ্ছদেশের গঠনবিকাশ সম্পর্কে পূর্ব্বোক্তরূপে উহাদের ব্যষ্টিক্রম ও গোষ্ঠীধারার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া থাকি।

ক্রমবিকাশ মতবাদের অপর একটী সহায়ক শাস্ত্র কোষ-বিজ্ঞান (Cytology)। ভ্রূণশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, প্রশিল-বিজ্ঞান প্রভৃতিও প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতগুলি আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিতে পাই যে সকল মতই দুইটী বিশেষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম সত্য—ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন (Individual variation); দ্বিতীয় সত্য—বংশানুক্রমিতা বা বংশানুক্রম (Heredity)। পরিবর্ত্তিত জীবগণ তাহাদের স্ব স্ব পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমে তাহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইলে তবে নূতন জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। এই ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনের ধারা ও বংশানুক্রমিতার নিয়মাদি আমরা কোষ-বিজ্ঞান পাঠে জানিতে পারি। ক্রমবিকাশ প্রবন্ধের পরিশেষে বিশদভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমবিকাশের মতগুলি লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ভিত্তিস্বরূপ উপরোক্ত সত্য দুইটী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১। প্রথম সত্য—ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন। স্বকীয় জীবনে জীবগণ যে পরিবর্ত্তন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন বলা চলে। সাধারণতঃ চারি প্রকার ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। আমরা ইহাদের যথাক্রমে স্বাভাবিক, ব্যবহারিক, আবেষ্টনিক ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন বলিব।

(ক) **স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন**। দেহাবয়বের যে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লইয়া জীব ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আমরা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বলিব। এই পরিবর্ত্তন আমাদের চেষ্টালব্ধ নয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মাত্রা খুব সামান্যই হইয়া থাকে। পিতা ও পুত্রের আকৃতিগত প্রভেদ এবং এক ভ্রাতা হইতে অপর ভ্রাতার যে প্রভেদ তাহা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনজনিত হয়। এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোমুখী হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী হয় না। ইহা দৈবঘটিত। আমরা দেখিতে পাই একই মনুষ্যের চারিটী সন্তান চারি প্রকারের হইয়া থাকে। কেহ কৃশ, কেহ বা স্থূল দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল; কেহ দীর্ঘ, কেহ নাতিদীর্ঘ, কেহ বা বামন হইল। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন আমাদের জননকোষে একপ্রকার পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণা আছে। উহার প্রভাবে এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। কোষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এ বিষয় বিশদভাবে বলিব। ক্রমবিকাশের ডারুইনপ্রবর্ত্তিত মতটী জীবজগতের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

(খ) **ব্যবহারিক পরিবর্ত্তন**। এই পরিবর্ত্তন জীবগণ স্ব স্ব চেষ্টা বা অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কামারের ডান হাতখানি অতি-ব্যবহারে মোটা ও শক্ত হইয়া যায়, কিন্তু অব্যবহারে বা কম ব্যবহারে বাম হাতখানি অপেক্ষাকৃত কৃশ থাকে। হস্তের এই পরিবর্ত্তন অভ্যাসলব্ধ। সেকালে চীনা মেয়েরা আশৈশব পায়ে কঠিন কাষ্ঠ পাদুকা পরিধান করিয়া তাহাদের পদতল (পায়ের পাতা) ছোট করিয়া ফেলিত। বেশী ছুটাছুটীর জন্য অশ্ব-বিশেষের পা-অন্যান্য অশ্ব অপেক্ষা কিছু বেশী মোটা হয়,—ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াগুলির পায়ের গঠন লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। স্বকীয় জীবনের এই অভ্যাসলব্ধ পরিবর্ত্তনকে আমরা ব্যবহারিক পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। লামার্ক-এর ক্রমবিকাশ মতটী এই ব্যবহারিক পরিবর্ত্তনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

(গ) **আবেষ্টনিক পরিবর্ত্তন**। জীবগণ নূতন কোনও এক আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নূতন আবহাওয়ার গুণে স্বভাবতঃ তাহাদের দেহের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই পরিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্যই শস্যশ্যামল বঙ্গদেশের বৃক্ষরাজি পত্রবহুল, কিন্তু মরুময় রাজপুতানার বৃক্ষাদি শুষ্ক ও স্বল্পপত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় কোন ব্যক্তি যদি একাদিক্রমে ৫০।৬০ বৎসর আফ্রিকা দেশে বাস করে, তবে তাঁহার গায়ের রং অনেকটা তামাটে হইয়া যায়। ইহার কারণ আফ্রিকার প্রখর রৌদ্র-তাপ। দীর্ঘকাল বংশপরম্পরায় সমুদ্রজলে বাস করায় তিমির গায়ের লোম ঝরিয়া গিয়া উহার দেহ মসৃণতা লাভ করিয়াছে। তিমির এই গাত্রলোমের বিলোপ উপরোক্ত আবেষ্টনিক পরিবর্ত্তনের ফল। পরবর্ত্তী যুগে ক্রমবিকাশের লামার্কীয় মত উপরোক্ত ব্যবহারিক পরিবর্ত্তনের সহিত এই আবেষ্টনিক পরিবর্ত্তনের সত্যতাও স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু আধুনিক লামার্কীয় মত ব্যবহারিক ও আকস্মিক এই উভয়বিধ পরিবর্ত্তনের সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) **আকস্মিক পরিবর্ত্তন**। জন্মের সহিত যে পরিবর্ত্তন মধ্যে মধ্যে জীবদেহে দেখা যায়, তাহাকে আকস্মিক পরিবর্ত্তন বলা হয়। মানুষের সাধারণতঃ হস্তে পাঁচটী অঙ্গুলি থাকে। কোনও কোনও মনুষ্যশিশুকে আবার ছয়টী অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। পথে ঘাটে এমন গাভী আমরা দেখিতে পাই, যাহাদের পৃষ্ঠ হইতে একটী সরু পঞ্চম পদ ঝুলিয়া থাকে। ভ্রমর সাধারণতঃ কালো, কিন্তু কখনও কখনও কালো ভ্রমর হঠাৎ শ্বেত ভ্রমরের জন্ম দিয়া বসে। তবে এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবজগতে খুব কম দেখা যায়। ক্রমবিকাশের ডি-ভ্রিয়েস্ (De Vries) মত এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত।

২। দ্বিতীয় সত্য—বংশানুক্রম বা বংশানুক্রমিতা (Heredity)। আমরা ক্রম-বিকাশের মতগুলির ভিত্তিস্বরূপ পূর্ব্বকথিত প্রথম সত্য 'ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন' সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়াছি। এইবার উহার দ্বিতীয় সত্য 'বংশানুক্রম' সম্বন্ধে বলিব। বংশানুক্রম সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনের জীবজগতে কি প্রয়োজন, তাহা বলা আবশ্যক।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে জীবগণের নানারূপে পরিবর্ত্তনকুশল হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রাণীর গঠনাদি তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল হইয়া থাকে। নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইলে নূতন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রাণী-দিগের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। একটী বিশেষ আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত কোন জীব যদি অন্য কোনও নূতন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে নূতন ধরণের জীবনযাপন করিতে হয়। এই নূতন ধরণের জীবনযাপনের জন্য তাহার দেহে নূতন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। তাহা না হইলে সহজভাবে প্রাণী বাঁচিতে পারে না। ধরা যাক কোনও একটী বিশেষ জীববংশ একইরূপ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে পৃথিবীর সারা অংশে ছড়াইয়া আছে ও তাহাদের দেহাবয়ব সেই সময়কার সমভাবাপন্ন প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপযোগী হওয়ায় তাহাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে না। তাহার পর সময়ের গতিতে কোন এক দৈব দুর্ব্বিপাকে পৃথিবীর এক এক স্থানে এক একরূপ আবেষ্টনের সৃষ্টি হইল—কোন অংশ মরুভূমিতে, কোন স্থান বনানীতে, কোন স্থান বা উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হইল, কোন অংশ জলাভূমির সৃষ্টি করিল, কোন অংশ বা গহ্বরাদিতে পরিপূর্ণ হইল। এখন সেই জীববংশের বিভিন্ন শাখাগুলিকে পৃথিবীর এই বিভিন্ন রূপান্তরিত অংশে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত কোনও না কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনের সাহায্যে তাহাদের দেহাবয়ব নূতন বাসস্থান বা আবেষ্টনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। যে সকল প্রাণীর কালোপযোগী পরিবর্ত্তনসাধন হইবে না তাহারা মরিবে।

প্রাণিজগতে পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার বংশানুক্রম ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিব। আমরা জানি পিতামাতার আকৃতি ও গুণাগুণ অনেকাংশে সন্তানগণ পাইয়া থাকে। "বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া"—এই প্রবাদ বাক্যটী মিথ্যানয়। প্রাণিগণের পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমে তাহাদের সন্তানগণ প্রাপ্ত না হইলে নূতন নূতন প্রাণিবংশের সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। আমরা দেখিয়াছি যে প্রাণিজগতের পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন সামান্য মাত্রায় হইয়া থাকে। এই সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন একটী জীব হইতে অপর এক প্রকার জীবের ক্রমবিকাশের সহায়ক হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এই পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায় প্রয়োজন মত একটী বিশেষ ধারায় বর্দ্ধিত হয়। এই ক্রমবর্দ্ধিত পরিবর্ত্তন একটী জীব হইতে আর একটী নূতন জীব সহজে সৃষ্টি করে। এই ক্রমবিবর্দ্ধনের কারণ স্বরূপ বৈজ্ঞানিকগণ বুঝেন যে বংশানুক্রম বা বংশগত রক্ষণ ধর্ম্মগুণে একটী প্রাণী তাহার স্বকীয় পরিবর্ত্তন তাহার

সন্তানসন্ততির মধ্যে সংক্রামিত করে। ফলে সেই সন্তানসন্ততির পরিবর্ত্তন তাহাদের নিজ নিজ পরিবর্ত্তন ও তাহাদের পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত পরিবর্ত্তনের সমষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। এইরূপে কয়েক পুরুষ পরে এক জীব হইতে অপর এক জীবের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। তখন সেই নবজাত জীবের দেহাকৃতি শত সহস্র বৎসরের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার বহু পূর্ব্বপুরুষের দেহাকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ প্রাপ্ত হয়।

এইবার বুঝা গেল পরিবর্ত্তক ধর্ম্ম (variation) ও বংশানুক্রম (heredity) নূতন আবেষ্টনাদি (environment) সহযোগে নূতন নূতন জীববংশের সৃষ্টি করে। এইবার প্রধানতঃ এই সত্য তিনটীর উপর ভিত্তি করিয়া যে মতবাদ কয়টী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ (theory) প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ডারুইন, লামার্ক ও ডি-ভ্রিয়েস্ প্রবর্ত্তিত মতবাদ প্রসিদ্ধ। এই মতত্রয়কে সমর্থন করিতে গিয়া কুভিয়ার, হ্যাইসম্যান প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ আরও কয়েকটী মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ডারুইনের মতবাদ

ডারুইন ও ডারুইনের শিষ্যগণপ্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশ মতটীকে আমরা ডারুইনের মতবাদ বলিয়া থাকি। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যতগুলি মত আছে, তাহার মধ্যে এই মতেরই বেশী লোক পক্ষপাতী। ডারুইনের মত হইতে আমরা যে শুধু জীববিশেষের সৃষ্টিপরিচয় জানিতে পারি তাহা নয়, জীববিশেষের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টির কারণ পর্য্যন্ত উহা হইতে সম্যকভাবে বুঝিতে পারা যায়। শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কেন, তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ও বর্ণের বিভিন্ন সমাবেশ এবং নখ, শিং, লোম প্রভৃতির উৎপত্তির কারণও আমরা ডারুইনের মত পাঠে অবগত হই।

বংশানুক্রম ও স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন—পূর্ব্বকথিত এই দুই সত্যের সহিত ডারুইন পরিলক্ষিত আরও কয়েকটী সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া ডারুইনের অভিমত প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ ডারুইন উক্ত সত্য কয়েকটীকে যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করেন,—

(১) ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তক ধর্ম্ম—Individual variation
(২) বংশানুক্রম বা বংশানুক্রমিতা—Heredity
(৩) বংশবিচ্ছেদ—Seggregation.
(৪) জন্মাধিক্য—Over production.
(৫) জীবন-যুদ্ধ—Struggle for existence.
(৬) যোগ্যতমের উদ্ধর্ত্তন—Survival of the fittest.
(৭) অযোগ্যের লোপ—Elimination of the unfit.

(৮) জীবের তুষ্টিভাব—Panmixia.

(৯) যৌন নির্ব্বাচন—Sexual selection.

(১০) অনুকরণ—Mimicry.

(১১) কৃত্রিম নির্ব্বাচন—Artificial selection.

এখন ডারুইনের মত সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন—আমরা জানি যে পৃথিবীতে কোনও দুইটী প্রাণী দেখিতে একপ্রকার হয় না। যমজ ভাইদের মধ্যেও দেখা যায় যে দুই জন দুই প্রকারের হইয়াছে। জাতিগত ও ব্যক্তিগত পার্থক্যই প্রাণিজগতের একটী বিশেষত্ব। যতই নিকট হউক না কেন, দুইটী প্রাণীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটীকে পরস্পর হইতে আমরা সহজেই চিনিয়া লইতে পারি। তাহার কারণ তাহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের একটী প্রেরণা আমাদের জনন বা বীজ-কোষগুলিতে নিহিত থাকে। এই কোষগুলি যখন ধীরে ধীরে একটী পূর্ণ প্রাণিবিশেষে পরিণত হয়, সেই অন্তর্নিহিত প্রেরণা-শক্তির প্রভাবে তাহাকে একটী বিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত করে এবং তাহার অবয়ব ও প্রকৃতি তাহার পিতামাতা বা অন্যান্য স্বজাতীয় প্রাণী হইতে অনেকটা পৃথক আকার বা ভাব ধারণ করে। এই পার্থক্য প্রথম দুই এক পুরুষে যদিও অতি অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়, কিন্তু বহু বহু পুরুষানুক্রমে লক্ষ লক্ষ বৎসরের এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনে ধীরে ধীরে প্রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্য তাহার সহস্র বৎসরের পূর্ব্বপুরুষ হইতে অনেক প্রকারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়। সেইজন্য পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ নানাপ্রকারের হইয়া গিয়াছে। যদিও চীনা ও জাপানী আর ভারতীয়দের পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন ছিল, তত্রাচ এই স্বল্প ক্রমিক পরিবর্ত্তনের প্রেরণা মানুষের বীজকোষে থাকার ফলে সহস্র সহস্র বৎসরের পরে দুই ভ্রাতৃবংশকে দুইটী বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত করিয়াছে।

বংশানুক্রম—বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও বলেন যে প্রত্যেক মানুষ তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর একটী পৈতৃক ছাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বংশের ভাবধারা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত থাকে। পুত্র যে অনেকটা পিতার মত হয় ও স্বীয় বংশের গুণাগুণ যে তাহার মধ্যে বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কোন ভুল নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি এবং শিক্ষা ও আপন-চেষ্টার প্রভাবে এই বংশগত বৈশিষ্ট্য অনেকটা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পুত্র পিতা ও মাতার নিকট হইতে তাহাদের আকার ও বিশিষ্টতা অনেক পরিমাণে পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই ধার করিয়া পাওয়া পরিবর্ত্তন আবার তাহার অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণাজনিত বর্দ্ধিত হইয়া আকৃতিতে তাহাকে পিতামাতা হইতে আরও পৃথক করিয়া ফেলে। শিশুর পার্থক্য তাহার পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত পার্থক্য ও নিজের পার্থক্যের সমষ্টি মাত্র। এই মিলিত পার্থক্য তাহার সন্তানাদি আবার তাহার

নিকট হইতে লাভ করিবে এবং তাহাদের নিজস্ব পার্থক্যের সহিত উহা মিলিত হইয়া একটী বিশিষ্ট বংশধারার সৃষ্টি করিবে। কিন্তু এই বিশিষ্টতা এক জাতীয় বিভিন্ন মানবের মধ্যে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রূপে পরিলক্ষিত হয় না। তাহার কারণ, স্ত্রী-পুরুষের বিবাহাদি দ্বারা নির্ব্বিচার মিলনের ফলে এই পৃথক বিশিষ্টতার ধারা ক্ষুণ্ণ হয় ও ব্যক্তিগত পার্থক্যকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে না দিয়া একটী বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এই গণ্ডিমধ্যে আবদ্ধ থাকায় লইয়া এক একটী মানবজাতির সৃষ্টি হয়।

বংশবিচ্ছেদ—কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছা অন্যরূপ। প্রকৃতির খেয়ালে এক-এক সময় প্রাণিগণের এই নির্ব্বিচার মিলন সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আমরা জানি আজ যেখানে জল, কাল সেখানে স্থল হইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে সমুদ্র দুই মহাদেশকে বিভিন্ন করিয়া দেয়, সমুচ্চ পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়া দুইটী মহাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। ফলে এক দেশের প্রাণীর অপর দেশে যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, সুতরাং সেই দুই দেশের প্রাণীর মিলনও আর সম্ভবপর হয় না, পরিবর্ত্তনজনিত বৈশিষ্ট্যের ধারাও আর ক্ষুণ্ণ হয় না। এইরূপে সহজেই এক জাতি হইতে দুইটী বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র যে সমুদ্র, পর্ব্বতাদি ও দুর্ভেদ্য অরণ্যানী এইরূপ প্রাচীর সৃষ্টি করে তাহা নয়, জলবায়ু প্রভৃতিও এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবধানের সৃষ্টি করে। যেমন শীতপ্রধান দেশের অনেক প্রাণী গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি এইরূপে যুগে যুগে আপন খেয়ালমত একই জাতিকে বিভিন্ন প্রকারে পৃথক করিয়া দিয়া তাহা হইতে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। ডারুইন উপরি-লিখিত সত্যগুলির সহিত আরও কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করেন। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু সকলের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। লক্ষ লক্ষ প্রাণী জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু কয়েক সহস্র মাত্র বাঁচিয়া থাকে। জীবনযুদ্ধে সকল প্রাণীর বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইলে এক জাতীয় প্রাণীর বংশধরেরাই সারা পৃথিবী পূর্ণ করিয়া ফেলিত। নিম্নপর্য্যায় ভিন্নপ্রস্থ প্রাণিগণের মধ্যে মাতৃস্নেহের বিশেষ অভাব, সেইজন্য তাহাদের অধিকাংশই জন্মের পর মৃত্যুকবলে পতিত হয়। এই নিমিত্ত জন্মের হারও তাহাদের অনেক বেশী। তাহাদের এক এক জন এক সময়ে ২০,০০০ হইতে ২৪,০০০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকে তাহার খুব কমই। উন্নত জীবদিগের মধ্যে হস্তীরাই খুব কম শিশু প্রসব করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটী হস্তিদম্পতী যদি জীবনে তাহাদের ৩০ বৎসর বয়স হইতে ১০০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৬টী শিশুর জন্ম দেয় এবং ঐ ৬টী শিশু ঐরূপভাবে বংশানুক্রমে ঐ সময়ের মধ্যে ৬টী করিয়া শিশু রাখিয়া যায়, তাহা হইলে ৭৫০ বৎসর পরে তাহাদের বংশে ১৯,০০০,০০০ হস্তী হইবে। খরগোস, ইঁদুর প্রভৃতির জন্মের হার আরও বেশী। আমেরিকায় এক প্রকার কীট আছে তাহাদের এক এক জনে ১৬,০০০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে। কয়েক পুরুষ মাত্র একটী কীট এই হারে প্রসব করিতে থাকিলে তাহাদের সংখ্যা

তিন পুরুষ বাদে হইবে ৬৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। আর সেই ডিম্বগুলির ওজন হইবে আমাদের এই পৃথিবীর ৮ গুণ। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এতগুলি প্রাণীর বাঁচিয়া থাকা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না।

ডারুইন বলেন, পৃথিবীর ইতিহাস প্রাণিগণের অনন্তকালব্যাপী জীবনযুদ্ধের ইতিহাস। এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ পৃথিবীর প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কেবল যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হয় তাহা নয়, একই জাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেও এই যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক বিড়ম্বনার সঙ্গেও প্রাণিগণের যুদ্ধ করিতে হয়। জগতে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য এই যুদ্ধ। আমাদের দেশের সুন্দরবনের কথা ধরা যাক। সেখানে ব্যাঘ্র, হরিণ, সর্প, নেউল, ভেক, কীটাদি কতপ্রকার জীবই না বাস করে। সকলকেই জীবনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। ব্যাঘ্র হরিণ মারিয়া খায়, আর হরিণ দৌড়াইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। ব্যাঘ্র দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইলে অনাহারে মরিবার সম্ভাবনা, আর হরিণের দৌড়াইয়া পলাইবার সামর্থ্য না থাকিলে মৃত্যু। সেইরূপ ভেক কীটাদি ভক্ষণ করিতেছে, সর্প খাইতেছে ভেক, আবার সাপের শত্রু নেউল। নেউলেরও শত্রুর অভাব নাই। পৃথিবীতে শত্রুর অভাব কাহারও নাই। মানুষেরও নয়। ১৯১০ সালে এক ভারতবর্ষেই ৫৫ জন লোক হস্তী দ্বারা, ২৫ জন হায়না দ্বারা, ১০৯ জন ভল্লুক, ৩১৯ জন নেকড়ে, ৮৫০ জন ব্যাঘ্র, ৬৪৪ জন শূকর ও অন্যান্য জন্তু দ্বারা এবং ২২,৪৭৮ জন সর্পাঘাতে নিহত হইয়াছে। সর্কসমেত নিহতের সংখ্যা হইবে ২৪,৮৭৮। আমাদের দেশে কুম্ভীরহাঙ্গরাদি (কামট) দ্বারাও প্রতিবৎসর অনেক মানুষ নিহত হয়। তাহাদের সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সর্পাঘাতে ৯৩,০০০ গবাদি মারা যায়। মানুষেরাও যে উহার প্রতিশোধ লয় নাই তাহা নহে। তাহারাও সেই বৎসরে প্রায় ৯১,০৪ সর্প এবং ১৯০০০এরও বেশী বন্য জন্তু নিহত করিয়াছে। তদ্ভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ, বন্যা, মহামারি, ব্যাধি, ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৌরাত্ম্য তো আছেই। পৃথিবীতে স্থান ও আহার সীমাবদ্ধ। এই জন্য প্রকৃতিদেবীর বিধানে জীবনযুদ্ধে সকলে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না। হইলে পৃথিবীতে অতগুলি জীবের স্থানসঙ্কুলান হইত না। স্থানাভাবে ও অনাহারে সকলগুলিকেই এক সঙ্গে মরিতে হইত, সৃষ্টি লোপ পাইত। কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। প্রাকৃতিক সমত্ব (Balance of Nature) বিধান দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে।

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—এখন একটী সহজ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—কাহারা বাঁচে আর কাহারাই বিনষ্ট হয়। ডারুইন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন, যাহারা যোগ্যতম তাহারাই জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া যায়, বাকীগুলি মরে। অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণাজনিত জীবগুলি নানারূপে পার্থক্য লাভ করিতেছে। হরিণের কথাই ধরা যাক। হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পায়ের জোর বাড়াইতে হয়। আবার

স্বজাতীয় প্রাণিগণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের শক্ত শিং দরকার। যাহারা অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণাশক্তি প্রভাবে দৈবক্রমে শক্ত শিং ও জোরাল পা লইয়া জন্মে তাহারাই জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া যায়। ডারুইন বলেন, এই হরিণদের পায়ে এক সময় চারিটী অঙ্গুলি ছিল, কিন্তু ঐগুলি ক্ষুরের ন্যায় কঠিন আবরণে ঢাকা থাকিত। তাহারা দেখিতে ছিল শিংবিহীন মেষের ন্যায়। পরে হিংস্র জন্তুর আবির্ভাবে প্রাণভয়ে তাহাদের ছুটাছুটি করিতে হইত। যাহারা ভাগ্যক্রমে শক্ত পা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই কেবল মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইত। বাকীগুলি শৈশবেই মরিত। যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের সকলেরই পা হইত শক্ত। আর এই শক্ত পদবিশিষ্ট দুইটী প্রাণীর মিলনে যে হরিণ-শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহাদের পদচতুষ্টয় (তাহাদের পিতামাতার পা শক্ত থাকাতে) শক্ত হইত। এই শক্ত পা-ওয়ালা শিশুদের আবার অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণার ফলে কাহারও কাহারও পা বেশীমাত্রায় শক্ত হইয়া উঠে। যাহাদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত কম হয়, তাহারা শৈশবেই মরিয়া যায়। হরিণদিগের ন্যায় ব্যাঘ্রগণকেও জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া থাকিতে হইবে। হরিণাদিই তাহাদের একমাত্র আহার। ফলে এই নবোৎপন্ন দ্রুতগামী হরিণশিশুগুলিকে ধরিতে হইলে তাহাদের আরও বেশী লম্ফনপটু, সবল ও তীক্ষ্ণদন্ত হইতে হইবে। সেই জন্য ব্যাঘ্রশিশুদের মধ্যে যাহারা দৈবক্রমে আরও বেশী সবল ও লম্ফনপটু হইয়া জন্মাইল তাহারা নবোৎপন্ন শক্তপাদ হরিণগুলিকে ধরিতে সমর্থ হওয়াতে বাঁচিয়া গেল। এইরূপে উন্নত হইতে অতি-উন্নত হওয়াই ইহাদের জীবন-অভিযানের ইতিহাস। এইরূপে ধীরে ধীরে শত সহস্র বৎসরের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিণবংশের অবয়ব বদলাইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেকেলে হরিণ ছাগলাদির ন্যায় ক্ষুদ্রাকার শিংবিহীন জীব ছিল। তাহাদের কঠিন ক্ষুরের ন্যায় আবরণে ঢাকা চারিটী অঙ্গুলিযুক্ত পা ছিল। এই চারি অঙ্গুলি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রথমে তিনটী ও পরে দুইটীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। নখগুলি দৌড়াইবার সুবিধার জন্য শক্ত হইয়া ক্ষুরে পরিণত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নীতি (Natural Selection) অনুসারে হরিণের শিং ও ক্ষুরের ক্রমাবির্ভাব হওয়াতে তাহাদের দেহাকৃতিও বেশী মাংসল ও বৃহদাকার হইয়াছে। কারণ সুবৃহৎ শিং ও ধাবনপটু দীর্ঘ পদচতুষ্টয় ধারণ করিতে হইলে মৃগদেহের ঐরূপ গঠন প্রয়োজন। প্রাণীর একটী অঙ্গবিশেষের পুষ্টিলাভ বা উন্নতি তাহার অপরাপর অঙ্গাদিরও পোষণের সহায়ক হয়।

ব্যাঘ্রও এই একই কারণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে কি অবয়বে, কি আকৃতিতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়া এক নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ডারুইন বলেন যে আধুনিক ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর পূর্ব্বপুরুষ একটী

বিশেষ প্রাণী ছিল। আহারের জন্য বিভিন্ন দুর্ব্বল জীবের উপর নির্ভর করায় বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অবস্থায় তাহারা এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া একই প্রকার জীব হইতে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে। অপর দিকে আত্মরক্ষার জন্য একই জাতিবিশেষ হইতে ঐরূপ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অবস্থায় গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে এক এক দেশে এক এক প্রকার হিংস্র বা মাংসাশী জন্তুর সংস্পর্শে এক এক প্রকার নিরামিষাশী জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর এই পরিবর্ত্তন দৈবঘটিত।

অযোগ্যের লোপ—কোন প্রাণিবিশেষের বিশেষ চেষ্টার ফলে নহে, এই পরিবর্ত্তন প্রাণিগণের অন্তর্নিহিত পরিবর্ত্তনবিধায়ক প্রেরণাজনিত হইয়া থাকে। দৈবক্রমে যে সকল পরিবর্ত্তনবিধায়ক বৈশিষ্ট্য প্রাণিগণের উপকারে আসিত সেই সকল বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য বংশানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিতে ও নূতন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ করিত। আর এই পরিবর্ত্তন অপকারী হইলে তাহাদের মরিতে হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে সকল হরিণাদি কম-জোর পা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, পলায়নপটু না হওয়ায় শৈশবকালেই শত্রু কর্ত্তৃক তাহারা নিহত হইয়াছে। আবার যাহারা ক্ষুদ্রাকার শিং লইয়া জন্মিয়াছিল, তাহারা স্বজাতীয় প্রাণিগণের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছে। ব্যাঘ্রাদির সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। নানারূপে দুর্ব্বল হওয়ায় অনাহারে শৈশবেই তাহাদের জীবন-কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে তথাকথিত অযোগ্য প্রাণীদের জীবনপ্রদীপ শৈশবেই নির্ব্বাপিত হইত, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা আর জননাদির দ্বারা নিজেদের বংশের ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া যাইতে পারিত না। ফলে বয়ঃপ্রাপ্ত জীব মাত্রই সবল হইত। আর এই যোগ্য জীবেরাই পরস্পর মিলিত হইয়া পরবর্ত্তী জীববংশের সৃষ্টি করিত। এই নবোৎপন্ন জীববংশ আবার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আরও যোগ্যতর জীবের উৎপত্তি করিত। এইরূপে প্রতি জীববংশ বংশানুক্রমে যোগ্য হইতে যোগ্যতর ও ক্রমশঃ যোগ্যতম হইয়া বিভিন্ন ধারায় নিত্য নূতন জীববংশের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

বিবিধ

প্রকৃতির ত্রয়োদশ বর্ষারম্ভ

বর্ত্তমান বৎসরে 'প্রকৃতি' ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 'প্রকৃতি'র উদ্দেশ্য-সাধনে যে সকল গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ 'প্রকৃতি'কে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, আজ নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল তাঁহারা 'প্রকৃতি'র প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা আশা করি নূতন বৎসরের যাত্রাপথেও তাঁহাদিগের সেই সহানুভূতি ও সাহায্যলাভে আমরা বঞ্চিত হইব না।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণালব্ধ ফল নানা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া নানা বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও যে আমরা এবিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার তেমনভাবে লাভ করিতে পারে নাই। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জটাজালের মধ্যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা ও শিক্ষা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিদেশী ভাষার সাহায্যলব্ধ শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই মাতৃভাষার পূত ও স্বযমোৎসারিত নির্ঝরিণীপথে যাহাতে আমাদের শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয় এই যুগের মনীষিগণ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। 'প্রকৃতি' দ্বাদশ বৎসর যাবৎ মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাবধারা প্রচার করিবার কার্য্য গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি তাহা পালন করিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয়, আজ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। 'প্রকৃতি'র উদ্দেশ্য আজ এমনভাবে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি সন্দেহ নাই। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলাভাষার ভিতর দিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও তাহার বহুমুখী উন্নতির কথা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে এদেশও বিজ্ঞানজগতে তাহার যোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে। আজ বর্ষারম্ভে মাতৃভাষার অনুরাগী ভ্রাতাভগ্নীদিগকে তাই 'প্রকৃতি'র উদ্দেশ্যসাধনে সহায় হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। সকলের সমবেত উৎসাহে ও সহানুভূতিতে আমাদের অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

নবনিযুক্ত বড়লাট ও বিজ্ঞানের আলোচনা

আমাদের নবনিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এদেশে নবাগত নহেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে কৃষি তদন্ত কমিটির সভাপতিরূপে তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র

পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের যথার্থ সমস্যাসমূহ গভীরভাবে বুঝিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কৃষিপ্রধান ও পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষে পল্লীসংগঠন ও কৃষির উন্নতি সাধিত না হইলে ভারতের অগণিত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নহে সেই সময়েই তিনি ইহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই সুদীর্ঘ নয় বৎসর পরে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার সুযোগলাভ করিয়া তিনি কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের প্রধানতম সমস্যাগুলি সমাধানের প্রতি সর্বপ্রথমে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং শাসনকার্য্যে এক নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার অধিনায়কত্বে পরিচালিত কৃষি তদন্ত কমিটির অভিমত অনুসারে এদেশে অতি অল্প কাজই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই তিনি দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতি সহকারে প্রথমেই তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া এদেশের কৃষি ও স্বাস্থ্যের প্রধান সহায় গোজাতির সুপ্রজনন উদ্দেশ্যে তিনি নিজে দুইটি ষণ্ড দান করিয়া জনসাধারণের সমবেত দৃষ্টি ভারতের এই সমস্যার দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতীয়গণের পুষ্টিকর খাদ্যসমস্যার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের এক আলোচনা সভায় তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে এদেশস্থ গাভী প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর পুষ্টিসাধনে ও অগণিত জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিধানে তাঁহার অসীম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণালব্ধ ফল মানবের কল্যাণকর কার্য্যে যাহাতে অনুসৃত হয়, ইতঃপূর্ব্বে অপর কোন রাজপ্রতিনিধি সে বিষয়ে সহযোগিতাপ্রকাশে এরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখান নাই। ইতোমধ্যেই তাঁহার উদ্যোগে ডেয়ারী ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নূতন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। যাহাতে এই ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য ইনষ্টিটিউট অব এগ্রিকাল্‌চারেল রিসার্চ্চ হইতে পৃথক্ করিয়া ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী এক্সপার্টের (Imperial Dairy Expert) কর্ত্তৃত্বাধীনে এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হইয়াছে। অতঃপর ভারতসরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জমি সংক্রান্ত বিভাগের সহিত এই প্রতিষ্ঠান সরাসরিভাবে কার্য্য করিবে। এতদ্ব্যতীত ডেয়ারী ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতিসাধন করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও এই ব্যবসায়ে অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত প্রায় ২ কোটি পরিমাণ টাকার বিবিধ দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানি হয়। যাহাতে ভারতবর্ষেই ঐরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য ন্যাসনাল রিসার্চ্চ ক্রিমারী (National Research Creamery) স্থাপন করিয়া নানাবিধ গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকাল্‌চারেল রিসার্চ্চ বা কৃষি-গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিপ্রতিষ্ঠার পর হইতে উহার শাখা-

প্রশাখা আজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এই সমিতি হইতে পরিচালিত গবেষণাসমূহের ফল আজ নানাভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে। গম প্রভৃতি শস্যের পোকানিবারণের ব্যবস্থা করিয়া উহা ইতোমধ্যেই ভারতের কৃষি ব্যবসায়ে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। এই সমিতির কার্য্যাবলী যে ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটি এযাবৎ কিরূপ কার্য্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেই বা উহার কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ইতোমধ্যেই দুই জন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর পরীক্ষা-কেন্দ্র রোথামষ্টেড্ এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনের ডিরেক্টর (Experimental Station in Agricultural Crops) স্যার জন রাসেল্ এবং রেডিং-শহরে অবস্থিত ন্যাসনাল ডেয়ারি রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক ক্যানি (Prof. Kany)—এই দুই জন বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই ভারতীয় কৃষিগবেষণা সমিতির কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। এই গবেষণা সমিতি কর্ত্তৃক ইতোমধ্যেই যে সকল সন্তোষজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উপরোক্ত বিশেষজ্ঞগণের নির্দ্দেশমত পরিচালিত হইলে ভবিষ্যতে উহা ভারতের বিজ্ঞানালোচনার পথ বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিবে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় এক ভারতীয় 'ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিশনে' (Development Commission) পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতের কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হইবে। লিন্‌লিথ্‌গো তদন্ত কমিটি ভারতীয় কৃষিগবেষণা সমিতিস্থাপনের অভিমত প্রকাশ করিয়া উহার এরূপ উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই কল্পনা করিয়াছিলেন এবং আমরা আশা করি তদন্তকমিটির সভাপতির নিজস্ব পরিচালনায় তাঁহাদের পরিকল্পনা এইবার বাস্তবে পরিণত হইবে। ভারতের সমস্যা এক বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমস্যার সমাধানকল্পে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের সুপ্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। ঋণভারজর্জ্জরিত, অনাহারক্লিষ্ট, দরিদ্র জন-সাধারণের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হওয়া আবশ্যক। যদি লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তাঁহার কার্য্যকালে ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের মুখে পুষ্টিকর আহার্য্যের গ্রাস তুলিয়া দিয়া আবার হাসি ফুটাইতে পারেন তবে তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা

যাহারা সচরাচর হুগলী নদীতে স্নান করেন বা এই নদীর জল পানীয় রূপে ব্যবহার করেন, তাঁহারা জানেন যে ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই চারি মাস হুগলী নদীর

জল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কিয়ৎপরিমাণে লবণাক্ত হইয়া উঠে। বর্ষাসমাগমে বৃষ্টির জল পতিত হইলে আস্তে আস্তে পরে এই লবণাক্ত ভাব কাটিয়া যায় এবং কলিকাতার সন্নিকটস্থ অঞ্চল হইতে সাগরের লোনা জলকে অনেকটা ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। যে বৎসর বৃষ্টিপাত কম হয়, সে বৎসর হুগলী নদীর জলে লবণের পরিমাণও অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাংলার অন্যান্য অনেক নদীর জলও অনুরূপভাবে লবণাক্ত হইতে দেখা যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের আসন্ন খাতে প্রবাহিত নদী যে কারণেই হউক বঙ্গোপসাগরের লোনা জলকে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, ফলে উহার জল বৎসরের বার মাসই লবণ হইতে মুক্ত থাকে।

বাংলাদেশে গত বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল হুগলী নদীপথে প্রবেশ লাভ করায় হাওড়ার অন্তর্গত বালির জলে পর্য্যন্ত লবণের অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়াছিল। গত বৎসর উপরোক্ত স্থানে প্রতি ১০০,০০০ ভাগ জলে ১১২ ভাগ লবণ রহিয়াছে বলিয়া পরীক্ষায় জানা যায়। গত বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে এবং এবৎসরও বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হওয়ায়, নদীখাতস্থ ভূমির হইতেও অধিক জল চুয়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সকল কারণে এবৎসরও বৃষ্টি নামিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হুগলী নদীর জলে লোনাভাব বেশ টের পাওয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ ১০০,০০০ ভাগ জলে ৫০ ভাগ লবণের পরিমাণ হইলেই জলের লোনাভাব বুঝিতে পারা যায়। এ বৎসর পলতা জলের কলের নিকটবর্ত্তী হুগলী নদীর জল পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর লবণ পাওয়া গিয়াছে। হুগলী নদীর জল ক্রমে একরূপভাবে লবণাক্ত হইয়া উঠিতেছে যে উহার ফলে কলিকাতা শহরে পানীয় জল সরবরাহের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা করপোরেশন এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ বৎসর বাংলা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'ওয়াটার-ওয়েজ বোর্ডের' নিকট করপোরেশনের পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে দেশের অন্তর্বর্ত্তী অঞ্চলের বিস্তৃত নদীখাত সংস্কার না করিয়া শুধু হুগলী নদীর মুখ কর্দ্দম-উত্তোলন (ড্রেজিং-এর) দ্বারা উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সমুদ্রের লোনা জল আরও অধিক পরিমাণে নদীপথে প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ পাইবে এবং পলতাস্থিত কলিকাতা করপোরেশনের জলের কলে সুস্বাদু জলসংগ্রহের পক্ষেও তাহাতে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে করপোরেশনের সেই আশঙ্কাই আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুস্বাদু পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে কলিকাতা করপোরেশন ক্রমেই যে গুরু হইতে গুরুতর অবস্থার মধ্যে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে কলিকাতার অধিবাসিগণ নানা অসুবিধা এখনই ভোগ করিতেছেন। পানীয় জল দূষিত হওয়ার অভিযোগও প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে জলের আসল প্রাপ্তিস্থানেই যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সুস্বাদু পানীয় জল পাওয়া

সম্পর্কে চিন্তান্বিত হইবার কারণ অস্বাভাবিক নহে। করপোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের এক বিবৃতি হইতে জানা যায়, যাহাতে লবণজল কম আসিতে পারে তজ্জন্য এখনই পলতাতে জোয়ারের সময়ের পরিবর্ত্তে নদীর জলে ভাটা পড়িবার কালে অধিকতর জল পাম্প করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূপ সাময়িক ব্যবস্থায় কিছু দিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনকভাবে সুস্বাদু জল লাভ করা গেলেও অপর কোনরূপ সুব্যবস্থার দ্বারা এই লবণজল রোধ না পারিলে ভবিষ্যতে নিদারুণ সমস্যার উদ্ভব হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে গ্রীষ্মের কয় মাসও যাহাতে হুগলী নদীর মধ্য দিয়া রীতিমত বেগবান্ জলস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হুগলী-ভাগিরথীর শাখা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্তর্বর্ত্তী অঞ্চলস্থ শাখা এরূপ শোচনীয়ভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে এবং স্বাদু জল বহন করিয়া আনিবার মত অপর কোন শাখানদী না থাকায় হুগলী নদীর নিম্নদিকস্থ গাঙ প্রায়ই পলি পড়িয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ফলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ নদীমুখে আসিয়া যাহাতে কলিকাতা বন্দরে ভিড়িতে পারে তজ্জন্য কর্দ্দম-উত্তোলনের (ড্রেজিং-এর) ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সমুদ্রজলও এভাবে নদীমুখে প্রবেশের পথ লাভ করিতেছে, অথচ হুগলী-ভাগিরথীর সহিত গঙ্গার যোগসূত্র হারাইবার ফলে অন্য কোন স্বাদু জল এই নদীপথে প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না। বৃষ্টির জল আর কত দিন এই অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে। সুতরাং পলতার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে হুগলী নদীর জলে লবণের পরিমাণ ক্রমেই যে বেশী হইয়া পড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি? কলিকাতার অধিবাসীদিগের সম্মুখে এই যে নিদারুণ সমস্যা সমুপস্থিত, বাংলা সরকার ও কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের এখনই সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক। বাংলার নদনদী অনেক স্থানে হাজিয়া মজিয়া গিয়া বাংলার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। কলিকাতার স্বাদু পানীয় জলের সমস্যাও যে সেই ব্যাপক সমস্যারই অন্তর্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় রেলওয়ের লৌহবর্ত্ম সম্পর্কে গবেষণা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত রেলওয়ে লাইন রহিয়াছে, তাহাদের লৌহবর্ত্ম-সমূহ কোথায় কিরূপ পরিমাণ ভারবাহী রেলগাড়ী বহন করিতে সমর্থ হইবে এবং রেলগাড়ী-সমূহের গতিবেগ কতদূর বর্দ্ধিত করিলেও এই সমস্ত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া তাহা নির্ব্বিবাদে চলা সম্ভবপর,—এই সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে স্থির করিবার জন্য বর্ত্তমানে প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বিভাগ হইতে কতিপয় কর্ম্মীকে এতৎসংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই গবেষকগণ নর্থ-ওয়েষ্টার্ন

রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পরীক্ষার নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে টেলিমিটার (Telemeter) নামক এক সূক্ষ্ম যন্ত্র আমদানি করা হইয়াছে। ইহা একটি ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র বিশেষ। যে স্থানের লৌহবর্ত্মের ভারবহন ক্ষমতা বা অন্যরূপ কিছু পরীক্ষা করিতে হইবে, এই টেলিমিটার যন্ত্রটি সেই স্থানের লৌহবর্ত্মের সহিত ক্রু দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্র হইতে বিশেষ একটি ইলেক্‌ট্রিক্ যন্ত্র পর্য্যন্ত তার লাগান রহিয়াছে। শেষোক্ত ইলেকট্রিক্ যন্ত্রে আবার একটি কম্পনলেখ যন্ত্র (oscillograph) আছে। কম্পলেখ যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম এক সূত্র দ্বারা লম্বিত একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাচফলক থাকে। টেলিমিটারের সামান্য কম্পনের ফলেও উপরোক্ত কম্পনলেখ যন্ত্র আলোড়িত হয় এবং ক্ষুদ্র এক আলোকবিম্বকে একখানি গতিশীল ফিল্‌মের উপরে নিপতিত করে। এই ফিল্‌মের ছবি পরিস্ফুট করা হইলে একটি আঁকাবাঁকা রেখা দৃষ্ট হয়। এই রেখা হইতে পরে নানাবিধ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পরীক্ষাকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত বর্ত্তমানে একটি পরীক্ষামূলক রেলগাড়ী ব্যবহৃত হয়। ইহাতে চারি চাকাবিশিষ্ট সুবৃহৎ আকারের দুইখানি গাড়ী লাগান থাকে। সাধারণ গাড়ীতে প্রতি এক্সেলে ১৬ টন পর্য্যন্ত মাল ভর্ত্তি করা হয়, কিন্তু এই কয়খানা গাড়ী প্রতি এক্সেলে ২২½ টন পর্য্যন্ত মাল বহন করিতে পারে এরূপভাবে নির্ম্মিত। বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী কয়খানা যে স্থানের লৌহবর্ত্ম পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার উপর দিয়া চালাইয়া নেওয়া হয় এবং গাড়ী যেমন চলিতে থাকে, লৌহবর্ত্মের সহিত সংশ্লিষ্ট টেলিমিটারের সাহায্যে তাহাদের কম্পন ও ভারবহনের পরিমাণ উপরিলিখিত ইলেক্‌ট্রিক্ যন্ত্র সহযোগে ফটোতে গৃহীত হইয়া যায়। ফিল্‌মপ্লেটের সহিত টেলিমিটার লাগাইয়া তাহাদের কম্পনেরও অনুরূপভাবে পরিমাপ করা হইয়া থাকে। ছয় মাস কাল মধ্যে এক নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে এইরূপভাবে পরীক্ষা করিয়াই প্রায় ৩,০০০ ফটো-রেকর্ড গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ফটো হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার কার্য্য বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত আছেন। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে লৌহবর্ত্মের বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অনুরূপ পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করা হইবে। বিভিন্ন লৌহ-নির্ম্মিত বর্ত্ম, বিভিন্ন প্রকারের স্লিপার, স্থানবিশেষের ভূমির অবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ই এই সমস্ত পরীক্ষাকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অধিকতর ভার লইয়া বা অধিকতর বেগে কোন গাড়ী চালাইতে হইলে বর্ত্তমানে অনেক সময় সম্পূর্ণ লাইন নূতন করিয়া স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ পরীক্ষাকার্য্যের ফলে স্থানবিশেষের লৌহবর্ত্ম বদলাইয়াই গাড়ী চালানো সম্ভবপর হইতে পারিবে। উপরোক্ত পরীক্ষামূলক ট্রেণখানিকে কোন কোন স্থানে গতিবেগ বাড়াইয়া ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগেও চালাইয়া দেখা হইয়াছে। উপরোক্ত পরীক্ষাকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে

গাড়ী চলিবার সময় স্লিপারের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত হয়, লৌহবর্ত্মে যে 'তরঙ্গ' খেলিয়া যায় তাহারই বা ফল কিরূপ সে সকল বিষয়েও নানারূপ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। রেলওয়েসমূহের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় রেলওয়ে লাইন স্থাপন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে এইরূপ পরীক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে সন্দেহ নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পোপ কমিটি (Pope Committee) নামে যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাও এরূপ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল। আমরা আশা করি গবেষণার ফলে এক দিকে যেরূপ রেল বিভাগের ব্যয় হ্রাস পাইবে, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন রেলপথের দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বহুলাংশে বিদূরিত হইবে।

খাদ্যদ্রব্যে খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা

জীবদেহে নানারূপ খনিজ পদার্থ এরূপ স্বল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈজ্ঞানিকগণ শরীরগঠনে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কতকগুলি ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সাধারণতঃ শরীরধারণের জন্য যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজন বলিয়া অবগত হওয়া যায় ইঁদুরগুলিকে তাহাই খাওয়ান হয়, কিন্তু পরীক্ষাকার্য্যের সুবিধার জন্য উপরোক্ত খাদ্য-সামগ্রী হইতে বিশেষ কোন খনিজ পদার্থযুক্ত খাদ্য বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এই বাদ দেওয়ার ফলে যদি দেখা যায় যে বিকৃত বা অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহ (abnormal symptoms) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে খাদ্যে ঐরূপ খনিজপদার্থ প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিশ্চিত ফল লাভ করিবার জন্য এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ রুগ্ন ইঁদুর লইয়াই পরীক্ষা করা হয়। যদি বিশেষ কোন খনিজ পদার্থব্যবহারে ইঁদুরের রোগ সারিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত খনিজ পদার্থের উপযোগিতা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ডাঃ এইচ, কে, কীল (Dr. H. K. Keil) এবং ডাঃ ভি, কনকোয়েষ্ট (Dr. V. Conquest) নামক দুই জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এইরূপ ধরণের পরীক্ষাকার্য্য করিয়া শরীররক্ষার পক্ষে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুগ্ধকে পূর্ণ খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বৈজ্ঞানিকগণ উহাই তাঁহাদিগের পরীক্ষিত ইঁদুরের জন্য মূল খাদ্য রূপে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়াছেন। তবে দুগ্ধে ব্রোমিন্, তাম্র, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং আইয়োডিন্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থের অল্পতা দৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক কীল ও কনকোয়েষ্ট প্রথমতঃ ইঁদুরগুলিকে গরুর দুগ্ধের সহিত তাম্র, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ সংযোগ করিয়া আহার্য্য দিয়া দেখিয়াছেন যে ইঁদুরগুলি তাহার ফলে আর তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদন করিতে পারে না। গোদুগ্ধের সহিত আইয়োডিন্ যোগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতেও অবস্থার

কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় না। কিন্তু ব্রোমিন্ সংযোগে দেখা গিয়াছে উহাতে ইঁদুরগুলি আট পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে ব্রোমিন্ যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যায়। দুগ্ধে তাম্র, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের সহিত ব্রোমিন্ যোগ করিবার ফলে ইঁদুরগুলির স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ডাঃ কীল এবং কন্‌কোয়েষ্ট পরীক্ষার ফলে আরও দেখিতে পান ইঁদুর-জননীগণ অষ্টম পুরুষের সন্তানকে শুধু নিজ স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। সেই অবস্থায় গরুর দুগ্ধের সহিত উপরোক্ত তাম্র, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও ব্রোমিন্ সহ শূকরের কাঁচা মেটে (liver) সপ্তম পুরুষের ইঁদুর-জননীদের খাওয়াইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে এপ্রকার আহার্য্য দেওয়ার ফলে ইঁদুর-জননী হইতে জাত স্ত্রী ইঁদুরগুলির স্তনে পর্য্যন্ত এত দুগ্ধ হয় যে তাহা দ্বারা সে তাহার নিজস্ব সন্তানগুলিকে প্রতিপালন করিতে সমর্থা হয়। উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে এই ব্যাপারে গোটা লিভারটি ব্যবহারে যেরূপ সন্তোষজনক ফল লাভ করা যায়, কেবলমাত্র লিভারের খনিজ পদার্থযুক্ত অংশটুকু ব্যবহার করিলে সেরূপ ফল পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় খনিজ পদার্থ ব্যতীতও লিভারে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা মাতৃস্তনে দুগ্ধবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে।

দুগ্ধ হইতে পশমপ্রস্তুত

প্রয়োজনীয়তাই চিরদিন মানুষকে নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা জোগাইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনানুরোধে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমরা অবগত আছি। কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক উপাদান হইতে ব্যাপকভাবে এমোনিয়া (synthetic ammonia) প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিগত মহাযুদ্ধকালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিমানপোত প্রভৃতি যানবাহনের আবিষ্কারও যুদ্ধ সময়ের চাহিদারই ফল। বিগত ইতালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে এইপ্রকার এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাহিদার ফলে কৃত্রিম উপায়ে পশম প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অভিনব আবিষ্কারের ফলে আবিসিনিয়া জয় করিয়া ইতালি যতদূর লাভবান হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে সে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী লাভবান হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিগত আবিসিনিয়া যুদ্ধে ইতালির বিরুদ্ধে কমবেশী ফ্রান্সেন প্রয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ইতালি যেরূপ অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রে তাহার মালপত্র প্রেরণ করিতে অসমর্থ হয়, তেমনি অন্যান্য অনেক দেশ হইতে তাহার অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাসামগ্রীও আমদানি করিতে পারে নাই। শেষোক্ত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পশম একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতেও উহা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং

ক্ষমতালিপ্সু এই রাষ্ট্রটি যে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা কৃত্রিম উপায়ে মিটাইবার জন্য সচেষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অবশ্য এরূপ চেষ্টা জার্ম্মানীতেও ইতঃপূর্ব্বে একবার হইয়াছিল। জার্ম্মান্ রসায়নবিৎ টডেনহাউপ্ট (Todtenhaupt) দুগ্ধের কেসিন (casien) হইতে একপ্রকার পশম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তবে তাহার আঁশ আশানুরূপ ভাল হয় নাই। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক এন্টনিও ফেরেট্টি (Antonio Ferretti) আবিসিনিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই কৃত্রিম উপায়ে জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা অধিকতর ভাল পশম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধের ফলে ইতালি সরকার হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া বিবিধ তন্তু-ব্যবসায়িগণ এইরূপ পশম উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। এই কৃত্রিম পশমের নাম "লানিটাল" (Lanital)। বর্ত্তমানে ইতালির বিবিধ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে দৈনিক প্রায় ৩০,০০০ পাউণ্ড 'লানিটাল' উৎপাদিত হইতেছে। অবশ্য 'লানিটাল'কে এখনও খুব ভাল পশম বলা যায় না, তবে উহা দ্বারা পশমের কার্য্য মোটামুটিভাবে চলিয়া যায়।

কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ পশম উৎপাদনের মূলে রহিয়াছে মাখনতোলা দুগ্ধ। দুগ্ধে কোন এসিড দিলে দুধ জমিয়া যায় (curdles) এবং এইভাবে কেসিন (casien) উৎপন্ন হইলে তাহা পৃথক করিয়া লইয়া শুষ্ক করা হয়। তৎপরে কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া উহাকে মাত গুড় বা মধুর মত ঘন একরূপ আঁটালো পদার্থে পরিণত করা হয়। অতঃপর সূক্ষ্ম ফাঁকবিশিষ্ট কাঠামোর মধ্য দিয়া উহা টানিয়া বাহির করিলে যে সূত্রবৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, ঘনীভূত এবং শুষ্ক হইলে উহা পশমের আকার ধারণ করে। এই সমস্ত তন্তু বেশ শুভ্র, চক্‌চকে ও কোমল, তবে স্বভাবজাত পশমের ন্যায় অত শক্ত নহে। অগ্নিতে উহারা স্বাভাবিক পশমের মতই জ্বলিতে থাকে, পশমের মতই উহারা উষ্ণ। কিন্তু জল পাইলে পশম যেরূপ ফুলিয়া উঠে উহারা তদপেক্ষা অধিকতর স্ফীত হয়। এই সকল অসুবিধার দরুণ বয়নযন্ত্রে এই 'লানিটাল' বা কৃত্রিম পশম লইয়া কাজ করা তত সহজসাধ্য হয় না। তবে কালক্রমে অসুবিধাগুলি বহুলাংশে বিদূরিত হইবে আশা করা যায়। মাখনতোলা দুধের মূল্য অত্যধিক নহে। সুতরাং উহা হইতে এইরূপ কৃত্রিম পশম উৎপাদন করার ব্যয়ও বেশী হইবে না। বর্ত্তমানে কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র যেরূপ বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম পশমের বস্ত্রও তেমনি অতিশয় সুলভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

নার্ভসমূহের চাঞ্চল্যনিরূপণ

আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ হইলে বা কোনরূপে কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহার বেদনা আমাদের মস্তিষ্কে পরিচালিত হয় ও আমরা ব্যথা অনুভব করি। জলের মধ্যে

কোথাও একটি ঢিল ছুড়িলে জলের ঢেউ যেমন ছড়াইয়া পড়িয়া তীরে আসিয়া আলোড়নের বার্ত্তা জানাইয়া দেয়, তেমনি আমাদের দেহের কোথাও কোনরূপ আঘাত লাগিলে তাহা আমাদের নার্ভসমূহের মধ্য দিয়া তরঙ্গগতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে এরূপ তরঙ্গ নার্ভসমূহের মধ্য দিয়া ৪০ হইতে ১০০ গজ পথ অতিক্রম করে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে এই সমস্ত তরঙ্গ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল অর্থাৎ যে পথে উপরোক্ত অনুভূতি পরিচালিত হয় তথায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে যে সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির উদ্ভব হয় তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। সাধারণ তড়িৎপাত্রে (cell) যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাই তড়িৎশক্তি উৎপাদনের কারণ। আমাদের নার্ভগুলী বা নার্ভাস্ সিষ্টেম যে একপ্রকার টেলিগ্রাফ যন্ত্রেরই অনুরূপ তাহা বলিলে ভুল হইবে না। অতএব কোন উপায়ে নার্ভের বৈদ্যুতিক অবস্থা নিরূপণ করিতে পারিলে ব্যক্তিবিশেষের নার্ভাস্নেস্ বা চিত্তসংক্ষোভতার পরিমাপ করা যাইতে পারে। 'ম্যাগ্নিফাইং টিউবের' সাহায্যে বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিমাপ অনেক হাজার গুণ বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই টিউবের সাহায্য লইয়া এ্যাড্রিয়ান এবং সেরিংটন নামক দুই ব্যক্তি ইদানীং ইংলণ্ডে 'নার্ভাস্ সিষ্টেম' সম্পর্কে অনেক পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণতত্ত্ববিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ এড্মণ্ড্ জ্যাকব্সন্ বর্ত্তমানে এরূপ পরীক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি অতিসূক্ষ্ম প্লাটিনামনির্ম্মিত তড়িৎদণ্ড নার্ভের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই দণ্ড এত সূক্ষ্ম যে সামান্য একটা পিন বিদ্ধ করা অপেক্ষা ইহাতে আর বেশী কিছুই অনিষ্ট হয় না। নার্ভের মধ্যে যে তড়িতাত্মক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা এইভাবে তড়িৎদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে অতিসূক্ষ্ম তড়িৎমাপক গ্যাল্ভেনোমিটার যন্ত্র সাহায্যে তাহা পরিমাপ করা চলে। ডাঃ জ্যাকব্সন্ এইরূপে এক ভোল্টের অতিসূক্ষ্ম তড়িৎ অংশেরও পরিমাপ করিতে সমর্থ হন। এই পরীক্ষার ফলে 'নার্ভাস্ সিষ্টেম' সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রাণতত্ত্ববিদ্গণের এত দিন ধারণা ছিল সুস্থ শরীরেও সর্ব্বদা নার্ভসমূহের কাজ মৃদুভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু ডাঃ জ্যাকব্সনের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা বিরামের সময়ে নার্ভসমূহের কোনরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, ফলে সূক্ষ্ম গ্যালভেনোমিটার যন্ত্রে বিন্দুমাত্রও তড়িৎপ্রবাহের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কোনও লোক নার্ভাস্ হইলে তাহার নার্ভাস্নেস্ কত কম বা বেশী তাহাও পরিমাপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচবার করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাপ করিয়া তাহা হইতে একটি লোক কতটা নার্ভাস্ বা সংক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহাও ডাঃ জ্যাকব্সন্ পরিমাপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দ্বারা নার্ভ-ঘটিত ব্যাধির উপশম করা যাইতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে শহরবাসীদের

সংক্ষোভতা অধিক। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের তুলনায় প্রাচ্য দেশীয়েরা অধিকতর শান্ত বলিয়া মনে হয়, তবে শেষোক্তগণ একবার নার্ভাস্ হইয়া পড়িলে কম চঞ্চল হইয়া উঠেন না। পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যাহারা নিয়মিতভাবে কায়িক শ্রম করিয়া থাকেন বা ব্যায়ামাদি করেন তাঁহারা শীঘ্র পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে সমর্থ। তবে এরূপ বিশ্রামগ্রহণের ক্ষমতাও অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।

অভিনব কীটাণু আবিষ্কার

সুইজারল্যাণ্ডের অধ্যাপক রাম (Prof. Rahm) জীবতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভ্রমণব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নন্দীপাহাড়ে ভ্রমণকালে তিনি "টাডিগ্রাডা" নামে এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কীটাণুর সন্ধানলাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক রাম "নিমাটয়েড" ও "টার্ডিগ্রাডা" এই দুই কীটাণুসম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত এবং তিনি এই দুই প্রকার কীটাণুসংগ্রহ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহশীল। নানারূপ গবেষণার ফলে তিনি "টাডিগ্রাডা" সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন, তাহা হইতে জানা যায় এই কীটাণু সাধারণভাবে পরিচিত অন্যান্য কীটাণু হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক। ইহা সর্ব্বত্র সুপরিচিতও নহে। পাহাড়ে ও বৃক্ষগাত্রে একপ্রকার শেওলা জন্মায়, ঐরূপ শেওলাতেই "টার্ডিগ্রাডা" কীটাণু পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের সময় শেওলা শুকাইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে টার্ডিগ্রাডাও শুষ্ক হইয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন উহাকে আর জীবিত বলা চলে না। এরূপ অবস্থাতেও এই কীটাণু অনেক বৎসর কাটাইতে পারে এবং আবার জল পাইবামাত্রই বাঁচিয়া উঠে। অধ্যাপক রাম গবেষণা করিয়া ইহাও দেখিয়াছেন যে তাপের মাত্রা প্রায় –২৮৩°ডিগ্রীতে পৌঁছিলেও উহারা টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হয় এবং তাপ পাইবামাত্র আবার সজীব হইয়া উঠে। যে অবস্থায় অন্যান্য কীটাণুর পক্ষে প্রাণধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব, এই নবাবিষ্কৃত "টার্ডিগ্রাডা" কীটাণু সে অবস্থাতেও বাঁচিয়া থাকে, জীবতত্ত্বের ইহা এক বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নাই। এই কীটাণু আকারে এক ইঞ্চিরও কুড়ি ভাগের এক ভাগ হইবে—এরূপ সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে উহা দেখা অসম্ভব। জীবরাজ্যে কত প্রকারের আশ্চর্য্যজনক জীব যে রহিয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়।

পাটশিল্পসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

পাট এদেশের এক উল্লেখযোগ্য কৃষিসম্পদ। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাংলা, বিহার ও আসামের নিম্নভূমি পাটচাষের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এই তিন প্রদেশে—বিশেষতঃ বাংলায় প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ পাট

জন্মিয়া থাকে। একমাত্র পাটের রপ্তানি-শুল্ক বাবদ ভারতসরকারের প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা আয় হয়। ভারতবর্ষ পাটচাষের একমাত্র ক্ষেত্র হইলেও দুঃখের বিষয় পাটচাষীদের অবস্থা ক্রমশই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। এই একটিমাত্র ফসলের উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারে উহার চাহিদাবৃদ্ধি ও মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দ্বারা এদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে উন্নত করা যাইতে পারে। সরকার হইতে প্রচারমূলক ব্যবস্থা দ্বারা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইয়া থাকিলেও সে চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। দিন দিন পাটের বাজারের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে পাটশিল্পের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নয় বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর অধিনায়কত্বে যে কৃষি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা পাটশিল্পের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহার উন্নতিবিধানার্থ পাট উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া উহা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত পর্য্যন্ত সব প্রকার স্তর আছে সে সকলের তদারক করিবার নিমিত্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় 'কটন্ কমিটি'র মত এক কেন্দ্রীয় 'জুট কমিটি'র প্রতিষ্ঠা করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাট বর্ত্তমানে ভারতের একচেটিয়া উৎপন্ন পদার্থ বটে, তবে চিরকালই যে উহা একপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে একথা জোর করিয়া বলা চলে না। কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পর কি ভাবে ভারতীয় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহার ইতিহাস আমরা সকলেই অবগত আছি। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ যেভাবে কৃত্রিম উপায়ে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতেছেন, কে বলিতে পারে পাটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তেমনি পাটের গুণবিশিষ্ট কৃত্রিম কোন্ পদার্থ আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতে পাটের চাষ একেবারেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে না। উৎপন্ন পাটের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই প্যাক করিবার থলে নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইতোমধ্যেই বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এই কার্য্যে পাটের চাহিদা কমিয়া আসিতেছে। কাগজের প্যাকিং ইতোমধ্যেই 'সিমেণ্ট' ও অন্যান্য অনেক জিনিষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ বস্তুর দ্বারা থলে প্রস্তুত করিয়া এ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লইতেছে। ভারতের পাটশিল্প সম্পূর্ণ গতানুগতিক ভাবেই এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। পাটের দ্বারা চট বা দড়িদড়া তৈয়ারী করা ছাড়া উহার নূতন কোন ব্যবহারের প্রণালী আবিষ্কার করার দিকে কোন কিছুই এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলাদেশের পাটসম্পর্কে তদন্ত করিবার নিমিত্ত যে বঙ্গীয় পাট তদন্ত কমিটি নামে এক সমিতি নিযুক্ত হয় তাহার সদস্যগণ কোন কোন বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করিলেও পাটের নূতন ব্যবহারপ্রণালী আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণার এবং পাটের কাটতি বাড়াইবার জন্য বাজারের সুবন্দোবস্ত করার বিষয়ে একমত

হইয়াছিলেন। পাটশিল্পের বৈজ্ঞানিক বিকাশ সাধনের নিমিত্ত সম্প্রতি ডাঃ এস্. জি. বার্কার (S. G. Barker) তাঁহার রিপোর্টে যে সব মন্তব্য ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি ভারতসরকারের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি প্রতিষ্ঠায় সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। সমিতি পাটসম্পর্কে যাবতীয় গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া উহা বিক্রয় করিবার যাবতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সদস্য লইয়া সমিতি গঠিত হইবে তাহাও ঘোষিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষিগবেষণা সমিতির সহিতও যাহাতে এই কেন্দ্রীয় পাট সমিতির সহযোগিতা রক্ষিত হয়, তজ্জন্য উক্ত গবেষণা সমিতির ডাইস্-প্রেসিডেন্টকেও এই সমিতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতীয় কৃষক যাহাতে পাটের ফসলের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন। নবনিযুক্ত বড়লাট এদেশে পদার্পণ করিয়াই এ সমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা আশা করি নবপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। পাটশিল্পের উন্নতির উপর এদেশের আর্থিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। ঋণভারজর্জ্জরিত কৃষক পাটের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় পাট সমিতি এই নিরাশার মধ্যে যদি আশার রশ্মি দেখাইতে পারেন, আবার একবার এদেশের কৃষক বাঁচিবার পথ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

গতিবেগের সীমানির্দ্ধারণ

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন প্রভৃতির গতিবেগ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ বিমানপোতের সাহায্যে দূরদূরান্তের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়া বিশিষ্ট বৈমানিকগণ জগতে কীর্ত্তিস্থাপন করিতেছেন। দিনের পর দিন গতিবেগের এই যে পাল্লা চলিয়াছে তাহাতে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—ইহার শেষ কোথায়? সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে ইনষ্টিটিউট্ অব্ এয়ারোনটিক্যাল সায়েন্স-এর (Institute of aeronautical sciences) এক বিশেষ সভায় সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ্জ ডব্লিউ লুইস্ (Dr. George W. Lewis) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গতিবেগেরও শেষসীমা আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ লুইস্ বিমানবিদ্যাসম্পর্কিত জাতীয় গবেষণা সমিতির ডিরেক্টর। এই সমিতির পরিচালনাধীনে ল্যাংলি ফিল্ড-এ (Langley Field) এক বিরাট পরীক্ষাগার পরিচালিত হয়। এই পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বাঁতাস সৃষ্টি করিবার (wind tunnels) নানারূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন বিমানপোত নির্ম্মিত হইলে

তাহার বিভিন্ন অংশ কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে তাহা এই স্থানে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়া থাকে। ডাঃ লুইস্ বলেন বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া বিমানপোতের গতিবেগ কখনও ঘণ্টায় ৫৭৫ মাইলের অধিক হইতে পারে না, অর্থাৎ ঘণ্টাপ্রতি ৫৭৫ মাইলই গতিবেগের শেষসীমা। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিনি উপরোক্ত পরীক্ষাগারে বিমানপোত লইয়া বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৩০০ পাউণ্ড পরিমাণ ঘনীভূত বায়ু কৃত্রিম উপায়ে বায়ুরন্ধ্রে (wind-tunnel) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বাতাস আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত টানেলের মধ্যে ছোটখাট রকমের ঝড়ের উৎপত্তি হয়। এই ঝড় ঘণ্টায় প্রায় ৭৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে যতরকম এত বেগে বাতাস প্রবাহিত হয় না। এরূপ গতিবেগবিশিষ্ট ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বিমানপোত প্রভৃতি যানসমূহ কিরূপে টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ তাহা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে এবং বিমানপোতনির্ম্মাণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতারও (resistance) পরিমাণ করা হয়। বাতাসের মধ্য দিয়া বিমানপোত পরিচালনা না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিমানপোতের উপর প্রচণ্ড বাতাসের প্রভাব কিরূপ, এইরূপ পরীক্ষায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যখন বায়ু ঘণ্টায় ৫৭৫ মাইল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন এমন কোন শক্তিশালী ইঞ্জিন নাই যাহা ঐ বায়ুর বেগ প্রতিরোধ করিতে পারে। সুতরাং গবেষণামূলক পরীক্ষায় ঘণ্টায় ৫৭৫ মাইলকেই গতিবেগের শেষসীমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯৩৪ সালে ইতালির এঞ্জেলো নামে একজন সৈনিক পুরুষ ঘণ্টায় ৪৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গতিবেগের রেকর্ড স্থাপন করেন। যদি এসময় তাঁহার নিজ শরীরের সম্মুখভাগ উপবিষ্ট অবস্থাতেও বাতাসের সম্মুখীন হইত, তাহা হইলে তাঁহার ৪ বর্গফুট দেহাংশকে প্রায় ২০০০ পাউণ্ড পরিমিত শক্তি প্রতিরোধ করিতে হইত। এ অবস্থায় তাঁহার হাত বাহিরে থাকিলে তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইত। কারণ প্রতি ঘণ্টায় ৪৪০ মাইল চলিলে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৯০ পাউণ্ডের কম হয় না। এই বিরাট বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানতঃ কাহারও পক্ষে চলা সম্ভবপর নহে। তাঁহার পরিচালিত বিমানটির ইঞ্জিন ৩৫০০ অশ্বশক্তি সমন্বিত ছিল। ৪৪০ মাইল বেগে চলিতে গেলেই যদি এইরূপ দাঁড়ায়, ঘণ্টায় ৫৭৫ মাইল গতিবেগে চলিলে যে কিরূপ বিশাল শক্তি প্রতিরোধ করিয়া চলিতে হইবে তাহা ধারণা করা বাস্তবিক সহজ নহে।

মরুসাগর হইতে রাসায়নিক দ্রব্য আহরণ

প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত মরুসাগরে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হওয়ার ফলে মরুসাগর ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া

আসিতেছে। ভূমধ্যসাগর হইতেও মরুসাগর ১৩০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে অন্যান্য সাগরজলের তুলনায় মরুসাগরের জলে নানাবিধ লবণজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই সমস্ত লবণজাতীয় পদার্থের ঘনত্বও (concentration) তুলনায় অত্যধিক। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সাগরের জল হইতে ব্যাপকভাবে পটাস আহরণ কল্পে 'প্যালেষ্টাইন পটাস লিমিটেড' নামে মরুসাগরের নিকটে একটি কারখানা খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ব্রোমিন্ তৈয়ারীর কারখানাও বসান হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স'দের এক সভায় মিঃ এম, এ, নভোমেস্কি (Mr. M. A. Novomeysky) মরুসাগরের তীরে পটাসশিল্পের বিকাশসাধন সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা হইতে মরুসাগরের জলে অবস্থিত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের আহরণ সম্পর্কে বিবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায়। জলের গভীরতা অনুসারে জলমধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বও ভিন্নরূপ। পোটাসিয়ম ক্লোরাইড, সোডিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়ম সালফেট্ এবং ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড প্রভৃতি লবণজাতীয় পদার্থ এই মরুসাগরের জলে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে পটাস ও ব্রোমিন্ আহরণের প্রচেষ্টাই চলিতেছে। ভবিষ্যতে উক্ত সাগরের জল হইতে অপরাপর লবণজাতীয় পদার্থও আহরণ করিবার আশা করা যাইতে পারে।

বাজারে সাধারণতঃ শতকরা ৮০ হইতে ৯৯ ভাগ পোটাসিয়ম ক্লোরাইড বিদ্যমান আছে এরূপ পদার্থই চলিয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপের সাহায্যে মরুসাগর হইতে এরূপ পটাস লবণ আহরণ করা রাসায়নিক পূর্ত্তবিজ্ঞানের এক কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্য। যাহাতে কম পরিমাণ সোডিয়ম ক্লোরাইড অথচ অধিক পরিমাণ কার্ণেলাইটযুক্ত পদার্থ লাভ করা যায় তদ্নিমিত্ত নানারূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মরুসাগরের জল বিশ্লেষণ করা হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্পীকরণ ক্রিয়ার ফলে উহার অবস্থা কিরূপ হয় তাহাও বিবিধ গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানে মরুসাগরের জল হইতে প্রতি বৎসর ২৫,০০০ হইতে ৩০,০০০ টন পর্য্যন্ত পটাস উৎপন্ন হয়। ব্রোমিন্‌ও প্রায় ১২,০০ টন উৎপাদিত হইতেছে। শতকরা ২২·২৩ ভাগ পোটাসিয়ম ক্লোরাইড এবং ৮·৯৬ সোডিয়ম ক্লোরাইডযুক্ত কার্ণেলাইটকে জল দ্বারা শোধন করিয়া লইলে তাহা হইতে শতকরা ৫০·৩৮ ভাগ পোটাসিয়ম ক্লোরাইড এবং ২·৭৫ ভাগ সোডিয়ম ক্লোরাইডযুক্ত সিলভেনাইটের উৎপত্তি হয়। উহা হইতে পরে বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা এমন একটি পদার্থ পাওয়া যায়, যাহাতে শত করা ৭৮·১ ভাগ পরিমাণ শুষ্ক পোটাসিয়ম ক্লোরাইড বিদ্যমান থাকে। এই পদার্থটিকেই পরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোধন করিয়া লইলে উহাতে শতকরা ৯৯ ভাগ পোটাসিয়ম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। বাজারে এরূপ পদার্থের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পিপীলিকার সাহায্য

সামান্য ঘটনা হইতে কিরূপভাবে বড় বড় বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কথিত আছে গাছ হইতে আপেল পড়িতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সন্ধান পান। কোন গির্জ্জার ছাদ হইতে টাঙ্গানো আলোকে ঝুলিতে দেখিয়া গ্যালিলিও 'দোলক' আবিষ্কার করেন। বাষ্পের প্রভাবে কেটলির ঢাক্না নড়িতে দেখিয়া বালক ওয়াট বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কারের কল্পনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানে আকস্মিকতার প্রভাব বড় কম নহে। সম্প্রতি যুক্ত রাষ্ট্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় একটি পিপীলিকা মাত্র একজন বৈজ্ঞানিককে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। ঘটনাটি এইরূপ—

জলের মধ্যে কোন কাগজ রাখিলে তাহা কতক্ষণ পর্য্যন্ত জল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় এবং ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে জল কাগজকে সিক্ত করিয়া ফেলে তাহা স্থির করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক কার্‌সন (Carson) অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য কোন প্রণালীই তিনি ঠিকভাবে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রায় হতাশ হইয়া তিনি এক দিন কতকগুলি কাগজ জলের মধ্যে রাখিয়া ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে কাগজের মধ্যে জল উঠিয়া তাহা সিক্ত করে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। বহুক্ষণের চেষ্টাতেও বিফলমনোরথ হইয়া জলের মধ্যে কাগজগুলি ভিজাইয়া রাখিয়াই তিনি সেই রাত্রির মত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে ফিরিয়া গিয়া দেখিতে পান জলমধ্যস্থিত একটি কাগজের একস্থানে একটা পিপীলিকা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। পিপীলিকা সারারাত্রি এইভাবে অনাহারে কাটাইয়াছে মনে করিয়া কার্‌সন দয়াপরবশ হইয়া উহার নিমিত্ত কাগজের উপর একটু চিনি ছড়াইয়া দিলেন। পরে দেখা গেল কাগজ চুয়াইয়া যে জল উঠিয়াছে তাহাতে চিনি আস্তে আস্তে গলিয়া গেল। তখন কার্‌সনের মনে হইল যদি চিনির সহিত জলে দ্রবণীয় কোন রং কাগজের উপর ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে কাগজ চুয়াইয়া ঠিক যে মুহূর্ত্তে জল উঠিয়া উহাতে লাগিবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রং গলিয়া গিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। এইভাবে সামান্য এক পিপীলিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ কাগজ বা শক্ত বোর্ডের জলপ্রতিরোধ ক্ষমতার পরীক্ষাসম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভিত্তি স্থাপিত হইল।

অধ্যাপক ফ্রয়েডের জয়ন্তী উৎসব

বিগত ৯ই মে (১৯৩৬) মনোবিজ্ঞানের নবপর্য্যায়ের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড্ (Sigmund Freud) অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরাও তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। খ্রীষ্টান জগতের ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাত ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কয়জন কৃতীপুরুষ আপন প্রতিভায় জগতে প্রতিষ্ঠাস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অধ্যাপক ফ্রয়েড্ তাঁহাদের অন্যতম। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সুবিখ্যাত ফরাসী মনোবিজ্ঞানবিৎ চারকটের অধীনে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেন। হিষ্টিরিয়া রোগের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন রকমের এক চিকিৎসা প্রণালীর বিষয় প্রকাশ করেন। সাইকো-এনালিসিস্ বা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রবর্ত্তন এই সময়েই আরম্ভ হয় বলা যাইতে পারে। নানা বাধাবিপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্য দিয়া আজ তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই মনোবিশ্লেষণ আন্তর্জ্জাতিক সম্মান লাভ করিয়াছে এবং বিশিষ্ট এক শাস্ত্ররূপে বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনাতন কালে জগতের অনেক বৈজ্ঞানিক এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও ফ্রয়েডই এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। মানসিক বিকারগ্রস্ত বিবিধ রোগীর চিকিৎসা করিতে করিতে ফ্রয়েড্ মানবমনের বিভিন্ন কার্য্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যে তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের মতই নূতন এক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূত্রপাত করিয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত 'ডাইনামিক আন্‌কনসাস্' (Dynamic Unconscious) অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ন্যায়ই কৃতিত্বপূর্ণ এবং ইহাই মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্যতম অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনোবিশ্লেষণের প্রবর্ত্তক এই কীর্ত্তিমান্ মহামানবের নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। মানবমনের অন্তরতম প্রদেশের রহস্যোদ্ঘাটন করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া তিনি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন বিজ্ঞানজগৎ চিরকাল তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

অধ্যাপক বীরবল সাহনি, এফ-আর-এস

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ বীরবল সাহনি এবৎসর লণ্ডন রয়াল সোসাইটির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে মাত্র চারিজন ভারতীয় এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক রামানুজম্ পরলোকগত। অপর তিন জন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার সি, ভি, রামন্ এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত।

ডাঃ বীরবল সাহনি পাঞ্জাবের অধিবাসী। ইহার পিতা অধ্যাপক রুচিরাম সাহনি পাঞ্জাবের একজন বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী। লাহোরের পাঠ সমাপন করিয়া ডাঃ সাহনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিবিধ উপাধি-লাভ করিবার পর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডাঃ সাহনি প্রথমতঃ কাশী হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শাখার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে ডাঃ সাহনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এস্‌সি-ডি' উপাধিলাভ করেন। ইতঃপূর্বে আর কোন ভারতবাসী এই উপাধিলাভে সমর্থ হন নাই।

ডাঃ সাহনি ভারতীয় ও বৈদেশীয় বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং নানা বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী এবং এই বিষয়ে তিনি বহু গবেষণা করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে প্যারি নগরীতে 'ন্যাচরেল হিষ্ট্রী মিউজিয়মের' যে তৃতীয় শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ডাঃ সাহনি তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর আমষ্টার্ডমে যে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে তাহাতেও তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। জীববিজ্ঞানে কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য এই বৎসর রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির 'বার্কলে পদক' তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞানজগতে এই কৃতী বৈজ্ঞানিক মনীষীর আবির্ভাব খুবই গৌরবের বিষয়। আমরা ডাঃ সাহনির দীর্ঘজীবন ও নিরন্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের নূতন নাম

এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল অতঃপর 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' এই নামে পরিচিত হইবে। সোসাইটির নামের পূর্বে 'রয়াল' শব্দটি ব্যবহার করিবার অনুমতি মহামান্য ভারত সম্রাট সম্প্রতি দিয়াছেন। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের জজ পণ্ডিতপ্রবর স্যার উইলিয়ম জোন্স্ উহার প্রথম সভাপতি এবং তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস উহার পৃষ্ঠপোষক হন। এরূপ জানা যায় এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৭২৯ সালে নবগঠিত 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়র্ল্‌ণ্ড' উহাকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সে প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসে উহার নাম পরিবর্তন এই প্রথম নহে। সর্বপ্রথম যখন এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উহার নাম ইংরাজীতে Asiatick Society এরূপ লিখিত হইত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে Asiatick শব্দের বানান হইতে k অক্ষরটি তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি উহার সেক্রেটারী 'মিনিট্‌স্ ইন্ সায়েন্স' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জেম্‌স্ প্রিন্সেপকে তাঁহার পত্রিকাটিকে 'এসিয়াটিক সোসাইটিজ্ জার্ণাল'

নামে প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি তখন তাঁহার প্রত্রিকাতে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' এই নামের সঙ্গে 'অব বেঙ্গল' কথাটি যোগ করিয়া দেন। অনুমান হয় যে, সে সময়কার নবপ্রতিষ্ঠিত ইংলণ্ডের 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সহিত যাহাতে ইহার নামের কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে তজ্জন্যই তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির একটি শাখা তখন বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও জানা যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির পূর্ব্ব নাম বহাল করিবার উদ্দেশ্যে সোসাইটির কাউন্সিল কর্তৃক এক কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিটি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালীন সর্ত্তাদি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি 'এসিয়াটিক সোসাইটি' নামে পরিচিত অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং উহার নাম শুধু 'এসিয়াটিক সোসাইটি' থাকাই সঙ্গত। কমিটির এই অভিমত কাউন্সিলে গৃহীত হইলেও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ সভায় উহা গৃহীত হয় না। ফলে 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামই থাকিয়া যায়। বহু বৎসর পরে এবার আবার উহা 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' এই পরিবর্ত্তিত নূতন নাম ধারণ করিল।

পরলোকে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এক জন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর তিরোধান হইল। বাঙ্গালী অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিলেও ব্যবসায়ক্ষেত্রে বড় পশ্চাৎপদ। এক্ষেত্রে যে দুই একজন বাঙ্গালী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী। সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া কার্য্যদক্ষতার ও প্রতিভার যে নিদর্শন রাজেন্দ্রনাথ রাখিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মবিমুখ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তাহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। সামান্য কর্ম্মচারী-রূপে সুবিখ্যাত মার্টিন কোম্পানীতে যোগদান করিয়া স্যার রাজেন্দ্রনাথ অবশেষে উক্ত কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হইয়াছিলেন। অতঃপর নানাবিধ বিশিষ্ট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীও যে অন্য কাহারও অপেক্ষা কম নহেন ইহা তিনি সুপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন গুণাবলীতে মুগ্ধ ভারত সরকার তাঁহাকে বিবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। পূর্ত্তবিভাগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রাজেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৫ সালে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টিরূপে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও

তাঁহার সবিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি পরিণত বয়সে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করিয়াছেন বটে, তথাপি তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার যে স্থান শূন্য হইল তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। আমরা এই সদালাপী, পরোপকারী, কর্ম্মবীর, বিরাট পুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

সংবাদ চয়ন

ব্রিটীশ এসোসিয়েসন ও ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার সম্মিলিত অধিবেশন

১৯২৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার ২৫ বৎসর কাল পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষ্যে মহাসভার রজত জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, মহাসভার আমন্ত্রণে 'ব্রিটীশ এসোসিয়েসন অব গ্রেটব্রিটেন'ও ঐ বৎসর ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার সহিত সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের অধিবেশন ভারতবর্ষে সমাপন করিবেন। এরূপ বিদ্বজ্জনসমাগমে ভারতের বৈজ্ঞানিক মহলে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই সমবেত মহাসভার অধিবেশন সফল করিবার জন্য এখন হইতেই সচেষ্ট হইবেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশন

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার আগামী চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশন ১৯৩৭ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ এইচ, হায়দর আলী খাঁ এবং ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ মুজাফরউদ্দীন কোরেশীকে সেক্রেটারী করিয়া একটি স্থানীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কোয়েম্বাটুরের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাও বাহাদুর টি, এস, ভেঙ্কটরামন্ বিজ্ঞান মহাসভার সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মহাসভার বিভিন্ন শাখা-অধিবেশনগুলি নিম্নলিখিত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের সভাপতিত্বে পরিচালিত হইবে—

গণিত ও জড়বিজ্ঞান শাখা—ডাঃ এস, দত্ত; প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

রসায়ন শাখা—অধ্যাপক জে, এন, রায়; লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা—মিঃ এইচ, জি, চ্যাপ্পিয়ন্; দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্।

প্রাণিবিজ্ঞান শাখা—ডাঃ জি, এস, থাপার; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়।

নৃতত্ত্ব শাখা—দেওয়ান বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার; পালঘাট।

কৃষিবিজ্ঞান শাখা—রাও বাহাদুর বি, ভি, নাথ; কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অস্থায়ী ডিরেক্টর, দিল্লী।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান শাখা— কর্ণেল এ, অলিভার; কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পশুপালনবিশেষজ্ঞ।

প্রাণতত্ত্ব শাখা—মেজর বি, এল, ভাটিয়া; বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের ডীন।

মনোবিজ্ঞান শাখা—মিঃ কে, সি, মুখার্জ্জি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, উক্ত অধিবেশনে শুধু মহাসভার সাধারণ সদস্যগণ এবং পূর্ণ অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিগণ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারিবেন। সাধারণ সদস্যগণের মারফতেও প্রবন্ধ দাখিল করা যাইবে। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠাইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের নিকট নিজ নিজ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের তিন কপি করিয়া সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম দাখিল করিবার জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের সমিতি প্রতিষ্ঠা

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান্ এনথ্রোপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট' বা ভারতীয় নৃতত্ত্ব পরিষদ নামে কলিকাতায় নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ ডাঃ জে, এইচ, হাটন ইহার প্রেসিডেন্ট এবং দেওয়ান বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার ও রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় ইহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ বি, এস, গুহ এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী এবং ডাঃ পঞ্চানন মিত্র জয়েণ্ট সেক্রেটারী। এতদ্ব্যতীত বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নৃতত্ত্বসম্পর্কে গবেষণার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতি হইতে একখানি ষাণ্মাসিক মুখপত্রও প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারকল্পে আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি।

সুবৃহৎ সিমেণ্ট প্রতিষ্ঠান সংগঠন

ভারতের বিশিষ্ট সিমেণ্টব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে একত্রিত করিয়া একটি সুবৃহৎ সিমেণ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন করার এক প্রস্তাব সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে। এই নবগঠিত কোম্পানী আট কোটি টাকা মূলধন লইয়া 'এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামে ব্যবসায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। পরলোকগত মিঃ এফ, ই, দিনশা সর্ব্বপ্রথম এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার পরিকল্পনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ একটি সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের ফলে ভারতীয় সিমেণ্ট ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

'ডিস্‌কভারি' জাহাজ ক্রয়ে নিউজিলণ্ডবাসীর আগ্রহ

মেরুপ্রদেশ অভিযানে 'ডিস্‌কভারি' (Discovery) নামক যে জাহাজখানা ভূপর্যটক স্কট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল 'নিউজিল্যাণ্ড এণ্টার্টিক সোসাইটি' তাহাদের বিগত বর্ষের সভায় ঐ জাহাজখানা ক্রয় করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সোসাইটির ইচ্ছা পূর্ণ হইলে তাঁহারা উক্ত জাহাজখানিকে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ অভিযান সম্পর্কে ব্যবহার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ অভিযানের সহিত নিউজিলণ্ডের নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং নিউজিলণ্ড দেশবাসী কর্ত্তৃক এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাহাজখানি ক্রীত হইলে তাহা সকল দিক দিয়াই সমীচীন হইবে সন্দেহ নাই।

'এভারেষ্ট'জয়ের ব্যর্থ অভিযান

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর মন্‌সুন অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে হওয়ায় এবং পাহাড়ের উপরে ভীষণতর তুষার-ঝঞ্ঝার উৎপাতে এভারেষ্ট অভিযাত্রীদল নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এইবারের অভিযানও সফল হয় নাই। তবে অভিযাত্রীদলের নায়ক মিঃ রাটলেজের অভিমত এই যে এভারেষ্ট শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ না হইলেও বর্ত্তমান অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এই অভিযানের ফলে হিমালয় আরোহণের পথ ও তত্রত্য আবহাওয়া সম্পর্কে যে সকল তথ্য জানা গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অভিযানে তাহা বিশেষ সহায়তা করিবে।

নন্দাদেবী অভিযান

হিমালয়ের উপরে সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ২৫,৬০০ ফুট উচ্চে 'নন্দাদেবী' শৃঙ্গ অবস্থিত। এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে আমেরিকা হইতে একদল অভিযাত্রী ভারতবর্ষে আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মিঃ আর্থার বি, ইম্মন্স (Mr. Arthur B. Emmons) এই অভিযানের অগ্রগামী দলের একজন সদস্য, তিনি ইতোমধ্যেই ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

গাণনিক্য বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা

বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে উক্ত ইনষ্টিটিউট হইতে গাণনিক্য বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে যথারীতি সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রদান করিবেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ল্যাবরেটরীতে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিলে

এই পরীক্ষাসম্পর্কিত নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে। 'গাণনিক্য' ক্রমেই একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে জনসমাজে আদরলাভ করিতেছে। ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় ইতোমধ্যেই অনেক সরকারী বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে গাণনিক্যে শিক্ষালাভ করিবার জন্য অনেক কর্ম্মচারীকে পাঠান হইতেছে। বোম্বাই, পুনা এবং মহীশূরে ইতঃপূর্ব্বেই ইনষ্টিটিউটের তিনটি শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর বেনারসেও আর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত সরকার, বাংলা সরকার এবং কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা সমিতি হইতে সাহায্য লাভ করিয়া এই ইনষ্টিটিউট বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যানির্ণয়কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের বিভিন্ন অবস্থাসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য বাঞ্ছনীয়।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আয়ুর্ব্বেদে শল্যতন্ত্র শিক্ষার ধারা—ভিষগাচার্য্য কবিরাজ শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী (ধন্বন্তরি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী—শ্রীমণীশচন্দ্র ভদ্র (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পি-এইচ-ডি (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

প্রজ্ঞানের প্রগতি—অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু, ডি-এস সি (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

ভারতীয় গণিতে 'পাই'—শ্রীকণিভূষণ দত্ত (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৩)

সিলিকণের আত্মকথা—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম-এ (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৩)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

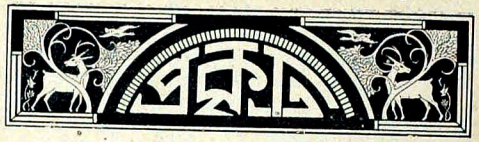

১৩শ বর্ষ বর্ষা ২য় সংখ্যা

আণবিক রহস্য

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

বাহ্যেন্দ্রীয় ইলেক্‌ট্রন সম্বন্ধে 'স্থিতিশীল অণু' সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি তাহা নিতান্ত স্থূল ও কাজ চালাইবার মত। প্রকৃত পক্ষে কোয়াণ্টাম্ বাদের (Quantum theory) সাহায্য ভিন্ন আণবিক প্রতিকৃতির কোন সূক্ষ্ম ও যথার্থ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। কোয়াণ্টাম্ বাদ পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম মূলসত্য। ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সত্য আবিষ্কার করেন ও মনস্বী আইন্‌ষ্টাইন্ (Einstein) ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া সম্পূর্ণতা প্রদান করেন। কোয়াণ্টাম্ বাদের উৎপত্তির কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ ফলের সহিত তথাকথিত ক্লাসিকাল অর্থাৎ যুগপূজ্য আদর্শ ও প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে যে ভাববিপ্লবের সৃষ্টি হয় তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগতের ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয় মিকেলসন ও মর্লির (Michelson and Morley) পরীক্ষালব্ধ ফল লইয়া। আইনষ্টাইনের সাম্যতত্ত্ব বা আপেক্ষিকতা বাদ (Theory of Relativity) এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়াছে। দ্বিতীয় বিরোধ উপস্থিত হয় তথাকথিত ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল মেকানিকস (Statistical Mechanics) বা সমবায়াত্মক বলবিজ্ঞানের পত্তনের ফলে। প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম্ বাদ এই দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছে। বস্তুতঃ সাম্যতত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম্ বাদ বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের সমগ্র ভাবধারার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের ধারণা তাঁহার পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, সম্পর্কহীন বাহ্য জগৎ বলিয়া পরিগণিত হইত। পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক যাহা পরিদর্শন করেন তাহা যেন অতি দূরস্থিত দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট কোন বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন জগতের প্রতিকৃতি, ইহার সহিত দ্রষ্টার কোন সম্বন্ধ নাই। ফলে বৈজ্ঞানিকের এই ধারণা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির যে রূপ তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় তাহাই প্রকৃতির স্বরূপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র প্রকৃতিকে যেভাবে প্রকাশ করিতেছে প্রকৃতি তাহা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের মনে উদিত হয় নাই। এইরূপ সন্দেহ দার্শনিকের পক্ষে সূক্ষ্ম আলোচনার বিষয়ীভূত হইবার সহায়তা করিলেও বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকের নিকট এইরূপ গবেষণা নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের এই বিশ্বাস চূর্ণ হইয়াছে। বর্তমান যুগের পদার্থবিদের নিকট প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন বা দ্রষ্টার সহিত সম্পর্কশূন্য নয়। দ্রষ্টা বস্তুতঃ প্রকৃতির অংশ মাত্র। বৈজ্ঞানিক যাহা সৃষ্টি বা ধ্বংস করিতেছেন—যাহা কল্পনা, নির্বাচন বা মনোনয়ন করিতেছেন তাহাই প্রকৃতি। নবাবিষ্কৃত কোয়াণ্টাম্ বাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে বহু স্থলে পরীক্ষা বা পরিদর্শন দ্বারা উপলব্ধ প্রকৃতির যে রূপ আমাদের জ্ঞানগোচর হয় তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত এক অতীত জগতের ইতিহাস মাত্র।

আপেক্ষিকতা বাদ অনুসারে প্রকৃতির স্বভাব অনেকটা রামধনুর ন্যায়। আমরা জানি যে রামধনুর কোন বস্তুতান্ত্রিক (objective) অস্তিত্ব নাই। সূর্য্যকিরণ বৃষ্টিকণায় প্রতিফলিত হইয়া বিবিধ বর্ণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সেই বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি আমাদের চোখে পড়ায় আমরা রামধনু দেখিয়া থাকি। কিন্তু অভিন্ন রশ্মি দুইজন লোকের চক্ষে পড়িতে পারে না, সুতরাং দুই ব্যক্তি একই রামধনু দেখে না। প্রত্যেক ব্যক্তির রামধনু তাহার নিজস্ব। এস্থলে জলকণা হইল বাস্তব পদার্থ, কিন্তু আমাদের আত্মোপলব্ধ (subjective) নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন হইল রামধনু যাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। সমগ্র বস্তুগত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধেও আমাদের ধরণা এইরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা দর্শন বা অনুভব করি তাহা অনেক স্থলেই বস্তুর আসল প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। আমরা চলিতে থাকিলে যেমন আমাদের রামধনুও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া থাকে, প্রকৃতিও সেইরূপ আমাদের অনুসরণ করে ও আমাদের গতির সহিত নিজের গতি মানাইয়া লইতে থাকে; সুতরাং গতিপরিবর্ত্তনের জন্য প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু রামধনু যখন আমাদের অনুসরণ করে তখন দূরস্থিত পর্ব্বত বা বনস্থলী উহার পশ্চাদ্‌ভূমির (background) স্থান অধিকার করিয়া স্থিরভাবে থাকে। প্রকৃতির কিন্তু এরূপ কোন পাশ্চাদ্‌ভূমি নাই, সুতরাং সমগ্র বিশ্বজগৎ আমাদের সঙ্গে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে-সকল ভাবধারা পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রের

গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান পদার্থবিদ্‌গণেরও সেই সকল ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে বস্তুতান্ত্রিক প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নাই, উহা শুধু আমাদের মানসিক ভ্রম বা বিকার মাত্র। বাহ্য জগতে যাহা কিছু আমরা দেখি তাহা আমাদের মানসিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা হইতে মানসিক উপাদান বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই বিশুদ্ধ বস্তুগত প্রাকৃতিক জগতের প্রতিকৃতি। মনস্বী আইনষ্টাইন, বর (Bohr) এবং হাইসেন্‌বার্গের (Heisenberg) নেতৃত্বে মানবীয় দৃষ্টির মোহ পরিত্যাগ ও মানসিক প্রভাব অতিক্রম এবং নিজেকে প্রকৃতির অংশ মনে করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর পদার্থবিৎ প্রকৃতির বিশুদ্ধ বাস্তব সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় তাঁহারা প্রকৃতির যে নূতন অদ্ভুত রূপের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই নূতন ভাবধারার উৎপত্তির কারণ এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক উপাদান কিভাবে গঠিত হয় সে বিষয়ে দুই একটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে মনের ভিতর প্রবেশ করে। এই ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য প্রায় একই প্রকারের। বাহ্য জগতের বস্তু শরীরের কোন বিশিষ্ট অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই প্রভাব বিভিন্ন শিরা-উপশিরা দিয়া মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। এই পর্য্যন্ত যাহা সংঘটিত হয় তাহা শরীরের বিভিন্ন অংশের আণবিক পরিবর্ত্তনের ফলে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতির যে প্রভাব তথাকথিত দেহ-মন-সেতু (mind-body bridge) পার হইয়া শরীর হইতে মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোড়নের সৃষ্টি করে তাহাকে অনুভূতি বলা হইয়া থাকে,—ইহারই ফলে আমাদের আনন্দ বা কষ্ট, সন্তুষ্টি বা বিরক্তি, উত্তেজনা বা অবসাদ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন অনুভূতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কোন্ বস্তু হইতে কিরূপ অনুভূতি হইবে তাহা আমাদের সহজেই বোধগম্য হয় এবং বাস্তব প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি জন্মিতে থাকে। কারণ যদি কোন বস্তুগত জগতের সত্তা না থাকিত তাহা হইলে আমরা সকল অনুভূতিকে স্বপ্নদায়ক করিয়া লইতে পারিতাম, কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা জানি যে ইহা সম্ভবপর নয়; সুতরাং আত্মোপলব্ধ বা মানসিক জগৎ ভিন্ন বাস্তব বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, যদিও ইহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই।

ইউরোপে না যাইয়াও ইউরোপপ্রবাসী কোন ব্যক্তির নিকট ইউরোপ সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা হইতে উক্ত মহাদেশ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্য-

পূর্ণ আমাদের মনোমত যে ধারণা আমরা করি তাহা ইউরোপের প্রকৃত রূপ না হইতেও পারে। অপরের মুখে কোন ব্যক্তির রূপগুণের কথা শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি তাহা আমাদের মনঃপুত হইলেও উক্ত ব্যক্তির সহিত সেই মনগড়া মূর্ত্তির বিভিন্নতা লক্ষিত হইতে পারে। আবার ইউরোপ বা উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের যুক্তিসঙ্গত ধারণা এবং উহাদের প্রকৃত রূপ এক হওয়াও বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ। যন্ত্রের ভিতর দিয়া এবং মানসিক অনুভূতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক যে জ্ঞানলাভ করেন তাহা হইতে তিনি বাস্তব প্রকৃতির একটী যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাই বাস্তব প্রকৃতির যথার্থ রূপ কিনা এবিষয়ে বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞান নিরুত্তর।

বাহ্য জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়পথে আগত যে সকল অনুভূতির সহিত আমরা পরিচিত বৈজ্ঞানিকের মতে তাহারা 'পদার্থ' বা 'বস্তুসম্ভূত। বস্তু বা পদার্থ নিজেরা কোন অনুভূতি উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু উহাদের অবস্থাপরিবর্ত্তনের ফল অর্থাৎ উহাদের ভিতরকার জড়-প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি (events) আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সূর্য্য আমরা কখনই দেখিতে পাই না, আমরা কেবল সূর্য্যের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন অবস্থা সংঘটিত হইতেছে সেগুলিই দেখিয়া থাকি। সূর্য্যের অণুমধ্যস্থ ইলেক্‌ট্রনগুলির অবিরত পরিবর্ত্তনের ফলে আলোকের উৎপত্তি হয় এবং সেই আলোকই আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রভাবান্বিত করে। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও একই নিয়ম। আলোকরশ্মি অন্য বস্তুর উপর পতিত হইতে দেখিতে পাই,—আলোক না থাকিলে বস্তুর অস্তিত্ব জানিতেই পারিতাম না। এখন মানসিক অনুভূতি দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে;—প্রথমতঃ কেবলমাত্র মনের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে, যেমন যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, এবং দ্বিতীয়তঃ যখন বাহ্য জগতের কোন ঘটনা ইন্দ্রিয়পথে মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। এই শেষোক্ত স্থলে যে কোন লোকের মনে একই রূপ অনুভূতি হইবে; সুতরাং ইহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের মনোগত সংস্কার নয়, ইহার মূলে বাস্তব প্রকৃতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। সাধারণতঃ আলোকচিত্রের প্লেটে যাহার প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে আমরা তাহাকে বস্তুগত বা বাস্তব (material) পদার্থ বলিয়া থাকি। মধ্য যুগের দার্শনিকেরা সাধারণতঃ পদার্থের মুখ্য ও গৌণ—এই দুই প্রকার প্রকৃতি আছে বলিয়া মনে করিতেন। মুখ্য প্রকৃতি বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন যে এই প্রকৃতি দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। ডেকার্টসের (Descartes) মতে বিস্তার (extension in space) ও গতি (motion)—এই দুইটী মাত্র বস্তুর মুখ্য প্রকৃতি। প্রত্যেক বস্তুর ভার অপরিবর্ত্তনীয় ইহা লক্ষ্য করিয়া লকে (Locke) ভার বা জড়ত্বকেও বাস্তব পদার্থের অন্যতম মুখ্য প্রকৃতি বলিয়া অনুমান করেন। আপেক্ষিকতা বাদ দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে

বস্তুতঃ বিস্তার, গতি বা জড়ত্ব ইহার কোনটাই বস্তুর মুখ্য প্রকৃতি নয়, অবস্থাবিশেষে ইহাদের সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাদরী বার্কলে (Berkeley) ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ বলেন যে মুখ্য ও গৌণ প্রকৃতির মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। ইহারা বস্তুগত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মনের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের সমষ্টি ভিন্ন, স্বপ্নের ন্যায় বাস্তব পদার্থেরও অন্য কোন সত্তা নাই। এই মতবাদকে মায়াবাদ (Idealism) বা মনোবাদ (Mentalism) বলা হইয়া থাকে। ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল বস্তুই মায়া বা ভ্রম, বস্তুতঃ মন ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। বস্তুর মুখ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জানিবার পূর্ব্বে বাহ্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে কি প্রকারে প্রভাবান্বিত করে তাহা জানা আবশ্যক। যখন আমরা কোন গন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করি ঐ বস্তুর কণাসমূহের সহিত আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইয়া থাকে। তেমনি জিহ্বার সহিত সংস্পর্শ হইলে খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ বুঝিতে পারি, কোন বস্তু স্পর্শ করিলে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। দেখা যাইতেছে ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদ এই তিন ইন্দ্রিয় বস্তুর সহিত সংযোগ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। চতুর্থ বা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা দূরস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করি। এস্থলে যে বস্তু হইতে শব্দ নির্গত হয় তাহার সহিত সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, কিন্তু ঐ বস্তুর চারিপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলে যে ক্রমবর্দ্ধমান সমকেন্দ্রিক শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় সেই তরঙ্গগুলি কর্ণপটহকেও সমভাবে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে বলিয়াই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। এখন পঞ্চমেন্দ্রিয় চক্ষু কি করিয়া কার্য্য করে তাহা জানা আবশ্যক। আমরা জানি যে আলোক রেটিনা বা চক্ষুর ভিতরকার পর্দ্দায় পড়াতে আমরা বাহ্য আলোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে আলোকের প্রকৃতি কিরূপ?

আলোকের প্রকৃতি—আলোকের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি এই যে ইহা সর্ব্বদাই সরলরেখায় গমন করে। কোন ছিদ্রপথে সূর্য্যকিরণ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলে উহা মোটার আকার ধারণ করিয়া থাকে। উজ্জ্বল আলোক চোখে লাগিলে আমরা সাধারণতঃ সম্মুখে হাত বাঁড়াইয়া চোখ ঢাকিয়া থাকি। পূর্ব্ব যুগের বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে আলোক কোন উজ্জ্বল পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি, উক্ত পদার্থ হইতে বন্দুকের গুলির ন্যায় অবিরত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নিউটন (Newton) এই অনুমানকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার আলোকের 'কণাবাদ' (corpuscular theory) প্রচার করেন। তাঁহার মতে সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই যে সূর্য্য হইতে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইতেছে। ইহারা আমাদের চোখের পর্দ্দাকে আঘাত করিয়া আলোকের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে, ফলে আমরা সূর্য্য দেখিতেছি বলিয়া মনে করি। ঐরূপ আলোকের কণাগুলি অন্য বস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রবেশ করিলে

আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিতে পাই বলিয়া বোধ করি। কিন্তু আলোকের এই কণাবাদ সকল প্রকার ঘটনাকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে বৃহৎ বস্তুর ছায়ার ভিতরে কোন আলোর রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, এস্থলে আলোকরশ্মি ঠিক বন্দুক নিক্ষিপ্ত গুলির ন্যায় বাধা পাইলে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ছায়ার ভিতর তাহা হয় না, আলোকরশ্মি উক্ত বস্তুর পাশ দিয়া বাঁকিয়া গিয়া পুনরায় মিলিত হয়। সুতরাং আলোকরশ্মি একেবারে প্রবেশ করিতে পারিবে না এরূপ সম্পূর্ণ ছায়াময় স্থান ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে নাই। এই বাঁকিয়া যাওয়া স্বভাব বন্দুকের গুলির মধ্যে পাওয়া যায় না, তরঙ্গের মধ্যে সাধারণতঃ এই প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে। কোন বস্তুর আড়ালে থাকিয়া আমরা বন্দুকের গুলি হইতে রক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু উহার শব্দ না শুনিয়া উপায় নাই। তাহার কারণ শব্দ তরঙ্গাকারে চলিয়া থাকে এবং সম্মুখে বাধা পড়িলে উহা বাধার পাশ দিয়া বাঁকিয়া যায়। আলোকের ও শব্দের প্রকৃতির এই সামঞ্জস্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে শব্দের ন্যায় আলোকও তরঙ্গাত্মক। সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই তাহার কারণ সূর্য্য হইতে আলোক-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রকার যুক্তি হইতে হাইগেন (Huyghen) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আলোকের তরঙ্গবাদ (undulatory theory) প্রচার করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে তরঙ্গবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আলোকের এমন কোন প্রকৃতি জানা ছিল না যাহা তরঙ্গবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারিত না। বস্তুতঃ আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তরঙ্গবাদ চরম ও সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু আমরা জানি উহা চরমও নয়, সম্পূর্ণও নয়। আলোকের কণাবাদের ভিতরেও বহু পরিমাণ সত্য নিহিত আছে। বস্তুতঃ কণাবাদ ও তরঙ্গবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, উহারা আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের যুগল অনুপূরক মাত্র। একভাবে দেখিতে গেলে আলোক সর্ব্বপ্রকারে তরঙ্গের ন্যায়, কিন্তু অন্যভাবে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টিও বটে।

সম্প্রতি আলোকের একটী গণিতাত্মক (mathematical) রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সাহায্যে আলোকের কণাত্মক ও তরঙ্গাত্মক উভয় প্রকৃতিই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোন বস্তুগত পদার্থের সহিত আমরা পরিচিত নহি, যাহার সহিত আলোকের প্রকৃত রূপের তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্রের সহিত আলোকের কতকটা তুলনা চলে। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে উহাকে তরঙ্গাত্মক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই তুলনা যে ভ্রমাত্মক তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ কণাত্মক ও তরঙ্গাত্মক এই উভয় প্রকার রূপই বস্তুগত সমুদ্রে একই সময়ে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আলোকের উভয় প্রকার

রূপ একই সময়ে সম্ভবপর নয়। যখন আলোকের কণাত্মক রূপের বিকাশ তখন উহার তরঙ্গাত্মক প্রকৃতির লোপ হয়; তেমনি তরঙ্গাত্মক প্রকৃতির দর্শন-কালে কণাত্মক প্রকৃতির চিহ্ন মাত্র থাকে না। নির্ব্বিকল্প মন লইয়া চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে আলোক কণা বা তরঙ্গের কোনটাই নয়। তবে কোন কোন বিষয়ে আলোকের সহিত সমুদ্রের তুলনা মন্দ মনে হয় না। সমবায়াত্মকভাবে দেখিতে গেলে আলোকের প্রকৃতি বহু প্রকারে তরঙ্গের ন্যায়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে উহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি মাত্র।

আমরা জানি জড়াত্মক সূর্য্য বিভিন্ন অণু বা ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটন্ দ্বারা গঠিত। কিন্তু অণু, ইলেক্‌ট্রন্ বা প্রোটন্ ইহার কোনটাই সূর্য্যের আলোক নয়। প্রত্যেক জড় পদার্থের একটী উপাদান হইল 'শক্তি' (energy)। শক্তি জড় পদার্থের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারে, এক জড় পদার্থ হইতে অন্য জড় পদার্থে চলাচল করিতে পারে, আবার জড় পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া শূন্যপথে অবিমিশ্র শক্তি রূপেও ইহা চলিতে পারে; এই অবস্থায় ইহাকে রশ্মি বা radiation বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

ষট্‌পদ প্রাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

জীবজগতে পোকার স্থান

গরু, মানুষ, ছাগল, সাপ, বেঙ, মাছ প্রভৃতি প্রাণীদের দেহের ভিতর হাড়ের কঙ্কাল আছে এবং এই কঙ্কালের উপর মাংস; মাংস চামড়ায় ঢাকা। কঙ্কালের মধ্যে মেরুদণ্ডই প্রধান এবং হাত ও পায়ের হাড় এই মেরুদণ্ডে লাগান। সাপের কেবল মেরুদণ্ডই আছে। যে সকল প্রাণীর শরীর কঙ্কাল দিয়া গঠিত তাহাদিগকে "সমেরুক" প্রাণী (Vertebrates) বলে।

শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, মাকড়সা, কেন্নো, গোবরে পোকা, প্রজাপতি প্রভৃতির শরীরের ভিতর কঙ্কাল নাই। কিন্তু ইহাদের চামড়া শক্ত খোলার মত। শামুক, কাঁকড়ার খোলা খুব শক্ত এবং গোটা বা অখণ্ডিত; চিংড়ি ও কেন্নোর খোলা তত শক্ত নয় এবং খণ্ডিত কতকগুলি ছোট ছোট খোলা জুড়িয়া উহাদের সমস্ত শরীর ঢাকা। প্রজাপতি ও গোবরে পোকার শরীরও সেইরূপে ঢাকা। শামুকের পা নাই। কেন্নো, চিংড়ি,

প্রজাপতির পা আছে এবং পা কতকগুলি পাব্ বা গ্রন্থি এক সঙ্গে জুড়িয়া গঠিত। এইজন্য এইরূপ প্রাণীর নাম "গ্রন্থিপদ" (Arthropoda)।

কতকগুলি প্রাণীর কঙ্কালও নাই এবং শক্ত খোলাও নাই, যেমন কেঁচো।

গ্রন্থিপদ প্রাণীদের মধ্যে চারি শ্রেণী, যথা—

(১) পোকাদের তিন জোড়া বা ছয়টি পা। অতএব পোকা হইল "ষট্‌পদ" প্রাণী। ষট্‌পদ প্রাণী বলিলে পোকাদের বিজ্ঞানসঙ্গত নাম বলা হইল। ইহাদের দেহ আমরা দেখিয়াছি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—শির, বক্ষ এবং উদর।

(২) মাকড়সার চারি জোড়া বা আটটি পা। ইহাদের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত। শির ও বক্ষ একসঙ্গে জোড়া এবং এই সংযুক্ত শিরোবক্ষেই চারি জোড়া পা লাগানো। কাঁকড়া বিছা (৩৭ নং চিত্র, গ) মাকড়সার নিকট আত্মীয়, যদিও ইহার গড়ন চিংড়ির মত বোধ হয়। ইহার শিরোবক্ষের উপর এক জোড়া দাড়া আছে এবং এই শিরোবক্ষের সঙ্গে উদরের প্রথম সাতটি গিরা লাগানো। এই জন্য সমস্তটাকেই বক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারও চারি জোড়া পা। গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির দেহের উপর যে সকল এঁটেলি (৩৭ নং চিত্র, ঘ) দেখা যায় তাহারাও মাকড়সার নিকট আত্মীয়। ইহাদেরও চারি জোড়া পা এবং দেহের কোনরূপ স্পষ্ট বিভাগ নাই।

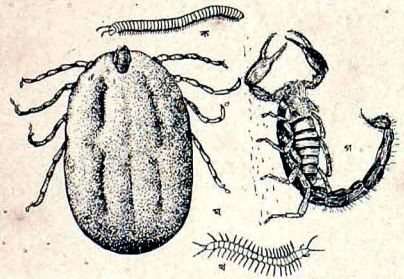

চিত্র—৩৭

ক—কেন্নো, খ—তেঁতুলে বিছা, গ—কাঁকড়া বিছা, ঘ—এঁটেলি

(৩) কেন্নো ও তেঁতুলে বিছার (৩৭ নং চিত্র, ক ও খ) চারি জোড়ার বেশি (পনর জোড়া কি আরও বেশি) পা। কেন্নোর দেহের প্রত্যেক গ্রন্থিতে দুই জোড়া এবং

তেঁতুলে বিছার এক জোড়া করিয়া পা লাগানো। ইহাদের দেহ, বক্ষ ও উদরের স্পষ্ট বিভাগ করা যায় না।

(৪) চিংড়ি এবং কাঁকড়াদেরও দেহের দুই প্রধান ভাগ, যথা—শিরোবক্ষ ও উদর। শিরোবক্ষে কয়েক জোড়া পা লাগানো এবং এই পাগুলিরই এক জোড়া দাড়ায় পরিণত। উদরেও ছোট ছোট পা আছে।

সুতরাং এইবার প্রাণিজগতে নেবুর প্রজাপতির (প্যাপিলিও ডিমোলিউস্) স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে লিখিতে হইবে—

প্রাণিজগৎ (Animal Kingdom)
↓
(এই জগতের মধ্যে) অমেরুক বিভাগ (Divison—Invertebrata)
↓
(এই বিভাগের মধ্যে) গ্রন্থিপদ শাখা (Pyllum—Arthropoda)
↓
(এই শাখার মধ্যে) ষট্‌পদ বা কীটপতঙ্গ শ্রেণী (Class—Insecta)
↓
(এই শ্রেণীর মধ্যে) লেপিডপতরা বর্গ (Order—Lepidoptera)
↓
(এই বর্গের মধ্যে) প্যাপিলিওনাদি বংশ (Family—Papilionidae)
↓
(এই বংশের মধ্যে) প্যাপিলিও গণ (Genus—Papilio)
↓
(এই গণের মধ্যে) ডিমোলিউস্ জাতি (Species—Demoleus)

পোকার জন্ম ও ভেকবদল

আমরা যতগুলি পোকা দেখিলাম গাছ উকুন (৩৮নং চিত্র) ছাড়া আর সকলেই ডিম হইতে জন্মে। তাহাদের মাতা এই ডিম পাড়ে। প্রায় সকল পোকাই এইরূপে জন্মে। কয়েকটি পোকা মাত্র ডিম প্রসব না করিয়া সন্তান বা কীড়া প্রসব করে। আকাশ, জল বা মাটি হইতে কিংবা অপর কোন জিনিস হইতে পোকা আপনাআপনি জন্মিতে পারে না। ইহাদের ডিম আমরা দেখিতে পাই না কিংবা ইহাদের জন্মের নিয়ম আমরা জানি না বলিয়া মনে হয় যেন পোকা আপনাআপনি জন্মিয়াছে। আর্শলা, উইচিংড়ি, গাছ ফড়িঙ, গান্ধি পোকা প্রভৃতি যখন ডিম হইতে বাহির হয় তখন উহাদের মুখ, পা প্রভৃতি উহাদের মাতার মুখ, পা ইত্যাদির মত হইয়া থাকে এবং উহারা উহাদের মাতার মতই খাইতে পারে। তবে শৈশবে উহাদের ডানা থাকে না। যেমন বড় হয় মধ্যে মধ্যে খোলস ছাড়ে এবং ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া ডানা গজায়। পূর্ণবয়স্ক হইলে ডানা সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন উহারা উহাদের মাতার মত হয়। এই সকল পোকা 'দ্বিজন্মা'।

প্রজাপতির ডিম হইতে প্রজাপতির মত পোকা জন্মে না। এই ডিম হইতে (শুঁয়াপোকা ও স্থতলী পোকা) কেটারপিলার্ হয়। কেটারপিলার্ বড় হইলে পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি হইতে প্রজাপতি জন্মিয়া থাকে। বোলতারও ডিম হইতে কীড়া, কীড়া হইতে পুত্তলি এবং পুত্তলি হইতে বোলতা হয়। এই সকল পোকা 'চতুর্জন্ম'।

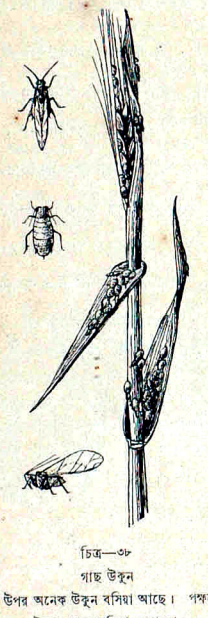

চিত্র—৩৮
গাছ উকুন
গমের শীষের উপর অনেক উকুন বসিয়া আছে। পক্ষহীন ও পক্ষযুক্ত উকুন পৃথক করিয়া দেখানো।

অতএব জন্মহিসাবে পোকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১। দ্বিজন্ম—সমস্ত অপতরা, অর্থপতরা, থাইসপ্তরা, হেমিপতরা এবং কতক নিরপতরা দ্বিজন্ম।

২। চতুর্জন্ম—সমস্ত লেপিতপতরা, হেমনপতরা, কড়াপতরা, দ্বিপতরা, সাইফন-অপতরা এবং কতক নিরপতরা চতুর্জন্ম।

দ্বিজন্ম পোকার বাচ্ছা দেখিয়া প্রায় বলা যায় তাহারা অর্থপতরা, কি হেমিপতরা, কি নিরপতরা। কারণ ইহাদের বাচ্ছারা দেখিতে অনেকটা পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের মত।

চতুর্জন্ম পোকার বাচ্ছা দেখিয়াও বলা যায় তাহারা কোন্ বর্গের পোকার বাচ্ছা। লেপিতপতরার কীড়া বা কেটারপিলার্ হয় শুঁয়াপোকা না হয় স্থতলী পোকা। ইহাদের কাটিয়া খাইবার বেশ স্পষ্ট মুখ আছে এবং বুকের তিন জোড়া পা ছাড়া উদরে পাঁচ জোড়া কিংবা চারি জোড়া কিংবা তিন জোড়া কিংবা দুই জোড়া পা থাকিবেই। উদরে পাঁচ জোড়ার বেশী কিংবা দুই জোড়ার কম পা থাকিলে তাহা কেটারপিলার্ নয়। গায়ে লোম থাকিতে পারে কিংবা নাও থাকিতে পারে (৩৯ নং চিত্রে নানা রকমের কেটারপিলার্ দেখান হইয়াছে)। লেপিতপতরার পুত্তলি সহজেই চেনা যায়। যে লেপিতপতরার পুত্তলি ফাঁকায় ঝুলে তাহা হইতে বাটার্-ফ্লাই বা দিনচর প্রজাপতি জন্মে। যে পুত্তলি গুটীর ভিতর কিংবা মাটির ভিতর থাকে তাহা হইতে মথ্ বা নিশাচর প্রজাপতি হয়। এক দল প্রজাপতি আছে যাহাদের কেটারপিলার্ পুত্তলির জন্য পাতা ইত্যাদি বাঁধিয়া গুটী করে। এই সকলেরই উদাহরণ আমরা পাইয়াছি।

কড়াপতরার কীড়ার কাটিয়া খাইবার মুখ থাকে এবং বুকের তিন জোড়া পা থাকিতেও পারে (যেমন গোবরে পোকা) কিংবা নাও থাকিতে পারে (যেমন কেরি বা চেলে পোকা)।

হেমনপতরার কীড়া প্রায় কৃমির মত হয়। তাহাদের কোন রকম পা থাকে না এবং মুখও এত ছোট যে প্রায় দেখা যায় না। তবে এক বংশ আছে তাহাদের কীড়া লেপিত-পতরার কেটারপিলারের মত, কিন্তু তাহাদের আট জোড়া উদরের পা থাকে। এই পোকা সরিষার পাতা খায়। কোথাও কোথাও ইহাকে 'কালো মেড়ী' (৪০নং চিত্র) বলে।

দ্বিপতর্ (মাছি ইত্যাদির) কীড়াও কৃমির মত। তাহাদের কোনরূপ পা থাকে না এবং দেহের পশ্চাদ্ভাগ মোটা ও অগ্রভাগ সরু। মুখের বদলে দুইটি হুকের মত কাঁটা থাকে এবং এই কাঁটাদুটি পিচকারীর ডাঁটার মত ভিতরে প্রবেশ করে ও বাহির হয়। মশা ও ডাঁসের কীড়ার গড়ন আলাদা।

আমরা প্রায় সকলেরই উদাহরণ পূর্ব্বে পাইয়াছি।

পূর্ণবয়স্ক না হইলে কোন পোকাই ডিম পাড়িতে পারে না। আর্শলার ডানা সম্পূর্ণ বড় হইলে অর্থাৎ আর্শলা পূর্ণবয়স্ক হইলে তবে ডিম পাড়িতে পারে। বাচ্ছা আর্শলা ডিম পাড়িতে পারে না। সেইরূপ বাচ্ছা গাছ ফড়িঙ, বাচ্ছা উইচিংড়ি, বাচ্ছা গান্ধি পোকা,

বাচ্ছা মালকাঁকড়া প্রভৃতি কোন দ্বিজন্ম পোকার বাচ্ছাই ডিম পাড়িতে পারে না। প্রজাপতির বাচ্ছা অর্থাৎ কেটারপিলার্ ও পুত্তলি ডিম পাড়িতে পারে না। প্রজাপতিই পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং ইহাই ডিম পাড়ে। বোলতা, কুমারিয়া পোকা,

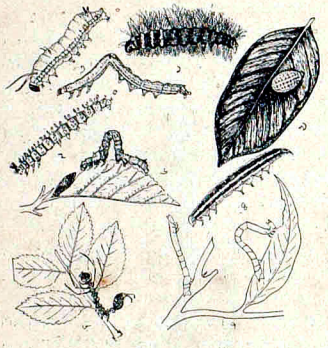

চিত্র—৩৯

বিভিন্ন প্রকার কেটারপিলার্

১। শুঁয়াপোকা বা বিচ্ছা—দেহ লোমে আবৃত, উদরের পা পাঁচজোড়া সমান।
২। এক প্রকার শুঁয়াপোকা—দেহের উপর কাঁটা, উদরের পা পাঁচজোড়া সমান।
৩। কেটারপিলার্—দেহের উপর কয়েকটি মাংসল তন্তু, উদরের পা পাঁচজোড়া সমান।
৪। কেটারপিলার—দেহ অনাবৃত (মাত্র কয়েকটি সরু রোঁয়া থাকে), উদরের পা পাঁচ জোড়া সমান।
৫। অর্দ্ধকুব্জ কেটারপিলার্ (Semi looper)—দেহ অনাবৃত (মাত্র কয়েকটি সরু রোঁয়া থাকে), উদরের প্রথম দুইজোড়া পা আকারে ছোট।
৬। অর্দ্ধকুব্জ কেটারপিলার্—দেহ অনাবৃত (মাত্র কয়েকটি সরু রোঁয়া থাকে), উদরে মাত্র তিনজোড়া পা আছে।
৭। কুব্জ কেটারপিলার্ (Looper)—দেহ অনাবৃত (মাত্র কয়েকটি সরু রোঁয়া থাকে), উদরে মাত্র দুইজোড়া পা আছে। শত্রুর ভয় হইলে কাঠির মত দাঁড়ায় এবং তখন উহা ডাল বলিয়া ভ্রম হয়।
৮। এক ভীমণাকার কেটারপিলার্—এইরূপ আকার শত্রু হইতে রক্ষার সহায়তা করে।
৯। সাপ কেটারপিলার্—ইহাদের পা প্রায় নাই, উদরের উপর ভর দিয়া চলে।

বিটল্, মশা, মাছি প্রভৃতি কোন চতুর্জন্ম পোকারই কীড়া ও পুত্তলি ডিম পাড়িতে পারে না। কেবল পতঙ্গই ডিম পাড়িতে পারে।

ভেকবদল—কীড়া হইতে পুত্তলি এবং পুত্তলি হইতে পতঙ্গ হইয়া পোকার চেহারা বদল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ইহা লক্ষ্য না করিলে অনেকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন।' পোকাপালন করিয়া সকলের পক্ষেই ইহা প্রত্যক্ষ করা সহজ। অপতত্ব পোকার ভেকবদল (metamorphosis) হয় না। লেপিস্‌মার বাচ্ছা সকল বিষয়েই পূর্ণবয়স্ক লেপিস্‌মার মত; কেবল

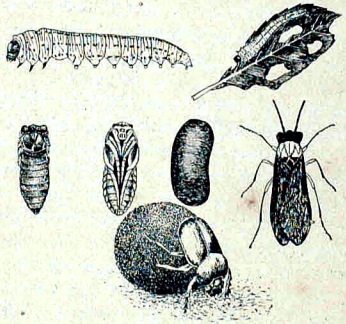

চিত্র—৪০

সরিষা প্রভৃতির কালো মেড়ীর জীবনী

উপরে ডান দিকে পাতার উপর মেড়ী-কীড়া এবং বাঁ দিকে উহাই পাশ হইতে দেখানো। উদরের পা আটজোড়া লক্ষ্য করিবার মত। নীচে বাঁ দিকে পুত্তলি (পর পর পিঠ এবং পেটের দিক হইতে), মধ্যে গুটী এবং ডান দিকে পতঙ্গ (মক্ষিকা)। সর্ব্বনিম্নে বিটল্ বিষ্ঠার গুলি গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

আকারে ছোট। ইহাদের মাত্র আকারটাই বাড়ে। অপর দ্বিজন্ম পোকার, যেমন—আর্শলা, গাছ ফড়িঙ, গান্ধি পোকা ইত্যাদির আকারও বাড়ে এবং ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। অতএব ইহাদের 'আংশিক' ভেকবদল হয়। লেপিতপতত্ব, কড়াপতত্ব, দ্বিপতত্ব প্রভৃতি পোকার কীড়া, পুত্তলি ও পতঙ্গের আকৃতি ভিন্ন। অতএব ইহাদের 'পূর্ণ' ভেক-বদল হইয়া থাকে।

পোকা কোথায় থাকে

পোকা জলে থাকে, ডাঙ্গায়, মাটির ভিতর ও গাছের উপর থাকে এবং আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। এমন স্থান খুব কমই আছে যেখানে পোকা থাকে না। এমন আর কোন প্রাণী নাই যাহারা পোকার মত জলে, স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে। পাহাড়ের মাথায় যেখানে বার মাস বরফ, সেই বরফেও পোকা দেখা গিয়াছে। আবার মাটির ভিতর হইতে যে গরম জলের ফোয়ারা বাহির হয়, সেই গরম জলেও পোকা থাকিতে দেখা যায়।

জলবাসী বা জলচর পোকা ছাড়িয়া দিলে স্থলবাসী বা স্থলচর পোকার কতক মানুষের ঘরে থাকে। গৃহস্থের ঘরে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 'গার্হস্থ্য পোকা' বলা হয়।

পোকা কি খায়

আমরা দেখিয়াছি নেবু, করবরি ও আকন্দর বাটারফ্লাই-এর কেটারপিলার্ পাতা খায়। গাছ ফড়িঙ গাছের পাতা খায়। বেগুনের পোকার কেটারপিলার্ বেগুন ও বেগুন গাছের ডাঁটা কুরিয়া খায়। গান্ধি পোকা ধানের দুধ চুষিয়া খায়। চেলে বা কেরি ভাওারের চাউল, গম প্রভৃতি খায়। কলাই-এর বিট্‌ল্ ভাওারের ছোলা অড়হর প্রভৃতি খায়। মৌমাছি ফুলের মধুরস খায় এবং মৌমাছির বাচ্চা ফুলের পরাগ খায়। গাছপালা, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ হইতে অনেক পোকা খাবার সংগ্রহ করে। এই সকল পোকা উদ্ভিদ্‌ভোজী।

অনেক পোকা আমাদের ক্ষেতের ফসল, ফল ও ফুলের গাছ ইত্যাদি নষ্ট করে। এই সকল পোকা আমাদের অপকারী। উদ্ভিদ্‌ভোজী সকল পোকাই যে আমাদের অপকারী তাহা নয়। কারণ এমন অনেক গাছ, লতা ও ঘাস হয় যাহা আমাদের কোনই কাজে লাগে না। অনেক আগাছা পোকায় খাইয়া নষ্ট করিলে ভালই হয়। যে গাছ আমাদের কাজে লাগে তাহা যদি কোন পোকা নষ্ট করে, তবে সেই পোকাকেই অপকারী বলিতে হইবে। জীবন্ত গাছের শিকড়, ডাঁটা, ফুল ও ফল খাইয়া যে সকল পোকা জীবনধারণ করে তাহাদিগকে উদ্ভিদ্‌ভোজী বলিয়াছি। শুকনো কাঠে উই ও ঘুণ ধরে; শুকনো বীজ (কলাই প্রভৃতি) কত পোকায় খায়; শুকনো পাতায় উই ধরে; পাতা ফল ইত্যাদি পচিলে তাহাতে কত পোকা হয়; আবার ইন্দুর বিড়াল প্রভৃতি জীব মরিলে তাহাদের দেহ কত পোকায় খায়; পিঁপড়া, উইচিংড়ি, আর্শলা মাছি প্রভৃতিতে মরা পোকামাকড় খায়; গরু, মহিষ প্রভৃতি পশুর এবং মানুষেরও বিষ্ঠা দুই তিন দিন পড়িয়া থাকিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পোকায় খাইয়াছে কিংবা মাটির নীচে লইয়া গিয়াছে এবং সেইখানে কত মাটি তুলিয়াছে। এই সমস্ত পোকাকে আমরা ময়লা জঞ্জাল ও মৃতভোজী বলিয়াছি।

কাঠের ঘুণ, কলাই-এর বিট্‌ল্ প্রভৃতি আমাদের অপকারী। কিন্তু যে সকল পোকা মরা জীব খায়, শুকনো পাতা ইত্যাদি খাইয়া মাটি ও সার প্রস্তুত করে, বিষ্ঠা ইত্যাদিকে মাটির নীচে লইয়া গিয়া সারে পরিবর্ত্তিত করে তাহাদিগকে উপকারী বলিতে পারি। তাহারা এই সকল ময়লা জঞ্জাল নষ্ট করিয়া পৃথিবী পরিষ্কার রাখে, সুতরাং নিশ্চয়ই পৃথিবীর কিছু উপকার করে।

জল ফড়িঙ বা গোপালিয়া ফড়িঙ এবং মালকাঁকড়া অন্যান্য পোকা ধরিয়া খায়, ইহারা 'পরভোজী' বা 'পরভুক'। বোল্‌তারাও পরভোজী। কুমারিয়া পোকা অন্য পোকাকে (কেটারপিলার্) ও মাকড়সাকে বিঁধিয়া অজ্ঞান করিয়া বাচ্ছাদের খাবার যোগায়, ইহারা 'পরবেধী'। কুজী মাছি রেশমের পলুর এবং আকন্দর প্রজাপতির পরনাশী মাছি কেটারপিলারের দেহের ভিতর থাকিয়া এবং কুরিয়া খাইয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলে। ইহারা 'পরনাশী'। এই সকল পরভোজী, পরবেধী ও পরনাশী পোকা অপর পোকার শত্রু। যে সকল পোকা আমাদের অপকারী তাহাদিগকেও ইহারা নষ্ট করে। অতএব ইহাদের অনেকে আমাদের উপকারী।

ছারপোকা বা উড়ুস এবং মশা মানুষের রক্ত খায়। ডাঁস, কুকুর মাছি এবং আরও কত রকমের মাছি গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির রক্ত খায়। এই সকল পোকা রক্তপায়ী। উকুন মানুষের মাথায় থাকিয়া রক্ত খায়, ইহারাও রক্তপায়ী এবং পরবাসী। ইহারা যে কেবল রক্ত খায় তাহা নহে, নানা রকম রোগের বিষও এক মানুষের দেহ হইতে অন্য মানুষের দেহে এবং এক পশুর দেহ হইতে অন্য পশুর দেহে লইয়া যায়। এইরূপে রোগের বিষ ছড়াইয়া ইহারা মানুষ ও অপর কত জীবের অসুখ আনে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। এই সকল পোকা 'স্বাস্থ্যনাশী'। ইহারা আমাদের অত্যন্ত অপকারী।

আমরা দেখিলাম কতক পোকা আমাদের অপকারী এবং কতক উপকারী। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রয়োজনীয় পোকা আছে, যেমন—মৌমাছি হইতে আমরা মধু ও মোম্ পাই, লাক্ষা-কীট হইতে গালা ও আল্‌তার রঙ পাই, রেশমের পলু হইতে পাট, তসর, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি কাপড়ের জন্য সুতো পাই।

পোকার আচরণ

পোকারা দেখিতে ও শুনিতে পায় কিনা, ভালমন্দ গন্ধ ও খাবার বিচার করিতে পারে কিনা এবং ছুঁইলে বা আঘাত করিলে বুঝিতে পারে কিনা এই সমস্ত বিষয় জানিবার কাহার না ইচ্ছা হয়? জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে পোকাদের আচরণ খুঁটানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করা।

দর্শন—পোকাদের চোখ আছে। এই চোখ দিয়া যে দেখিতে পায় তাহাতে সন্দেহ

নাই। প্রজাপতির বড় বড় চোখ, কিন্তু তাহার বাচ্ছা কেটার্‌পিলারের মুখের দুই ধারে কয়েকটি ক্ষুদ্র চোখ থাকে। কেটার্‌পিলার্‌ কাছের জিনিস দেখিতে পায়, দূরের জিনিস পায় না। প্রজাপতি উড়িয়া এফুল-ওফুল করিয়া কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা দূরের জিনিস নিশ্চয় দেখিতে পায়। আমাদের মত অনেক দূরের জিনিস দেখিতে পায় কিনা তাহা সহজে বলিবার জো নাই। যে সকল পোকা বরাবরই অন্ধকারে এবং খাদ্যবস্তুর মধ্যে থাকিয়াই জীবন কাটায় তাহাদের অনেকের হয় চোখ খুব ছোট, কিংবা কখনও কখনও একেবারেই থাকে না। গোবরের ভিতর থাকিয়া যে সব মাছির কীড়া বড় হয় তাহাদের চোখ নাই। দাসদাসী উই-এরও চোখ নাই।

শ্রবণ—পোকাদের আমাদের মত বা গরু বাছুর কি পাখীর মত কান নাই। উই-চিংড়ির সাম্‌নের পায়ে এবং গাছ ফড়িঙ, পঙ্গপাল ফড়িঙ ও মাট ফড়িঙ প্রভৃতির পেটে কানের ছিদ্রের মত এক রকম ছিদ্র আছে। উই ও পিঁপড়ার সাম্‌নের পায়ে এবং মশা প্রভৃতির শুঙ্গতেও খুব ছোট ছোট একরূপ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া ইহারা শুনিতে পায় বলিয়া মনে হয়।

আমরা কত রকম পোকার শব্দ শুনিতে পাই। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকিবার সময় ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ-ই-ই শব্দ সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাদের দেহের উপর ছিদ্র আছে, তাহা হইতে এই শব্দ বাহির হয়। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা কখনও শিলং, দার্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ে গিয়াছেন তাঁহারা 'ঘণ্টা পোকার' শব্দ শুনিয়া থাকিবেন। কোন কোন ঘণ্টা পোকার শব্দ পাঁচ সাত মাইল দূর হইতেও শুনা যায় যেন জোরে রেলের এঞ্জিনের বাঁশি বাজিতেছে। মদ্দারাই এইরূপ শব্দ করিতে পারে, মাদিরা পারে না। এইজন্য মনে হয় মাদিদের মন ভুলাইবার জন্য মদ্দারা এইরূপে গান করে। জনৈক কবি বলিয়াছেন—

সুখী কিবা ঝিঁঝিঁর জীবন
বাক্‌হীন হচ্ছে যে গো তাদের স্ত্রীগণ।

যাঁহাদের ঝগ্‌ড়াটে স্ত্রী তাঁহারা ঝিঁঝিঁর হিংসা করিতে পারেন।

ঘাসবনে বা জঙ্গলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেই 'চেরের্‌-র্‌-চের্‌-চেরের্‌-র্‌' শব্দ শুনা যায়। নানা রকমের গাছ ফড়িঙ দেহের উপর পা ঘসিয়া এরূপ শব্দ করে। ঘরে, বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে, উইচিংড়ির 'চিরর্‌-চিরিফ্‌-চিরির্‌' শব্দ সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ইহারা ডানায় ডানায় ঘসিয়া এই শব্দ করে। বর্ষা ফুরাইলেই বড় লাল উইচিংড়ি (কোথাও কোথাও ইহাকে ঝিল্লি বলে) পথে, ঘাটে, মাঠে, উঠানে সন্ধ্যার সময় 'ক্রিরিন্‌-ক্রিরিন্‌-ন্‌-ন্‌' শব্দ করিয়া মাতাইয়া তোলে। মশার 'পি-ই-ই' শব্দ বা ভন্‌-ভনানি কে না জানে? সকল পোকার মদ্দারাই শব্দ করিতে পারে, মাদিরা পারে না। এইরূপে শব্দ বা গান করিয়া মাদিদিগকে জানাইয়া দেয় তাহারা কোথায় আছে।

কালার সঙ্গে আমরা জোর করিয়া কথা বলি না। সব মানুষই যদি কালা হইত, তাহা হইলে কথা বলিবার চলনও থাকিত না। তেমনি পোকারা যখন শব্দ করে তখন নিশ্চয়ই তাহারা এই শব্দ শুনে এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। পঙ্গপাল আসিলে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, কেনেস্তারা বা টিন বাজাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইবার প্রথা আছে। অনেক সময় দেখা যায় কোনস্থানে ঐরূপে শব্দ করিতে থাকিলে পঙ্গপাল সেখানে বসে না।

কিন্তু সকল পোকাই শুনিতে পায় বলিয়া মনে হয় না। সকল পোকা শব্দ করে না এবং সকলের শুনিবার যন্ত্রও দেখা যায় না। কোন জঙ্গলের মধ্যে যদি হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় মানুষ, পশু, পক্ষী সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাছেই হয় তো কোন প্রজাপতি বা মৌমাছি ফুলের মধু খাইতেছে। বন্দুকের শব্দ সে গ্রাহ্যই করে না, যেন কিছুই হয় নাই।

আঘ্রাণ—পোকাদের ঘ্রাণশক্তি বা শুঁকিয়া চিনিয়া লইবার ক্ষমতা খুব বেশী। পাশাপাশি পাঁচ সাত দল মৌমাছি রাখিয়া দাও, তাহারা আপন আপন বাসা চিনিয়া বাহিরে যাওয়া আসা করিবে। যদি এক দলের কোন মৌমাছি অপর দলের বাসাতে ঢুকিতে যায়, ঢুকিতে পাইবে না, তাড়া খাইবে। গন্ধ দ্বারা মৌমাছি নিজের দলের অপর মৌমাছিকে চিনিতে পারে। পিঁপড়ারাও গন্ধ দ্বারা নিজের দলের লোক চিনিয়া লয়। কোন পোকা মারিয়া মেঝেতে ফেলিয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় সারি দিয়া পিঁপড়া সেই দিকে আসিতেছে। অনেক পোকাই খাদ্যের গন্ধে আসিয়া জোটে। গন্ধের দ্বারাই চিনিয়া পোকা এমন গাছের উপর ডিম পাড়ে যাহার পাতা ইত্যাদি খাইয়া বাচ্ছারা বাঁচিতে পারে। বনে জঙ্গলে হাজার গাছের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া প্রজাপতি এমন গাছটিতে ডিম পাড়ে যাহার পাতা তাহার বাচ্ছা খাইবে।

বেশীর ভাগ পোকাই দিনে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিতে বাহির হয়। আমরা দেখিয়াছি সকল পোকা শব্দ করে না। তাহাদের মদ্দা ও মাদিতে মিলন হয় গন্ধের সাহায্যে। মাদির দেহ হইতে গন্ধ বাহির হয়, সেই গন্ধে দূর হইতে মদ্দারা আসিয়া জোটে। যাহারা তসরের পলু পালন করে তাহারা সন্ধ্যার সময় মাদি প্রজাপতিকে বাহিরে বাঁধিয়া রাখে। তাহাতে অনেক জঙ্গলী মদ্দা তাহার কাছে আসিয়া জোটে।

আমরা নাক দ্বারা শুঁকি। পোকাদের শুঁকিবার নাক নাই। তারপিন্‌ তেল বা কোন কড়া গন্ধওয়ালা জিনিসে একটি কাঠি ডুবাইয়া যদি কোন মৌমাছি বা বোল্‌তার সাম্‌নে ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সে ডানা বা পা কি অপর কোন অঙ্গ না নাড়িয়া শুঙ্গদুটি শুধু উঠাইতে নামাইতে ও ঘুরাইতে থাকে এবং মুখ ও পা দিয়া এই দুইটিকে মুছিতে থাকে। শুঙ্গ দিয়াই পোকারা গন্ধ টের পায়। শুঙ্গতে বহু ছোট ছোট শুঁকিবার যন্ত্র আছে। যে সকল পোকা খাদ্যের গন্ধে আসে

তাহাদের কতকগুলির শুঙ্গ কাটিয়া একটু দূরে ছাড়িয়া দিলে আর তাহারা খাদ্যের কাছে পৌঁছিতে পারে না। তসরের পোকা প্রভৃতির মদ্দা প্রজাপতি গন্ধ দ্বারা মাদির খবর পায়। এই জন্য মদ্দাদের শুঙ্গ খুব বড়, মাদিদের শুঙ্গ ছোট।

স্বাদগ্রহণ—কোন কোন পোকা খাইয়া ভাল মন্দ চিনিতে পারে। একজন পণ্ডিত বোলতাকে কয়েক দিন ধরিয়া মিছরী খাওয়াইয়াছিলেন। এক দিন সিছরীর বদলে ফটকিরি রাখিয়া দেখিলেন যে বোলতা একটু খাইয়াই বুঝিতে পারিল। সরবতের সঙ্গে কুইনাইন দিলে মৌমাছি খাইতে চায় না।

কেটারপিলার যে গাছের পাতা খায় সে পাতা না পাইলে মরিয়া গেলেও অন্য পাতা খাইতে চায় না। অনেক সময় দেখা যায়, ডিম হইতে ফুটিবার পর হইতেই অপর পাতা দিতে থাকিলে কেহ কেহ এই পাতা কিছু কিছু খায়। বড় কেটারপিলার কিন্তু কিছুতেই অপর পাতা খাইতে চায় না।

আমরা নাক টিপিয়া তিক্ত ঔষধ খাই এবং নাক টিপিয়া মিষ্টি খাইলেও বেশ বুঝিতে পারি না। গন্ধেই তেত ও মিষ্টি বেশী টের পাই। পোকাদেরও চাখিয়া বাছিবার ক্ষমতা বেশী আছে কিনা সন্দেহ, বোধ হয় গন্ধেই তাহারা বেশী টের পায়। পোকার রুচিতে ও আমাদের রুচিতে অনেক তফাৎ। অনেক পোকাই তেত পাতা খায়। তামাকের, এমন কি শুকনো তামাকের পাতা খায় এবং ঝাঁঝওয়ালা লঙ্কাও খায়। সেই তামাকের পাতা আমাদের নাকের কাছে আসিলে হয় তো হাঁচিতে হাঁচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে এবং সেই লঙ্কার ঝাঁঝে কাশিতে কাশিতে আমাদের দম আটকাইয়া যাইবে।

স্পর্শ—আমাদের গায়ে যে লোম আছে তাহা ছুঁইলেই এবং গায়ে হাত না পড়িলেও আমরা বুঝিতে পারি। পোকাদের দেহের উপর এবং মুখের ও শুঙ্গর উপর যে সকল লোম আছে তাহাদেরও বোধশক্তি খুব বেশী। দেহের লোম নাড়া দিলে কেটারপিলার প্রভৃতি লাফাইয়া উঠে। শুঙ্গ ও মুখ বুলাইয়া পোকারা সমস্ত জিনিস পরখ করিয়া লয়।

কোন্ অঙ্গ কাটিয়া দিলে পোকারা যন্ত্রণা পায় কিনা জানিবার জো নাই। প্রজাপতির একটা পা কিংবা লেজের অগ্রভাগ কাটিয়া দিলেও সে সহজেই উড়িয়া যায়। বোলতার পেট কাটিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে সে সরবত খাইতে থাকে, যদিও কাটা পেট দিয়া সরবত গড়াইয়া পড়িয়া যায়। জল ফড়িঙের পেট কাটিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে সে ছোট ছোট মাছি খাইতেছে, কিন্তু মাছিগুলি কাটা পেট হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন কেটারপিলারের গায়ে কাঁটা ফুটাইয়া দিলে সে ছট্‌ফট্‌ করে এবং মুখ দিয়া ঘসিয়া কাঁটাটাকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করে। পোকারা যে যাতনা বোধ করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস—আমরা নাক দিয়া নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস লই। পোকাদের মুখের উপর বা মুখের কাছে কোন নাক নাই। ১১নং চিত্রে যেমন দেখান হইয়াছে তাহাদের দেহের দুই ধারে ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র দিয়াই তাহারা নিঃশ্বাস লয়। কীড়া, পুত্তলি, পতঙ্গ সকলেরই এইরূপ নিঃশ্বাস লইবার যন্ত্র আছে।

সকল পোকারই নিঃশ্বাস লওয়া দরকার হয়। কিন্তু কতটুকু দরকার তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। মানুষকে বড় সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে সে হাঁপাইয়া মরে। কিন্তু শক্ত শুকনো মটর ও ছোলার ভিতর পোকা অনায়াসে বাঁচিয়া থাকে। গাছের গুঁড়ির ভিতর এবং শুকনো শক্ত কাঠের ভিতর ঘুণ বেশ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয় তাহারা হাওয়া পায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মটর, ছোলা ও কাঠের ভিতর খুব অল্প অল্প হাওয়া ঢোকে। ইহাতেই পোকাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে।

প্রজাপতি, বিটল্, ফড়িঙ কিংবা কোন পোকাকে একটা শিশিতে পুরিয়া যদি সেই শিশির ভিতর কর্পূর, ন্যাপথলিন্ কিংবা তুলাতে ভিজাইয়া কেরোসিন, তারপিন্, ক্লোরোফরম্ অথবা বেন্‌জিন্ দেওয়া হয় এবং শিশির মুখটি বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অল্প ক্ষণের ভিতরেই পোকা ছট্‌ফট্ করিয়া অজ্ঞান হয় ও পরে মরিয়া যায়। অস্ত্র করিবার সময় ডাক্তারেরা মানুষকে ক্লোরোফরম্ শুঁকাইয়া এইরূপে অজ্ঞান করে। বেশী শুঁকাইলে মানুষ মরিয়া যাইতেও পারে।

সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদ্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
RHODODENDRON (Linn.)								
১। রোডোডেনড্রোন ভ্যাক্সিনিয়োইডেস Rhododondran vaccinioides (Hook).	ক্ষুদ্র গুল্ম ২′	সাদা বা পাটল বর্ণ	শ্রাবণ	কার্ত্তিক	বাতাসিয়া জালাপাহাড় ৮০০০′	সিকিম	চিমল	
২। রোঃ গ্রান্ডি R. grande (Weight Ic.)	বৃক্ষ ৩০′	বড় সাদা	চৈত্র-বৈশাখ	অগ্রহায়ণ	টংলু ৯০০০′	পূর্ব্বহিমালয়		
৩। রোঃ হজসোনি R. Hodgsoni (Hook f.)	বৃক্ষ ২০′, পাতার নিম্নভাগ রজত-শুভ্র	গাঢ় গোলাপী	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ	ফালুট ১০০০০′	নেপাল-ভোটান		
৪। রোঃ ফাল্কোনারি R. Falconeri (Hook.)	বৃক্ষ ২০′	সাদা, ঈষৎ হরিদ্রাভ	ঐ	ঐ	টংলু ৯০০০′	ঐ		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৫। রোডোডেনড্রোন আরবোরিয়াম Rhododendron arboreum (Sm. Ext.)	বৃহৎ গুল্ম, পাতার নিম্নভাগ রজত-শুভ্র	অলক্ত বর্ণ	ফাল্গুন বৈশাখ	অগ্রহায়ণ	টংলু ৯০০০′	কাশ্মীর-ভোটান খাসিয়া-ব্রহ্মদেশ		
প্রকার—নিলাগিরিকা var. nilagirica					নীলগিরি ৬০০০′	নীলগিরি-লঙ্কাদ্বীপ		
প্রকার—ক্যাম্পবেলিয়াই var. Campbellii	গুল্ম, নিম্নভাগ লৌহমরিচার রং	গোলাপী লাল	বৈশাখ	ঐ	টংলু ১০০০০′	কাশ্মীর-ব্রহ্মদেশ		
প্রকার—ওয়ালিসাই var. Wallichii		প্রায় সাদা	চৈত্র-বৈশাখ	মাঘ	কালাপোখরি ১০০০০′	ঐ		
৬। রোঃ নিভেয়াম R. niveum (Hook.)	ক্ষুদ্র গুল্ম, আরবোরিয়ামের মত দেখিতে		জ্যৈষ্ঠ	ঐ	ঘোমা উপত্যকায়	সিকিম-হিমালয়		
৭। রোঃ ক্যাম্পানুলাটাম R. campanulatum (Don.)	৬′-১৬′	হলদে অথবা ধূমল বর্ণ	ঐ	ঐ	তারী ১৩০০০′	কাশ্মীর-ভোটান		
৮। ঐ		সাদা, ফুট ফুট লাল দাগ	বৈশাখ	ঐ	ছান্দু ১২০০০′	ঐ		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
রোডোডেনড্রোন ক্যাম্পানুলাটাম Rhododendron campanulatum		সামান্য গোলাপী	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ	ছাঙ্গু ১২০০০′	কাশ্মীর-ভোটান		
ঐ		সেওফুলের মুকুলের রং	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
ঐ		লাল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
ঐ		পাটল বর্ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
প্রকার—ওয়ালিসাই var. Wallichii		নীল	ঐ	ঐ	ফালুট ১২০০০′	সিকিম-ভোটান		
৯। রোঃ ফালজেন্স R. fulgens (Hook.)		লাল		ঐ	চুয়াভানজঙ্গ ১২০০০′	নেপাল-সিকিম		
১০। রোঃ ওয়াইটাই R. Wightii (Hook.)	বৃহৎ গুল্ম ৬′-১৪′	লাল ফুট ফুট দাগবিশিষ্ট হলদে বা রক্তাভ	বৈশাখ	ঐ	তারী ১৩০০০′	ঐ		
১১। রোঃ ল্যানাটাম R. lanatum (Hook.)	১′ গুল্ম			কার্ত্তিক	ঐ	সিকিম-হিমালয়		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
১২। রোডোডেনড্রোন ক্যাম্পিলোকারপাম R. Campylocarpum (Hook.)	গুল্ম ৪′-৮′	হরিদ্রাভ সাদা	বৈশাখ-আষাঢ়	অগ্রহায়ণ	মেঞ্জরডারা ১৩০০০′	নেপাল-সিকিম		
১৩। রোঃ গ্রিফিথিয়ানাম্ R. Griffithianum (Wight Ic.)	২৫′ বৃক্ষ	সাদা ফুল	আষাঢ়	ঐ	চুয়াভানজঙ্গ ১২০০০′	সিকিম-ভোটান		
১৪। রোঃ টমসোনি R. Thomsoni (Hook.)	৫′ গুল্ম	গাঢ় অলক্তবর্ণ	ঐ	ঐ	মেগু ১৩০০০′	নেপাল-সিকিম		
প্রকার—ক্যানডেলেব্রাম var. candelebrum (Hook.)	৮′ গুল্ম		জ্যৈষ্ঠ			ঐ		
ঐ		হলদে		কার্ত্তিক	লিঙ্গটু ১২০০০′	ঐ		
প্রকার—ফ্লাকলোজ—আঁশযুক্ত var. floculose						ঐ		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
১৫। রোডোডেনড্রোন বারবাটাম Rhododendron barbatum (Wall.)	৬' গুল্ম	গাঢ় লাল	চৈত্র	কার্ত্তিক	সন্দকফু ১১৫০০'	কুমাওন-ভোটান		
প্রকার—স্মিথাই var. Smithii	পাতার তটদেশ ঈষৎ রোঁয়াযুক্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ			
১৬। রোঃ এজয়োরথাই R. Edgeworthii (Hook.)	পরগাছা, শিলার উপরে জন্মে, পাতা কোঁকড়ান	পীতাভ হলদে	বৈশাখ	কার্ত্তিক	ঘুম ৮০০০'	সিকিম-ভোটান		নূতন শাখা রোঁয়াযুক্ত
১৭। রোঃ পেনডুলাম R. pendulam (Hook.)	গুল্ম, শাখা দোদুল্যমান	সাদা	বৈশাখ		জংগ্রি ৯-১১০০০' লাচেন	সিকিম		
১৮। রোঃ ডালহৌসি R. Dalhousiæ (Hook.)	পরগাছা	ঐ	চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ	পৌষ	ঘুম ৮০০০'	সিকিম-ভোটান		
১৯। রোঃ সিলিয়াটাম R. ciliatum (Hook.)	২'-৪', শৈলের উপর বিস্তৃত	ঐ	ঐ	ঐ	চাকুংছু লাচেন	সিকিম		

| নাম | গাছের প্রকৃতি | ফুলের আয়তন ও রং | ফুল ফুটার সময় | বীচি পাকিবার সময় | প্রাপ্তিস্থান | স্বাভাবিক বাসস্থান | স্থানীয় নাম | মন্তব্য |

৪ ২০। রোডোডেনড্রোন ক্যামিলিফ্লোরাম Rhododendron camelliæflorum (Hook.)	৩'-৬'	সাদা			ল্যাচুং-এর পাহাড়ের উপরে	নেপাল-ভোটান		
২১। রোঃ গ্লকাম R. glaucum (Hook.)	২' ঝোপ	নীলাভ অথবা হরিদ্রাভ	বৈশাখ		ছাঙ্গু ১২০০০'	সিকিম-ভোটান		
২২। রোঃ পুমিলাম R. pumilum (Hook.)	৬"-৮"	সুন্দর বেগুনে রং	আষাঢ় আশ্বিন	আষাঢ়	এমছো-লা ১৪০০০' পাহাড়ের উপর	সিকিম		
২৩। রোঃ লেপিডোটাম R. lepidotum (Wall.)	১', শৈলের উপর বিস্তৃত	হলদে অথবা ধূমল বর্ণ	ভাদ্র	কার্ত্তিক	সেরাবথাং ১২০০০'	কাশ্মীর-ভোটান		
২৪। রোঃ সিটোসাম R. setosum (D. Don.)	১', শাখা বৃন্তলযুক্ত	ফুল লালাভ	জ্যৈষ্ঠ	কার্ত্তিক	ছাঙ্গু, বক্টু ১১০০০'	নেপাল-সিকিম		
২৫। রোঃ নিভেল R. nivale (Hook.)	নিবিড় ক্ষুদ্র ঝোপ ২"	গোলাপী লাল ১ পুষ্পী			ফালুট ১২০০০'	সিকিম		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
২৬। রোডোডেনড্রোন আন্থোপোগন Rhododendron Anthopogon (D. Don.)	১′ গুল্ম	হলদে, অন্য ভাগ সাদা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ		তারী ১৩০০০′	কাশ্মীর-ভোটান		
২৭। রো: ম্যাডিনি R. Maddeni (Hook.)	৬′-৮′	৪-১২-পুষ্পী সাদা	আষাঢ়	অগ্রহায়ণ	চিয়াভানজাং ১২০০০′	সিকিম-ভোটান ৬০০০′		
২৮। রো: সিন্নাবারিনাম R. cinnabarinum (Hook.)	৪′ গুল্ম	লম্বা সঙ্কীর্ণ উপঘণ্টাকৃ, কমলাবং বা গোলাপী রং	বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ অগ্রহায়ণ	মেজোরভারা কালাপোখরি ১২০০০′	সিকিম-ভোটান		
২৯। রো: ট্রিফ্লোরাম R. triflorum (Hook.)	৪′-৮′ ঝোপ	হলদে	জ্যৈষ্ঠ		ইয়ামথাং ১০০০০′	সিকিম-ভোটান		
৩০। রো: ভিরগাটাম R. virgatum (Hook.)	৪′ ঝোপ	ধূমলবর্ণ ১/২″		কার্ত্তিক	লাচেন ৮০০০′	ঐ		
PYROLA (Linn.)								
১। পাইরোলা রোটাণ্ডিফোলিয়া Pyrola rotundifolia (Linn.)	১′, পাতা ২″ লম্বা বৃন্তের উপরে বর্ত্তুলাকার	১/২″ সাদা এবং পাটলবর্ণ, মঞ্জরী বহুপুষ্পী		আশ্বিন	থাঙ্গু ১১০০০′	কাশ্মীর-খাসিয়া		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
প্রকার—আসারিফোলিয়া var. asarifolia.				বৈশাখ	লাচেন-এর উপরে ১৪০০০′	কাশ্মীর-খাসিয়া		
DIAPENSIACEÆ (C. B. Clarke)								
ডাইপেনসিয়া হিমালইকা Diapensia himalaica (Hk. f. & T.)	ছোট ঘন ঝোপ				চোলা ১৪০০০′	সিকিম-হিমালয়		
PLUMBAGINEÆ								
সিরাটস্টিগ্মা গ্রিফিথাই Ceratostigma Griffithii (Clarke)	খাট, বহুশাখাবিশিষ্ট ঝোপ	নীল			লামন্থ	ভোটান		
PRIMULACEÆ (J. D. Hooker)								
১। প্রাইমূলা রোটানডিফলিয়া Primula rotundifolia (Wall.)	১′	মুকুল ঘনভাবে পালোদানা দ্বারা আবৃত	জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়	কার্ত্তিক	সন্দকফু ১২০০০′ শিলার উপর	কাশ্মীর-সিকিম	সোথে সোথে ওড়ারে	

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
২। প্রাইমুলা গ্যামবেলিয়ানা Primula Gambeliana (Wall.)	১০'	হরিদ্রাভ	আষাঢ়	ভাদ্র	মেঘু শিলার উপর ১৪০০০' জঙ্গি	সিকিম-হিমালয়		
৩। প্রাঃ পুলচ্রা P. pulchra (Wall.)	৬"	২-১০ শিথিল-ছত্রক, বেগুনে নীল	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	তারীর শিলার উপর	ঐ		
৪। প্রাঃ রেটিকুলাটা P. reticulata (Wall.)	৯"	সাদা বা হলদে ফুল ফুঁদেলাকৃতি ১২"-১৬"	আষাঢ়	আশ্বিন	ছাঙ্গু ১১-১২০০০' ড্যামফেভির ১৩০০০'	নেপাল-সিকিম		
৫। প্রাঃ ভ্যাগিনাটা P. vaginata (Wall.)	৫"	গোলাপী ধূমলবর্ণ	জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	লাঘেব-লা ১০০০০'	ঐ		
৬। প্রাঃ জিরেনিফোলিয়া P geraniifolia (Hook.)	৬", পাতা গোলাকৃতি দন্তিল, রোমশ	হলদে, সামান্য সুগন্ধী	আষাঢ়	আশ্বিন	কাংলামায় শিলার উপর ১০০০০' ফালুট	সিকিম-ভোটান		
৭। প্রাঃ লিস্টেরী P. Listeri (King)	৪", পাতা বর্তুলাকার	গোলাপী পাটলবর্ণ	জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	কালাপোখরি ১০৫০০' সন্দকফু	সিকিম-হিমালয়		
৮। প্রাঃ ডেন্টিকুলাটা P. denticulta (Smith)	৪"-৬", পাতার মধ্যশিরা চওড়া আঁশবিশিষ্ট নহে	বেগুনে রং	বৈশাখ	আষাঢ়	ফালুট ১১১০০'	আফগানিস্থান-খাসিয়া		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
প্রকার—ক্যাসমিরিয়ানা—পাতা ও ফুল এক সময় নির্গত হয়, সাধারণতঃ পালোদানা দ্বারা আবৃত থাকে। var. Cashmeriana								
৯। প্রাইমুলা ক্যাপিটাটা Primula capitata (Hook.)	৬", পাতা সাধারণতঃ অত্যন্ত নরম, সুন্দরভাবে দন্তিল	গাঢ় ধূমলবর্ণ	আষাঢ়	আশ্বিন	আলুকথাং ১৩০০০'	সিকিম-ভোটান		
১০। প্রাঃ ইরোজা P. erosa (Wall.)	৬", পাতা কখন কখনও ১৮" লম্বা হয়	ফুল উপছত্র ধূমলবর্ণ	শ্রাবণ	ঐ	নিংবিল ১৩০০০'	কুমাওন-ভোটান মেঘু ও ফেডাপ		ইহা ডেন্টিকুলাটার জাত হইতে পারে
১১। প্রাঃ বেলিডিফোলিয়া P. bellidifolia (King)	৪"-৬"	ছোট, উপশির নীলাভ ধূমলবর্ণ	আষাঢ়	ভাদ্র	জেমুর হিমনদে জুনিপার গাছের তলায়	সিকিম		
১২। প্রাঃ কনসিন্না P. concinna (Wall.)	১", অত্যন্ত ক্ষুদ্র পাতা	সাদা বা পাটলবর্ণ	বৈশাখ	ভাদ্র	থাঙ্গালার জলাভূমিতে	সিকিম-হিমালয় তিব্বতের গিরিবর্ত্মের মধ্যে		
১৩। প্রাঃ গ্লাব্রা P. glabra (Klatt.)	২"	নীল ধূমলবর্ণ	ঐ	আশ্বিন	তারীর শিলার উপর ১৩০০০'	সিকিম-হিমালয়		পুষ্পমুকুট প্রাঃ পুসিল্লার মত ঝালরিত নহে

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
১৪। প্রাইমুলা ইনভোলুক্রাটা Primula involucrata (Wall.)	১", ভৌম পুষ্পদণ্ড ৩", লম্বা অথবা থাট বোঁটর উপর পাতা বর্তুলাকার	ফেঁকাসে হলদে অথবা ধূমলবর্ণ	আষাঢ়	আশ্বিন	কংলিংএর জলাভূমিতে কাপুপ	কাশ্মীর-সিকিমের হিমপ্রদেশ		
১৫। প্রাঃ টিবেটিকা P. tibetica (Watt)	২"	ধূমলবর্ণ	ঐ	ঐ	লোনাক ১৪৫০০' আর্দ্র শৈলের উপর	পশ্চিমতিব্বত সিকিম		
১৬। প্রাঃ স্পিসিস P. specis	পাতা ৪"	৬" হলদে ক্ষুদ্র ভৌম পুষ্পদণ্ড কখন কখন আবর্ত্তে	ঐ	ভাদ্র	জংগ্রি			
১৭। প্রাঃ অবটিউসিফলিয়া P. obtusifolia (Royle)	পাতা ৪"; ভৌম পুষ্পদণ্ড ১০"	ধূমলবর্ণ, মধ্যস্থল হলদে	ঐ	শ্রাবণ	ফালুট ১১০০০' ছাপু ১২০০০'	কুনাওয়ার-ভোটান	মূলকাণ্ড স্থূল	
১৮। প্রাঃ ট্যানেরি P. Tanneri (King)	১০"	ধূমলবর্ণ	জ্যৈষ্ঠ	ঐ	লাঘেপ ১২০০০'	সিকিম-হিমালয়		
১৯। প্রাঃ এলংগাটা P. elongata (Watt)	৫", পাতা দীর্ঘ বৃন্তে, ভৌম পুষ্পদণ্ড	লম্বা হলদে	ঐ	ভাদ্র	নাথংএর পশুচারণ ভূমিতে ১২০০০'	সিকিম-জেমু		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
২০। প্রাইমুলা পারপুরিয়া Primula purpurea (Royle)	৫", ভৌম পুষ্পদণ্ড ১'			শ্রাবণ	গোরাকচুলা ১৫৭০০			
২১। প্রাঃ নিভালিস P. nivalis (Pallas)	কাণ্ডের শিকড় স্থূল ৬"	ধূমল বর্ণ	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন	লাচেংএর উপরে থীলা ১৬০০০'			
২২। প্রাঃ ষ্টুয়ার্টাই P. Stuartii (Wall.)	পাতা ৫"-১০" ধারাল দন্তিল, হলদে পালোদানা দ্বারা আবৃত	ফেঁকাসে হলদে	আষাঢ়		জংগ্রি ১৪০০০'	কাশ্মীর-সিকিম		
প্রকার—পারপুরিয়া var. purpurea	পাতা ষ্টুয়ার্টাই-এর মত সাদা, নিম্নে পালোদানা দ্বারা আবৃত	ফেঁকাসে গাঢ় ধূমলবর্ণ অথবা সামান্য ধূমলবর্ণ	ঐ	আশ্বিন	বীথেভানজঙ্গ ১১০০০'		ফুল সময় সময় ২ আবর্ত্তে	
প্রকার—মুরক্রফটিয়ানা var. Moorcroftiana						কাশ্মীর		
প্রকার—ম্যাক্রোকারপা var. macrocarpa	নিম্নভাগ পালোদানা দ্বারা আবৃত	বৃতি অত্যন্ত বৃহৎ; ফেঁকাসে হলদে, সাদা বা ঈষৎ গোলাপী রং		ভাদ্র	ইয়ামথাং ১৩০০০' ইমছো-লার অগভীর প্রস্তরময় ক্ষুদ্র ঝরণাতে			

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার-সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
২৩। প্রাইমুলা সিকিমেনসিস্ Primula sikkimensis (Hook.)	মূল-কাণ্ড অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল, পাতা ৬"-১৭", পালোদানা দ্বারা আবৃত নহে	ভৌম পুষ্পদণ্ড অত্যন্ত লম্বা ৬-৩০	আষাঢ়		মেঙু ১৪০০০'	সিকিম-হিমালয়		
২৪। প্রাঃ ওয়াটাই P. Wattii, King	২" পাতা, ভৌম পুষ্পদণ্ড ৫"		ঐ	আশ্বিন	চোলা উপত্যকায় ১৩৫০০'			
২৫। প্রাঃ কিঙ্গাই P. Kingii (Watt)	৪", ভৌমপুষ্পদণ্ড ৫"	অলক্তবর্ণ অথবা ধূমলবর্ণ; হলদে অক্ষি	ঐ	ঐ	ছাঙ্গু ১৩০০০' কুপুপের জলাভূমিতে, খোলা ভূমিতে হিমগিরি-নিঃসৃত জলে			
২৬। প্রাঃ আট্রোডেনটাটা P. Atrodentata (Smith)	১" পাতা আবর্ত্তের মধ্যে, ভৌম পুষ্পদণ্ড ৩"		জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	লোনাক ১৬০০০'			
২৭। প্রাঃ ডিকিয়ানা P. Dickieana (Watt)	পত্র দন্তুর মসৃণ	ফুল ২-৬ বড় পুষ্প	আষাঢ়	ভাদ্র	ইমছো-লা ১৩০০০'			সুন্দর গুল্ম

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
২৮। প্রাইমুলা পণ্ট্‌লিঙ্গাই Primula Pantlingii (King)	পাতা ১½", ভৌম পুষ্পদণ্ড ৬"	গাঢ় হলদে	ঐ	আশ্বিন	ইমছো-লা ৯০০০' জলাভূমিতে			
২৯। প্রাঃ এলউইসিয়ানা P. Elwesiana (King)	৫", ভৌম পুষ্পদণ্ড ১', মূলকাণ্ড অত্যন্ত স্থূল	ধূমলবর্ণ; কোমল লোমস	ঐ	শ্রাবণ	ছাঙ্গুর নীচে ১২৫০০' সেরাবথাং ১২০০০' জলাভূমিতে, ল্যাচেন ১৩০০০'	সিকিম-হিমালয়		
৩০। প্রাঃ কেভিয়ানা P. Caveana	৫", ভৌম পুষ্পসহ		ভাদ্র	কার্ত্তিক	নাকু-লা ১৬০০০' লোনাক			
৩১। প্রাঃ টেনেল্লা P. tenella (King)	পাতা ½", ভৌম পুষ্পদণ্ড ২½"	নীল	ভাদ্র	কার্ত্তিক	ফারির শুষ্ক শৈলে	সিকিম-ভোটান		
৩২। প্রাঃ পুসিল্লা P. pusilla (Wall.)	পাতা ঘনগুচ্ছে	পুষ্পমুকুট ঘন রোমস	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন	মেঘু, জংগ্রী শিলার উপর	নেপাল-সিকিম		
৩৩। প্রাঃ সাফিরিনা P. sapphirina (Hook.)	অত্যন্ত ক্ষুদ্র নির্লোম অথবা ধূসরাভ শুভ্র, ½" ভৌম পুষ্পদণ্ড ১½"	১-৪-পুষ্পী বেগুনে রং	ঐ	ঐ	সেরাবথাং খাটো ঘাসের মধ্যে ১২০০০'	সিকিম-হিমালয়		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৩৪। প্রাইমুলা ইউনিফ্লোরা Primula uniflora (Klatt.)	পাতা ½" বৃন্তক	বেগুনে রং অথবা ধূমলবর্ণ এবং বৃহৎ ½"	আষাঢ়	আশ্বিন	এমছো-লা ১৪০০০'	সিকিম-হিমালয়		সাকিরিনার মত দেখিতে
৩৫। প্রাঃ সোল্ডানেলিয়ডিস P. soldanellioides (Watt)	⅙", ভৌম পুষ্পদণ্ড ১½'	সাদা ফুঁদেলাকৃতি	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	জংগ্রি ১৪০০০' লাচেং ১৪০০০'	ঐ		
৩৬। প্রাঃ পেটিওলারিস P. petiolaris (Wall.)	২½"	বেগুনে রং, গাঢ় ধূমলবর্ণ, সাদা, গোলাপী	চৈত্র আশ্বিন	জ্যৈষ্ঠ	তারি শৈলের মধ্যে ১২৫০০'	সিমলা-ভোটান		
৩৭। প্রাঃ পেটিওলারিস প্রপার P. petiolaris proper	পাতা দীর্ঘ বৃত্তাকার	পাটলবর্ণ বা সাদা	চৈত্র	ঐ	টংলু ১০০০০'	সিকিম-হিমালয়		
প্রকার—নানা var. nana	সামান্য রকম পালোদানা দ্বারা আবৃত	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ		
প্রকার—ষ্ট্রেচেয়ী var. Stracheyi	ঐ	ঐ			কুমাওন	হিমালয়		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন ও রং	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
প্রকার—সালফুরিয়া var. sulphuria	হরিদ্রাভ পালোদানা দ্বারা মুকুট ভিন্ন অবশিষ্ট অংশ আবৃত		চৈত্র	জ্যৈষ্ঠ	কুমাওন-পিন্তারেন	সিকিম-হিমালয়		
প্রকার—এজ্ওয়ার্থাই var. Edgeworthii	পাতা ৩"-৪"	মুকুল মাত্র পালোদানা দ্বারা আবৃত	পৌষ		চুম্বাভানজঙ্ঘ ১২০০০'			
প্রকার—স্কেপিজেরা var. scapigera	ভৌম পুষ্পদণ্ড স্থূল পাতার ন্যায় অথবা পাতার চেয়ে লম্বা			বৈশাখ আষাঢ়	টংলু ৯০০০'	সিকিম-ভোটান		
৩৮। প্রাইমুলা হুকেরি Primula Hookeri (Watt)	½"; পালোদানা দ্বারা আবৃত	সাদা	আষাঢ়		ইমছো-লার আর্দ্র ভূমিতে ১৪৫০০'			
৩৯। প্রাঃ টেনুইলোবা P. tenuiloba (Hk. f.).	⅙" অতিক্ষুদ্র	⅙", গাছ অপেক্ষা ফুল বৃহৎ	ঐ		চাকুং ১৪৫০০'	সিকিম-হিমালয়		
৪০। প্রাঃ মুস্কয়ডিস P. muscoides (H. f.)	⅙"; ধাবিত জননশাখা 'মস্' (moss)-এর মত দেখিতে		ঐ	কার্ত্তিক	নাংমা-লা ১৬০০০'	ঐ		
৪১। প্রাঃ ষ্টারটোনিয়ানা P. Stirtoniana (Watt)	⅙" পাতা, ১" ভৌম পুষ্পদণ্ড	গোলাপী ¼"	জ্যৈষ্ঠ	ঐ	জংগ্রি ১৪০০০'	ঐ		
৪২। প্রাঃ ফ্লোরিবান্ডা P. floribunda (Wall.)	৬"; ভৌম পুষ্পদণ্ড ১½'	হলদে পাটলবর্ণ	আষাঢ়	আশ্বিন	বিখেভানজঙ্ঘ ১১০০০'	কুমাওন-কাশ্মীর		

আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

শ্রীসুধীরকুমার বসু

পরলোকগত মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর রাজত্বসময়ে বিজ্ঞান নানা দিকে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, পৃথিবীর অতি অল্প রাজার রাজত্বকালে এরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে তাঁহার রাজত্বকালের এই গৌরবময় যুগের সহিত একমাত্র তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের তুলনা করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সাল হইতে এই যুগের আরম্ভ। এ বৎসরই সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রণ্ট্‌গেন কর্ত্তৃক এক্স-রে বা রণ্ট্‌গেন-রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলেক্‌ট্রন্ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ হয়। ১৮৯৬ সালে রেডিও-একটিভ বা স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থ সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তাহার ফলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাশ্চর্য্য ধাতু পোলোনিয়ম ও রেডিয়ম আবিষ্কৃত হয়। শক্তি সম্পর্কে প্রাক্তের কোয়াণ্টাম্ মতবাদের (Quantum Theory) গোড়াপত্তনও প্রায় এই সময়ে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছিল। এ যুগেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বেতারবার্ত্তা প্রেরণের কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত মার্কনি উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথনির্দ্দেশে সহায়তা করেন। এ যুগেই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের সাম্যতত্ত্ব (Principle of Relativity) প্রচারিত হওয়ার ফলে বিজ্ঞান-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সময় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিসমূহেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কোন মটর গাড়ী আগে আগে লাল নিশান উড়াইয়া লোকজনকে সাবধান না করিয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না, কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মোটর যন্ত্রের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যন্ত্রচালিত বিমানও আরোহী লইয়া শূন্যে উঠিতে সমর্থ হয়। এই যুগে বিজ্ঞানের নানা দিকে উন্নতির যে সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলিতে গেলে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালে তাহাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান যে জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে পারিয়াছে তাহা যেমনি অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর! এই প্রবন্ধে আমরা মোটামুটিভাবে এই জ্ঞানের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রথমেই পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাল্টনের যুগ হইতে আমরা যে আজ

এবিষয়ে বহু দূরে অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমাণু সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা একান্ত বিস্ময়কর। এরূপ গবেষণার ফল যে ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে এপর্য্যন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিবিধ পরীক্ষাপ্রণালী পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, প্রচণ্ড গতিবেগবিশিষ্ট কোনও বস্তুকণা দ্বারা অপর কোনও পদার্থের পরমাণুর বিয়োগসাধন (bombardment); দ্বিতীয়তঃ, বর্ণচ্ছত্ররেখামূলক বিভিন্ন পরীক্ষা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধনাত্মক তড়িৎপ্রবাহযুক্ত, এক 'নিউক্লিয়স্' প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর বস্তু-সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে, আর তাহার চতুর্দ্দিকে ঋণ তড়িৎ-সম্পন্ন 'ইলেকট্রন্'সমূহ নানা পথে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিউক্লিয়সকে সূর্য্যের সঙ্গে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ইলেক্‌ট্রনসমূহকে গ্রহের সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়সের এইরূপ একটিমাত্র গ্রহ বা ইলেক্‌ট্রন্ আছে। এইরূপে হিলিয়মের দুইটি, লিথিয়মের তিনটি এবং স্বর্ণের ৭৯টি ইলেক্‌ট্রন্ রহিয়াছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নানাবিধ পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পান যে এইরূপ নিউক্লিয়স বা বস্তুকণা দ্বারা প্রত্যক্ষ সংঘাত ঘটাইতে পারিলে উহার সাহায্যে অন্য পদার্থকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া তাহা হইতে আবার নূতন পদার্থের উৎপত্তিসাধন করা যাইতে পারে। এইরূপে হিলিয়মকে হাইড্রোজেনে, নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করা গিয়াছে। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা কিমিয়াবিদ্‌গণের স্বপ্ন ছিল; কিন্তু আজ যদি আমরা পারদ-পরমাণুর নিউক্লিয়সের অভ্যন্তর হইতে একটি 'প্রোটন' বাহির করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে স্বর্ণের 'নিউক্লিয়স্' লাভে সমর্থ হইব। শুধু সংঘাতের ফলে একটি মৌলিক পদার্থকে অপর পদার্থে পরিণত করা যে একান্ত অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পদার্থকে অপর পদার্থে পরিণত করিতে প্রত্যক্ষ আঘাত করিবার জন্য বর্ত্তমানে কয়েকটি বস্তুকণা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধুনা-আবিষ্কৃত 'নিউট্রন' নামে পরিচিত বস্তুকণাটি সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বলিয়া মনে হয়।

কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের এরূপে রূপান্তরসাধন বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিরূপ ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা একমাত্র এই কথা বলিলেই প্রতীয়মান হইবে যে ১৯১৯ সালে কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কয়েকটি পদার্থই এরূপে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত, আজ কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় কয়েকটি অত্যধিক ভারী পদার্থ ব্যতিরেকে প্রায় সমুদয় মৌলিক পদার্থকেই এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে নূতন পদার্থের উৎপত্তিসাধন সম্ভবপর হইয়াছে। উপরোক্ত গবেষণার ফলে এরূপ অভাবনীয়

তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'পরমাণবিক জগতের' মধ্যে যে এত বিস্ময় লুক্কায়িত ছিল, সূক্ষ্ম পরমাণুকে যে এরূপভাবে গবেষণার সামগ্রীরূপে নাড়াচাড়া করিয়া তাহা হইতে ততোধিক বিস্ময়কর অভিনব সামগ্রী লাভ করা যাইতে পারে, কিছুকাল পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। ডাল্টনের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র 'পরমাণু' আজ পরম বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

বর্ণচ্ছত্ররেখার বিবিধ পরীক্ষাও পরমাণুর গঠন এবং তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কম সহায়তা করিতেছে না। নিউক্লিয়সের গঠন, সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহ-উপগ্রহের প্রদক্ষিণের অনুরূপ নিউক্লিয়সকে কেন্দ্র করিয়া ইলেকট্রন্‌সমূহের প্রদক্ষিণ, নিউক্লিয়সের ও ইলেকট্রনের পারস্পরিক সম্বন্ধ, কোন্ অদ্ভুত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এরূপভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে, বিভিন্ন জড়শক্তির প্রভাবে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, জড়বিজ্ঞানের প্রকৃতিনির্ণয়ে এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান নানা দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়। পরমাণু সম্পর্কিত এই সকল বিষয় অত্যন্ত জটিল সন্দেহ নাই। দিনের পর দিন এবিষয়ে আরও যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সেই সমস্ত জটিল বিষয়ের ধারণা করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইতিমধ্যেই পলির সিদ্ধান্ত (Pauli's Principle), রাম্‌ন ক্রিয়া (Raman effect), কম্পটন ফল (Compton effect), নিষিদ্ধ বর্ণচ্ছত্ররেখা (forbidden spectral lines), অবস্থান্তর সম্ভাবনীয়তা (Transition probabilities) প্রভৃতি কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণার উদ্ভোক্তা হইলেও এবং পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে বিবিধ গবেষণা করিলেও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রামনের গবেষণাও যে পাশ্চাত্য জগৎ প্রশংসার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আধুনিক যুগে যে সুদূরপ্রসারী গবেষণা চলিতেছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ যৌগিক পদার্থের গঠনাকৃতি সম্পর্কেও এযুগের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি হীরক অঙ্গারের এক রূপ। গ্র্যাফাইট্‌ও উহার অপর এক রূপ। অথচ হীরক শক্ত ও স্বচ্ছ, আর গ্র্যাফাইট্ অস্বচ্ছ ও নমনীয়। এক অঙ্গারেরই বিভিন্ন রূপের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কোথা হইতে আসে, এরূপ ধরণের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকগণের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই যুগের বৈজ্ঞানিকগণ তাই বিভিন্ন পদার্থের অণুর গঠন সম্পর্কে নানারূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে পরমাণুর মত অণুর রূপ ও আকৃতি বিষয়েও নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। একার্য্যে রন্টগেন আবিষ্কৃত এক্স-রে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বিগত ১৯১২

খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক্স-রেও সাধারণ আলোকের মতই তরঙ্গরশ্মি; সাধারণ দৃশ্যমান বর্ণচ্ছত্রের লাল নীল প্রভৃতি আলো হইতে উহার পার্থক্য এই যে এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য উহাদিগের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হইতে বহু শত গুণ ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মির সাহায্যে আমাদের চক্ষুর অগোচর অনেক কিছুই আমরা দেখিতে সমর্থ হই। ফলে এই অত্যাশ্চর্য্য রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থনিচয়ের অণুমধ্যস্থিত পরমাণুসমূহ কিভাবে সজ্জিত থাকে তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। জড়বিজ্ঞানে পরমাণুসমূহের অবস্থান সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান যে বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও কার্য্যকরী তাহা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন পদার্থের গুণাবলীনির্ণয়ে উহা বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কোন্ পদার্থ স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ হইবে, তড়িৎপ্রবাহ বহন করিবার ক্ষমতাই বা কাহার কিরূপ, কোন্ পদার্থ কিরূপ কঠিন বা কতটা শক্তিসম্পন্ন হইবে পদার্থমধ্যস্থিত পরমাণুর অবস্থান দেখিয়া বর্ত্তমানে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর। হীরক ও গ্র্যাফাইটের গুণাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে একই অঙ্গার হইতে গঠিত হইলেও উহাদের পরমাণুর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এই কারণেই উভয়ের গুণাবলীতে এরূপ পার্থক্যের উদ্ভব। বর্ত্তমান যুগে এক্স-রের সাহায্যে জৈব ও অজৈব এরূপ বহু পদার্থের গঠনভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। বিভিন্ন পদার্থে পরমাণুসমূহের অবস্থানে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাহা বলাই বহুল্য। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু পদার্থবিশেষের বাহিরের রূপ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তাহার সংগঠনকারী প্রতি পরমাণুটি কিরূপ ভঙ্গীতে তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে, তাহার বিশেষ অবস্থান কিরূপ তাহা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আজ বৈজ্ঞানিকগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পদার্থসমূহের অণুমধ্যস্থিত পরমাণুর অবস্থান সম্পর্কে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে, সে সম্পর্কে স্যার উইলিয়ম ব্র্যাগ্-এর (Sir William Bragg) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের নানাবিধ গবেষণার ফলেই আজ পরমাণুর গঠনের ন্যায় অণুমধ্যস্থিত পরমাণুর সংস্থান সম্পর্কেও আমরা নানারূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পদার্থবিশেষের বাহিরের রূপের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে আজ তাহার আভ্যন্তরীণ রূপও স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অণুর গঠনভঙ্গী (molecule patterns) আজ তাহার নিকট ছবির মত সুস্পষ্ট। অণু ও পরমাণুর গঠন সম্পর্কে উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও জড়বিজ্ঞানে যে যুগান্তকারী মতবাদ ইদানীং আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের পরলোকগত মহামান্য সম্রাটের রাজত্বকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ নিউটনপ্রবর্ত্তিত সাধারণ মতবাদের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু ১৯১৫ সালে

বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁহার যুগান্তকারী সাম্যবাদ প্রচার করিয়া বিজ্ঞানজগতে এক বিস্ময়কর আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার এই সাম্যতত্ত্ব সহজে বোধগম্য না হইলেও প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা যেভাবে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে আমরা এই মতবাদকে দুঃসাহসিক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। নিউটনের মতবাদের মধ্যে একাধিক স্বীকার্য্য (postulates) ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁহার মতবাদে শুধু একটি মাত্র দেশ-কাল ('space-time') absolute আছে বলিয়া মত পোষণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে নিউটনপ্রবর্ত্তিত "মাধ্যাকর্ষণের" কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আইনষ্টাইনের মতানুসারে উহা কোন বল বা শক্তি নহে, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সসীম বিস্তৃতির (space-time continuum) একটি বিশেষ গুণ মাত্র। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে দূরদিগন্তস্থিত নীহারিকাসমূহ আমাদের নিকট হইতে ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, উহাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকের নিকট হইতে দূরে যাইতেছে এবং প্রত্যেকটির বেগও তাহার দূরত্ব অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। মনে হয় এইগুলি পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটিয়া যাইতেছে এবং ব্যবধানের অনুপাতে উহাদের গতিবেগও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অতীব রহস্যময় গতি নিউটনপ্রবর্ত্তিত জড়বিজ্ঞানের নিয়মবিরোধী। বরং জড়-আকর্ষণের ফলে ইহাদের পরস্পরের নিকট হইতে নিকটতর হইবার কথা। আইনষ্টাইনের নূতন সাম্যতত্ত্ব এই রহস্যের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার মতে ব্রহ্মাণ্ড অসীম নহে, মহাকাশের বিস্তৃতি প্রকাণ্ড হইলেও উহার সীমা রহিয়াছে। আইনষ্টাইন তাঁহার মতবাদের দ্বারা আলোকরেখার বক্রীভবন অথবা গ্রহ-উপগ্রহের বক্রপথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এগুলি আইনষ্টাইনের মতবাদ নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। যদি তাঁহার প্রচলিত এই সাম্যতত্ত্ব অনুযায়ী গণনা সত্য হয়, তবে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে আমরা চতুর্দ্দিকে যে মহাকাশ দেখিতে পাই তাহা সসীম কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান। সম্ভবতঃ কোন সুদূর অতীতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিশ্চল এক পদার্থ ছিল। পরে কোন নৈসর্গিক কারণে উহা স্ফীত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া ঘন-আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভাবেই হয় তো প্রলয়ের শেষ দিন অবধি চলিতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন ব্রহ্মাণ্ড ইতোমধ্যেই তাহার উচ্চ শক্তিসমন্বিত অবস্থা হইতে ক্রমে নামিয়া আসিতেছে—তাহার ব্যবহারযোগ্য শক্তিও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান ইতোমধ্যেই এবিষয়ে যে তথ্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ধ্বংস রহস্য ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই যুগের বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গপ্রবর্ত্তিত 'অনিশ্চয়তা সূত্র' (Principle of Indeterminacy) বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সাধারণ অবস্থায় জড়জগতে কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা শক্ত নহে। কোন্ কার্য্যের ফল কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু আণবিক জগতে দেখা গিয়াছে কোন এক বিশেষ অবস্থায় বস্তুকণার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা চলে না। গবেষণাগারের সকল প্রকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি লাপ্লাস বা আইনষ্টাইনের ন্যায় মস্তিষ্কবিশিষ্ট হইয়াও দেখিতে পাইবেন, কোন বস্তুকণার পরবর্ত্তী অবস্থান সম্পর্কে তিনি কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। ইহার মূল কারণ এই যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া কেহ প্রকৃতির কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যথাসাধ্য নিপুণতার সহিত পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, পরবর্ত্তী বিশেষ কোন এক মুহূর্ত্তে কোনও বস্তুকণার অবস্থান কিংবা তাহার গতিবেগ ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। সকল সময়েই কোনও বিশেষ অবস্থায় বস্তুকণার গতিবেগ কি হইবে সে সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিদ্যমান থাকে। উহার অবস্থান ঠিকভাবে নির্ণয় করিতে গেলে হয় তো গতিবেগ যথাযথ নির্ণীত হইবে না, আবার গতিবেগ যথাযথ নির্ণয় করিতে গেলে বস্তুকণার অবস্থান যথাযথভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে না। একটিকে যতই সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হইবে, অপরটিতে ততই ভ্রম দেখা দিবে। পরীক্ষাকার্য্যের এই 'অনিশ্চয়তা' অনেকাংশে হ্রাস করিতে পারিলেও উহাকে একেবারে দূর করা সম্ভবপর হয় না। হাইসেনবার্গ-আবিষ্কৃত এই অনিশ্চয়তা সূত্র মানব-মনীষার এক বিচিত্র নিদর্শন। কারণ এই সূত্র এক দিকে যেমন অনিশ্চয়তার সীমা-গণনা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি কোন কোন বিষয়ে মানবের জ্ঞানের সীমাও নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়া মনে হয়। এ যেন বলিতে চাহিতেছে, "So far shalt thou go and no farther."

বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞানের উন্নতিমূলক কয়েকটি বিষয় উপরে বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত এযুগে আরও কয়েকটি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আইসোটোপ্ বা একই রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপে অবস্থান এই যুগের আর এক অভিনব আবিষ্কার। হাইড্রোজেন মৌলিক পদার্থটির ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিভিন্ন আইসোটোপ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাসায়নিক সংগঠনে ইহাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই, তবে জড়প্রকৃতিতে ইহাদের বিভিন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই যুগের আর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার—কস্‌মিক-রে বা বিশ্বরশ্মি। সৌরজগতের বহির্ভাগ হইতে এই অদৃশ্য রশ্মি আসিয়া আমাদিগের উপর আপতিত হইতেছে। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিচিত অপরাপর রশ্মিসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হইতে বহু বহু গুণ ক্ষুদ্র। এক্স-রের আবিষ্কার যেমন বিজ্ঞানের নানাদিকে অদৃশ্য বস্তুর

সন্ধান দিয়াছে, বিশ্বরশ্মির আবিষ্কারও তেমনি নব নব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই।

এই যুগে জড়বিজ্ঞানে যে একটি নূতন মতবাদ আবার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই মতবাদকে আমরা জড়পদার্থের তরঙ্গবাদ (wave-theory of matter) বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক ডি ব্রগ্‌লি (De Broglie) এই মতের প্রচারক। তাঁহার মতে প্রত্যেক জড় পদার্থকণার সহিত তরঙ্গবিশেষের ধারা (wave-process) যুক্ত রহিয়াছে—এই তরঙ্গ ও পদার্থকণা মিলিয়াই সম্পূর্ণ পদার্থের সত্তা। ইতোমধ্যেই আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডেভিসন (Davison) ও গারমার (Germer) পদার্থের সহিত যুক্ত এইরূপ তরঙ্গ আলোকচিত্রে প্রতিফলিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। এই মতবাদ এখনও তেমন প্রসার লাভ না করিলেও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ইহা যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারার কথা বাদ দিলেও বর্ত্তমান যুগে মানুষের প্রয়োজনানুসারে যেভাবে উহাদিগকে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই যুগ বিগত শতাব্দীকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। মানবের ইতিহাসে এই সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যেরূপ অভিনব তেমনি আশ্চর্য্যজনক। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ বিজ্ঞানের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে। বেতার ও দূরদর্শন আজ দূরকে নিকটে আনিয়াছে, মটর ও বিমানপোত দিগন্তের পথ মুহূর্ত্তে অতিবাহিত করিতেছে, সুবিশাল অর্ণবযান নির্ব্বিঘ্নে দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া দেশদেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিজ্ঞানের কাছে প্রকৃতি আজ পদে পদে পরাজিতা হইতেছেন, বিজ্ঞানের বিজয় রথ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ধাতু-শিল্পের অভ্যুদয়

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"With the discovery of metals, and notably the application of copper and its alloys in Neolithic times, we have one of the great turning-points, if not the greatest, in the history of human development, the first-birth of the germs of that civilization and culture to which we have attained at the present day."

William Gowland (1912).

অধ্যাপক লেথবীর (Prof. Lethaby) মতে স্থাপত্যশিল্প হইতেই সভ্যতার জন্ম। তিনি বলেন, "সৌধ-শিল্পের জ্ঞান কেবল অট্টালিকানির্ম্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না ইহার অভ্যুদয়ে বিরাট বিরাট নগরীর সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশগঠন ও তাহার সৌন্দর্য্যবিধানের কার্য্যেও এই জ্ঞান বড় কম কার্য্যকরী হয় নাই। মিশর, গ্রীস্ এবং ইতালী প্রভৃতি দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে বহু সুসজ্জিত নগরনগরীতে পরিপূর্ণ হইয়া, পরন্তু মানুষের বসবাসহীন শূন্য ভূখণ্ডরূপে নহে।" কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ কাষ্ঠ ও প্রস্তর কাটিবার উপযুক্ত ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, ততদিন তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তিগঠন সম্ভবপর হয় নাই। আগে তাহাদের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া ছুতরমিস্ত্রী ও প্রস্তরের কার্য্যের নিমিত্ত রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিকে শিল্পকলায় নিপুণ করিয়া লইতে হইয়াছে, তবেই পরে স্থাপত্যশিল্পের পত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। কেননা উহারাই হইল স্থাপত্যের প্রাথমিক আয়োজন। কালক্রমে ধাতুবিদ্যাবিৎ ধাতুসাহায্যে সভ্যজীবনোপযোগী বহু কলকব্জাও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, এবং সেই জ্ঞান আজ এত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে যে তাহার উন্নতির সীমানিরূপণ দুঃসাধ্য।

চাষ-বাসের সহিত ধাতুর আবিষ্কারের তেমন মুখ্য সম্বন্ধ অবশ্য কিছু নাই। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চাষ-আবাদের প্রচলনের ফলে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা সম্ভবপর হইয়াছে এবং এরূপ জীবনযাপন সম্ভবপর হওয়াতেই ধাতু আবিষ্কারের সৌভাগ্য মানব সহজে লাভ করিতে পারিয়াছে। সে যাহা হউক ভাগ্যক্রমে মানব দৈবাৎ ধাতুর সন্ধান না পাইলে সভ্যতার এরূপ উন্নতি হইতে পারিত কিনা সন্দেহস্থল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০ অব্দে প্রথম ধাতু আবিষ্কৃত হয়; তদবধি সভ্যতার ভিত্তিগঠনে ধাতুই অধিকাংশ অভাব পূর্ণ করিয়াছে। নদীর প্রতি-

দেবত্ব আরোপণ—অবস্থাভেদে কখন কখনও তাহার সুজাভাপ্রাপ্তি তাম্র আবিষ্কারের পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ধাতুর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণই মানুষের ব্যবহারে আসিয়াছিল দেখা যায়। গ্রীক্ কবিগণের কাব্য গ্রন্থাদিতেও মানবেতিহাসের এই স্বর্ণব্যবহার কালের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। তৎপর অধিকতর কঠিন ধাতুসমূহের প্রচলনের ফলে এবং দলবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খল যুদ্ধবিগ্রহের আবির্ভাবের সহিত স্বর্ণের ব্যবহার অনেকটা কমিয়া যায়, কারণ তখন বর্ত্তলৌহ বা কাংস্য (alloy of copper and tin) এবং লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বেশী হইতে থাকে।

স্বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই নরনারীগণ শুক্তি বা ঝিনুক, জীবজন্তুর দাঁত, মৎস্যমেরুদণ্ডের পর্ব্ব এবং রক্তবর্ণ সীসমণি জাতীয় পদার্থের দানা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত কণ্ঠহার, কঙ্কণ এবং মেখলা প্রভৃতি দেহাভরণ পরিধান করিত। তাহারা এইগুলি রসজ্ঞানের দিক্ হইতে সুরুচিসম্মত বলিয়া বাছিয়া লয় নাই, পরন্তু তাহাদের বিশ্বাস ছিল এই সকল সামগ্রী দেহে ধারণ করিলে এক অপূর্ব্ব যাদুপ্রভাব তাহাদের উপর বিস্তারলাভ করিবে, ফলে পরিধানকারীর জীবনরক্ষার পক্ষে ও তাহার শক্তিসামর্থ্যবর্দ্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। শুক্তি ও সীসমণির দানা প্রাণদাতারূপে বা একটু বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে মৃত্যুনিবারক বলিয়া বিবেচিত হইত। হিংস্র পশুর দাঁত উহার পরিধানকারীকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে বলিয়া তাহারা মনে করিত, কারণ ঐসকল দাঁতের অধিকারী পশু নানাপ্রকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ধারণ করে। মাছের মেরুদণ্ডের পর্ব্বগুলিকে শক্তি এবং দৃঢ়তার প্রতীক বলিয়া মনে করা হইত এবং ধারণা ছিল মেরুদণ্ডের সাহায্যে যেমন মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে ঐগুলিও তেমনি মানবের ঋজুত্বদানে সমর্থ। কিন্তু স্বর্ণের আবির্ভাবে তদ্দ্বারা প্রাণসঞ্চারী শুক্তির আকারে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সকল বস্তুর লঘুত্ব ও অতুল সৌন্দর্য্যে তৎকালীন মানব বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ইহাদিগকে স্বর্গচ্যুত অক্ষয় ও পবিত্র সামগ্রী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। প্রথমে যাদুপ্রভাবযুক্ত বলিয়া ইহাদের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও স্বর্ণ দ্বারা নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুতের প্রতি যে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাও প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইতে চলিল।

আর একটি কারণে মানব স্বর্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। নিতান্ত খেয়াল বশে (অর্থাৎ কোনপ্রকার তুলনামূলক ভিত্তির উপর নহে) ইহার যে উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহার ফলে লোকের নিকট ইহা ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের চিহ্নস্বরূপে সম্মাননা লাভ করে;—মুদ্রামূলের মানরূপে ব্যবহৃত হইবারও বহু পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছে। ধাতুর প্রতি নৈসর্গিক মূল্য আরোপিত হওয়ায় এবং ইহাকে জীবনসংরক্ষণশক্তির

মূলাধার জ্ঞান করায় মানুষ মাত্রেরই এই পবিত্র পদার্থ লাভের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু কেবলমাত্র ইহা লাভ করিবার স্পৃহাই যদি মানবের বলবতী হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত কল্পিত যাদুশক্তি ব্যতীত অপর কোন প্রকার অভিনব মূল্যজ্ঞান যে ইহার পশ্চাতে নিহিত রহিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না। এইরূপেই শেষে পদমর্য্যাদার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমাজের মধ্যে স্বর্ণের আদানপ্রদান প্রচলিত হইয়াছে। দেবতাগণের অমর জীবনের সহিত স্বর্ণের তুলনা করা হইত। রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার গন্ধদ্রব্যপ্রলিপ্ত শবদেহের উপরে অজস্র স্বর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া হইত, যেন তিনি স্বর্গবাসিগণের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। কালক্রমে ইহার সেই যদৃচ্ছানির্দ্ধারিত মূল্য ও ধর্ম্মানুমোদিত সম্মন এতদুভয়ের সমন্বয় সাধিত হইয়া স্বর্ণ মুদ্রারূপে গণ্য হইতে লাগিল। কিন্তু কেবল যে মূল্যের মান হিসাবেই ইহার প্রচলন আরম্ভ হয় তাহা নহে, ইহার উচ্চ মূল্যের জন্য ব্যবসায়বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতিসাধনে ইহা সহায়ক হইয়াছে।

মিশর ও সুবিয়ার প্রাগ্‌রাজশাসন (predynastic) যুগের* সমাধিক্ষেত্রসমূহে সমুদ্রজ শুক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ঐগুলি লৌহিত সাগর হইতে আনীত শুক্তি, ভূমধ্যসাগরের নহে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী মরুভূমির মধ্য দিয়া লোহিত সাগর ও নাইল উপত্যকার মধ্যে সর্ব্বদাই যাতায়াত চলিত। বৎসরের পর বৎসর যাতায়াতের কালে সুবিয়া উপত্যকার যাত্রীগণ লক্ষ্য করিতে লাগিল যে তাহাদের পথের পার্শ্বে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে একপ্রকার অত্যুজ্জ্বল পীতবর্ণের ধাতু বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অষ্ট্রেলিয়া কিংবা পপুয়ার অসভ্যগণ স্বর্ণের যতটুকু মূল্য দান করে ঐ সকল যাত্রীর পূর্ব্বপুরুষগণও সেই বিক্ষিপ্ত সামগ্রীকে তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করে নাই। নাইল উপত্যকাবাসিগণের প্রয়োজনপূরণার্থ লোহিত সাগরজাত শুক্তি সরবরাহ করিবার নিমিত্তই বিশেষ করিয়া সুবিয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া যাতায়াত চলিত। এই সকল শুক্তির অধিকাংশ ব্যবহৃত হইত অঙ্গরাগের আধাররূপে। কড়ি ও শামুকের খোল ইতঃপূর্ব্বেই দৈবগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, জীবনরক্ষার ও জীবিতকাল দীর্ঘতর করিবার শক্তিসম্পন্ন কবচ বলিয়া উহারা বিবেচিত হইত।

অতি সুপ্রাচীনকাল হইতেই মানবজাতি সকল প্রকার শুক্তিকে প্রাণদানের মহৌষধ ও দৈবগুণবিশিষ্ট অমোঘ কবচ বলিয়া গণ্য করিত এবং তজ্জন্য দেশদেশান্তরে শুক্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত। উইলফোর্ড জ্যাক্‌সন্ এ সম্বন্ধে অসংখ্য হৃদয়গ্রাহী প্রামাণিক আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন।†

অতি পূর্ব্বেই নাইল উপত্যকায় মাটি বা প্রস্তরাদি দ্বারা শুক্তির আকারের কৃত্রিম

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ অব্দ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাল।

† Wilford Jackson, *Shells as Evidence of the Migration of Early Culture*.

দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রচলন হয়; শুধু মাটি বা প্রস্তর কেন, সম্ভবপর হইলে যাহা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যাইত তাহা দ্বারাই শুক্তি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইত। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, স্বভাবজাত শুক্তি-কবচের চাহিদা এত বেশী ছিল যে যে-পরিমাণ শুক্তি সংগৃহীত হইত তাহাতে প্রয়োজন মিটিত না, সুতরাং কৃত্রিম শুক্তিপ্রস্তুতের আবশ্যক হইয়া পড়িল। বিশ্বাস ছিল শুক্তির যাহা গুণ তাহা উহার নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা নির্ভর করে কেবল উহার বাহ্য আকারের উপর। কৃত্রিম শুক্তিনির্ম্মাণে যে সকল পদার্থ ব্যবহৃত হইত তাহার মধ্যে প্রাচ্য মরুভূমিতে সহজে নমনীয় যে ধাতু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া উল্লেখ আছে তাহারই ব্যবহার হইত বেশী। এইরূপে হৈম শুক্তি আবিষ্কৃত হইলে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লোকে ধাতুটির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া মানব স্বর্ণের কোনপ্রকার বস্তুগত মূল্য নির্দ্ধারণ করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতায়ই ইহা ধর্ম্মসম্মত স্বর্গীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎকালীন সভ্যতার আদর্শানুসারে ইহা ছিল দেবত্ব ও অমরত্বের উপাদান, সুতরাং বস্তুগত মূল্যনির্দ্ধারণের কথা তখন কাহারও মনে উদয়ই হইতে পারে নাই। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও মিশর, বেবিলোনিয়া, ক্রিট, আনাটোলা, গ্রীস্, ভারতবর্ষ, চীন, মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা এবং পেরু প্রভৃতি সকল দেশেই স্বর্ণের প্রতি যে একটা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা গুণ সমভাবে আরোপিত হইয়াছে তাহা হইতে সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য প্রতিভাত হয়। স্বর্ণের প্রতি এই গুণারোপ হইতে তৎকালীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য প্রতিপন্ন হয় এবং সংস্কৃতির সম্পদ যে পৃথিবীময় বিকীরিত হইয়াছে তাহাও প্রমাণিত করিবার সাহায্য করে।

এক্ষণে তাম্র ধাতুর ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। উত্তর-মিশরের সমাধি-স্থানগুলিতে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে তাম্র অন্যতম এবং তাম্রব্যবহারের ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে অধ্যাপক জর্জ্জ এ, রাইজ্নারের মতানুসারে প্রাগ্‌রাজশাসন যুগের মধ্যভাগে তাম্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক রাইজ্নার এ সম্পর্কে যে সময়ের নির্দ্দেশ করেন তাহা সুমেরিয়াস্থ উর্ ও কিশে এবং এলামস্থ সুসায় সম্প্রতি যে সকল তাম্রনির্ম্মিত জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বহু শত শতাব্দী প্রাচীন সন্দেহ নাই। অনেকের মতে সুমেরিয়ায় প্রাপ্ত জিনিসগুলি খ্রীষ্টজন্মের ৩৫০০ বৎসর আগেকার। কিন্তু এই দাবী সপ্রমাণিত হয় না এবং বর্ত্তমানে যতটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গতও নহে। যাহা হউক, যদি ধরিয়াও লওয়া যায় সুমেরীয় দ্রব্যাদি খ্রীষ্টজন্মের ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার, তথাপি উহারা যে প্রাগ্‌রাজশাসন যুগের মিশরীয় তাম্রদ্রব্যের মত প্রাচীন নহে তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা চলে।

তাম্রের ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম মিশরে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবিসংবাদী সত্য এবং ইহার সমর্থনে ডাঃ রাইজ্নার বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। মিশরের প্রাগ্‌রাজশাসন যুগের সমাধিস্থানসমূহে মৃতদেহের সহিত এক টুকরা করিয়া মালেকাইট (malachite) এবং উহা ঘসিয়া লওয়ার উপযোগী একখানা পাথরের টালিনির্ম্মিত বর্ণপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা যে কেবল মুখানুলেপন হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হইত তাহা নহে, ইহা জীবনদানকর মহৌষধও বটে। প্রাগ্‌রাজশাসন যুগের তাম্র ধাতুর সহিত মিশরীয়গণের পরিচয় ঘটিবার বহুশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাহারা মালেকাইট ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। কিভাবে মিশরীয়গণ প্রথমে মিশ্র-ধাতু হইতে আসল ধাতুটি নিষ্কাশনের জ্ঞান অর্জ্জন করিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে,—দৈবাৎ হয় তো অনিচ্ছাকৃত কোন কারণে কিছুটা অঙ্গরাগ যাইয়া কয়লার আগুনে পড়ে, ফলে তাহা হইতে সোনার মত এক রকম পদার্থের দানা বাহির হয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির দৃষ্টি হয় তো এই দৈবক্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। তাহার বৈজ্ঞানিকসুলভ প্রতিভা ছিল, তাই দৈব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছামত অনুরূপ পদার্থপ্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনা স্বভাবতঃই তাহার অন্তরে জাগরিত হইয়া থাকিবে। এইরূপে কেবল মালেকাইট হইতে তাম্রনিষ্কাশনের উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই, সমস্ত ধাতুনিষ্কাশন প্রথাই কালক্রমে এইভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে প্রস্তর যুগের বিলোপ এবং ধাতু যুগের প্রবর্ত্তন ব্যতীত সম্ভবতঃ আরও অনেক বেশী উপকার সাধিত হইয়াছে। মালেকাইটের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ হইতে সোনার অনুরূপ এক প্রকার ধাতুনিষ্কাশন করা যাইতে পারে—এই সত্য যখন পরীক্ষিত ফল দ্বারা প্রমাণিত হইল, তখন মানুষের অন্তরে আবার এক নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল স্পর্শমণি সংগ্রহ করিতে পারিলে কিংবা কোনপ্রকার রসসিদ্ধি দ্বারা স্পর্শমণি প্রস্তুত করিয়া লইলে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ-নির্ম্মাণ সহজসাধ্য হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় পাঁচ হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইল। জীবনের মহৌষধ আবিষ্কার এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থকে অবিনশ্বরত্ব গুণবিশিষ্ট স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার অবিরাম চেষ্টার ফলে কালক্রমে রসায়নের জন্ম হইল, সঙ্গে সঙ্গে মানবের জীবনযাত্রার এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম্মাদির, এমন কি সভ্যতারও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহারা তাম্রনিষ্কাশন করিতে আরম্ভ করে, তাহারা শোধনচুল্লীর ধাতুমলের মধ্যে মৃৎপাত্রাদির বর্ণকের রহস্যোদ্ঘাটন (glazing) করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কাচ প্রস্তুত-প্রণালীর আবিষ্কারও তখনই ঘটে; কিন্তু বহু শতাব্দী পরে যখন চীনদেশে চীনামাটির পাত্রপ্রস্তুতের সূত্রপাত হয় তখন এই আবিষ্কারের ফল পরোক্ষভাবে কার্য্যকরী হইয়া প্রকাশ পাইল।

ধাতুনিষ্কাশন প্রথার আবিষ্কারের ফলে বহু সুফল সাধিত হইল। তাম্রের ব্যবহার সম্যক উপলব্ধি হওয়ায় এবং স্বর্ণে দৈবগুণ আরোপণের ফলে মানব উহাদের আবিষ্কারার্থ পর্য্যটন ও পরীক্ষণে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এইরূপে নবাবিষ্কার স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হইয়া লোক নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পৃথিবীময় বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন লোকের পরস্পরের মধ্যে অবাধ মিলামিশা চলিতে থাকিল। এই প্রকার মিলামিশার ফলেই মাত্র জ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং যাহারা স্বর্ণাদি খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত অথবা যে সকল কারিকর খনি হইতে বিভিন্ন দ্রব্য উত্তোলন ও নিষ্কাশনকার্য্যে নিরত থাকিত, তাহারাই সভ্যতাবিকীরণের অগ্রদূত বা পথপ্রদর্শক।

তাম্র-আবিষ্কার সম্বন্ধে পুনরায় একটু বিশদ আলোচনা করা যাক। খনিজ তাম্রধাতু প্রথমে স্বর্ণ যে যে স্থানে পাওয়া যাইত সেই সকল স্থান—অর্থাৎ নুবিয়ার অন্তর্গত ওয়াদি-আলাকী হইতেই উত্থিত হইতেছিল। এই খনিজ ধাতু নিষ্কাশন করিয়া যাহা পাওয়া যাইত, তাহা প্রথমে স্বর্ণের রূপান্তর বলিয়া তৎকালীন লোক মনে করিত এরূপ অনুমান হয়। এই নিষ্কাশিত ধাতু দ্বারা বন্ধনী (band) এবং অন্যান্য দেহালঙ্কার নির্ম্মিত হইত। এখন অবশ্য বহুযুগলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের নিকট গহনানির্ম্মাণ ব্যাপারটা অতি সহজসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তখনকার যুগে তাম্রের সাহায্যে ছুঁচ, বর্শা ও বাটালি প্রভৃতির নির্ম্মাণকৌশল আয়ত্ত করিতে বহু দিন কাটিয়া গেল। ধাতব বাটালি আবিষ্কৃত হওয়ায় কাঠের কার্য্য, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল। তথাপি যতদিন পর্য্যন্ত শবরক্ষা পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত ইচ্ছানুসারে কাঠ কাটিয়া কাঠে কাঠে জোড়া লাগানো এবং পাথর কাটিয়া ইচ্ছামত আকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেহ বোধ করে নাই। ক্রমশঃ সেই প্রয়োজনীয়তাবোধের ফলে পাহাড় কাটিয়া সমাধিপ্রস্তুত এবং প্রস্তর দ্বারা মন্দিরনির্ম্মাণের ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে স্থানলাভ করে।

প্রথমে সহজ-নমনীয় সোনার মত তাম্রের দ্বারাও নানাপ্রকার জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। হাতুড়ি দ্বারা পিটাইয়া নানারকম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত এবং অনেক সময় পাথরের জিনিসের ন্যায় খোদাইও করা হইত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তৎকালীন মানব আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে গলানো ধাতু গরম গরম চুল্লী হইতে নামাইয়া তৎক্ষণাৎ কোন গর্ত্তে বা তদনুরূপ কিছুতে ঢালিয়া দিলে যাহাতে ঢালা যায় তাহার আকার ধারণ করে। তখন হইতে তাহারা বিভিন্ন আকারের ছাচ ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং গলিত তাম্র ছাচে ঢালিয়া আবশ্যকমত নির্দ্দিষ্ট আকারের নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। ধাতু-ঢালাইয়ের প্রচলন হওয়ায় ধাতুদ্রব্য প্রস্তুতনৈপুণ্য এক বিশিষ্ট ও উন্নত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। ইহার প্রায় পনের শত বৎসর পরে

ধাতুজগতে আবার আর এক প্রবল বিবর্ত্তন ঘটে। এই সময়ে প্রথমতঃ তাম্র এবং টিনের মিশ্রণে কাংস্য বা ব্রোন্‌জ্ নামক এক নূতন মিশ্র ধাতুর আবিষ্কার হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ইহারও কিছুকাল পরে লৌহ ও ইস্পাতের সহিত মানবজাতির পরিচয় ঘটে।

তাম্র ও টিনবিমিশ্রিত ধাতুর প্রচলন হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই গ্রানাইট* ও ততোধিক কঠিন অন্যান্য পাথর কাটিবার নিমিত্ত ধাতুনির্ম্মিত হাতিয়ার ব্যবহৃত হইত। পীরামিড্ যুগে সমাধিমন্দির ও ভজনালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত পাথর কাটা হইত তামার বাটালি দিয়া। এই সমস্ত বাটালি এমন শক্ত করিয়া প্রস্তুত হইত এবং এমনভাবে পাঁন দেওয়া (temper) হইত যে কয়েকবার আঘাতেই উহাতে ইস্পাতের মত ধার উঠিত। এই জাতীয় বাটালি দিয়া চুনাপাথর, গ্রানাইট্ প্রভৃতি অনায়াসে কাটা চলিত। এই তাম্রযন্ত্র যে এত শক্ত ও ধারাল হইত তাহার কারণ খনিজ ধাতুশোধনের প্রক্রিয়াভেদে তাম্রের সহিত তাম্রের অক্‌সাইড (oxide) ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিয়া যাইত। বাটালিগুলিতে পান দেওয়া হইত এক অভিনব উপায়ে,—যে দিক ধারাল করিতে হইবে সেই দিকটা একটা বড় প্রস্তরখণ্ডের উপরে রাখিয়া আর একটি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাহাতে আঘাত করা হইত। যন্ত্রের কার্য্যকারিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করা আবশ্যক ছিল।

কাংস্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে এ কথা মনে হয় যে, এমন কোন স্থানে প্রথম ইহার আবিষ্কার হইয়া থাকিবে যেখানে টিন সহজ-প্রাপ্য ছিল। সেই টিন খনিজ তাম্রশোধন কালে তৎসহ চুল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া কোনক্রমে হয় তো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মিশ্র কাংস্য ধাতু উৎপন্ন করিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া সতর্কভাবে যাহারা এই শোধনকার্য্য সম্পন্ন করিত তাহারা সহজেই পদার্থটির কাঠিন্য অনুধাবন করিয়া ফেলিল। কালক্রমে পরে তাহারা ইচ্ছানুসারে ইহার প্রস্তুতকৌশল আয়ত্ত করে। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় উত্তর-পারস্যে মাসিদের কাছাকাছি কোথাও সম্ভবতঃ এই যুগান্তকর আবিষ্কার সংঘটিত হইয়া থাকিবে। †

অর্থনীতির দিক্ দিয়া যখন একবার লাভালাভের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইল, তখন টিন অন্বেষণের এক তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। টিনের অনুসন্ধানে বহু পর্য্যবেক্ষক ইতালী, স্পেন, ব্রিটন প্রভৃতি নানা দিকে বাহির হইয়া পড়িল এবং ঐ সকল দেশ হইতে ক্রিট্, মিশর, সিরিয়া ও ইজিয়ান্ প্রভৃতি স্থানে টিন লইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

* Granite (গ্রানাইট)—কোয়ার্টজ (কাচমণি), ফেলস্পার (স্ফটিকবৎ খনিজ পদার্থবিশেষ) এবং অভ্রসমন্বিত একপ্রকার দানাদার স্ফটিক প্রস্তর।

† In the article "Anthropology" in the 12th edition of the *Encyclopædia Britannica* (1922, p. 151) a summary has been given of the evidence that suggests the probability of the invention of bronze in Northern Persia at sometime between 2500 and 2000 B. C.

কিছুদিন পরে ধাতুবিদ্যার এই নবলব্ধ জ্ঞান সমস্ত য়ুরোপ ও পূর্ব্ব-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইয়া পড়ে। আরও কিছুকাল পরে আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে এই বিদ্যা প্রবেশলাভ করে।

কাংস্য যুগের আবির্ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে যে এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল তথ্য আমরা পাই তাহা হইতে অনুমান হয় কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ প্রান্তভাগে পূর্ব্ব-উপকূলস্থিত কোন স্থানে এক অজ্ঞাতনামা কারিকরের কর্ম্মকুশলতায় এই গুরুত্বপূর্ণ অভিনব আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেও দানাপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লৌহের ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাগ্‌রাজশাসন যুগে মিশরীয় ও সুমেরীয়-গণ অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় লৌহও কখন কখনও ব্যবহার করিত। কিন্তু নানা প্রকার মিশ্রিত খনিজ দ্রব্য হইতে লৌহনিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবন এবং উহার অত্যধিক কাঠিন্যগুণ আবিষ্কার করিতে আরও দুই হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এইস্থানে এ কথা উল্লেখ করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তুত-আঙ্খ-আমেনের (Tut-Ankh-Amen)* সমাধির ভিতর একটি লৌহনির্ম্মিত ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

খনিজ ধাতু হইতে লৌহনিষ্কাশনের প্রথা কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা নিরূপণের তেমন কোন সহজ পন্থা নাই। লৌহ যুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেও যে হেমেটাইট্ ও লৌহসংযুক্ত অন্যান্য কয়েকটি পদার্থ রং করিবার কার্য্যে এবং মৃৎপাত্রাদির বর্ণকরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু লৌহনিষ্কাশন প্রথা কোথায় এবং কখন যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। তবে খুব সম্ভবতঃ এশিয়া মাইনর অঞ্চলেই সর্ব্বপ্রথম প্রচুর লৌহ ব্যবহার প্রচলিত হয়। প্রারম্ভে হিত্তাইত্‌গণের † মধ্যেই লোহার হাতিয়ার প্রস্তুতের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অচিরেই ট্রয়, গ্রীস, সিরিয়া ও এসিরিয়া পর্য্যন্ত ইহা ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও এই সময়েই লৌহযন্ত্রাদি প্রস্তুতপ্রণালীর জ্ঞান বিকাশলাভ করে,—হায়দরাবাদের অফুরন্ত লৌহ খনি এবিষয়ে যথেষ্ট সৌকর্য্য-সাধন করিয়াছে। মিশরের বিরুদ্ধে হিত্তাইত্‌গণের অভিযানকালে ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাদের সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং বহু লোক তাহাদের মজুর খাটিতে থাকে। এই সময়েই ইহারা লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদির সহিত পরিচিত হয়। অতঃপর ইহারাই ইতালী ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরাঞ্চলে এই সকল অস্ত্র লইয়া যায়।

* খ্রীঃ পূঃ ১৩৫৩ অব্দ।

† "There is evidence that the Hittites were not a thoroughly homogeneous people and doubtless had been influenced by Proto-Nordics......... ......and possibly by drachycephals associated with Proto-Nordics."

Haddon, A. C., *The Races of Man* (1929), p. 96.

অস্ত্রশস্ত্রের জন্য লৌহের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপলব্ধি হইলেও য়ুরোপ অংশে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা তেমন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দে উত্তর-ইতালী ধাতুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও তথায় লৌহব্যবহারের কেবল সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। তারপর পরবর্ত্তী তিন-শত বৎসরে ডেন্যুবিয়া অঞ্চলে ও সুইজারলণ্ডে, পূর্ব্ব ফ্রান্সে ও দক্ষিণ জার্ম্মানীতে লৌহশিল্প ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের চারি শত বর্ষ পর্য্যন্তও সমগ্র য়ুরোপে লৌহের প্রচলন তেমন হয় নাই।*

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

পদার্থ (matter) তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্। আজকাল উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কারের পর পদার্থের এই প্রকার-ভেদ একটু বদলাইয়া বলা চলে, পদার্থ দুই প্রকার—চেতন (living) ও অচেতন (non-living)। চেতন পদার্থকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—উদ্ভিদ্ (vegetables) এবং জীবজন্তু (animals); আর অচেতন খনিজ পদার্থ (minerals)। চেতন ও অচেতন পদার্থকে আবার জৈব (organic) ও অজৈব (inorganic) হিসাবেও পৃথক করা যায়।

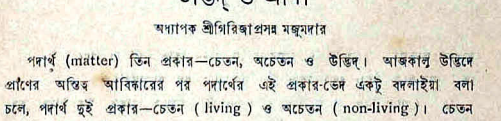

আমাদের আলোচ্য বিষয় চেতন পদার্থ। আমরা উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুকে প্রাণি-পর্য্যায়ে অভিহিত করিব। মানুষ-গরু-ভেড়াকে আম-জাম-লিচু গাছ হইতে সহজেই পৃথক করা যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে তাহা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা মানুষ-গরু-ভেড়াকে জীবপর্য্যায়ে এবং আম-জাম-লিচুকে উদ্ভিদ্পর্য্যায়ে ফেলি। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পর্য্যায়ের উচ্চাঙ্গের

* G. Elliot Smith প্রণীত *In the Beginning* নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়।

প্রাণী। ইহাদিগকে চোখে দেখিয়াই কে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা বলিয়া দিতে পারা যায়; কিন্তু যখন একটী প্রবাল (coral) ও প্রবালের মত সামুদ্রিক গাছ, একটী ফ্লাস্ট্রা (flustra) এবং একটী প্যাডিনা (padina), একটী আমিবা (amœba) এবং একটী মিক্সোমাইসিটি (myxomycete) তুলনা করি, নির্দ্দেশ না করিয়া দিলে সাধারণ লোকে কোন্‌টী কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা চোখে দেখিয়া বলিতে পারিবে না। জীবাণুকে (bacteria) কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা হইবে তাহা লইয়া মতদ্বৈধ এখনও আছে। ইহারা প্রত্যেকেই প্রাণী ও উদ্ভিজ্জগতের অতি নিম্নস্তরের প্রাণী। অনেকে এই রকম "না-উদ্ভিদ না-জীব" প্রাণীকে প্রটিস্ট্য (Protista) বলিয়া একটী নূতন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, ইহারাই পৃথিবীর আদি জীবের স্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

আমরা পৃথিবীর জন্মকথা আলোচনা করিয়া জানিতে পারি ইহা প্রথম অবস্থায় একটী অগ্নিপিণ্ড ছিল। তারপর ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে জীবের বাস ছিল একেবারেই অসম্ভব। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভবপর হইল? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আজও দেওয়া যায় নাই, তবে দুই একজন পণ্ডিত ইহার একটা মোটামুটি উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে লোকে মনে করিত ভগবান প্রত্যেকটী প্রাণীকে পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ডারুইনপ্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পরে এ কথা কতকগুলি গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণী ও অশিক্ষিত লোকজন ভিন্ন অপর কেহ মানিয়া লইতে চাহে না। লর্ড কেল্‌ভিন (Kelvin) মনে করেন উল্কাপিণ্ডের সহিত অন্য গ্রহ হইতে আদিম জীব আমাদের গ্রহে আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ মতও কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। কাজেই পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাবের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জৈব ও অজৈব পদার্থকে পৃথক মনে করা হইত। ইহাদিগের মধ্যে যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখন প্রমাণিত হইয়াছে অজৈব পদার্থ (inorganic matter) হইতে জৈব পদার্থ (organic matter) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রাসায়নিকের গবেষণাগারে এই রকম পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে। রাসায়নিক মনে করেন এমন দিন আসিবে যখন তিনি তাঁহার গবেষণাগারে নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিতে পারিবেন, হয় তো বা নূতন প্রাণীর সৃষ্টিও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। সুতরাং কেহ কেহ মনে করেন আদিম জীবের উদ্ভবের সময় পৃথিবীর আবহাওয়ার অবস্থা যে রকম ছিল, সেই রকম আবহাওয়ার সমাবেশ করিতে পারিলেই অজৈব পদার্থ জৈব পদার্থে পরিণত হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। সে রকম আবহাওয়ার সমাবেশ হয় না, কিংবা করিতে পারা যায় না বলিয়া অজৈব পদার্থ হইতে নূতন প্রাণীর উদ্ভব এখনও সম্ভবপর হয় নাই।

যে প্রকারেই উদ্ভব হউক পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী ছিল অতি সরল গঠন, আজকালকার 'প্রটিস্ট্য'র মত। তারপর কালের প্রবাহে ও ক্রমবিকাশের ফলে সেই আদিম জীব বহুতে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়া নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান গাছপালা ও জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে।

পুরুষানুক্রম বা উত্তরাধিকার, পরিবৃত্তি বা ব্যত্যয় (variation), পারিপার্শ্বিকের উপযোগিতাসাধন এবং জীবনসংগ্রাম প্রভৃতি জীবনধারার ভিতর দিয়াই আদিম প্রাণীর বর্ত্তমান পরিণতি সম্ভবপর হইয়াছে। যে মত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে বিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution) বলে।

পৃথিবীতে প্রাণীর আগমন বা উদ্ভব আমরা স্বীকার করিয়া লইব। আমরা দেখি প্রাণী হইতেই প্রাণীর জন্ম হয়, এবং ডারুইন প্রমাণ করিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীকে কতকগুলি ঘটনার সংযোগে নূতন প্রকারের প্রাণীতে পরিণত করা যায়। সুতরাং আদিম প্রাণী পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীতে পরিণত হইলেও আদিম প্রাণীর আবির্ভাব অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি প্রাণীর এই 'প্রাণিত্ব' বা 'প্রাণ' কি?

প্রাণ যে কি তাহা কেহই বলিতে পারে না। কাহার প্রাণ আছে আমরা কেবল তাহাই বলিতে পারি। প্রাণ বলিতে প্রাণীর কতকগুলি কার্য্যের কথা আমাদের মনে আসে, যেমন খাওয়া-দাওয়া, নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, সন্তানের জন্ম দিয়া বংশ রক্ষা ও বিস্তার করা প্রভৃতি। যাহারা প্রাণী তাহাদের প্রত্যেকের একটী করিয়া শরীর বা দেহ থাকে, উচ্চস্তরের প্রাণীর এই দেহ আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিংবা নানা ইন্দ্রিয়ে বিভক্ত।

প্রাণীর শরীরকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাইবে ইটের পর ইট সাজাইয়া যেমন আমাদের বাস করিবার ঘর প্রস্তুত হয় তেমনি প্রাণের ঘর অর্থাৎ প্রাণীর দেহ কোষের (cell) পর কোষ সাজাইয়া নির্ম্মিত। ইট যেমন আমাদের বাসঘরের একক (unit), কোষ তেমনি প্রাণিদেহের একক (unit structure)। প্রাণীর প্রকারভেদে কাহারও দেহ মাত্র একটী কোষ দিয়া প্রস্তুত (unicellular), আবার কাহারও দেহ বা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কোষ দিয়া (multicellular) প্রস্তুত হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন এই যে 'প্রাণ' কি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়? মানুষকে ভূতে-ধরার গল্প আমরা অনেকেই শুনিয়া থাকি। ভূতের শরীর কেহ দেখিতে পায় না, সে অশরীরী। কিন্তু সে যখন কোন মানুষকে আশ্রয় করে তখন সেই মানুষের কার্য্য দ্বারা ঠিক পাওয়া যায় তাহাকে ভূতে ধরিয়াছে কি না, তেমনি অশরীরী প্রাণ যখন প্রাণীর দেহ আশ্রয় করে তখনই প্রাণের কার্য্য প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রাণ দেহের কোন্ অংশ আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে? আমরা যদি শরীরের উপাদানীভূত একটী জীবন্ত কোষ

(living cell) লইয়া পরীক্ষা করি তবে দেখিতে পাই প্রত্যেক কোষটী জেলি কিংবা ম্লিসারিণ-এর মত চট্‌চটে ভিমের শ্বেতাংশের ন্যায় (albuminoid) একটু পদার্থের সমষ্টি মাত্র। কোন কোন কোষের এই পদার্থ একটী প্রাচীর বা আবেষ্টনী (cell-wall) দ্বারা বেষ্টিত, কাহারও বা এই বেষ্টনী থাকে না। এই albuminoid বা প্রতিদ (proteid) বস্তু আশ্রয় করিয়াই প্রাণ অবস্থান করে। আর এইজন্যই পণ্ডিতপ্রবর হাক্সলি ইহাকে প্রাণের বস্তুতাত্ত্বিক সত্তা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে প্রাণবস্তু বা প্রটোপ্লাজম বলা হয়।

এই প্রাণবস্তু প্রাণহীন বস্তু হইতে নানা প্রকারে পৃথক। এই পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারি—

(১) ইহার রাসায়নিক উপাদান, (২) ইহার প্রতিক্রিয়ার শক্তি (irritability), (৩) ইহার চলিবার শক্তি (movement), (৪) ইহার খাদ্য প্রস্তুত ও জীর্ণ করিবার শক্তি, (৫) শরীরবিকাশ ও বৃদ্ধির শক্তি, (৬) শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি, (৭) অপনয়ন দ্রব্যাদির নিষ্কাশন শক্তি এবং (৮) প্রজনন শক্তি। জীবিত অবস্থায় প্রটোপ্লাজমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। তবে মৃত অবস্থায় পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে জল ভিন্ন ইহার ভিতর প্রোটিন, শর্করা জাতীয় পদার্থ ও কিছু ধাতব লবণ (mineral salts) আছে। ইহার অন্যান্য শক্তি আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাণীর দেহ কোষ দ্বারা গঠিত। যেখানে প্রাণীর দেহ একটী মাত্র কোষ দ্বারা নির্ম্মিত সেখানে সেই একটী কোষই জীবনধারণের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু যেখানে দেহ বহু কোষের সমষ্টি সেখানে এই সমস্ত কার্য্যগুলি তাহারা ভাগ করিয়া করে। একটী সংসারে যদি মাত্র একটী প্রাণী থাকে তবে তাহাকে ধাবার সংগ্রহ করা, রান্না করা, পয়সা উপার্জ্জন করা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কার্য্য একাই করিতে হয়। কিন্তু যে সংসারে বহু প্রাণী সেখানে সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য এই সমস্ত কার্য্য পরস্পরের ভিতর ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আমরা দেখি বাড়ীতে কোন উৎসব উপস্থিত হইলে এবং উৎসবটী সৌষ্ঠবসহকারে সম্পন্ন করিতে হইলে সকলেরই উপর সকল কার্য্যের ভার না দিয়া কার্য্য ভাগ করিয়া দিলে তাহাতে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়া সমস্ত কার্য্যটী সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। তেমনি বহুকোষ প্রাণীর দেহের বিভিন্ন কোষসমষ্টির (tissues) উপর বিভিন্ন কার্য্যের ভার দেওয়া থাকে। কার্য্যের এই প্রকার বিলি-বন্দোবস্তকেই শ্রমবিভাগ অথবা কোষসমষ্টির অঙ্গোদ্ভব সম্বন্ধ বলে এবং দেহের কার্য্যাবলীর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তদুপযোগী হইতে হয়। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তখন আমরা ইন্দ্রিয় (organ) নামে অভিহিত করি, যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ইত্যাদি। আমরা পরের প্রবন্ধে পৃথিবীর আদি জীব হইতে কি প্রকারে প্রাণী ও উদ্ভিদে পৃথক হইয়া দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের সৃষ্টি হইল তাহার আলোচনা করিব।

বিবিধ

ভারতে 'বেতার' সমস্যা

ভারতে 'রেডিও-ব্রডকাষ্টিং'এর প্রচলন খুব বেশী দিন হয় নাই। তথাপি ইতোমধ্যেই যে উহা জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদরলাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিগত মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে 'ব্রডকাষ্টিং লাইসেন্স' ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া 'ব্রডকাষ্টিং' কার্য্যজনিত ব্যয়সঙ্কুলান হইয়াও গবর্ণমেণ্টের দুই লক্ষ টাকার অধিক আয় হইয়াছে। অবশ্য নবপ্রচলিত জিনিষটির প্রতি লোকের এখন যেরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, একবার নূতনত্বের ঝোঁক কাটিয়া গেলে লাইসেন্স গ্রহণকারীদের সংখ্যা কমিলেও কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহাতে ইহা দিন দিন আরও অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে, তজ্জন্য বেতার প্রোগ্রামের অদলবদল করিয়া নব নব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতঃ 'ব্রডকাষ্টিং সার্ভিসে'র উন্নতিসাধন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতে বেতার লোকশিক্ষার প্রধান সহায়। এরূপ একটি জনহিতকর বিষয়ের প্রতি সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। ভারতের অগণিত জনসাধারণ কিভাবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বেতার কিরূপে প্রতিগৃহে শিক্ষার বাণী পৌছাইয়া দিতে পারে, বেতারের ব্যাপক প্রবর্ত্তনের পক্ষে কি কি বাধা বিদ্যমান—এই সকল বিষয় তদন্ত করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত সরকার ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মিঃ এইচ, এল, কার্কেক (Mr. H. L. Kirke) নিযুক্ত করেন। কয়েক মাস ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মিঃ কার্কে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কয়েকটি প্রদেশে তত্রত্য লোকদিগের রুচি ও ভাষানুযায়ী কার্য্য চালাইবার প্রস্তাবসহ আটটি নূতন মাঝারি আকারের তরঙ্গপ্রেরক ষ্টেশন স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। রাজধানী দিল্লী নগরীতে ১৫০ হইতে ৫০০ কিলোওয়াট পরিমাণের একটি কেন্দ্রীয় বেতার ষ্টেশন এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য পরীক্ষামূলক আরও একটি ষ্টেশনস্থাপন সম্পর্কে তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয়গণ যাহাতে অল্পমূল্যে রেডিও-গ্রাহকযন্ত্র কিনিতে পারেন, তৎপ্রতিও তিনি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। কার্কের মতানুসারে কাজ হইলে এবং ৫০০ কিলোওয়াটের একটি কেন্দ্রীয় ষ্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা হইলে উহা যে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী তরঙ্গপ্রেরক কেন্দ্র হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যন্ত্রপাতি ও আধুনিক ধরণের বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন, তৎপূর্ব্বে ভারতে বেতারের বহুল প্রসারের পক্ষে যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত এরূপ দেশব্যাপী বৃহৎ ব্যাপারের সম্যক অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ ব্রডকাষ্টিং সার্ভিসের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান লিস্‌নার' (Indian Listner) সম্প্রতি এক প্রবন্ধে ভারতে বেতার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ত্রিবিধ সমস্যার দিকে দেশের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তরঙ্গের বিভিন্ন কম্পনসংখ্যার উপর আবহাওয়ার প্রভাব কিরূপ, দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্রতরঙ্গ ব্যবহার উপযোগী কিনা এবং তৃতীয়তঃ পৃথিবীর তরঙ্গপরিচালন ক্ষমতা কি পরিমাণ,—বেতারের ব্যাপক প্রচলনের জন্য এই সমস্যাত্রয়টির সমাধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আবহাওয়া রেডিও-তরঙ্গের উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে সে বিষয়ে সকলেই একমত। এখন কিরূপ তরঙ্গ কিভাবের আবহাওয়ার দরুণ কতটা বাধাপ্রাপ্ত হয় গবেষণার সাহায্যে সে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র কত দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে বা তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা কত কম হইলে কাম চলিতে পারিবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অর্থচ এই প্রয়োজনীয় তথ্য ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কমই সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণ দেশে এ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করা সুকঠিন সন্দেহ নাই, তবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিকগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা থাকিলে একার্য্য একেবারেই অসম্ভব বলা চলে না। বিগত ৫ই মে (১৯৩৬) ইংলণ্ডে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও রেডিও-গবেষকগণের যে সম্মিলিত বৈঠক হয় তাহাতে ভারতবর্ষে একটি রেডিও-গবেষণা-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ সমিতি-রেডিও সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া বেতারের প্রসারের পথে যে সমস্ত অসুবিধা বর্ত্তমান তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষও অচিরে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় এ বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে একদিকে বেতারের প্রসারে লোক নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবারও যেমন সুযোগ পাইবে, লোকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গ্রামসমূহেরও তেমনি উন্নতিসাধনের পথ প্রশস্ত হইবে।

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রনির্ম্মাণ

গ্যালেলিও কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে দূর দিগন্তস্থিত গ্রহনক্ষত্র-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভমানসে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সাধারণতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের (lens) ব্যাস যত অধিক হয়, উহার দৃষ্টির পরিধিও ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৬ ইঞ্চি

ব্যাসবিশিষ্ট লেন্সযুক্ত একটি দূরবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি ৩ ইঞ্চি ব্যাসের লেন্সযুক্ত যন্ত্রের প্রায় চতুর্গুণ হয়। এই কারণে কাচশিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর লেন্স প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার অভিনব প্রচেষ্টা এই যুগে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার লেন্সের ব্যাস ১০০" ইঞ্চি অতিক্রম করে নাই; এরূপ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার 'মাউণ্ট উইলসন সোলার অবজারভেটরী' বা সূর্য্য মানমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। মিঃ হকার নামে আমেরিকার একজন লক্ষপতি ব্যক্তি কার্ণেগি ইনষ্টিটিউসনে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন। এই অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উপরোক্ত মানমন্দিরে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে তাহাতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইতেও অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে নৈসর্গিক আকাশের আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত করা সম্ভবপর। এতদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকটি বিশিষ্ট গবেষণা পরিষদ সমবেতভাবে ২০০" ইঞ্চি ব্যাসের একটি বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুতের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এরূপ সুবৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণে সাধারণতঃ নির্ম্মাণকার্য্যের অসুবিধা বড় কম নহে। যে কাচ দ্বারা লেন্স প্রস্তুত হইবে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে তাহার ব্যাস ঠিক রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই নিমিত্ত যে সকল কাচ আয়তনে খুব বাড়ে বা কমে না অর্থাৎ যাহাদের co-efficient of expansion খুব কম, তাহাই এই ধরণের দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাইরেক্স (pyrex) নামে একপ্রকার কাচে এই সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান। বর্ত্তমানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রসমূহে পাইরেক্স কাচই ব্যবহৃত হইতেছে। ২০০" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সও এই কাচ হইতেই প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং বিগত ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা ঢালাই হইবার পর হইতে উহাকে ধীরে ধীরে শীতল করিবার (anneal) ব্যবস্থা হইয়াছে। লেন্সটি সম্পূর্ণরূপে ঠিক হইলে উহার উপরিভাগ এলুমিনিয়ম দ্বার আবৃত করিয়া উহাকে যথাস্থানে বসান হইবে। এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইলে উহাকে 'মাউণ্ট উইলসন সোলার অবজারভেটরী'তে না বসাইয়া পালোমার মাউণ্টে স্থাপিত করা হইবে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই বিরাট যন্ত্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইলে ইহার সাহায্যে আকাশস্থিত বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই বিরাট যন্ত্রের সহকারী হিসাবে আরও কয়েকটি ছোটখাট যন্ত্রও উহার সহিত সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহাতে উহার কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নব নব রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্র বহু দূর প্রসারিত করিয়া দিবে আশা করা যায়।

ইস্পাতের ভঙ্গুরতা

ইস্পাত ভাঙ্গিয়া যাইবার সময় তাহার আভ্যন্তরীণ গঠনাকৃতিতে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ডাঃ গাউ (Dr. Gough) নামে একজন পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ সম্প্রতি এক্স-রের সাহায্যে সে সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইস্পাতের প্রতি একঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ১০ লক্ষ হইতে ১০ কোটি পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাদার (crystal) বস্তুকণা রহিয়াছে। যখন বিশেষ কোন পরিমিত চাপ (stress) ইস্পাতের প্রতি প্রয়োগ করা হয় তখন প্রথমতঃ এই সূক্ষ্ম দানাগুলি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। পরে ইস্পাতটা যেমন ভাঙ্গিতে থাকে এগুলি একই আকারের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এই সমস্ত অংশ পরস্পর কোণাকুণি ভাবে অবস্থিত থাকে। এক একটি অংশ (fragment) আকারে এক ইঞ্চির একলক্ষ ভাগের একভাগ হইবে মাত্র। ইস্পাত ভাঙ্গিবার নিমিত্ত যেমন চাপ প্রযুক্ত হইতে থাকে, ইস্পাতমধ্যস্থিত দানাগুলি সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্তভাবে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অতঃপর অংশসমূহের সম্প্রসারণশীলতা বা বিততি (strain) নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পৌঁছিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

শব্দমান যন্ত্র

কিছুদিন হয় টেডিংটন ন্যাশনাল ফিজিকেল লেবরেটরীতে একটি অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত লেবরেটরীর সাধারণ সমিতি যখন বার্ষিক পরিদর্শনে আসেন সেই সময় উক্ত যন্ত্রটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যন্ত্রটি একটি কৃত্রিম কর্ণবিশেষ, দেখিতে সাধারণ একটা পোর্টেবল্ বেতার যন্ত্রের অনুরূপ। যন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে মানুষের কর্ণ যে সকল শব্দ গ্রহণ করিতে পারে উহার সাহায্যে শুধু তাহাই শুনিতে পারা যায়, মনুষ্যকর্ণের গ্রহণানুপযোগী অতি উচ্চগ্রামের অথবা অতি নিম্নগ্রামের শব্দ এই যন্ত্রে মোটেই শ্রুতিগোচর হয় না; ফলে উহাকে একটি শব্দমান যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিবার সুবিধা হইয়াছে। ব্রিটীশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ট্যুনিং (tuning) সিগ্‌নালের অনুরূপ বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রামের (pitch) শব্দের সহিত তুলনা করিয়া এই কৃত্রিম কর্ণটি অন্য শব্দ পরিমাপ করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত যন্ত্রটিকে নানা স্থানে লইয়া গিয়া ইতোমধ্যেই উহার সাহায্যে নানাবিধ শব্দ শুনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, শীঘ্রই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সম্মিলিত হইয়া শব্দের মান সম্পর্কে আলোচনা করতঃ শব্দপরিমাপক কোনরূপ একক বা 'ইউনিট' প্রচলনের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ ইউনিট প্রচলিত হইলে শব্দের গ্রাম আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট করা অসম্ভব হইবে না। ফলে যে সমস্ত শব্দ অশ্রীতিকর এবং মানবের স্বাস্থ্যহানিকর সেরূপ শব্দোৎপাদন বন্ধ করাও সম্ভবপর হইবে।

বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে গবেষণা

বিমানপোত প্রভৃতি চলিবার সময় উহার গাত্র ও পক্ষের উপর বায়ুপ্রবাহ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বিমানপূর্ত্তবিশারদগণ বর্ত্তমানে তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের বিমানবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষাগারসমূহে এই উদ্দেশ্যে নানা-প্রকার পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। কৃত্রিম উপায়ে ধোঁয়া উৎপন্ন করিয়া তাহার সাহায্যেই বায়ুপ্রবাহের ফটো ইত্যাদি এতাবৎকাল গৃহীত হইয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি টেডিংটন ন্যাশনাল ফিজিকেল লেবরেটরীতে বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য এক নূতন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। অতিবিস্তৃত (diffuse) ধোঁয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করা অপেক্ষা এই উপায়ে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। টেডিংটন লেবরেটরীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে মাঝে মাঝে উষ্ণ বায়ুস্রোত (hot air spots) উৎপন্ন করা হয়। এই উষ্ণ বায়ু তড়িতের সহিত পরিচালিত হইতে থাকিলে তাহার প্রতিফলিত ছবি ফটোযন্ত্রে তোলা হয়। সাধারণতঃ এরূপ বায়ুপ্রবাহের গতি খালি চোখে নিরূপণ করা যায়না। তন্নিমিত্ত দীরগতি চলচ্চিত্রের সহায়তায় চোখের সম্মুখে উহার প্রবাহ এরূপ মন্দীভূত করা হয়, যাহাতে উহার গতিপথের প্রত্যেক ভঙ্গীটি সহজে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। এই উপায়ে ফিল্‌ম হইতে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের বিভিন্ন স্থানে গতির পরিমাণ কিরূপ তাহাও নির্ণয় করা যায়। কোন বিমানপোতের বিভিন্ন অবস্থানে তাহার উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব কিরূপ এই উপায়ে তাহাও নিরূপণ সম্ভবপর। সুতরাং বিমানপোতের বিভিন্ন অংশে বায়ুপ্রবাহের কার্য্যকারিতা অবগত হইয়া তদনুসারে বিমানপোত নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, বিমানপোতের দেহ যত অমসৃণ হয় ততই উহাকে অধিকতর বায়ুপ্রতিরোধ করিয়া চলিতে হয়; ফলে বিমানের গতিবেগ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিমানপোতের পক্ষ এবং অন্যান্য অংশ যত মসৃণ হয়, উহার গতিবেগ ততই বৃদ্ধি পায়। ডানার কোনও স্থান এক ইঞ্চির চারি হাজার ভাগের একভাগ পরিমাণ উঁচু থাকিলেও ঘণ্টায় ২০০ হইতে ৩০০ মাইল বেগে ধাবিত বিমানপোতের শতকরা ৩০ ভাগ অধিকতর বাধা (resistance) অতিক্রম করিতে হয়। বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণে উহার বিভিন্ন দেহাংশ যাহাতে অধিকতর মসৃণ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মসৃণ গোল মস্তকবিশিষ্ট বহির্মুখে প্রসারিত কোন দণ্ড যত বাধা উৎপত্তি না করে, দেখা গিয়াছে আগাগোড়া সূক্ষ্ম অমসৃণ দেহ তদপেক্ষা অধিকতর বাধা উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং বিমানপোতনির্ম্মাণে বিমানপোতের পক্ষ ও অন্যান্য অংশ যাহাতে বিশেষভাবে মসৃণ হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক গৃহে কোলাহলনিবারণের উপায়

বর্ত্তমানে বহুতল গৃহ প্রায়ই নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়। একই বাড়ীর বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন প্রকারের লোক বিভিন্ন অংশে বাস করে। এক অংশের লোকদের চলাফেরা, গৃহকার্য্য প্রভৃতি কারণে যে কোলাহল (noise) উত্থিত হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অন্য অংশের বাসিন্দাগণের অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে মেঝের উপর ছুটাছুটি বা চলাচলের শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শব্দ অট্টালিকার গাঁথুনির ভিতর দিয়া অতি সহজেই বায়ুবাহিত শব্দ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত অন্য স্থানে পরিচালিত হইয়া থাকে। এমন কি যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দও অনেক সময় মেঝের সহিত যন্ত্রটির সংযোগ থাকায় সহজে পরিচালিত হইয়া অন্য অংশে বা ঘরে গিয়া পৌঁছে ও তথাকার লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। এইভাবে যাহাতে শব্দ পরিচালিত না হইতে পারে, তজ্জন্য অনেক দিন যাবৎ নানারূপ পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। গৃহের সাধারণ মেঝে হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে শব্দপ্রতিরোধক পদার্থের উপর স্থাপিত "ভাসমান মেঝে" (floating floor) প্রস্তুত করিবার প্রণালী কয়েক বৎসর হয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের অনেক গবেষণাগারে এই ধরণের উন্নত মেঝে প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রবার নির্ম্মিত প্যাডের উপর এইরূপ কৃত্রিম মেঝে স্থাপন করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, এইভাবে মেঝে প্রস্তুত করিলে কোলাহল বিশেষভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। রবার প্যাডের আয়তনের উপর শব্দের উচ্চতা ও গুণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। বিবিধ গবেষণার ফলে এই সম্পর্কে যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে এমন মেঝে ও ছাদ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে, যাহার ফলে একই বাড়ীর বিভিন্ন তলস্থ বাসিন্দাগণের কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। এরূপ কোলাহলনিবারক মেঝে বা ছাদ প্রস্তুত করিতে ব্যয়ও খুব অধিক পড়িবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং সাধারণ গৃহস্থগণও এই উপায় অবলম্বন করিয়া অপ্রীতিকর শব্দকোলাহলের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন।

বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ

বায়ুমণ্ডলস্থিত বিদ্যুৎ সম্পর্কে বর্ত্তমানে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আবহাওয়া ভাল থাকিলে ভূপৃষ্ঠ ঋণাত্মক বিদ্যুতে আচ্ছন্ন থাকে এবং উহার অব্যবহিত উপরিস্থিত বায়ু ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে 'কার্ণেগি' নামক চুম্বকবিহীন জাহাজ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উন্নিখিত তড়িৎযুক্ত অবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই সময়ে বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। ভূপৃষ্ঠের তড়িৎ সম্পর্কে বর্ত্তমানে ইহাই ধারণা করা

হয় যে, মাঝে মাঝে যে বৈদ্যুতিক ঝড় (thunder storms) উৎপন্ন হয়, তাহারই ফলে ভূপৃষ্ঠে ঋণাত্মক তড়িৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলে নিম্নস্তর হইতে উপরের স্তর প্রায় হাজার গুণ অধিক তড়িৎযুক্ত হইতে দেখা যায়। সূর্য্য হইতে নির্গত রশ্মিই যে বায়ুমণ্ডলে এই 'আয়ন'-উৎপাদনের (ionisation) কারণ তাহা জানা গিয়াছে। রেডিও পরীক্ষায় দেখা যায়, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি এইরূপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। বিদ্যুৎমণ্ডলের উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে আবার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নস্তরে বিদ্যুতের ঘনত্ব শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু উচ্চস্তরে গ্রীষ্মের সময়ে এরূপ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। অসামঞ্জস্যের কারণ এই বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে ১৫০ হইতে ২০০ মাইল উচ্চে সূর্য্যকিরণজনিত বায়ুমণ্ডলের তাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ফলে বায়ুর আয়তন বাড়িয়া যাওয়াতে বিদ্যুতের ঘনত্বের হ্রাস ঘটে। পরীক্ষায় যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বায়ুর ঐ স্তরে তাপের পরিমাণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে অন্ততঃপক্ষে ২০০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপাঙ্কের কম হইবে না বলিয়া অনুমিত হয়। বিদ্যুৎমণ্ডলে বিদ্যুতের ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি সূর্য্যের প্রভাবের উপর নির্ভর করে। প্রতি ১১ বৎসরে সূর্য্যের এক একটি 'পরিক্রম' (cycle) বলিয়া ধরা হয়। ১৯৩৩ সালের শেষভাগে সৌরশক্তি (solar activity) সর্ব্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। বর্ত্তমানে চুম্বক ও রেডিও পরীক্ষায় দেখা যায় উহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। দূরবর্ত্তী স্থানে রেডিও-তরঙ্গপ্রেরণে এই সকল জ্ঞান বিশেষ সৌকর্য্যসাধন করিবে।

প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ

পদার্থবিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম ব্রিগ বলেন যে, প্রকৃতির গঠনমূলে একটা 'সুনির্দ্দিষ্ট ধারা' বিদ্যমান এবং সেই ধারা আবিষ্কৃত হওয়াতেই আধুনিক বিজ্ঞানের এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। বাস্তবিক প্রকৃতির যাবতীয় ব্যাপারেই গঠনভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু লইয়া পদার্থ গঠিত—ডালটনের এই আবিষ্কারই আধুনিক রসায়নের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা যায় বিদ্যুতেরও নির্দ্দিষ্ট গঠন রহিয়াছে। ঋণাত্মক বিদ্যুতের অতিক্ষুদ্র অংশই 'ইলেকট্রন'। পদার্থ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে এই আবিষ্কার অন্য এক মতবাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছে। আজ শক্তিরও (energy) একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন রহিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা চলে। শক্তিসমূহও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পরিচালিত হয়, উহারই নাম 'কোয়াণ্টাম্'। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুকেও পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্টিগোচর করা যাইতে পারে। একটি মাত্র ইলেকট্রন বা কোয়াণ্টাম্‌কেও অনুরূপভাবে প্রদর্শন অসম্ভব নয়। গৃহের নক্সা প্রস্তুতকারক যেমন বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের নক্সা প্রস্তুত করে, আজ বিজ্ঞানের

সাহায্যে কোন্ পদার্থে কয়টি পরমাণু কিভাবে সজ্জিত হইয়া অণু গঠিত করিয়াছে তাহাও মানচিত্রের মতই অঙ্কিত করিয়া দেখান যায়। ছয়টি অঙ্গার বা কার্ব্বন পরমাণু কিভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া বেঞ্জিন অণু, নেপথালিনের 'ডবল রিং' বা এনথ্রাসিনের 'ট্রিবল্ রিং' প্রস্তুত করে তাহা আজ অনায়াসেই দেখা সম্ভবপর। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় অট্টালিকার গঠনের মত প্রকৃতিও তাঁহার সমস্ত গঠনে বিশেষ একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া থাকেন। যে কারণে আমরা প্রকৃতির এই বিশেষ ধারাটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি,—প্রতিপদবিক্ষেপে ব্যাহত হইয়াও তাহার গূঢ় রহস্যের সন্ধানে মনোযোগী হইয়াছি, সেই কারণেই বিজ্ঞানের উন্নতির পথ আজ সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

সর্পবিষ সংগ্রহের প্রণালী

বর্ত্তমানে সর্পবিষ লইয়া অনেক গবেষণা চলিতেছে। ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় সর্পবিষ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া জানা যায়। আমাদের দেশে ডাঃ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দমদমাতে সর্পবিষ লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষার নিমিত্ত সর্প হইতে কিভাবে বিষ সংগৃহীত হইয়া থাকে এসম্পর্কে অনেকের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণতঃ সাপ ধৃত হইবার পরক্ষণেই এবং তাহার পরেও মাঝে মাঝে উহার বিষ বাহির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ মাঝে মাঝে বিষ বাহির করা অথবা সর্পকে দোহন করার কারণ এই যে উহাতে সর্প কি অবস্থায় কিরূপ পরিমাণ বিষ উদ্গার করে, বিষ ঢালিতে উহার কতটা সময় লাগে, বিষ উদ্গারের ফলে উহার দেহের অবস্থা কিরূপ হয় ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। বিষসংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণতঃ একটি কাচনির্ম্মিত পাত্রের মুখ শক্ত করিয়া রবার দিয়া আটকানো থাকে। যে সাপটির বিষ সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহাকে এই রবারের উপর দংশন করিবার জন্য উত্তেজিত করা হয় এবং উদ্গীরিত বিষ রবারের ছিদ্রপথে কাচপাত্রে আসিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। সাপের মুখ হইতে নির্গত লালা বা অন্য কোন অপরিকৃত পদার্থ এই উপায়ে ঐ পাত্রে আসিতে পারে না। সুতরাং সংগৃহীত সর্পবিষ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সর্পবিষের অনেক সময় কোন রং থাকে না; আবার অনেক সময় গাঢ় অথবা পাতলা হল্দে বা ফিকে লাল (pink) রংয়েরও বিষ হয়। বিষের বর্ণে অবশ্য কিছু যায় আসে না, কারণ উহার বর্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বিশেষভাবে নির্ম্মিত পাত্রে এই বিষ উষ্ণ করিয়া লইলে উহা একপ্রকার দানাদার মত (pseudo-crystalline) পদার্থে পরিণত হয়। জল অথবা লবণাক্ত দ্রব্যে বিষ সহজেই গলিয়া যায় এবং এই অবস্থায় উহা গবেষণাগারের বিবিধ পরীক্ষাকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলশোষক (dehydrating)

বিশেষ কোন পদার্থের সাহায্যে শুকাইয়া লইয়া বিষ ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য বোতলে পুরিয়া রক্ষা করা যাইতে পারে। সর্পবিষ লইয়া নাড়াচাড়ায় সমূহ বিপদ আছে। উহা নাক, মুখ, চক্ষু এবং কণ্ঠনালীর ঝিল্লীসমূহকে আক্রমণ করতঃ বিপদের সবিশেষ সম্ভাবনা ঘটায়। সর্পদংশনের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনপ্রচেষ্টায় অনেক বৈজ্ঞানিক এই ভয়ঙ্কর বিষ লইয়া যেভাবে নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন তজ্জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই সমগ্র মানবসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

আইনষ্টাইনের মতবাদের সমালোচনা

আইনষ্টাইনের সাম্যতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানজগতে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অভিনব মতবাদ সমগ্র জগৎকে কেবল বিস্ময়াবিষ্ট করে নাই, পরন্তু বহু বৈজ্ঞানিককে এতৎসম্পর্কে নানাবিধ সূক্ষ্ম বিচারেও প্রবৃত্ত করিয়াছে। এই সকল বিচারবিতর্কের শেষ ফল কি দাঁড়াইবে, আইনষ্টাইনপ্রবর্ত্তিত মতবাদ শেষ পর্য্যন্ত আদৌ টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে ইতোমধ্যেই কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই মতবাদের যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার শাহ মহম্মদ সুলেমানের নাম করা যাইতে পারে। সম্প্রতি এলাহাবাদে জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় স্যার সুলেমান আইনষ্টাইনপ্রবর্ত্তিত মতবাদকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলেন এই মতবাদ দ্বারা প্রকৃতিকে ভুল বুঝা হইয়াছে। আইনষ্টাইনের মতবাদে কালকে (time) দেশের (space) চতুর্থ মাত্রা (dimension)রূপে উল্লেখ করা হয়। সুলেমানের মতে এই যুক্তি অস্বাভাবিক ও অসম্পূর্ণ। তিনি বলেন কালের ধারণা আমাদের দ্বিবিধ উপায়ে জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ কোন পদার্থের অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহার অবস্থান্তর হইতে। প্রথমোক্ত উপায়ে বিচার করিলে অবশ্য কালকে গণিতের মারপ্যাঁচে দেশের সহিত একযোগে ধরা চলে এবং তদনুসারে কাল ও দেশকে চতুর্থ মাত্রার ধারাবাহিকতা (continnum) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত উপায়ে অর্থাৎ অবস্থান্তর হইতে কালের যে ধারণা হয় তদনুসারে বিচার করিলে কালকে দেশের (space) চতুর্থ মাত্রা বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। একই ব্যক্তির শৈশব অবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থার মধ্যবর্ত্তী কালকে অসীম বিস্তৃতির অর্থাৎ দেশের মধ্যে ঐ ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে বিচার করিয়া বুঝান যায় না, বরং ঐ সময়ে তাঁহার অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ঐ কাল দ্বারা তাহাই সূচিত হয়। সুতরাং এভাবে বিচার করিলে দেশ হইতে কালের পার্থক্য এবং পৃথক সত্তা সহজেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

স্যার মহম্মদের মতে আকর্ষণবিকর্ষণের প্রভাব যে আইনষ্টাইনের চারি-মাত্রিক-ধারাবাহিকতা (four-dimensional continuum) দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা বুঝান হয় নাই। আকর্ষণী শক্তি (gravitational influence) স্বভাবতঃ উহার কেন্দ্র হইতে ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য এবিষয়ে সুলেমান তাঁহার মতবাদ অবলম্বনে গণিত-শাস্ত্রানুযায়ী যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আইনষ্টাইনও তাহার সাম্যতত্ত্ব দ্বারা সেইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। কিন্তু যখনই বর্দ্ধিত গতিবেগের (velocity) কথা উঠে তখনই উভয় সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখা যায়। আলোকের উপর সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির ফল সম্পর্কে উভয় মতবাদলব্ধ সিদ্ধান্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। আলোক প্রতি ঘণ্টায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সুলেমানের মতে নক্ষত্র হইতে নির্গত আলোক আইনষ্টাইনের মতানুসারে গৃহীত সংখ্যা হইতে শতকরা ৩৩ হইতে ৫০ ভাগ বেশী তির্য্যকভাবে আসিবে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত আলোকও এইভাবে আইনষ্টাইনের নির্দ্দেশ অপেক্ষা শতকরা ১০০ ভাগ অধিক লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে।

স্যার মহম্মদ তাঁহার নিজস্ব মতবাদের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্তসমূহ পদার্থ ও 'মিডিয়ম'কে অস্বীকার করিয়া থাকে। ইহা সমস্ত যুক্তিবাদ বা ন্যায়শাস্ত্রকে অস্বীকার করার তুল্য। সুলেমানের মতে কেবলমাত্র দ্বিবিধ উপায়ে কোন জড়শক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইতে পারে,—(১) সচল কতকগুলি পদার্থকণার সাহায্যে, অথবা (২) কোন মিডিয়মের মধ্য দিয়া আন্দোলন (vibration) তুলিয়া। আধুনিক বিজ্ঞান পদার্থ এবং মিডিয়ম উভয়কেই অস্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তরঙ্গের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। পদার্থ বা মিডিয়ম ব্যতিরেকে তরঙ্গের অস্তিত্ব অসম্ভব ইহাই সুলেমানের অভিমত। প্রচলিত মতবাদের পরিবর্ত্তে তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে, যদিও প্রত্যেক বস্তুকণা বন্দুকের গুলির ন্যায় দ্রুতবেগে চলিতেছে এবং একাকী তরঙ্গের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না, তথাপি বহু সংখ্যায় একত্রিত হইয়া তাহারা একরূপ তরঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারে। স্যার মহম্মদ সম্প্রতি তাঁহার এই মতবাদ সূক্ষ্ম গণিতের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন; ইহার দ্বারা প্রকৃতির রাজ্যে 'বিচ্ছিন্নতার ভাব (discontinuum) বিদূরিত হইবে এবং কার্য্য-কারণ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা মিলিবে। পদার্থের সত্তা অস্বীকার করতঃ উহাকে শুধু কতকগুলি কাল্পনিক তরঙ্গসমষ্টি মনে করিয়া এবং উক্ত তরঙ্গ কোন মিডিয়ম ব্যতিরেকেও পরিচালিত হইতে পারে এই ধারণা চালাইবার চেষ্টা করিয়া বিজ্ঞানে এক অযৌক্তিকতার স্রোত আনয়ন করা হইয়াছে। স্যার মহম্মদ মনে করেন শ্রয়ডিঙ্গার ও হাইসেনবার্গ (Schrödinger, Heisenberg) প্রবর্ত্তিত উপরোক্ত মতবাদ এবং আইনষ্টাইন

প্রবর্ত্তিত কাল সম্পর্কিত উদ্ভট ধারণা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান জগতে অনেক নব নব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। স্যার মহম্মদ সুলেমানের মতবাদও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত ১৯শে জুন তারিখের সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে, আগামী বৎসর ৮ই জুন তারিখের সূর্য্যগ্রহণ দ্বারা সে সমস্ত পরীক্ষালব্ধ ফল সমর্থিত হইলে সুলেমানের এই নবপ্রবর্ত্তিত মাধ্যাকর্ষণ মতবাদ (Gravitational Theory) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

বাংলার জনসংখ্যা সমস্যা

বাংলার জনসংখ্যা ৫ কোটি ১ লক্ষ, প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৬৪৬ জন লোক বাস করে। জনতা যে সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে অনেকেই মনে করেন বাংলার আয়তন অনুসারে যত লোক বাংলাদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ, বর্ত্তমানে সেই অবস্থাও অতিক্রান্ত হইয়াছে। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার এই অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকার সম্পর্কেও অনেকে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিতেছেন। সম্প্রতি সেড্রিক ডোভার সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিলে এই অবস্থার প্রতিকার হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁহার মতে দেশের আর্থিক উন্নতি যতই হউক না কেন, একরূপ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার স্বচ্ছল জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সংস্থান দেশের আয়তন অনুসারে কখনই করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলার মৃত্যুহার অত্যধিক সন্দেহ নাই; ডোভার বলেন জন্মহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি প্রদান করিলে মৃত্যুহারও বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগশোক, দুঃখদারিদ্র্যের হাত হইতেও বাংলার লোক নিস্তার পাইবে।

সেড্রিক ডোভারের মতামত খুব স্থির ও ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক কৌশল আপামর সাধারণের শিক্ষাযোগ্য কিনা এবং সেই কৌশল আদৌ অবিমিশ্র শুভকর কিনা তাহা পূর্ব্বে নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, নতুবা হয় তো হঠাৎ ইহার প্রচলন করিয়া ফেলার জন্য ভবিষ্যতে গভীর অনুতাপ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব

পুষ্টিকর খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বর্ত্তমানে বহুবিধ আলোচনার ফলে নানা স্থানে খাদ্যসমস্যা

লইয়া বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। সম্প্রতি 'অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ'এর জীবনরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ এইচ, ই, সি, উইলসন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কলিকাতায় বহুসংখ্যক ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এবং তাহাদের খাদ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহাতে সারপদার্থের বিশেষ অভাব। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে 'ক্যালোরি' বা প্রয়োজনীয় তাপপরিমাণের অভাব না থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে উহার পুষ্টিকারিতা-গুণের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে ভিটামিনের অভাবই একমাত্র অভাব নহে, পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশীয় খাদ্যদ্রব্যে প্রাণীজ প্রোটিনও খুব অল্পই বিদ্যমান। প্রোটিন হইতেই মানবদেহ বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করে। ভিটামিন হইতে উহার কার্য্যপদ্ধতি অন্যরূপ। খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের অভাব ঘটিলে শারীরিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং ওজন হ্রাস পায়। বাঙ্গালীর খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের অভাব অনেক কাল পূর্ব্বে মেজর মেক্‌কেও (Major Mckay) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই সময় 'ভিটামিন' এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। দেহগঠনে প্রোটিন বিশেষভাবে কার্য্যকরী; সুতরাং আমাদের খাদ্যদ্রব্যে ভিটামিনযুক্ত অন্যান্য পদার্থের সহিত মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাণীজ প্রোটিন থাকাও বিশেষ প্রয়োজন।

সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা

সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বিবিধ দ্রব্যাদি কোন্ সুপ্রাচীন যুগের তাহা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে এখনও গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার হাঙ্গারীদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ সি, এল, ফ্যাব্রি (Dr. C. L. Fabri) বিশেষ কয়েকটি চিত্রলিপি (pictograph) পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা প্রায় ৪,৬৩৬ বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭০০ অব্দের হইবে। মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত গ্রীক ও মেসাপোটেমিয়ার সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাতে ফ্যাব্রি মনে করেন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দেশের মধ্যে সেই প্রাচীন যুগেও বাণিজ্য সংক্রান্ত আদানপ্রদানের জন্য স্থলপথের ব্যবস্থা ছিল। দেওয়ালে অঙ্কিত বিবিধ চিত্র হইতে ক্রীট্ ও মহেঞ্জোদারোর ধর্ম্মমূলক আচারপদ্ধতিতেও আশ্চর্য্যজনক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মহেঞ্জোদারোতে প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদিই অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির অভাব দেখিয়া মনে হয় প্রস্তর যুগের শেষভাগেই সিন্ধু উপত্যকায় এই প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সুদৃশ্য নগরের সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং ইষ্টকাদির নির্ম্মাণকৌশল বর্ত্তমান যুগের লোকদিগেরও বিস্ময়োৎপাদন করে।

এরূপ শুনা যাইতেছে যে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইলে দ্রব্যগুলি

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাদুঘরে প্রেরণ করা হইবে। এই সভ্যতার জন্মভূমি সিন্ধুপ্রদেশ অবশ্যই ভাগবাঁটোয়ারায় অধিকতর দ্রব্য লাভ করিবে; করাচি মিউনিসিপ্যালিটি এখন হইতেই তজ্জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতেছে। কিন্তু আমাদের মতে এই সকল দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানা প্রদেশে না পাঠাইয়া ভারতের কোন মধ্যবর্ত্তী স্থানের সুবৃহৎ যাদুঘরে অথবা শুধু ইহাদেরই জন্য বিশেষ একটি যাদুঘর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একসঙ্গে এগুলি সযত্নে রক্ষা করা উচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই নিদর্শনগুলি একসঙ্গে রক্ষিত হইলে লোকশিক্ষার যেরূপ সুব্যবস্থা হইবে, দ্রষ্টব্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রদর্শনী হিসাবেও উহার মূল্য বড় কম বৃদ্ধি পাইবে না।

বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনষ্টিটিউট সম্পর্কে তদন্ত

যে উদ্দেশ্য লইয়া ২৭ বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য জে, এন, টাটা কর্ত্তৃক বাঙ্গালোরে 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে এবং বিগত পাঁচ বৎসরে ইনষ্টিটিউট কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করতঃ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য স্যার জেমস্ আর্‌ভিন্‌কে সভাপতি করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কার্য্যাবলী বিচারের পর প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা পদ্ধতিতে নানাবিধ সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া সম্প্রতি উক্ত 'আর্‌ভিন্ কমিটি' রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। বিগত ২রা জুলাই তারিখে ইনষ্টিটিউটের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হয়। এরূপ জানা যায় যে উক্ত রিপোর্টে ইনষ্টিটিউটের বর্ত্তমান ডিরেক্টর স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটা রামনের কর্ম্মপরিচালনার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রকাশ যে তাঁহার পরিচালন-পদ্ধতিতে ইনষ্টিটিউটের একদল শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। 'আর্‌ভিন্ কমিটি' তাঁহাদের রিপোর্টে ডিরেক্টরের ক্ষমতার সঙ্কোচসাধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি তাঁহাকে শুধু তাঁহার নিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে রাখিয়া সমগ্র বিভাগের কার্য্যাদি পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধনের (co-ordinate) ভার একজন 'রেজিষ্ট্রারের' উপর ন্যস্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ডিরেক্টরের যে একজন নিজস্ব সহকারী আছে তাহার পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে। স্যার চন্দ্রশেখর উল্লিখিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এরূপ ব্যবস্থায় ইনষ্টিটিউটের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইয়া বরং নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও অস্বীকার করেন। যাহা হউক আমরা আশা করি ভারতের এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সুপরিচালিত ও ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চার আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হইয়া ইহা পরলোকগত টাটার দান সার্থক করিয়া তোলে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

মৌমাছিপালনে বিদ্যুতের ব্যবহার

আধুনিক যুগে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক, প্রায় প্রত্যেক কাজে বিদ্যুৎ আজ মানুষের সহায়তা করিতেছে। সম্প্রতি বিদ্যুতের এক চমকপ্রদ ব্যবহারের সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে মৌমাছিপালন এক বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। অনেক দেশেই আবহাওয়ার স্থিরতা থাকে না, শীতের কুহেলিকা কাটিয়া গেলেও বসন্ত প্রথম প্রথম তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে না; অথচ মৌমাছিরা উপযুক্ত সূর্য্যকিরণ ও বসন্তকালীন আবহাওয়া না পাইলে তেমনভাবে কাজ করিতে পারে না, ফলে মধুরও অভাব ঘটে। কোন কোন ফসলের পক্ষে আবার আশানুরূপ পরাগসঙ্গম না হওয়ায় ফসল ফলিতে এবং তজ্জন্য মধুসংগ্রহে বিলম্ব হয়। এই সকল কারণে কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া মৌমাছিদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাহাতে মৌচাক সতেজ হওয়ার ফলে তন্মধ্যে যেমন রোগ প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি স্বাভাবিক ঋতুর পূর্ব্বেই উহাতে অতিরিক্ত মধু সঞ্চিত হয়। মৌমাছিদিগকে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য মধুব্যবসায়িগণ ইদানীং বিদ্যুতের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। প্রত্যেক মৌচাকের পশ্চাদ্দিকে গর্ত্তের মত করিয়া বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে উহা এরূপভাবে আলোকিত করা হয় যেন মৌমাছিগণ বাহিরের স্বাভাবিক অনুকূল আবহাওয়া আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাহা আসিয়াছে মনে করে। সমস্ত মৌচাকগুলি বিশেষভাবে নির্ম্মিত একটি গৃহে রাখিয়া দেওয়া হয়। গৃহটি এমনভাবে প্রস্তুত যেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুকূল হইলেই মৌমাছিগণ চাকের বাহিরে আসিতে পারে। বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে এই মৌগৃহকে এমনভাবে আলোকিত এবং উহার তাপসংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা করা হয়, যেন গৃহের উত্তাপ সর্ব্বদাই ফারেনহাইট তাপাঙ্কের ৬০° ডিগ্রিতে থাকে অর্থাৎ মোটামুটিভাবে এই আলোকগুলি কৃত্রিম সূর্য্যের কার্য্য করে। মৌমাছিদিগকে তুলাইবার জন্য টবে করিয়া সতেজ চেরি ফুল, পাম গাছ প্রভৃতিও রক্ষিত হইয়া থাকে। কিছু স্বাভাবিক পরাগও এই ভাবে যোগান দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত মধু উৎপাদনের জন্য মৌমাছির ব্যবহারার্থ পাত্রে করিয়া চিনির সিরাপ, বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রভৃতিও রক্ষিত হয়। সময় বুঝিয়া নানা উপকরণে সজ্জিত এক একটা টেবিল প্রত্যেক মৌচাকের নিকট স্থাপিত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক আলোক যখন মৌচাক ভেদ করিয়া ভিতরে আসিয়া পৌঁছে, তখন কর্ম্মঠ মৌমাছিগণ টেবিলের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করার জন্য এই টেবিলে যে কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয় তাহাতে প্রতারিত হইয়া তাঁহারা দেহসঞ্চালন করে এবং কৃত্রিম আলোক সূর্য্যালোকবৎ উপভোগ করিয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে মৌরাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপ কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি না

করিয়া মৌচাকটি বাহিরে রাখিলে মৌরাণীকে সচরাচর ডিম পাড়িতে দেখা যায় না। শীতের শেষে সাধারণ মৌচাকের মৌমাছি যখন শীতের আমেজ কাটাইয়া উঠিতে পারে না, কৃত্রিম উপায়ে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিবার ফলে উল্লিখিত মৌচাকের মাছিসমূহ বিশেষভাবেই কার্য্যারম্ভের উপযোগী হইয়া উঠে এবং কার্য্যে তৎপর হয়। বস্তুতঃপক্ষে সাসেক্স শহরে 'গ্রেটর ফেলকোর্ট' নামক বৈদ্যুতিক গৃহে মিঃ আর, বোরলেস্ মেথুজ (R. Borlase Mathews) এসম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষায় জানা যায় এইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে মৌচাক হইতে প্রতিবৎসর ১৭।১৮ পাউণ্ড পরিমাণ মধু উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয়, দীর্ঘকাল পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে উৎপন্ন মধু হইতে লাভের তুলনায় ঐ খরচ কিছুই নয়। এই কৃত্রিম উপায় মৌমাছিদের স্বাস্থ্যের অপকার করতঃ অতিরিক্ত শ্রমে প্ররোচিত করে না, বরং আবহাওয়ার ব্যতিক্রমের জন্য মধু উৎপাদনে যে বিঘ্ন ঘটে সেই ক্ষতিপূরণে সাহায্য করে মাত্র।

গিরিশৃঙ্গ আরোহণকারীদের উপর উচ্চ স্তরের প্রভাব

অক্সিজেনের সাহায্য ব্যতীত মানুষ সজ্ঞানে কত অধিক উচ্চে উঠিতে পারে তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহারের যে সকল যন্ত্রপাতি প্রচলিত আছে সেই সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যেই বা কত দূর উচ্চে মানুষের পক্ষে উঠা সম্ভবপর তাহাও এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। সুখের বিষয়, মিঃ রাটলেজের অধীনে বিগত এভারেষ্ট শৃঙ্গ অভিযানের ফলে এবিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় উক্ত অভিযাত্রীদলের চিকিৎসক ডাঃ নোয়েল হাম্‌ফ্রিজ (Dr. Noel Humphreys) এসম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় ২১,০০০ ফুটের উর্দ্ধে মানুষের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। অবশ্য ঐরূপ উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়া কাহার শরীরের অবস্থা কিরূপ হইবে পূর্ব্বাহ্নে তাহা বলা শক্ত। কারণ দেখা গিয়াছে, সমুদ্র-সমতলে বা সমুদ্র-সমতল হইতে অল্প উচ্চে যে সমস্ত ব্যক্তি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন ২১,০০০ ফুটের উর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহাদের অনেকের স্বাস্থ্যই অত্যন্ত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বেকার অন্যান্য অভিযানে যাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব ভাল রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এত উর্দ্ধেও আপনাদিগকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিগত অভিযানে দেখা গিয়াছে, যাঁহারা একবার উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া ঐ স্থানের আবহাওয়া সহ্য করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের শারীরিক অবনতি অল্পই ঘটিয়াছে।

অবশ্য যাহারা সমুদ্র-সমতলে বা সমুদ্র-সমতল হইতে অল্প উচ্চ স্তরে কার্য্য করিয়া

অভ্যস্ত, তাহারা এইরূপ পর্ব্বতারোহণের পক্ষে স্বভাবতঃই অনুপযোগী। তবে একবার উপরের আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইতে পারিলে তাহাদের পক্ষে এরূপ উচ্চ স্তরে যাওয়া দুঃসাধ্য নহে। ২১,০০০ ফুটের উর্দ্ধে উঠিলেই শারীরিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিগত অভিযানে দেখা গিয়াছে খুব উচ্চে উঠিয়া আবার ২১,০০০ ফুটের নিম্নে নামিয়া আসিলেই শরীর অধিকতর দ্রুত উচ্চ স্তরের আবহাওয়া সহ্য করিবার শক্তি লাভ করে। বিগত অভিযানে এইজন্য আবহাওয়ার ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে অথবা তীব্র তুষারপাত আরম্ভ হইলেই অভিযাত্রী দল ৩নং ক্যাম্প হইতে ১নং ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুনরায় যখন তাঁহারা ৩নং ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তখনই তাঁহাদের সহনশীলতা ও সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণতঃ উচ্চ স্তরে উঠিলেই মাথাঘোরা, শ্বাসকষ্ট, অগ্নিমান্দ্য, গা-বমিবমি ভাব, অনিদ্রা, অজীর্ণদোষ, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনও রোগ সহজেই নিরাময় করা যায়। অনিদ্রা ক্লোরাল-হাইড্রেটের দ্বারা উপশমিত হয়, এসপিরিনের সাহায্যে মাথা ধরা কমে। কিন্তু দেখা গিয়াছে অধিকতর উচ্চ স্তরে উঠিলে গলাবেদনা, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই কমান যায় না।

বিগত অভিযানে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে এই সমস্ত সাধারণ রোগ ব্যতীত অপর কোনরূপ গুরুতর ব্যাধি দেখা দেয় নাই। উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথে বিবিধ বাধা বর্ত্তমান সন্দেহ নাই, তবে এইরূপ অভিযানে বিভিন্ন উচ্চতায় আরোহণকারীদের শরীরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত হয় ডাঃ নোয়েল তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। বিগত অভিযান ব্যর্থ হইলেও তদুপলক্ষ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তারে কম সহায়তা করিবে না।

কাচ হইতে তন্তু-উৎপাদন

কাচ হইতে তন্তু উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার এক কারখানা সম্প্রতি নিউইয়র্কের 'কর্ণিং গ্লাস ওয়ার্কস্' কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কাচ হইতে পশমের ন্যায় 'তন্তু' বাহির করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এবিষয়ে এতদূর সাফল্য ঘটিয়াছে যে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে এরূপ তন্তু দ্বারা ঝাড়ন, বিছানার চাদর, পরদা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ (tapestry) প্রভৃতি যাবতীয় বস্ত্রসম্ভার প্রস্তুত হইতে পারিবে। কাচ স্বভাবতই খুব নমনীয়, দ্রবীভূত কাচের উপর কঠিন চাপ প্রয়োগ করতঃ অতিসূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে টানিয়া বাহির করিয়া আনিলে সূক্ষ্ম তন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুকাইয়া শক্ত হইলে এই তন্তু এত সূক্ষ্ম হয় যে, উহার প্রায় ৯০টি তন্তু একত্র

করিলে ৬০ নম্বরের সুতার আকার ধারণ করে। এই সমস্ত তন্তু সাধারণ তাঁতে চড়াইয়া সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উহারা এত শক্ত হয় যে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় ১,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ চাপ বহন করিতে পারে। এরূপ কাচতন্তুনির্ম্মিত জিনিষ রাসায়নিক গবেষণাগারে তড়িৎ-অপরিবাহক দ্রব্য (insulation) এবং ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখিতে সিল্ক প্রভৃতি তন্তুদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের অনুরূপ। সুতরাং বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অভিনব সামগ্রী হইলেও এক দিন হয় তো এই কাচতন্তু হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিশেষভাবে সমাদৃত ও ব্যবহৃত হইবে।

করিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্মানলাভ

তিন বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'স্যার জগদীশ বসু পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। ভারত-বর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসিগণই এই পুরস্কারপ্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। খুবই আনন্দের বিষয়, এরূপ নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় কলিকাতা শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অন্যতম অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস্-সি, কবিশেখর মহাশয় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবিরাজমহাশয় "আয়ুর্ব্বেদে ত্রিদোষতত্ত্ব" নামক এক বিশেষ গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই পুরস্কারের জন্য দাখিল করেন, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ধীরেনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি উপাধিধারী হইয়াও যেভাবে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবলম্বনে গবেষণা ও মৌলিক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ভারতের এই লুপ্তগৌরব ও অনাদৃত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি আধুনিক বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বস্তুতঃ বিশেষ প্রশংসনীয় ও অন্যান্য কবিরাজমহাশয়গণের অনুকরণযোগ্য।

রায়মহাশয় 'প্রকৃতি'র পরম শুভানুধ্যায়ী, তাঁহার রচিত অনেক মৌলিক প্রবন্ধ 'প্রকৃতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে; বায়ু, পিত্ত, কফ—এই ত্রিদোষতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি 'প্রকৃতি'তে সুচিন্তিত ও বহু তথ্যপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা এই তরুণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপককে তাঁহার এই সাফল্যে অভিনন্দিত করিতেছি। ভবিষ্যতে তিনি আরও বিপুল গৌরবের অধিকারী হউন ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করি।

শোকসংবাদ

পরলোকে অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন মিত্র মাত্র

৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা বাংলার বিজ্ঞানসমাজের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। পরলোকগত মনস্বী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয়ের পৌত্র ডাঃ মিত্র তাঁহাদের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে এম-এ পাশ করিবার পর হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের পদে বৃত থাকিয়া অবশেষে ঐ বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে নৃতত্ত্ব এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে হনলুলুর বিশপ মিউজিয়মের এক বৃত্তি লইয়া তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ পরিভ্রমণ করেন এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পলিনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পলিনেশিয়াভ্রমণের পর তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লার্কের অধীনে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৩২ সালে ডাঃ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি কলিকাতা নৃতত্ত্ব পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে তিনি নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। সংস্কৃতিগত নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) বিষয়ে তিনি কয়েকখানা পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে Prehistoric India, History of American Anthropology, India's Cultural Influence in Polynesia প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকখানা হনলুলুর বিশপ মিউজিয়ম কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ডাঃ মিত্র নিরহঙ্কার, অমায়িক ও নির্ম্মল চরিত্রের আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আমরা এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল আর, নোল্‌স্

কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অস্থায়ী ডিরেক্টর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল আর, নোল্‌স্ (Lt.-Col. R. Knowles) সি-আই-ই, আই-এম-এস বিগত ৩রা আগষ্ট তারিখে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে নোল্‌স্ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় (ট্রপিক্যাল) রোগ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য তাঁহার নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত কৃতী চিকিৎসকের তিরোধান হইল। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল নোল্‌স্ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত কুইলনে জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করিবার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করিয়া

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। পরে তিনি কশৌলি পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বিভাগে যোগদান করেন। কিছু কাল বোম্বাই ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বিভাগে কার্য্য করিবার পর তিনি শিলং পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হন। লেঃ-কর্ণেল নোল্‌স্ কিছু দিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করিয়াছেন। এই সময়ে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইলে তিনি ঐ স্কুলের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়া স্কুলসংগঠনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বর্ত্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্কুলের আদি-জীবতত্ত্ব বা প্রোটোজুলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ নোল্‌স্ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় প্রোটোজুলজির প্রভাব সম্পর্কে তিনি বহু মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্তই তাঁহার এই শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের কথা চিরদিন ঘোষণা করিবে।

পরলোকে ডাঃ এফ, জে, এফ, শ'

সুপ্রসিদ্ধ কৃষিবিজ্ঞান বিশারদ ডাঃ এফ, জে, এফ, শ' (Shaw) অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পুসা কৃষি কলেজের ডিরেক্টর ছিলেন এবং স্যার রবার্ট ব্রাইস ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির সহকারী সভাপতি পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির কৃষিবিশেষজ্ঞের কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি পুসার কৃষি কলেজ দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্থানান্তরকার্য্য সম্পর্কে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। অনেকে মনে করেন এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ডাঃ শ' কৃষি সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভারতের অগণিত কৃষিব্যবসায়িগণ যাহাতে কৃষি কলেজে অনুষ্ঠিত গবেষণা হইতে উপকৃত হয় তদ্বিষয়ে ডাঃ শ' বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং তাহাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাঁহার হাতে গড়া পুসা কলেজ দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে অমত প্রকাশ করেন নাই। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য ডাঃ শ' অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কৃষি সম্পর্কে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার জন্যই বিগত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা অধিবেশনে তাঁহাকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়। ডাঃ শ'য়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রকৃত বিজ্ঞানসাধকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।

সংবাদ চয়ন

ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের আগামী বার্ষিক অধিবেশন

'ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের' বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ব্লাকপুল শহরে অনুষ্ঠিত হইবে। স্যার জোসিয়া ষ্ট্যাম্প সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি 'সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব' (Impact of Science on Society) সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন। ব্রিটীশ এসোসিয়েসন প্রতি বৎসরই সাধারণ অধিবেশনগুলিতে জনহিতকর বহুবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। এ বৎসরও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এরূপ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইবে। ব্লাকপুলের মেয়র এই উপলক্ষ্যে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে 'উইন্টার গার্ডেন্সে' এক সভায় সম্বর্দ্ধিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলায় লণ্ঠনের কারখানা

সম্প্রতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আগরপাড়ায় একটি লণ্ঠনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত এই কারখানায় প্রতিদিন ৫০০ হইতে ৭০০ লণ্ঠন প্রস্তুত হইতে পারিবে। হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ হ্যারিকেন লণ্ঠন বাংলাদেশে আমদানি হইয়া থাকে। এই কারখানা স্থাপিত হওয়াতে বাংলার বিশেষ একটি অভাব দূরীভূত হইল। আমরা কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণের সাফল্য কামনা করিতেছি।

ডাঃ জে, এইচ, হাটনের কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ

সুবিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ ডাঃ জে, এইচ, হাটন, ডি-এস সি, সি-আই-ই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও যে সমস্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন ডাঃ হাটন তাঁহাদের অন্যতম। নৃতত্ত্বসম্পর্কিত গবেষণায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। আসামেই তিনি তাঁহার চাকুরীজীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন এবং এই সময়েই ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন। ভারতীয় নৃতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ পণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিপদে অভিষিক্ত করা হয়। শুনা যাইতেছে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "গাছ ঘর" প্রতিষ্ঠা

এরূপ জানা গিয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রগণের সুবিধার নিমিত্ত একটি "গ্রীন্ হাউস" বা "গাছ ঘর" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। এই ঘরে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং শীতপ্রধান দেশ হইতে আনীত নানাবিধ উদ্ভিদ্ জন্মাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এজন্য যাহাতে বৎসরের সকল সময়েই উক্ত গৃহমধ্যস্থ তাপ ৫০° হইতে ৭০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপাঙ্কের মধ্যে থাকে তদুপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে অনেক বোটানিক্যাল গার্ডেনে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদাদি জন্মাইবার নিমিত্ত 'গ্রীষ্মাবাসের' (summer house) ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনুরূপ 'শীতাবাস' নির্ম্মিত হইলে উদ্ভিদ্‌সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

নূতন খনিজ পদার্থের সন্ধান

দক্ষিণ ধলভূমে এবং ময়ূরভঞ্জের উত্তরাংশে ভেনেডিয়ম (Vanadium) নামক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এক প্রকার ইস্পাত প্রস্তুত করিতে এই পদার্থটি বিশেষ উপযোগী। এরূপ ভেনেডিয়মসংশ্লিষ্ট খনিজ লৌহ (iron ore) ভারতের অপরাপর অংশে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অঞ্চলে কিন্তু পর্ব্বতের ঢালু প্রদেশে ভেনেডিয়মসংযুক্ত বহু লক্ষ টন আবর্জ্জনাস্তূপ বিদ্যমান বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিদ্যাশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা সম্পর্কে সিনেট কর্ত্তৃক কিছু দিন পূর্ব্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি কমিটি এইরূপ শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের অনুকূলে মত প্রকাশ করায় সিনেট সভা কর্ত্তৃক তাহাদের রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সামরিক বিদ্যা সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এজন্য জুনিয়র ও সিনিয়র এই দুই প্রকার পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে; উভয় পাঠ্যেই থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালী ছাত্রগণ সামরিক বিদ্যাশিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলি উৎসব

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আগামী ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের যে সম্মিলিত

অধিবেশন হইবে তাহাতে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ড সভাপতিত্ব করিবেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্ত্রীশিক্ষা সংস্কারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যম

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর প্রদত্ত অর্থ হইতে স্ত্রীশিক্ষার সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে এক অভিনব প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় কোন একটি বাঙ্গালী মহিলা গ্রাজুয়েটকে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে, তিনি ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং তদনুসারে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার ও প্রসারকল্পে যাহা প্রয়োজন তাঁহার অভিমতসহ তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণের ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত আরও কিছু অর্থ উক্ত বিহারীলাল মিত্র ফেলোসিপ ফণ্ড হইতে তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় বাংলার স্ত্রীশিক্ষা সংস্কৃত হইয়া সুপথে পরিচালিত হইবে আশা করা যায়।

গিরিশৃঙ্গ আরোহণে ভারতীয় অভিযাত্রী

হিমালয় অভিযান সমিতির (Himalayan Expedition Club) উদ্যোগে একদল ভারতীয় বর্ষান্তে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নন্দাদেবী পর্ব্বত আহোরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভবিষ্যতে 'এভারেষ্ট' প্রভৃতি উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যই তাঁহাদের এই উদ্যম। একদল ইঙ্গ-আমেরিকান ও একদল জাপানী অভিযাত্রীও এ বৎসর নন্দাদেবী (২৬,৬৪২ ফুট) ও নন্দকোট (২২,০০০ ফুট) পর্ব্বতে আরোহণ করিবাব জন্য ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহারাও আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই তাঁহাদের অভিযান আরম্ভ করিবেন। ইতোমধ্যে তাঁহারা তজ্জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তাদি করিতেছেন।

ডাঃ হরেন্দ্রনাথ রায়ের নূতন পদলাভ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার ডাঃ হরেন্দ্রনাথ রায় এম-এস-সি, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) মুক্তেশ্বরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ভেটেরনারি রিসার্চ্চের ইম্পিরিয়াল প্রোটোজুলজিষ্ট বা আদি-জীবতত্ত্ববিদের পদলাভ করিয়াছেন। ইতঃপুর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হন নাই। ডাঃ রায় প্রোটোজুলজি (আদি-জীবতত্ত্ব) সম্পর্কে বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত অনেক মৌলিক প্রবন্ধ ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ডাঃ রায়ের এই পদপ্রাপ্তিতে আনন্দজ্ঞাপন করিতেছি।

গৃহপালিত পশুর পুষ্টিবিধান

ভারতের গোমহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর উন্নতিবিধানার্থ ইজ্জতনগরে একটি নিউ-ট্রিসন ইনষ্টিটিউট্ গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ইনষ্টিটিউট্ মুক্তেশ্বরের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট্ অব ভেটেরনারী রিসার্চ্চের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রাণতত্ত্ব রসায়ন শাখা (Physiological chemistry) যতশীঘ্র সম্ভব ইজ্জতনগরে স্থানান্তরিত করা হইবে। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই ক্রমশঃ ইজ্জতনগরের এনিম্যাল নিউট্রিসন ইনষ্টিটিউট্ বা প্রাণিপুষ্টি পরিষদ গঠিত হইয়া উঠিবে। গৃহপালিত জন্তুর সুপ্রজনন ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এস্থানে নানারূপ পরীক্ষাকার্য্যের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই।

পুস্তক সমালোচনা

চর্ম্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ, এফ্-সি-এস্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা, সাধনা ঔষধালয় হইতে প্রকাশিত, মূল্য বার আনা।

পুস্তকখানি আগ্রার শ্রীযুক্ত জে, সি, বসাক মহাশয়ের "Care of the Skin and Personal Hygiene" নামক ইংরাজি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারে স্থানবিশেষ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত।

সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির অনেক কথা এই পুস্তকপাঠে জানা যাইবে, কিরূপে চর্ম্ম ভাল রাখিতে হয়, কিরূপে স্নান করিতে হয়, কিরূপ খাদ্য খাওয়া উচিত, যৌন স্বাস্থ্যনীতি, ইত্যাদি বহু তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উপাদান, খাদ্যে ভাইটামিন ও খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক কালের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহা সাধারণ গৃহস্থের কাজে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়।

তবে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। পুস্তকখানির ভাষা পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা ইংরাজির অনুবাদ। যথা "উজ্জল, পরিষ্কার, সুস্থ এবং জ্যোতিঃবিকীরক চর্ম্মের একটি নিজস্ব বিশেষ সম্মোহনশক্তি থাকে" (পৃঃ ২)। আবার,—"মলনলী এবং মূত্রযন্ত্রের ন্যায় চর্ম্ম দেহের ভিতরকার ব্যবহৃত অনিষ্টজনক

বস্তুগুলিকে নিঃসরণ করিয়া থাকে" (পৃঃ ৭)। আর একটী কথা, সফলক মহাশয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, সুতরাং আমরা এই পুস্তকে অয়ুর্ব্বেদসম্মত মতের আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি প্রায় সকল স্থলেই বিদেশীয় মত পোষণ করিয়াছেন। "স্নানের সময় সাবান ব্যবহার করা উচিত" (পৃঃ ১২)। সাবান মাখিলে চর্ম্ম পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু নিত্য ভাল করিয়া তৈলমর্দ্দন করিলেও চর্ম্ম পরিষ্কার থাকে, আর তাহাতে খরচও অনেক কম। তিনি তৈলমর্দ্দনের চারিপ্রকার সুবিধার সহিত চারিপ্রকার অসুবিধার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৬০), কিন্তু সাবান মাখার অসুবিধা দেখান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "মাথায় সরিষার তৈল মর্দ্দন হিতকর" (পৃঃ ১৩)। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদমতে তিল তৈলই শ্রেষ্ঠ। আবার, "হাতের চর্ম্ম শুষ্ক এবং কর্কশ থাকিলে গ্লিসারিণ অথবা ভেসেলিন মাখিলে কোমল হয়" (পৃঃ ১৩)। আমরা জানি যে প্রত্যহ তেল মাখিলেও চর্ম্ম কোমল ও স্নিগ্ধ থাকে। "চা পরিমিতরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন" (পৃঃ ১৫), "কয়েক ফোঁটা অডিকোলন স্নানের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিলে চর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়", "ছোট করিয়া ছাঁটা বব্‌ড্ হেয়ার (bobbed-hair) অধিকতর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত" (পৃঃ ৪০),—ইত্যাদি মত আমরা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে আশা করি নাই।— ধীঃ রাঃ।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন—শ্রীসুধীরকুমার বসু (দেশ, ৩য় বর্ষ ১৩৪৩, ৩৯শ সংখ্যা)

প্রাচীন ভারতে হাসপাতাল—কবিরাজ শ্রীদীরেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি (ধন্বন্তরি, শ্রাবণ ১৩৪৩)

লর্ড এবেরি—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ, বি-এল (সুবর্ণবণিক্ সমাচার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

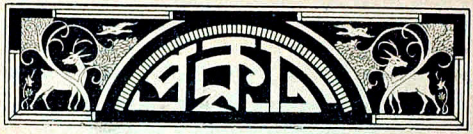

১৩শ বর্ষ শরৎ ৩য় সংখ্যা

লাল-পিপীলিকার জীবনেতিহাস

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ইটের মত লাল রং-এর একপ্রকার পিপীলিকাকে দলবদ্ধভাবে গাছপালার উপর বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম *Œcophylla smaragdina* Fabr.। এদেশে চল্‌তি ভাষায় ইহাদিগকে নাল্‌সো পিঁপড়া বলে। দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও কোপন স্বভাবের জন্য ইহারা সকলের নিকটই সুপরিচিত। গাছের ডালের ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজ পত্রগুলি একত্র জুড়িয়া ইহারা কতকটা ফুটবলের মত গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। এক একটি বাসার মধ্যে সহস্র সহস্র পিপীলিকা দলবদ্ধভাবে বসবাস করিয়া থাকে। পিঁপড়ার সংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, নূতন নূতন পাতা জুড়িয়া তাহারা বাসার কলেবর ততই বৃদ্ধি করে। কাছাকাছি সমস্ত পাতা বাসানির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইবার পর যখন আর বাসা বাড়াইবার উপায় থাকে না, তখন কতকগুলি পিপীলিকা নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হয়। বোলতা ও মৌমাছিদের মধ্যে যেমন সাধারণতঃ রাণীদের উপলক্ষ্য করিয়াই বাসার পত্তন হয় ইহাদের সেরূপ নহে। সন্ধানী-পিপীলিকারা স্থাননির্ব্বাচন করিবার পর কর্ম্মীরা দলে দলে গিয়া নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। বাসানির্ম্মাণের উপকরণ পুরাতন বাসা হইতেই সংগৃহীত হয়। বাসা নির্ম্মিত হইবার পর একদল পিপীলিকা সেখানে গিয়া বাস করিতে থাকে বটে, কিন্তু পুরাতন বাসার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিতে কর্ম্মী-পিপীলিকারা সাধারণতঃ দুইপ্রকার উপায় অবলম্বন করে। যে গাছে বাসা বাঁধিবে, সে গাছের পাতা যদি খুব চওড়া ও লম্বা হয় তবে কর্ম্মীরা প্রথমে ২০।২৫ জন একত্রিত হইয়া পাতার ডগার দিকটা আস্তে আস্তে বোঁটার দিকে

গুটাইয়া আনিতে থাকে (১নং চিত্র)। পাতার ডগাটা যতই ভিতরের দিকে বাঁকিয়া আসে ততই অধিক সংখ্যক নূতন নূতন কর্ম্মী আসিয়া সারবন্দিভাবে পাতার দুই দিকের ফাঁক যথাসম্ভব ছোট করিবার উদ্দেশ্যে এক দিক পায়ে আঁকড়াইয়া এবং অন্য দিক দাঁতে কামড়াইয়া পাতাটাকে চাপিয়া ধরে। এই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইহারা একইভাবে

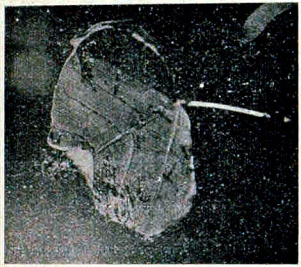

চিত্র—১
লাল-পিপীলিকারা পালিতা-মাঁদারের পাতা মুড়িয়া বাসা বাঁধিতেছে

অবস্থান করিয়া থাকে। বিশ্রাম বা আহারের জন্য ভ্রুক্ষেপও নাই। পাতাটা সম্পূর্ণরূপে দুই-ভাঁজে মুড়িয়া গেলে কতকগুলি কর্ম্মী পুরাতন বাসা হইতে তাহাদের কীড়া বা লার্ভা মুখে করিয়া উপস্থিত হয়। লার্ভাগুলি দেখিতে সম্পূর্ণ সাদা, একমুখ ছুঁচলো এবং ইহাদের শরীরের মধ্যদেশ অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সরু। কর্ম্মী-পিপীলিকারা তাহাদের সাঁড়াশির মত চোয়ালের সাহায্যে কীড়ার শরীরের ক্ষীণ মধ্যদেশে কামড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে চালাফেরা করে। তখন কীড়ার ছুঁচলো মুখটা সম্মুখের দিকে থাকে। পুরুষ, স্ত্রী ও কর্ম্মী-পিপীলিকার কীড়া বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হয়। স্ত্রী-পিপীলিকার কীড়া আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পুরুষ ও কর্ম্মীর কীড়ার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। তবে কর্ম্মীর কীড়াই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। তাঁতীরা যেমন মাকুর সাহায্যে তাঁত বোনে, কর্ম্মী-পিপীলিকারা তেমনি মাঝারি বয়সের কর্ম্মী-কীড়াকে মাকুর মত ব্যবহার করিয়া তাহাদের বাসা জুড়িয়া থাকে (২নং চিত্র)।

যে সব কর্ম্মীরা পাতার দুই দিক টানিয়া সারবন্দিভাবে অবস্থান করে মাকুবাহী কর্ম্মীরা তাহাদের উপর দিয়া চলাফেরা করিয়া কীড়ার মুখটিকে একবার পাতার এক প্রান্তে আবার অপর প্রান্তে বারবার ঠেকাইতে থাকে। এই সময় শুঁড় দুইটি দিয়া মাঝে মাঝে

কীড়ার মুখের কাছে শুড়শুড়ি দেয়। শুড়শুড়ি দিলেই কীড়া বা মাকুর মুখ হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম সুতা নির্গত হয়। ঐ সুতা মাকড়সার সুতার মতই আঠালো,

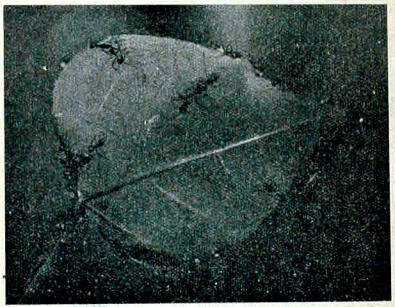

চিত্র—২
পালিতা-মাঁদারের পরস্পরসন্নিহিত দুইটি পত্র একত্র করিয়া লাল-পিপীলিকারা লার্ভার সাহায্যে সংযোগস্থল জুড়িয়া দিতেছে।

কাজেই একটু ঠেকাইলেই পাতার গায়ে আটকাইয়া যায়। এইভাবে সুতা বুনিতে বুনিতে পাতার সংযোগস্থলে একটি সাদা পাতলা পর্দ্দার সৃষ্টি হইয়া উঠে। বুনাইবার কার্য্য যতই অগ্রসর হইতে থাকে টানা-কর্ম্মীরা ততই একে একে টান ছাড়িয়া দেয়। মোটামুটি বুনানো শেষ হইলে আস্তে আস্তে পর্দ্দা বুনিয়া সমস্ত ফাঁক বন্ধ করিয়া দেয়, কেবল বোঁটার দিকে যাতায়াতের উপযুক্ত একটু ছোট ছিদ্র রাখে।

গাছের পাতা যদি ছোট অথবা সরু হয়, তবে কর্ম্মীরা প্রথমে বোঁটার দিক হইতে পাশা-পাশি দুইটি পাতাকে টানিয়া কাছে আনে (৩নং চিত্র)। কারণ বোঁটার দিকে পাতাগুলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁক অনেক কম, কিন্তু দুইটি পাতার ডগার দিকে ফাঁক সাধারণতঃ খুব বেশী হইয়া থাকে। কাজেই প্রথম একটি পিপীলিকা বোঁটার দিকে শায়িতভাবে থাকিয়া একটা পাতার ধারের দিকে কামড়াইয়া পা দিয়া অপর পাতার পার্শ্ব আঁকড়াইয়া ধরে। এইরূপে একটির পর একটি পিপীলিকা আসিয়া পাশাপাশিভাবে পাতাদুটিকে যতদূর সম্ভব কাছে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। যেখানে দুইটি পাতার মধ্যে ফাঁক খুব বেশী

শত চেষ্টা করিয়াও খুব কাছে আনিতে পারে না, সেখানে একটি পিপীলিকা অপরটির কোমর কামড়াইয়া ধরিয়া শিকল তৈয়ারী করে এবং পাতাদুটিকে যথাস্থানে টানিয়া রাখে।

চিত্র—৩

লাল-পিপীলিকারা বাসা নির্মাণ করিবার জন্য পাশাপাশি অবস্থিত আমের পাতাগুলিকে টানিয়া কাছে আনিতেছে।

পাঁচ ছয়টি পিপীলিকাকে আমি এইরূপে শিকল তৈয়ারী করিয়া পাতা টানিয়া রাখিতে দেখিয়াছি। পাতাদুইটিকে এইভাবে আয়ত্তে আনিলে পর কর্মীরা কীড়া মুখে লইয়া উপস্থিত হয় এবং সূতা দিয়া উহাদিগকে জুড়িয়া ফেলিতে সুরু করিয়া দেয়। প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে উহারা মোটামুটিভাবে একটি নূতন বাসা গড়িয়া তোলে (৬নং চিত্র)।

লার্ভা বা কীড়াই ইহাদের প্রধান সম্পত্তি। কীড়া না হইলে ইহারা মোটেই বাসা বাঁধিতে পারে না। অভাবের সময় আবার ইহারা কীড়া খাইয়াই প্রাণধারণ করে, এবং এই কীড়া হইতেই পিপীলিকাদের দলপুষ্টি হয়। লাল-পিপড়ার স্ত্রীপুরুষ প্রজননের উৎপত্তি রহস্যময়। অনেকে অনুমান করেন কর্মী-পিপীলিকারা যান্ত্রিনিয়ন্ত্রণ করিয়া একই শ্রেণীর ডিম হইতে স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী এই তিন প্রকারের পিপীলিকা উৎপন্ন করিয়া থাকে। লিঙ্গবৈষম্যের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকার উৎপত্তি বিষয়ে আর একটা ঘটনা

আমার নজরে পড়িয়াছে। বিভিন্ন সময়ে শত শত বাসা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—প্রত্যেক বড় বড় বাসাতে বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই কর্মী-পিপীলিকার অজস্র কীড়া পাওয়া যায়; কিন্তু ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই কয় মাস ছাড়া আর কোন সময়ে পুরুষ বা স্ত্রী-পিপীলিকার কোন কীড়া দেখা যায় না। শীত ঋতুর অবসানে গরমের এই কয় মাস এক একটা বড় বড় বাসার মধ্যে ডানাওয়ালা শত শত পুরুষ ও স্ত্রী-পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে স্ত্রী ও পুরুষ-পিপীলিকারা পরিণত বয়স্ক হইলে বাসা হইতে বাহির হয় এবং উড়িতে

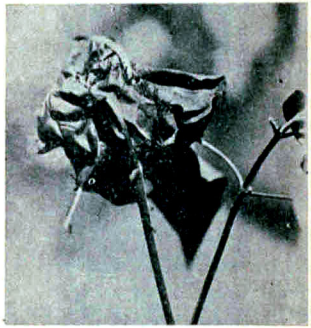

চিত্র—৪

কৃষ্ণকলির পত্র একত্রিত করিয়া লাল-পিপীলিকারা বাসা নির্মাণ করিয়াছে; বাসার উপরের দিক লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দেওয়ার পর উহারা সেই ফাঁক বন্ধ করিতেছে।

উড়িতে উহাদের যৌনসম্মিলন ঘটিয়া থাকে। বাহিরে উড়িবার সময় ঝড়, জল ও শত্রুর কবলে পড়িয়া ইহাদের অধিকাংশেরই জীবনান্ত ঘটে। অবশিষ্ট রাণী পিপীলিকারা যে কোন বাসায় গিয়া আশ্রয় লয় এবং সেখানে ডিম পাড়ে; তখন তাহাদের ডানা খসিয়া যায়। ইহাদের ডিম পাড়িবার কায়দা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। প্রসবের সময় হইলেই রাণী বাসার মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসে এবং হাত-পা চাটিতে থাকে। খানিকক্ষণ পরেই আবার এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিতে

আরম্ভ করে, চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। প্রায় ১০।১৫ মিনিট একপ অস্থিরতা প্রকাশ করিবার পর শরীরের প্রান্তদেশ দুই দিকের পায়ের মধ্য দিয়া মধুকের আকারে বাঁকাইয়া মুখের কাছে লইয়া আসে এবং মুখ দিয়া চাটিতে থাকে। এই অবস্থায়

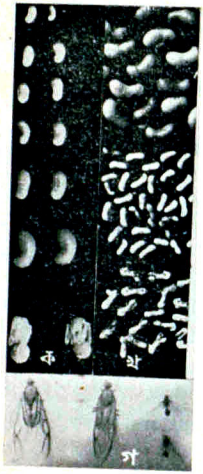

চিত্র—৫

ক—উপর হইতে রাণী-পিপীলিকার কীড়ার ক্রমপরিণতি দেখান হইয়াছে; নীচের দুইটি রাণীর পুত্তলি। খ—উপরে রাণীর কীড়া, মধ্যে পুরুষ ও কর্ম্মীর কীড়া; নীচে কর্ম্মীর পুত্তলি। গ—দক্ষিণের দুইটি পুরুষ ও বামের দুইটি রাণী পিপীলিকা।

লম্বাটে গোছের ডিমের অগ্রভাগ খানিকটা বাহির হইয়া আসে। রাণীর চারিদিকে পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি কর্ম্মী-পিপীলিকা ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়ায়, সময় সময় রাণী ও কর্ম্মীরা পরস্পরের শুঁয়া নাড়িয়া একটা যেন আদরের ভাব দেখায়। কিছুক্ষণ পরে ডিমটা আরও বাহিরে আসিলে রাণী মুখ দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া সেটাকে টানিয়া লইয়া আসে এবং

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে করিয়াই রাখে। তারপর কর্ম্মীদের যে কেহ রাণীর মুখ হইতে ডিমটাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে আর একটা কর্ম্মী আসিয়া ডিমটিকে মুখে তুলিয়া লয়। কীড়া অবস্থায় না পৌঁছানো পর্য্যন্ত ডিম প্রায় সর্ব্বক্ষণই কর্ম্মীদের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। পনর বিশ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা অন্তর রাণী আবার আর একটি ডিম পাড়ে। কর্ম্মীরা প্রায় ১০।১৫টি ডিম এক-সঙ্গে মুখে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ডিমগুলি একপ্রকার আঠালো পদার্থে পরস্পর সংলগ্ন থাকে বলিয়াই এইরূপে মুখে করিয়া বেড়ানো সহজসাধ্য হয়।

বাসা বদল করিবার সময় ব্যতীত বা অন্য কোন গুরুতর বিপদ না ঘটিলে কর্ম্মীরা কখনও ডিম লইয়া বাসার বাহিরে আসে না। রাণী ও পুরুষ-পিপীলিকারাও বাসার বাহির হয় না। ডিম, কীড়া প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়াই অপরের সহিত ইহাদের শত্রুতার কারণ ঘটে বেশী। বিভিন্ন রকমের মাছ, পাখী ও পিপীলিকা লাল-পিঁপড়ার ডিম ও কীড়া প্রভৃতি খাইতে ভালবাসে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই নিজের ক্ষমতায় এই ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণতঃ মানুষের সাহায্যেই তাহারা এই উপাদেয় বস্তুর স্বাদগ্রহণে সমর্থ হয়। মানুষই লাল-পিঁপড়ার প্রধান শত্রু। দক্ষিণ-ভারত, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা এই পিপীলিকা ও তাহাদের ডিম অতীব মুখরোচক মসলার মত খাইয়া থাকে। তাহারা এই পিঁপড়া ও ডিম প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া একত্র গুঁড়াইয়া রাখে এবং সারা বৎসর উহা তরকারীর সঙ্গে ব্যবহার করে। পিঁপড়ার ডিম মাছের উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ছিপে মাছ ধরিবার জন্য হাটে বাজারে প্রচুর পরিমাণে উহা বিক্রয়ার্থ আমদানি হয়। অতদ্ব্যতীত সোলেনপ্সিস জেমিনাটা (*Solenopsis geminata*) নামে একপ্রকার খুদে পিপীলিকা লাল-পিঁপড়াদের ভীষণ শত্রু। লাল-পিপীলিকারা বোধ হয় সংসারে এই খুদে পিপীলিকার মত আর কাহাকেও অত ভয় করে না। যেখানে এই খুদে পিপীলিকা দেখা যায় তাহার ত্রিসীমানায় লাল-পিঁপড়া বাস করে না। খুদে পিপীলিকারা দেড় হইতে দুই মিলিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের গায়ের রং লালচে-হলদে, কিন্তু পুচ্ছদেশের শেষার্দ্ধ কালো। হাজার হাজার পিপীলিকা সারি বাঁধিয়া অতি ধীরে ধীরে চলে। ইহারা গুড়, চিনি, মৎস্য, মাংস ও শস্যকণা প্রভৃতি খাইয়া থাকে এবং শীত ও বর্ষাকালের জন্য প্রচুর পরিমাণে উপরোক্ত খাদ্য বাসায় সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই খুদে পিপীলিকাগুলিকে দেখিবামাত্রই লাল-পিঁপড়ারা যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, সকলেই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বাসায় ছুটিয়া যায় এবং সবাই মিলিয়া শুঁড় উঁচু করিয়া বাসার চতুর্দ্দিকে যাহার যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধারণতঃ মানুষ ও পশুপাখী নির্ব্বিশেষে ছুটিয়া গিয়া ইহারা সকলকেই গায়ে পড়িয়া আক্রমণ করে বটে, কিন্তু এই খুদে পিপীলিকার বেলায় তাহাদের

বিপরীত আচরণই লক্ষিত হয়। খুদে পিপীলিকারা লাল-পিপড়া ও তাহাদের ডিম, কীড়া প্রভৃতি খাইতে ভালবাসে। একবার কোনরকমে টের পাইলেই হয়, দলে দলে আসিয়া প্রায় ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই বাসা উজার করিয়া ফেলে। খুদের কামড় লাল-পিপড়াদের পক্ষে ভয়ানক বিষাক্ত। একটি পিপড়ার কামড়েই ইহারা যেন বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে এবং দেখিতে দেখিতে ইহাদের শরীর উল্টাদিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়। খুদে পিপড়ার সঙ্গে একবার লড়াই সুরু হইয়া গেলে ইহারা অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিয়াই মরে। প্রথম অবস্থায় দুই চারিটাকে লাল-পিপড়ারা সাঁড়াশির মত ধারাল দাঁত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে, কিন্তু কতক্ষণ আর পারিবে? খুদেরা দলে ভারি, একটা মরিবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দশটা আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করে। তখন লাল-পিপড়ারা কেবল দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। অন্যান্য শত্রুকে যেমন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করে খুদে পিপড়ার বেলায় ইহাদের তেমন আক্রমণাত্মক ভাব মোটেই দেখা যায় না। প্রত্যেকেই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, কাজেই খুদেদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠে না। খুদে পিপড়া আছে এরূপ স্থানের গাছে দূর হইতে বড় বড় বাসাসুদ্ধ লাল-পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি। ভাঙ্গা বাসা হইতে নূতন বাসা তৈয়ারী করিবার জন্য সন্ধানী-পিপড়ারা বাহির হইয়া সারা গাছটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। গাছের কাণ্ডের কাছে এক স্থানে কয়েকটা লাল-পিপড়ার সহিত গুটিকয়েক খুদে পিপীলিকার সাক্ষাৎ হইল। খুদের সামনে পড়িবামাত্রই সন্ধানীরা হঠাৎ যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। অগ্রবর্ত্তী সন্ধানী-পিপীলিকাটি শুঁড় উঁচাইয়া দুই বার অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু দুই বারই পিছু হটিয়া আসিল। সঙ্গীরা কিন্তু শুঁড় উঁচাইয়া তখনও ঠিক এক স্থানে ঠায় দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে অগ্রবর্ত্তী পিপীলিকাটি মুখ ফিরাইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেই সকলে একসঙ্গে তড়তড় করিয়া ছুটিয়া পালাইল। খুদেরা বোধ হয় ইহাদের গন্ধ পাইয়াছিল। তাহারা যেন শুঁকিতে শুঁকিতে পলাতকদের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু গতি তাহাদের মন্থর, পলাতকদের সন্ধান তাহারা পাইল না। গাছের উপরে বসিয়া আমি দুই দলেরই গতিবিধি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম গোটা দুই খুদে পিপীলিকা যেন বিফল মনোরথ হইয়াই গাছের কাণ্ড বাহিয়া নীচের দিকে চলিয়া গেল। লাল-পিপড়াদের সেই ঝুলানো বাসাটার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম— সেখানে ভয়ানক সাড়া-পড়িয়া গিয়াছে, কর্ম্মী-পিপীলিকারা দলে দলে বাহির হইয়া সেই ঝুলানো বাসাটার কাছেই ছোট্ট আর একটা বাসানির্ম্মাণ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া প্রাণপণে টানিয়া ডালের পাতা একত্র জুড়িবার চেষ্টা করিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই মুকুবাহী কর্ম্মীরা আসিয়া সেই পাতাগুলিকে সুতা দিয়া জুড়িয়া দিতে লাগিল। এত তাড়াতাড়ি করার অর্থ তখন বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম। খুদে

পিপীলিকা দেখিয়া যে সন্ধানী-পিপড়ারা পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা বিপদের খবর জানাইবার ফলেই তাড়াতাড়ি সম্পত্তি ও জীবনরক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া এত চটপট কার্য্য করিতেছিল। ভাঙ্গা পুরণো বাসার ভিতর তাহারা কিছুতেই থাকিবে না, কারণ সেই বাসায় যে শত্রু লাগিয়াছে ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, কাজেই নূতন বাসানির্ম্মাণ করা ছাড়া আর উপায় নাই। বাসা সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারী হইতে না হইতেই দেখিলাম-দলে দলে কর্ম্মীরা কীড়া ও পুত্তলি মুখে লইয়া নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাসার নির্ম্মাণকার্য্যও অগ্রসর হইতেছে। কার্য্যের একটুও বিরাম নাই, পিপীলিকাদেরও বিশ্রাম নাই।

গাছের যে স্থানে খুদে পিপড়ার সঙ্গে লাল-পিপড়াদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিছু ক্ষণের মধ্যেই সে স্থান পর্য্যন্ত ডালের সর্ব্বত্র লাল-পিপড়ার রক্ষীদল মোতায়েন হইল। কতকগুলি পিঁপড়া আবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অপর পক্ষের কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত দেখা নাই। লাল-পিপড়াদের এই সব বন্দোবস্ত শেষ হইবার প্রায় মিনিট পনর পরে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম কতকগুলি খুদে পিপড়া এলোমেলোভাবে গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে উঠিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই কি ভীষণ কাণ্ড! যে গুটি দুই খুদে পিপীলিকা নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছিল তাহারাই গিয়া নিজেদের বাসায় খবর পৌঁছাইয়াছে। কিন্তু বাসাটা ছিল তাহাদের মাটীতে, গাছ হইতে প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে। একে, গতি মন্থর, তাহাতে অত দূর হইতে যাতায়াত করিতে খুদেদের যথেষ্ট সময় লাগিয়া গিয়াছিল। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ঐ দলের কতকগুলি পিপড়া রক্ষী লাল-পিপড়াদের নিকটে আসিয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে প্রথম রক্ষী-পিপড়াটাকে ঘিরিয়া ধরিল। মুরগীরা যেমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া আহার করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপভাবে রক্ষী-পিপড়াটা এক একটা খুদে পিপীলিকাকে সাঁড়াশির মত দাঁত দিয়া খুঁটিয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। এদিকে ক্রমশঃ নীচের দিক হইতে খুদে পিপড়ার দল ভারি হইয়া আসিতেছিল। প্রথম রক্ষী প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতেছিল, দূর হইতে দেখিয়া মনে হইল লাল-পিপড়াটা যেন রণাঙ্গণে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে। চোখে মুখে তাহার ভয়ের ভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। প্রথম রক্ষী পুচ্ছদেশ ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ক্রমে মস্তকের কাছে আনিয়া অবশেষে নীরব হইল। ইতিমধ্যে অন্যান্য রক্ষীদের সঙ্গেও খুদে পিপড়াদের অনুরূপ লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ রক্ষীই জীবনত্যাগ করিল। যাঁহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারাও ভয়ে হটিয়া গিয়া নূতন বাসার কাছাকাছি ডালের স্থানে স্থানে জড় হইল। তারপর বাসা হইতে আরও নূতন রক্ষীদল আমদানী হইল। খুদে পিপীলিকারা কিন্তু এবার আর লাল-পিপড়াদের সমবেত প্রতিরোধ এড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারিল

না। দলে দলে তাহারা মরিতে লাগিল। লাল-পিঁপড়ারাও মরিতেছিল। খুদেরা তখন রক্ষীদের উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা প্রধান লাইন হইতে ডালপালার মত প্রায় সাত আটটা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ডালের পাশ ও নিম্ন দিক দিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রক্ষীদিগকে একযোগে আক্রমণ করিল। এবার লাল-পিঁপড়ারা সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল, কিছুতেই তাহারা খুদে পিপীলিকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না, দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। বিজয়ী খুদে পিপীলিকারা তখন দলে দলে লাল-পিঁপড়াদের নূতন বাসার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে লাল-পিঁপড়ারা তাহাদের পুরাতন বাসা হইতে যতদূর সম্ভব সমস্ত ডিম, কীড়া ও পুত্তলি নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে। যখন খুদে পিপীলিকারা দলে দলে বাসার মধ্যে ঢুকিয়া ভিতরে কর্ম্মীদিগকে আক্রমণ করিতেছে সেই সময়ে পুরাতন বাসা হইতে রাণী ও পুরুষ পিপীলিকাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল। খুদে পিপীলিকারা অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কর্ম্মীদিগকে মারিয়া অবশিষ্ট ডিম, কীড়া ও পিঁপড়াদের মৃতদেহগুলি তাহাদের নিজেদের বাসায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পুরুষ ও স্ত্রী-পিঁপড়ারা বাসা হইতে বাহির হইয়া এদিক-ওদিক গাছের ডালে গিয়া কেহ কেহ আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাহারও কোথাও নিস্তার নাই। খুদেরা সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকেও ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে লাগিল। লাল-পিঁপড়াদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমি গাছের কাণ্ডের মধ্যস্থলে কেরোসিন তেল মাখিয়া দিয়াছিলাম। খানিকক্ষণের জন্য অবশিষ্ট স্ত্রীপুরুষেরা বাঁচিয়া গেল বটে ; কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক পরে গিয়া দেখি খুদে পিপীলিকারা আরও অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়া যে স্থানে তেল উবিয়া গিয়াছে, সেই স্থান দিয়া পথ করিয়া লইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অবশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের মৃতদেহ বহন করিয়া তাহাদের বাসায় লইয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে সন্ধান করিয়া পুরাণো বাসায় গিয়াও তাহারা উপস্থিত হইল। সেখানে অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল সকলই লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া গেল।

লাল-পিঁপড়ারা এই খুদে পিপীলিকা ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য শত্রুদের কথা দূরে থাকুক, মানুষ পর্য্যন্ত কামড়ের ভয়ে ইহাদের কাছে ঘেঁসিতে সাহসী হয় না। যে কোন অবস্থাতেই ইহারা মরণ পণ করিয়া লড়াই করিয়া থাকে। কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, মরিয়া গেলেও মৃতদেহে শত্রুর শরীর কামড়াইয়া ঝুলিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের ওজনের তুলনায় বহুগুণ ভারী একটা পাথরের টুকরা, কাঠি অথবা অন্য কোন কিছু মুখের কাছে ধরিবামাত্রই নির্ব্বিচারে সেটাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবে এবং কামড়াইয়া টানিয়া তুলিতে না পারিলেও মুখে লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়া থাকিবে। শত্রু কাছে আসিলেই দূর হইতে নড়াচড়া দেখিয়া ইহারা বাসার উপরে

ও আশেপাশে দলে দলে জমায়েত হইতে থাকে এবং শত্রুর নাগাল না পাইলে সম্মুখের দুই পা ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় ও শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে অনবরত এক প্রকার উগ্রগন্ধযুক্ত বিষাক্ত রস পিচ্‌কারীর মত ছুড়িয়া মারিতে থাকে। জীবন্ত প্রজাপতি, ফড়িং, টিকটিকি ও ইঁদুর প্রভৃতিকে কাছে পাওয়া মাত্রই কেবল শিকারের উদ্দেশ্যে নহে ক্রোধের বশেও কামড়াইয়া ধরে। একটাতে কামড়াইয়া ধরিবামাত্রই অপরগুলি দলে দলে আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে শিকারের ঠ্যাং, ডানা ও লেজ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামড়াইয়া তাহাকে একেবারে টানা দিয়া ধরিয়া রাখে।* যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিকার ছটফট করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটি পিঁপড়াও কামড় ছাড়ে না। শিকার নিস্তেজ হইলে অথবা মরিয়া গেলে অধিকাংশ পিঁপড়াই সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য কাজে চলিয়া যায় ; দুই চারিজন মাত্র মৃতদেহ বহন করিয়া বাসার ভিতরে লইয়া আসে। সময় সময় সকলে মিলিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিবার পূর্ব্বেই প্রজাপতি বা ফড়িং প্রভৃতি প্রবল বেগে ঝাপ্‌টাঝাপটি করিয়া উড়িয়া যায়। যে দুই চারিটি পিপীলিকা তাহাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহারা কিন্তু তখনও কামড় ছাড়ে না, উড়ন্ত প্রজাপতি বা ফড়িংকে কামড়াইয়া ঝুলিয়াই থাকে। ফড়িংও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথাও স্থির হইয়া বসে না। অবশেষে বিষের জ্বালায় ক্লান্ত হইয়া কোন স্থানে বসিবামাত্রই পিঁপড়ারা পা দিয়া সেই স্থানে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আবার তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে। অবশ্য পিঁপড়ারাও দল ছাড়া হইয়া নাস্তানাবুদ হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় ফড়িংএর লেজের সঙ্গে দুই তিনটা পিঁপড়া শিকল গাঁথিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম দুই একটা পিঁপড়া ফড়িংকে আক্রমণ করিলে কোন রকমে সে পলাইবার উদ্যোগ করিবামাত্রই অন্যান্য পিঁপড়ারা পরপর তাহাদের কোমর কামড়াইয়া ধরিয়া শিকল গাঁথিয়া ফেলে, যেন তাহার সঙ্গীরা ফড়িংএর সঙ্গে উড়িয়া না যাইতে পারে। বাসা বাঁধিবার সময় প্রায়ই লাল-পিপীলিকাদিগকে এইরূপ পর পর একটি অপরটির কোমর কামড়াইয়া ধরিয়া চটপট শিকল তৈয়ারী করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। আবার সময় সময় কোন দুর্লঙ্ঘ্য স্থান অতিক্রম করিবার জন্য দেড় ফুট দুই ফুট লম্বা মোটা শিকলও ইহাদিগকে তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছি (৬নং চিত্র)। এই লম্বা মোটা শিকলকে ইহারা ঝুলানো সেতুর মত ব্যবহার করে। সেতু বাহিয়া দলস্থ সকলে অপর প্রান্তে উপনীত হইলে, এক দিকের বাঁধন ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত শিকলটাই নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং নীচের দিক হইতে ক্রমশঃ পিঁপীলিকাগুলি একে একে কামড় খুলিয়া উপরে উঠিয়া আসে।

কর্ম্মী-পিপীলিকারাই বাসার যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে। তাহারা কীড়া, পুত্তলি, রাণী ও পুরুষদিগকে মুখে করিয়া খাওয়ায়। পুরুষরা সময়ে সময়ে নিজেরাও খাইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাণীরা সর্ব্বদাই কর্ম্মীদের মুখ হইতে খাবার গ্রহণ করে। রাণীর চারিদিকে

* পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে অপরাধী বা শিকারকে এইরূপ অদ্ভুতভাবে টানা দিয়া রাখাকে "চেঙ্গী দেওয়া" বলে।

পাঁচ-সাতটি কর্মী তরল খাদ্য মুখে করিয়া অপেক্ষা করে, রাণী একবার ইহার মুখ হইতে আর একবার উহার মুখ হইতে খাদ্য লয়। কর্মীরা বাসা বাঁধে, খাদ্য সংগ্রহ করে, শিকল গাঁথে, লড়াই করে, আবার বাসা স্থানান্তরিত করিবার সময় ডিম, কীড়া, পুত্তলি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যায়। ভেড়ার পালের মত পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গকে এক স্থান হইতে অন্যত্র

চিত্র—৬

এক পাতা হইতে দূরে অবস্থিত অপর পাতা পর্য্যন্ত লাল-পিপীলিকারা শিকল নির্ম্মাণ করিয়াছে।

তাড়াইয়া লইয়া যাইবার ভার কর্মীদের। সময় সময় উহারা পুরুষদিগকে ঘাড়ে কামড় দিয়া ধরিয়া ঘাড়া করিয়া নূতন বাসায় স্থানান্তরিত করে। স্ত্রীরা আয়তনে বড় বলিয়া উহাদিগকে বহন করিতে পারে না, দলে দলে তাড়াইয়া লইয়া যায়। কর্মীরা অবসর সময়ে স্থানে স্থানে কয়েকটিতে একত্র মিলিয়া জটলা করে। উহাদের

মধ্যে আর একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। উহাদের মধ্যে ছোট ও বড় দুই রকমের পিপীলিকা আছে। বড় কর্মীরা এক একটি ছোট কর্মীকে মুখে করিয়া বাসার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লইয়া যায়, সেই সময়ে এমন কতকগুলি হাবভাব লক্ষিত হয় যাহাতে এই ব্যাপারটাকে যৌনসম্মিলন বলিয়া সন্দেহ হয়। পরীক্ষাগারে স্ত্রীপুরুষবিবর্জ্জিত কৃত্রিম বাসার মধ্যে আমি এরূপ কর্মীদের ডিম হইতে দেখিয়াছি

চিত্র—৭

সেলুলয়েডের কৃত্রিম পত্রনির্ম্মিত লাল-পিপীলিকার বাসা
লাল-পিপীলিকারা এই কৃত্রিম পত্র মুড়িয়া সূতা জড়াইয়া বাসা তৈয়ারী করিয়াছে।
স্বচ্ছ সেলুলয়েডের ভিতর দিয়া বাসার ভিতরে পিঁপড়াদের কার্য্যকলাপ
পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

(৭নং চিত্র)। অবশ্য ইহাদের বংশবিস্তার সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে এখনও কোন কথা বলা যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি সাধারণ ক্ষেত্রে অবশ্য সেই উপায়েই বংশবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

লাল-পিঁপড়ারা মাংসাশী; কিন্তু গুড়, চিনি প্রভৃতিও খাইয়া থাকে। প্রয়োজন মত জল এবং দুধও খায়। কীটপতঙ্গের মৃতদেহ, মাছের কাঁটা, মাংসের ছোট ছোট হাড়, পাখীর পালক প্রভৃতি বাসায় লইয়া গিয়া ইহারা যত্ন করিয়া রাখে এবং অবসর মত সকলে মিলিয়া চাটিয়া চাটিয়া খায়। দাঁত দিয়া খুঁটিয়া খায় না, মুখের শক্ত দাঁত দুইটি

কামড়াইবার অথবা কিছু ধরিবার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে সকলে মিলিয়া নিজেদের বাসাস্থ ডিম, কীড়া অথবা পুত্তলি খায়। ইহাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহও প্রয়োজন মত ইহারা খাইয়া থাকে।

অন্যান্য সকল পিপড়ার মত ইহারা একপ্রকার গাছ-উকুন প্রতিপালন করে। এই গাছ-উকুনগুলি চেপ্টা ও ঈষৎ সবুজাভ। সাদা রংএর আর এক রকমের গাছ-উকুনও ইহাদের প্রতিপালন করিতে দেখিয়াছি। বাসাপরিবর্ত্তন করিবার সময় কর্ম্মীরা মুখে করিয়া উকুনগুলিকে স্থানান্তরিত করে। ফাল্গুনচৈত্র মাসে গাছে নূতন পাতা গজাইবার সময় পল্লবের ডাঁটার গায়ে অসংখ্য গাছ-উকুন জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা মাছের আঁশের

চিত্র—৮

আমের মুকুলগুচ্ছের চতুর্দ্দিকে সূতা বুনিয়া লাল-পিপীলিকারা উহার মধ্যে গাছ-উকুন প্রতিপালন করিতেছে।

মত ডাঁটার গায়ে লাগিয়া থাকে, তখন লাল-পিপড়ারা রাতদিন ইহাদিগকে ঘিরিয়া পাহারা দেয়। উকুন ছাড়িয়া ইহাদের অনেকেই কোথাও যায় না। পত্রশূন্য আমগাছে থোকায় থোকায় মুকুলের ডাঁটায়, এবং অশোক ও রঙ্গনফুলের থোকায় এই উকুন জন্মিতে দেখা যায়। লাল-পিপড়ারা ফুলের প্রত্যেকটি থোকা ঘিরিয়া সাদা পাতলা পর্দ্দার মত সূতা বুনিয়া তাহার মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে উকুন তদারক করে এবং তাহাদের রস খায় (৮নং চিত্র)। কাগজের মত পাতলা পর্দ্দা দেওয়া থাকায় মৌমাছি বা অন্য কোন পোকা কোনরূপ উপদ্রব করিতে

পারে না। প্রত্যেক মুকুলের থোকা ঐরূপ সাদা পর্দ্দায় আবৃত থাকায় গাছগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

কালো রংএর ডেঁয়ে পিপড়ারা দুধের মত সাদা একপ্রকার গাছ-উকুনের রস খাইতে ভালবাসে। তাহারাও ঐ সময়ে গাছ-উকুনের সঙ্গে দলে দলে দিন রাত অবস্থান করে। স্থলপদ্মের পল্লবের ডাঁটায় এই জাতীয় সাদা গাছ-উকুন প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন গাছের ডাঁটার চতুর্দ্দিকে খুব পুরু করিয়া এক পোঁচ খড়ি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটা বাগানে একবার আম গাছের নীচু ডালে লাল-পিপড়ারা বাসা বাঁধিয়াছিল। তার পার্শ্বেই একটা স্থলপদ্মের গাছ। গাছটাতে সাদা রংএর অসংখ্য গাছ-উকুন। কাল ডেঁয়েরা দলে দলে তাহার উপর আনাগোনা করিতেছিল। একদিন দুপুরের পর ঝড়ের বেগে পদ্ম গাছটা হেলিয়া গিয়া আম গাছটার উপর পড়ে। ঝড় জল থামিবার কিছুক্ষণ পরে সেখান দিয়া যাইতেই দেখি লাল-পিপড়ারা সারি বাঁধিয়া তাহাদের বাসার আশেপাশে জমায়েৎ হইয়াছে। ব্যাপার কি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটু লক্ষ্য করিতেই ডেঁয়ে পিপড়াগুলি নজরে পড়িল। দুই একটা ডেঁয়ে মাঝে মাঝে আমের ডালের উপর দিয়া ছুটাছুটী করিতেছিল। ইহাই হইল লাল-পিপড়াদের সমর-সজ্জার কারণ। ডেঁয়েরা লাল-পিপড়া অপেক্ষা অনেক বড় এবং তাহাদের দাঁতেও জোর বেশী। ডেঁয়ের কামড়ে মানুষের চামড়া কাটিয়া রক্ত বাহির হয়; কিন্তু তথাপি লাল-পিপড়াকে তাহারা ভয়ানক ভয় করে। দুই চারিবার আনাগোনা করিতেই একটা ডেঁয়ে অসাবধানে একটা লাল-পিপড়ার কাছে আসিয়া পড়িল। দেখিবামাত্রই লাল-পিপড়াটা তাহাকে এমনভাবে তাড়া করিল যে, ডেঁয়ে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া পালাইতে গিয়া একেবারে ডাল হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্যাপারটা কি ঘটে দেখিবার জন্য আমি পদ্ম গাছটাকে ঠেলিয়া লাল পিপড়ার বাসাটার একটু কাছে আনিয়া দিতেই হুলুস্থূল বাঁধিয়া গেল। বাসার ভিতর হইতে দলে দলে লাল-পিপড়ারা শুঁড় উঁচু করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ডেঁয়েদিগকে আক্রমণ করিল এবং প্রায় ৫।৭টা ডেঁয়েকে পায়ে ও শুঁড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া টানা দিয়া রাখিয়া দিল। গোটা দুই ডেঁয়ে লাল-পিপড়াদের কবলে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ যুঝিতেছিল। তাহাদের শক্ত ধারালো চোয়াল দ্বারা প্রায় ৩টি ৫।৬ লাল-পিপড়াকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াও কিন্তু তাহারা নিস্তার পাইল না। লাল-পিপড়ারা দলে দলে আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া টানা দিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ডেঁয়েরা ইতিমধ্যেই বিপদ বুঝিয়া ছুটিয়া পালাইয়াছিল, অনেকে আবার হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইল।

সময়ে সময়ে লাল-পিপড়াদের দুই বিভিন্ন দলের মধ্যেও লড়াই বাঁধিয়া যায়। কোন গুরুতর অবস্থার উদ্ভব না হইলে সামান্য কারণে যখন তখন দুই দলের মধ্যে লড়াই বাঁধে না, কারণ সাধারণতঃ তাহারা যথাসম্ভব পরস্পর পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে।

লাল-পিপড়ারা উইপোকা খাইতে খুব ভালবাসে, কিন্তু উইপোকা তাহাদের পক্ষে দুর্লভ বস্তু। সময় সময় উইপোকারা গাছের গুঁড়িতে মাটীর উপর ডালপালার মত মাটী দিয়া সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করে। লাল-পিপড়ারা নীচে আসিয়া কেহ কেহ তাহাদের শক্ত দাঁত দিয়া সুরঙ্গের ছাত ফুটা করিয়া পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। উইয়েরা ভাঙ্গা ছাত মেরামত করিবার জন্য যেই বাহিরে মুখ বাড়ায় অমনি লাল-পিপড়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসগঠনে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রভাব

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

উচ্চাবচতার ধারা (Gradation)

যে বিরাট ঘূর্ণ্যমান ভূ-গোলকটির আমরা অধিবাসী, তাহা প্রধানতঃ কঠিন বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত (প্রস্তরমণ্ডল); কিন্তু উহার বহির্ভাগ পাতলা বাষ্পীয় আবরণে মণ্ডিত (বায়ুমণ্ডল); এতদ্ব্যতীত একটি অসংলগ্ন তরল পদার্থের স্তরও পৃথিবীবক্ষের কতকাংশ অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে (উদ্‌মণ্ডল)।

প্রস্তরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনায় পরিমাণে নিতান্ত কম হইলেও ভূপঞ্জরের পৃষ্ঠদেশের পরিবর্ত্তনসাধনে উক্ত বায়ুমণ্ডল ও উদ্‌মণ্ডলের প্রভাব কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তরল ও বায়বীয় স্তরের প্রবহনের দ্বারাই পৃথিবীবক্ষের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠে সৌরশক্তির অসম বিস্তারই জল ও বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টির কারণ। উক্ত অসম বিস্তারের মূলে আবার কতিপয় ঘটনার প্রভাব দৃষ্ট হয়,—যথা পৃথিবীর ঘূর্ণন, সূর্য্যকিরণের বিভিন্ন ধারায় পৃথিবীবক্ষে আগমন, এবং স্থল ও জলের নানারূপ বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণেরও আবার হেতু খুঁজিয়া বাহির করা যায়; কিন্তু সে সকল বিষয় আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য নহে।

জল ও বায়ুর বিভিন্নরূপ প্রবহণেই বহুবিধ ব্যাপার সম্পাদিত হয়। নিম্নবর্ত্তী প্রস্তরমণ্ডল উক্ত প্রবহণজাত ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়িত হইয়া যায় এবং কঠিন বস্তুর চূর্ণগুলি এদিক্ ওদিক সঞ্চালিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে এই সমস্ত কঠিন বস্তুর দলাগুলি উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন দিকেই চালিত হইয়া থাকে। ফলে উচ্চতর প্রদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিম্নতর প্রদেশ গঠিত হয়। যে পদ্ধতিদ্বারা এই ব্যাপার ঘটে,

তাহাকেই উচ্চাবচতার ধারা (Gradation) বলা হইয়া থাকে। প্রস্তরমণ্ডলের বহির্দ্দেশ সমতল ভূমিতে পরিণত করার দিকেই ইহার ঝোঁক।

জল ও বায়ুর বিশেষ বিশেষ প্রবাহ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বাতাস খুব প্রবলভাবে বহিতে আরম্ভ করিলে আমরা তাহাকে ঝড় বলিয়া থাকি। জল বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া ঢালু জায়গা দিয়া চলিতে চলিতে স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। তুষার-আকারে পতিত যে জল ক্রমশঃ সঞ্চিত ও শক্ত হইয়া বরফে পরিণত হয়, ঢালু জায়গার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাই বরফের নদী (Glaciers) বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রবল বাত্যাসঞ্চালনে সমুদ্র ও হ্রদের জলে তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া তটদেশকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে। বৃষ্টির যে জল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ফোয়ারার সৃষ্টি করে, সেই জলই মৃত্তিকা অভ্যন্তরের জল।

জলবায়ু দ্বারা ক্ষয়—প্রস্তরমণ্ডলের গাত্র অধিকাংশ স্থলেই একটা অসংলগ্ন উপাদানে গঠিত। সেই অসংবদ্ধ অংশ সহজেই খনন করা বা কর্ষণ করা যায়, স্রোতের জলেও তাহা সহজেই ক্ষয়িত হইয়া থাকে। স্রোতস্বিনী যে পরিমাণে এই আল্‌গা বস্তু বহন করে, সেই পরিমাণেই উহার জল ঘোলাটে হইয়া উঠে। আবার এই অসংলগ্ন মৃত্তিকার অভ্যন্তর প্রদেশ গভীরভাবে খনন করিলেই জমাট শৈল বা পৃথিবীর ভিত্তিগাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানকার জমি অত্যন্ত বেশী ঢালু সেখানে ভিত্তি-শৈলের উপরে কোনও অসংলগ্ন বস্তুর আবরণ নাও থাকিতে পারে। তবে কোথাও কোথাও ঐরূপ সরলোন্নত শৈলেও আবরণ দেখা যায় কেন? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

যে কোনও পর্য্যবেক্ষকই দেখিতে পাইবেন যে শৈল "জীবন্ত" বা "চিরস্থায়ী" নহে। পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে বৃক্ষ জন্মিবার ফলে, অথবা দিন অপেক্ষা রাত্রির অসম তাপ এবং শৈত্যজনিত চাপের দরুণ, অথবা শুদ্ধমাত্র মাধ্যাকর্ষণের ফলেও উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্তরকণা স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। কম ঢালু জায়গাতেও এইভাবে ধ্বংসকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে,—কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেখানে ভগ্নাবশেষ অপসারণের কার্য্য উত্তমরূপে সাধিত করিতে পারে না বলিয়াই দৃঢ় শৈলের ধ্বংসের ফলে ঢালু স্থানগুলির উপর একটা আবরণ পতিত হয়।

উল্লিখিত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কার্য্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াও কম সাহায্য করে না। বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান (oxygen), জল ও কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড আসিয়া শৈলের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অক্সাইড, হাইড্রেটেড যৌগিক পদার্থ ও কার্ব্বনেট্ প্রস্তুত করে। উক্ত সমস্ত রকমের পরিবর্ত্তনই শৈলের বন্ধন শিথিল করিবার কাজে সহায়তা করে বলিয়াই উহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাকৃতিক,

রাসায়নিক ও জৈব—যে কোন উপায়েই এই কঠিন শৈল ধ্বংস হউক না কেন, তাহাদের মোটামুটি সমষ্টিগত ফল ক্ষয়সাধন (weathering)। কিন্তু এই ক্ষয়িত ভগ্নাবশেষও শৈল ভিন্ন আর কিছু নহে, কারণ প্রস্তরমণ্ডলের উপাদানই শৈল। উক্ত ভগ্নাবশেষ কঠিনই আছে বটে (অর্থাৎ তরল বা বাষ্পীয় আকার ধারণ করে নাই), কিন্তু উহা আর সুসংবদ্ধ নহে। উহা আবরণ-শৈল। যেখানে গঠিত হইয়াছে সেখানেই যদি উহা লাগিয়া থাকে, তবে গভীরতর প্রদেশে অবস্থিত ভিত্তি-শৈলকে ভবিষ্যৎ অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর হয় না, কারণ জল ও বায়ুর প্রবাহ আসিয়া তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

বাত্যা—বিভিন্ন প্রবহণের মধ্যে বাত্যাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ কতকটা সীমাবদ্ধ। বাতাসের গুরুত্ব জলের মাত্র ৮০০ শত ভাগের একভাগ এবং জলের তুলনায় উহার ভাসাইয়া লইয়া যাইবার ও ঘর্ষণ করিবার ক্ষমতাও কম। আবরণ-শৈলের সূক্ষ্মতর কণাগুলি মাত্র বাতাসে সরাইতে পারে, কিন্তু তাহাও আবার ভিজা থাকিলে অথবা তাহার উপর গাছগাছড়া জন্মিলে পারে না। বাতাসের কার্য্যকারিতার পক্ষে শুষ্ক জমিই উত্তম।

বায়ুতাড়িত বালুকা সাধারণতঃ মাটির গা ঘেঁষিয়াই চালিত হয়। বাতাসের ঝাপ্‌টা আসা-যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তু লাফাইয়া লাফাইয়া চলে,—উহা তাহাদের অগ্রগতির লক্ষণ। কাজেই বায়ুলাচলের পথে কোনও বাধা উপস্থিত হইলে সে দিকেই বালুকারাশি সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ বালুকাস্তূপটি নিজেই অনতিবিলম্বে বায়ুর গতিপথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া এমন হয় যে কেবলমাত্র বায়ুসঞ্চালিত বালুকাদ্বারাই একশত ফুট বা ততোধিক উচ্চ বালির পাহাড় সৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বালির পাহাড় বা বালিয়াড়িগুলি কিন্তু অচল পদার্থ নহে। বায়ু-অভিমুখী ঢালু স্থানের উপর দিয়া বালিয়াড়ির চূড়া পার হইয়া বাতাসশূন্য স্থানে গিয়াই বালুকা সঞ্চিত হয়; ফলে বায়ু-অভিমুখী ঢালুস্থান ক্ষয়িত হইয়া বাতাসশূন্য ঢালু জায়গা ভরিয়া উঠে এবং বালিয়াড়িগুলি ক্রমশঃ অধিকতর ঝড়ঝঞ্ঝাশূন্য বাতাসের দিকে অগ্রসর হয়। সমুদ্রতীরের বা নদীর উপত্যকার বালিয়াড়িসমূহ সাধারণতঃ অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই বৃক্ষলতাদি সমাচ্ছন্ন হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

বাত্যাতাড়িত পদার্থনিচয়ের মধ্যে বালুকাকণাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। ধূলিকণা অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া বায়ুকর্ত্তৃক অতি সহজেই বহু দূরে অধিক পরিমাণে চালিত হইয়া থাকে। ধূলিকণার অধিকাংশই শুষ্ক প্রদেশের আবরণ-শৈল হইতে সংগৃহীত হয়। কিন্তু বালিয়াড়ির বালুকা যেমন স্থান হইতে অধিক দূরে চালিত হইতে পারে না, ধূলি-কণা তেমন নহে; উহা এত সহজে পরিচালিত ও এত বিস্তৃতভাবে বিকীর্ণ হয় যে প্রত্যেক দেশ হইতেই ধূলিকণা অপর যে কোন দেশে গিয়া সঞ্চিত হইতে পারে। কাজেই

অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া প্রায় শতাধিক ফুট প্রমাণ ধূলার স্তর সঞ্চিত হইয়া সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত আবরণ-শৈল সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে ধূলিসঞ্চালন ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ স্থানে মাত্র এই ধরণের ধূলা সৃষ্ট হইয়া চালিত ও সঞ্চিত হইতে পারে, কিন্তু যে ধূলিরাশি পৃথিবীর বাকী তিন-চতুর্থাংশ স্থানে (অর্থাৎ সমুদ্রে) গিয়া পতিত হয়, তাহারা তো আর স্থলভাগের উপর প্রত্যাবর্ত্তন করে না; কাজেই তাহাতে স্থলভাগের উপাদানের মোটের উপর ক্ষতিই ঘটিয়া থাকে।

স্রোতের জল—পৃথিবীবক্ষে স্থলভাগের উপর যে বৃষ্টিধারা পতিত হয় তাহা যদি কোথাও প্রবাহিত না হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠেই অবস্থান করিত, তবে বৎসরে মাটির উপর দুই হাত জল সঞ্চিত হইত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত জল ঢালু জায়গার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়। এই ঢালু জায়গাগুলি একত্র মিশিয়াই ক্ষুদ্র প্রবাহের সৃষ্টি করে এবং তাহা হইতেই স্রোতস্বিনীর উদ্ভব। পৃথিবীবক্ষের শৈলরাজির ভগ্নাবশেষকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বহন করিয়া লইবার পক্ষে উক্ত স্রোতস্বিনীই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। মিসিসিপি নদী প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১,০০০,০০০ টন অর্থাৎ প্রায় ২১,০০০,০০০ মণ কাদা ও পলি বহন করিয়া মেক্সিকো সাগরে লইয়া যায়। ইহা তো কেবল একটি নদীর কথা; ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে পৃথিবীর স্থলভাগের কতখানি অংশ প্রত্যহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে বড় বড় স্রোতস্বিনীর নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেই ক্ষয়ের মাত্রা বেশী, কারণ বড় নদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের সমবায়ে গঠিত। স্রোতের ক্ষয়ে নদীর গর্ত্ত দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই সেই স্থান দিয়া অধিক জল প্রবাহিত হইয়া ভাঙ্গনের কাজ অগ্রসর হয়। কিন্তু এই ভাঙ্গনেরও একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে। কোন নদীই সমুদ্রপৃষ্ঠ-সমতলের নীচে গভীর হইতে পারে না, আর ততখানি গভীরতাও তাহার মোহানা ব্যতীত অন্যত্র ঘটে না। নদীর খাত যতই গভীর হয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় তাহার ঢালুতাও ততই কমিতে থাকে, ফলে নদীস্রোতের গতিও মন্থর হইয়া আসে, নদী ভাঙেও কম; কাজেই কর্দ্দম এবং পলিও বহন করে কম। যেখানা নদী বেশী গভীর ধলিয়াই পদ্মা অপেক্ষা কম ভাঙে এবং তাহার জলও অধিকতর পরিষ্কার।

যেখানে ভাঙ্গনের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়, সেই অঞ্চলে প্রথমতঃ নদী ও উপনদী খুবই কম থাকে। নদীগর্ভ অধিক ঢালু এবং খাত গভীর হওয়ায় কাজও দ্রুত চলিতে থাকে, উপনদীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, নূতন নূতন নদীখাতের সৃষ্টি হয় যত দিন না সেই অঞ্চলের প্রত্যেক জায়গার জল খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। প্রধান প্রধান নদীগুলিই প্রথমে তাহাদের গভীরতার সীমায় পৌঁছায়, তারপরে উপনদীগুলি এবং সর্ব্বশেষে

পাহাড়ের ঢালু জায়গার সঙ্কীর্ণ স্রোতগুলি পর্য্যন্ত সেই খাতের গভীরতার সীমায় গিয়া উপনীত হয়। অনেক দিন পরে নদীর আদিম জলনির্গমন স্থানগুলির ঢালুতা এত কমিয়া যায় যে নদীর ভাঙ্গন মোটামুটি শেষ হইয়া যায়। যে অঞ্চল একদা উচ্চ ও বন্ধুর ছিল, তাহাই কালক্রমে নিম্ন ও সমতল ভূমিতে পরিণত হয়, তাহার নবীনত্ব আর থাকে না স্থবিরত্ব আসিয়া পড়ে। অবাধ নদীভাঙ্গার অবশ্যম্ভাবী ফল নূতন "পেনিপ্লেন" এর (peneplain) সৃষ্টি। নদীস্রোতে স্থলপ্রদেশের যাহা ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়, সমস্তই গিয়া সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয়লাভ করে। জলবায়ু সংযোগে ভিত্তি-শৈল (bed rock) রূপান্তরিত হইয়া অসংলগ্ন আবরণ-শৈলে (mantle rock) পরিণত হয় বলিয়াই উক্ত স্রোতঃপ্রবাহে অধিকাংশ ভাঙ্গনের কাজ সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমুদ্রের তলদেশে যে সমস্ত বস্তু স্রোতঃচালিত হইয়া সঞ্চিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

মৃত্তিকানিষ্মের জল—বৃষ্টির জল মাটিতে পতিত হইয়া সমস্তটাই ঢালু জায়গা দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায় না; কারণ আবরণ-শৈল ও ভিত্তি-শৈলের গাত্রে অনেক ছিদ্র ও ফাটল আছে, কতক জল তাহার মধ্য দিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। আমরা মাটির উপরে যথেষ্ট পরিমাণে জল সংগ্রহ করিতে না পারিলে সাধারণতঃ মাটি খুঁড়িয়া কূপ নির্ম্মাণ করতঃ জলের চাহিদা মিটাইয়া লই। স্থানবিশেষে কিয়দ্দূর গর্ত্ত খনন করিলেই মাটির মধ্যে হইতে নির্গত পরিষ্কৃত জলে উহা পূর্ণ হইয়া যায়। মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জল মাধ্যাকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং উক্ত জলের অধিকাংশই নিম্নতর প্রদেশে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পথ পাইলে আবার বাহিরে চলিয়া আসে। মৃত্তিকাভ্যন্তরে যাত্রাপথে জল বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমূহ ও দ্রবীভূত জৈব পদার্থের সহায়তায় এবং সম্ভবতঃ উচ্চতর তাপমাত্রায় শৈলগাত্র হইতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ বিগলিত করিয়া সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। খনিজ পদার্থ অধিক মাত্রায় অথবা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইলে সেই স্থানে বড় বড় গর্ত্ত হইতে পারে। আর জল যদি বাছাই করিয়া খনিজ পদার্থ গলাইয়া লয়, তাহা হইলে শৈলগাত্র ছিদ্রময় হইয়া থাকে। উক্ত পদার্থ কোথাও কোথাও আবার সঞ্চিত হইতে পারে, ফলে ধাতুমিশ্রিত মাটির স্তর অথবা পর্ব্বতগহ্বরে 'লম্বমান চৌর্ণসূচী' (stalactites) গঠিত হয়। 'মাটির জল' মুক্ত হইয়া যখন নদীস্রোতে মিশে তখন গলিত খনিজ পদার্থ তাহার সঙ্গে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়। অমিশ্রিত অবস্থায় যে পরিমাণ দ্রব নদীর জলে প্রবাহিত হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ মাত্র গলিত অবস্থায় নদী বহন করিয়া থাকে। বাত্যাতাড়িত ধূলিকণা ও নদীবাহিত কর্দ্দমবালুকা প্রভৃতির ন্যায় এই দ্রবীভূত পদার্থও স্থলভাগের ক্ষয় সাধন করে। যাহারা নানা উপায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ নিত্য ক্ষয় করিতেছে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জল তাহাদের অন্যতম।

বরফের নদী (Glaciers)—যে অঞ্চলের শীতাতপের অবস্থা ও তুষারপাত এরূপ-

ভাবে পরস্পরসম্পর্কিত যে শীত ঋতুতে যে পরিমাণ তুষার সঞ্চিত হয়, গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা কম বিগলিত হয়, সেই অঞ্চলেই 'বরফের নদী' সৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ বরফের নদীসমূহ তো বহু বৎসরের সঞ্চিত তুষারকণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই জমাট তুষারকণাই বরফে পরিণত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের টানে ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া নিম্নদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশের উচ্চ উপত্যকায় তুষার পতিত হইয়া বরফে পরিণত হয়। এইভাবে অতি তুঙ্গ সাধারণ বরফের নদী সৃষ্ট হয়। বরফের নদী অতি মন্থর গতিতে গড়ে দৈনিক কয়েক ফুট মাত্র অগ্রসর হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য-অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বরফ এত পুরু হইয়া জমাট বাঁধে যে সমস্ত প্রদেশটি বরফে আবৃত হইয়া যায়; ফলে পাতের (sheets) আকারের তুষারনদীর সৃষ্টি হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা সমতল ভূমি বা মালভূমিতেই এই ধরণের বরফের নদীসৃষ্টির সম্ভাবনা অধিক। উপত্যকার মধ্যে জমাট না বাঁধার দরুণ এইরূপ বরফের পাত (sheets) বৎসরে কয়েক ফুট মাত্র চলিতে পারে।

মন্থর গতি সত্ত্বেও জমাট বরফ অত্যন্ত বেশী পরিমাণেই ক্ষয়সাধন করে। যে প্রস্তরখণ্ড বরফের তলায় জমাট অবস্থায় থাকে, তাহা ভিত্তি-শৈলের উপর নিজের ভার ও তদুপরিস্থ বরফের সমস্ত ভার চাপাইয়া দেয়; কাজেই বরফের নদীর গতির সঙ্গে গড়াইয়া যাইবার সময় উহা প্রস্তরগাত্র কাটিয়া খাতের সৃষ্টি করিয়া যায়। স্রোতের জলের ক্ষয়-সাধনের সঙ্গে এখানেই বরফের নদীর ক্ষয়সাধনের পার্থক্য। স্রোতস্বিনীর তলায় যে প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহা উপরিস্থ জলের ভার ভিত্তি শৈলের উপর চাপাইয়া দেয় না, বরং নিজেই স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া চলে। চলন্ত বরফ একটা বিশাল উপাবিলেখ (rasp) —পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া কতকগুলি খণ্ড সে তৈয়ারী করে। বরফের নদীর নিম্নে জলবায়ু সহযোগে কোন রূপান্তর ঘটে না। গঠনোপাদানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বরফকর্ত্তিত শৈলখণ্ড ও তাহার জন্মদাতা অক্ষত ভিত্তি-শৈলে কোনও পার্থক্য নাই।

উপত্যকাস্থিত বরফের নদী বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের যেখানে সঞ্চিত হয়, সেখানেই গভীরভাবে কাটিয়া বসে। ঐরূপ নদী উপত্যকাগুলির এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পূর্ণ করিয়া ফেলে এবং নিম্নদিকে গভীরভাবে খনন করিয়া এবং কতক পরিমাণে তলদেশ কর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত খাড়াই ঢালুতার সৃষ্টি করে। বরফাচ্ছাদিত উপত্যকার আকার অনেকটা U-অক্ষরের ন্যায়, কিন্তু নদীর উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ V-এর মত হইয়া থাকে।

নদীর ন্যায় তুষারপ্রবাহ কখনও সমুদ্রে গিয়া মিশে না, কারণ নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিলেই তাহারা সাধারণতঃ গলিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের দ্বারা খনিত বস্তুসমূহের অধিকাংশই স্থলভাগের উপর জমা হইয়া থাকে, এবং এমন একটা বিশিষ্ট ধরণের আবরণ-শৈল সৃষ্টি করে যাহার সহিত জলবায়ুসহযোগে রূপান্তরিত শৈলের কোনও সাদৃশ্যই নাই। বরফাচ্ছাদিত বস্তুর কতকাংশ বিগলিত বরফের জল মিশ্রিত হইয়া চলিয়া যায়, আর

অবশিষ্ট অংশ বরফ নিঃশেষিত হইবার পরেও হাজার হাজার বৎসর ঐ স্থানে পড়িয়া থাকে। অবশেষে আবহাওয়া উষ্ণতর হইলে যে সমস্ত স্রোতস্বিনীর আবির্ভাব হয় তাহাদের দ্বারা বাহিত হইয়া স্থানচ্যুত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত তুষারপ্রবাহসমূহও (Glacier) ভিত্তি-শৈল ধ্বংসের অন্যতম মুখ্য হেতু। তাহারা উপত্যকা গভীরভাবে খনন করিয়া উচ্চ ভূমিকে নিম্নাভিমুখী করে এবং বরফের স্তররূপে সমস্ত পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। যে বস্তুর অপচয় তাহারা করে, একদিন না একদিন সেগুলি সমুদ্রের জলে গিয়া মিশে; কাজেই তাহাতে স্থলভাগের বিশেষ ক্ষতি সংসাধিত হয়।

তরঙ্গ ও সমুদ্রতট-প্রবাহ—তরঙ্গ ও সমুদ্রতট-প্রবাহেও সমুদ্রের বেলাভূমি ক্ষয়িত হইয়া থাকে। জলের উপর বাতাসের ঘর্ষণেই তরঙ্গের সৃষ্টি। বাতাস অপেক্ষা কম দ্রুত হইলেও জলের উপর দিয়া তরঙ্গ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হয়, জলকণাগুলি কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে না চলিয়া দোলনযন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র এদিক্-ওদিক্ দুলিতে থাকে। সমুদ্রের তটভূমি ব্যতীত তরঙ্গের গতিশক্তি অন্য কোথাও কোনও পরিবর্ত্তন ঘটায় না, সলিলপৃষ্ঠের সমতলে তটদেশেই মাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তুষারপ্রবাহ এবং কোন কোন স্থলে স্রোতস্বিনীর ন্যায় তলদেশ ক্ষয়ের ফলে সমুদ্রের তীরও এইরূপ ধ্বসিয়া পড়া হয়। তরঙ্গে নিম্নদেশ ক্ষয়িত হয় বলিয়া উপরের দিক ধ্বসিয়া পড়ে। এই ভাবেই সমুদ্রতট ক্ষয় পায়।

একথা সত্য যে কোনও কোনও সমুদ্রের তীর ভরাট হইয়া সমুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে; যেখানে বাতাস কোনাকুনি মাটির উপর আঘাত করে, সেখানেই সমুদ্রের স্রোতে সমুদ্রতটে বালি ও কঙ্কর জমিয়া উঠে। কিন্তু যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ গভীর জলে চলিয়া যায়, তাহারা আর সমুদ্রের তটে ফিরিয়া আসে না; কাজেই স্থলভাগের পক্ষে উহা ক্ষতিসাধন করে। আর মোটামুটি দেখিতে গেলে তটগড়া অপেক্ষা তট ভাঙ্গেই বেশী। যদি কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইত, তবে কালক্রমে সমস্ত তটদেশই ভাঙ্গিয়া জলের নীচে সব ডুবিয়া যাইত।

যে সমস্ত কারণে পৃথিবীর স্থলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আমরা অতি সংক্ষেপে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম। সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তন —শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মনুষ্যজীবনের সঙ্গে, এমন কি একটি জাতির জীবনের সঙ্গে তুলনায়ও সেই পরিবর্ত্তনের গতি অত্যন্ত ধীর।

আমরা নানা বিষয় আলোচনা করিয়া এই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে 'সূর্য্য যেমন নিশ্চিতই আলোক প্রদান করিবে' ক্ষয়কারী শক্তিগুলিও তেমনই কাজ করিয়া পৃথিবীর মাটি কমাইয়া দিবেই। কারণ সূর্য্যের বিকীর্ণ শক্তিতেই সমুদ্রের উপরিভাগ বাষ্পে পরিণত হয়, তাহাতেই বায়ুমণ্ডলে বাত্যা সঞ্চালিত হয় এবং সেই বাতাসই আবার তরঙ্গ, সমুদ্রস্রোত, বৃষ্টি, নদী, 'মাটির জল' ও বরফের সৃষ্টি করিয়া

থাকে। ইহারাই স্থলদেশ ধ্বংসের কারণ। যে সমস্ত ভগ্নস্তূপ নানাবিধ উপায়ে সমুদ্রগর্ভে স্থান লাভ করে, তাহাদের আয়তনের সমপরিমাণ জল তাহারা সমুদ্রগর্ভ হইতে সরাইয়া দেয় অর্থাৎ সমুদ্র-সমতলকে উচ্চ করিয়া তোলে। যদি বর্ত্তমান দেশগুলি সমুদ্র-সমতল পর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর ক্ষয়িত ভগ্নস্তূপ সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬৫০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৪৩৩ হাত উচ্চে ফুলিয়া উঠিবে। কাজেই পৃথিবীর স্থলভাগ যদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্ষয়িত হইতে থাকে এবং বাধা দিবার মত অন্য কিছুই উপস্থিত না হয়, তবে সমগ্র পৃথিবী যে জলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে তাহা নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী।

অথচ আজও পৃথিবীতে মাটি আছে এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে যতটা মাটি ছিল এখনও ঠিক ততটাই আছে, আর এই সমস্ত ভূমির অনেকাংশই এখনও উচ্চ, বন্ধুর ও নবীন। তাহা হইলে, ক্ষয়কারী শক্তিসমূহ তাহাদের কার্য্য সমাধা করিতে পারে এমন বয়স পৃথিবীর এখনও কি হয় নাই? অথবা ক্ষয়কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারে এমন কোনও কারণ ইহার পশ্চাতে আছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই পৃথিবী-বক্ষে যে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিরাজ করে তাহাদের নিম্নপ্রদেশে ক্ষয়কার্য্যে বাধাপ্রদানকারী শৈল বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত সমতলভূমি একটিমাত্র উপায়ে গঠিত হইতে পারে। ক্ষয়কার্য্যের দরুণ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা এক্ষণে peneplain-এ পরিণত হইয়াছে। তাহাদের নদীসমূহ সমতলে মিশিয়া গিয়াছে, কাজেই সেগুলি এখন আর ভাঙ্গে না। পৃথিবীর বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, যদিও তাহার যৌবন এখনও অতীত হয় নাই। এমন প্রমাণও উপস্থিত করা যায় যাহাতে সিদ্ধান্ত হইবে যে অতীত যুগে পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ এবম্প্রকারের পেনিপ্লেনস্ (peneplation) সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যে সময়ে উহা ঘটিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সমগ্র কালের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আর তখন কখন কখনও স্থলপ্রদেশ অধুনাতন স্থলদেশের অর্দ্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার একটি প্রমাণ আমরা পাই যখন পৃথিবীর বুকে নবযৌবনসম্পন্ন গিরিমালা ও মালভূমি আজও আমাদের চোখে পড়ে। নিশ্চয়ই এমন কতকগুলি কারণ আছে, যাহার ফলে ক্ষয়কার্য্যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া নিম্ন ভূমিকে উন্নত করিয়া তোলে এবং কখন কখনও বা জলমগ্ন ভূমিকে উচ্চ ভূমিতে পরিণত করে। পেনিপ্লেনস্ (peneplation) যখন পুনঃ পুনঃ সাধিত হইয়াছে, এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিও নিশ্চয়ই সেই সময়ের নিমিত্ত শান্ত ছিল, ক্ষয়কার্য্য অবাধে চলিতে পারিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতার ধারার (gradation) প্রতিক্রিয়াশীল যে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের সমতা রক্ষা করে, আমরা এক্ষণে তাহার কথা আলোচনা করিব।

শৈলসঞ্চালন (Diastrophism)

ভূপঞ্জরের স্পন্দন বা কম্পনের ফলে কত সময় মানুষের বিরাট বিরাট অট্টালিকা ভূমিস্যাৎ হয়, কত নগরজনপদ ধ্বংস হইয়া যায়। এই ভূমিকম্পের কারণ কি? অধিকাংশ ভূমিকম্পই অন্তঃস্থ ভিত্তি-শৈলের ভাঙ্গন ও স্খলনের অর্থাৎ স্তরভঙ্গের (faulting) ফল। যে নিপীড়নের ফলে স্তরের ভাঙ্গন ও স্থানচ্যুতি ঘটে, দশ বিশ বৎসরের নিমিত্ত সেই শক্তির চাপ হ্রাস পায়। কিন্তু উহা পুনরায় সঞ্চিত হইয়া সেই অঞ্চলেই আর একটি ভূমিকম্পের সঞ্চার করিতে পারে। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তরমণ্ডলের মধ্যে কোনও রকমের সুশৃঙ্খলিত পরিবর্ত্তন ঘটিবার ফলে যে শক্তির সমাবেশ হইতেছে, তাহাই কঠিনতম শৈলকে ভগ্ন করিয়া তাহার বিশাল বিশাল খণ্ডের স্থানচ্যুতি ঘটাইতেছে।

ভূমিকম্পের ন্যায় তত চমকপ্রদ না হইলেও সমুদ্রতটে স্বাভাবিক উচ্চতার যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও উপেক্ষার বস্তু নহে। সমুদ্রতট হইতে জাহাজে মালপত্র বোঝাই ও খালাস করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে যে পাকা প্রস্তরমঞ্চ শতবর্ষ পূর্ব্বে নিম্মিত হইয়াছিল অধুনা তাহার কোন কোনটি সমুদ্রতীর হইতে অনেক উচ্চ হইয়া দূরে অপসৃত হইয়াছে, কোন কোনটি আবার সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিতও হইয়াছে। এরূপ উন্নতি ও অবনতির পরিচয় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বহুল পরিমাণে দৃষ্টি-গোচর হয়। সমুদ্রতট হইতে বহু দূরের স্থলদেশে কোথাও কোথাও বা পর্ব্বতপ্রান্তরে শিলীভূত সামুদ্রিক জীবজন্তুর দেহ চূর্ণপ্রস্তরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহাও সমুদ্রতটের উচ্চাবচতার পরিচায়ক। দ্রুতই হউক কি মন্থরই হউক, প্রস্তরমণ্ডলের এতাদৃশ সঞ্চালন Diastrophism বা শৈলসঞ্চালন নামে কথিত হয়।

শৈলসঞ্চালনের ইতিহাসে বাস্তবিক বিস্ময়ের বস্তু এই যে, বৃহত্তম স্খলনগুলি যেন ঠিক খাড়াভাবে না হইয়া কাতভাবে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। আমাদের পর্ব্বতশ্রেণীর অনেকগুলিই আকারে শিলাস্তূপের বিশাল কুঞ্চনমাত্র—ঐ শিলাস্তূপ এক সময়ে কোনও অগভীর সমুদ্রের বালুকা অথবা কর্দ্দমের সমতলভূমি ছিল। এইরূপ বিশাল কুঞ্চনের উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ ভূপৃষ্ঠে স্পর্শজ্যাবৎ (tangential) বিরাট সঙ্কোচের ফলে। আর এই সঙ্গে শায়িত সমতল ক্ষেত্রের বরাবরে যে সঙ্কোচক স্তরভঙ্গ দৃষ্ট হয়—যাহার বিস্তৃতি কোথাও কোথাও বহু মাইলব্যাপী—তাহাতেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে পর্ব্বতশ্রেণী গঠিত হইবার সময়ে উক্ত অঞ্চল পর্ব্বতশ্রেণীরেখার সমকোণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

যদি ভাঁজপড়া পর্ব্বতের নিম্মাণভঙ্গীই উক্তরূপ খর্ব্বতার নিদর্শন হইয়া থাকে, তবে পৃথিবী যে-শক্তির বলে সঙ্কুচিত হইয়াছে সেই শক্তিবিজ্ঞানের সহজ কথাতেই উক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। গোড়াতে লোকের মনে এই ধারণা ছিল যে দ্রবীভূত পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে যে-হারে তাপ বিনষ্ট হয়, তাহা এই পর্য্যন্ত

ভূতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক যুগে যে পরিমাণ কুঞ্চন ঘটিয়াছে তাহা সংশোধন করিবার পক্ষে অপারগ। আবার ইহাও মোটামুটিরূপে সম্ভবপর পৃথিবী যে-পরিমাণ তাপ শূন্যে বিকীর্ণ করিতেছে, সেই পরিমাণ তাপ নিজের মধ্যেও সৃষ্টি করিতেছে। অধিকন্তু মধ্যস্থল হইতে নির্গমনশীল (radial) খর্ব্বতার পরিমাণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ উপরোক্ত মতবাদ (অর্থাৎ পৃথিবীর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ার কথা) অনুসারে এইরূপ হওয়া মোটেই উচিত নহে। সুতরাং সঙ্কোচনের কারণ নির্ণয় করিতে আমাদিগকে আরও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মধ্যস্থল হইতে নির্গমনশীল খর্ব্বতার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি? অথবা পৃথিবীর কুঞ্চিত অঞ্চল লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই ধরণের একটা কথা ধারণা করিয়া লই? আমাদের বিশ্বাস, উপরোক্ত ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা তখনই বুঝিতে পারি যখন প্রস্তরমণ্ডলের বিশালতম বন্ধুর ভূমি আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়। প্রস্তর-মণ্ডলের উপরিভাগের দুই-তৃতীয়াংশ মহাসমুদ্র আর এক-তৃতীয়াংশ মহাদেশ (প্রান্তস্থিত অগভীর সমুদ্রসহ স্থলভাগ)। মহাসমুদ্রগুলির গভীরতা গড়ে আড়াই মাইল আর মহাদেশের উচ্চতা গড়ে অৰ্দ্ধ মাইল। এই খাড়াভাবে তিন মাইল উচ্চাবচতার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা একটি অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই—মহাসমুদ্রের তলদেশস্থ প্রস্তরমণ্ডল মহাদেশীয় ভূমি অপেক্ষা অধিকতর ভারী পদার্থে প্রস্তুত। উপযুক্ত গঠনের একটি দোলক দোলাইয়া এই বিষয়টি প্রমাণ করা হইয়াছে। একটি নির্দ্দিষ্ট দোলকের স্থলভূমির উপর দুলিতে যত সময় প্রয়োজন, সমুদ্রের তলদেশে দুলিতে তাহা অপেক্ষা কিছু কম সময় লাগিয়া থাকে। অধিকন্তু মহাসমুদ্রজাত আগ্নেয়-গিরির গৈরিক স্রাব মহাদেশীয় আগ্নেয়গিরির স্রাব অপেক্ষা অধিকতর ঘন। প্রস্তর-মণ্ডলের এই আলোচ্য অঞ্চলসমূহের পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের পার্থক্য প্রায় শতকরা তিন ভাগ। ইহার কারণ নিশ্চিতরূপে এখনও জানা যায় নাই। পৃথিবী সম্পর্কে যে সমস্ত অজ্ঞাত বিষয় রহিয়াছে ইহা তন্মধ্যে অন্যতম। হয় তো কোনদিনই আমরা সম্পূর্ণরূপে উহার তথ্য অবগত হইতে পারিব না। নিম্নতর অঞ্চলসমূহই বহিঃস্থ প্রস্তরমণ্ডলের গুরুতর অংশ। তাহারা অধিকতর ভারী বলিয়াই বোধ হয় তাহারা অধিকতর নিম্নে অবস্থিত। যদি আমরা পৃথিবীকে প্রকাণ্ড কতকগুলি কীলকের দ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পনা করি—যে কীলকগুলির অগ্রভাগ ভূগোলকের ভিতর দিকে রহিয়াছে এবং গোড়ার দিক এই মহাদেশীয় ভূমি ও মহাসমুদ্রের তলদেশ গঠন করিয়াছে, আর যদি একথাও কল্পনা করি যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ক্রমশঃই আয়তনে কমিয়া গিয়াছে, তাঁহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভারী কীলকগুলি অর্থাৎ অংশগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা অংশ হইতে অধিকতর তলায় বসিয়া যাইবে এবং উদ্গমণ্ডল ঠিক তাহার উপরেই সঞ্চিত হইবে।

অভ্যন্তর প্রদেশ সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যে বিরাট অংশগুলির একত্র সমাবেশ ঘটে, তাহাই শৈলসঙ্কালনের মূল কারণ বলিয়া গণ্য হয়। স্থল-দেশের পাহাড়সমূহে যে শায়িতভাবে ধাক্কার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, তাহা এই একত্র সমাবেশের ফল। যে সমস্ত মহাদেশীয় সীমান্ত অঞ্চলে পার্শ্বাভিমুখী বহু বস্তুর সমবায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সাধারণতঃ ভূমিকম্পের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং বিশাল কুঞ্চিত পর্ব্বতরাজি সেই সকল প্রদেশেরই সংলগ্ন অথবা সমান্তরালভাবে অবস্থিত। আবার মহাদেশীয় ভূমি সহজেই ধ্বসিয়া যায় বলিয়া ক্ষুদ্র স্তরভঙ্গ এবং বিভিন্ন দিকে বক্রতা ঘটিতে পারে। শায়িত সকলন সমস্তগুলিই সঙ্কোচক হয় না, কিংবা খাড়া সকলনও সবগুলি সমুদ্রতীরের সমান্তরাল নহে। কোথাও সমুদ্রতীরেখা হয় তো ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে, কোথাও হয় তো ডুবিয়া যাইতেছে, আবার অন্য একস্থানে হয় তো স্থির আছে।

দুইটি পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নিয়তই আমাদের সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছে—"উচ্চাবচতার" (gradation) দ্বারা স্থলদেশ ক্ষয়িত হইতেছে এবং "শৈলসঙ্কালন" (diastrophism) দ্বারা সেই সমস্ত দেশ নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। অধুনা যদিও শৈলসঙ্কালনই অধিক কার্য্য করিতেছে, তথাপি অতীতে এমন দিন গিয়াছে যখন 'উচ্চাবচতা' অপ্রতিহত গতিতে বহু দিন কার্য্য করিয়াছে। এসম্পর্কে আমরা পরে আরও আলোচনা করিব।

জীববিদ্যাবিৎ

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

"লক্ষ যোনি ভ্রমন করে এমন মানবজনম পেয়েছ রে"—যে ভাবুক কবি কবিতার এই পদটী রচনা করিয়াছিলেন, তিনিও বোধ হয় ভাবেন নাই কত বড় সত্যের সন্ধান তিনি এই কয়েকটী কথার মধ্যে দিয়া গিয়াছেন। মানুষ ভগবানের চরম সৃষ্টি কথাটী বলিতে আজ মনে দ্বিধা বোধ হয়, সংশয় আসে; কিন্তু মহাকবি সেক্‌সপিয়রের ভাষায় এই মানুষ সম্বন্ধেই অসঙ্কোচে বলিতে ইচ্ছা করে—What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! মানুষ আজ বুদ্ধিবলে পৃথিবী শাসন করিতেছে, তাহার অগম্য স্থান নাই, তাহার অসাধ্য কাজ খুব কমই আছে। এই মানুষ কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। তাহাকে ঘিরিয়া যে উদ্ভিদ্ ও

প্রাণিজগৎ বিদ্যমান তাহাদিগকে না বুঝিতে পারিলে, তাহাদিগের সহিত জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে কিংবা আপোষ করিতে না পারিলে পৃথিবীতে মানুষের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিত, কারণ তাহারা সংখ্যায় অগণিত এবং তাহাদের অনেকেই মানবের অদৃশ্য ভীষণ শত্রু। আবার তাহাদের কাহারও কাহারও মত মানবের এমন মিত্রও কেহ নাই। শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক তাহাদের আচারব্যবহার, আকৃতিপ্রকৃতি না জানিতে পারিলে, তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে কিংবা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা, অথবা তাহাদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। মানবের প্রতিবেশী এই যে জীবজগৎ (Biosphere) তাহাকে নিবিড়ভাবে জানিবার এবং তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার একমাত্র উপায় জীববিদ্যার (Biology) সাহায্যগ্রহণ। যে সকল মহাপণ্ডিত এই বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন বা করেন সেই জীববিদ্যাবিদ্‌গণ (Biologist) আমাদের নমস্য।

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যেদিন মানব 'নর-বানর' (anthropoid ape) পর্য্যায় হইতে 'নর' (man) পর্য্যায়ে উন্নীত হইল সেই দিন এবং তাহার পরেও বহু কাল ধরিয়া সে বনে জঙ্গলে অসভ্যের মত বাস করিয়াছে। বর্ত্তমানে সে সুসভ্য। এই সভ্য হইবার উপাদান যোগাইয়াছে জীববিদ্যাবিৎ। আজ যখন তাহার কিশোর-গোপাল কল্পনা করে—

নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দেব সৌরভে!
আকাশ পানে তুলব মাথা সকল বাঁধন টুটব গো।
সাগর-জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মত বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।"

তখন তাহার সেই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সাহায্য করে জীববিদ্যাবিৎ।

আবার যখন—

"মহামানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকার তার মালা যোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়
নট তারে তোষে নৃত্যগানে;
স্বর্ণকারেরা ভুষিছে সোনায়,
গোয়ালা জোগায় ছানা সর ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়
বণিকেরা তারে করিছে ধনী।

যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।"

তখনও এসকল কাজের ভার লয় জীববিদ্যাবিৎ। কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধে করিবার প্রয়াস পাইব।

জীবনসংগ্রামে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শরীরপোষণার্থ ও দেহে শক্তিসঞ্চয় করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য। আমাদের খাদ্যদ্রব্য আমরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রধানতঃ উদ্ভিদের নিকট হইতে সংগ্রহ করি। খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে উদ্ভিদের খাদ্যাখাদ্য কি, এবং উহা জানিতে হইলে উদ্ভিদের জীবন-যাপনের প্রণালীটা আমাদিগকে শিখিতে হইবে। এই শিক্ষা জীববিদ্যার সাহায্য ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না। জীববিদ্যাবিৎ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যেখানে ঘাসের একটী পাতা হয় সেখানে কি প্রকারে দুইটী পাতা উৎপন্ন করা সম্ভবপর। তিনিই শস্য-পর্য্যায়ের (rotation of crops) মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং শস্য উৎপাদনের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন। পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে লোকসংখ্যা গড়ে ১২০ হইতে ১৪০ লক্ষ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের খাদ্য-সংস্থানের উপায় আবিষ্কার করিতেছেন জীববিদ্যাবিৎ। তিনি যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে খাদ্যাভাবে আমাদের কি দশা হইবে অনুধাবন করিতে বেগ পাইতে হয় না। মানবসভ্যতা ও সৃষ্টি রক্ষার উপায় আবিষ্কার করার জন্য মানুষের ঋণ তাঁহার নিকট কতখানি! হারমন পর্ব্বতের (Mt. Hermon) উপর যে বন্য গম জন্মে তাহা আজ জীববিদ্যাবিদের চেষ্টাতে 'মারকুইস্' নামক প্রথম শ্রেণীর গমে পরিণত হইয়াছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক বিফেনের গমসম্বন্ধে গবেষণার ফলে ইংলণ্ডে কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদেরই দেশে ইন্দোর গবেষণাগারে হাওয়ার্ডএর নবাবিষ্কৃত গমে এক মধ্যপ্রদেশেই প্রায় দশ কোটি টাকার ফসল উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। এই রকমে সারা পৃথিবীর শস্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া অন্ন-সমস্যার নিরাকরণ ও দেশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিবার সহায়তা করিয়াছেন জীববিদ্যাবিদ্গণ। তাঁহারা অন্য দেশ হইতে নিজের নিজের দেশে নূতন নূতন গাছপালা, জীবজন্তু আমদানি করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া নিত্যই দেশের ধনসম্পদবৃদ্ধি করিবার পথ দেখাইতেছেন। টমসন বলেন—Biology spreads our table, and may help us to spread it more and more.

দেশের গোসম্পদের উন্নতি করা সম্ভবপর হইয়াছে জীববিদ্যাবিদ্গণের গবেষণার ফলে।

তাঁহারাই দেখাইয়াছেন কি প্রকারে গোজাতির উন্নতি করিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্য দধি, দুগ্ধাদির পরিমাণবৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে।

দুধ, ঘি, মাছ, মাংস প্রভৃতি যাহাদের নিকট হইতে পাই সেই সকল প্রাণীর সহিত আমাদের চা'ল, ডাল, আটা, ময়দা, তরিতরকারি যে উদ্ভিদের নিকট হইতে সংগৃহীত হয় তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ সকলকেই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর কমবেশী নির্ভরশীল। আমরা ছেলেবেলায় যে ছড়াটী নিতান্ত গল্পকথা মনে করিতাম আজ দেখি তাহার ভিতর একটা অখণ্ড সত্য নিহিত আছে। আমরা শুনিতাম বাড়ীর কর্ত্তা গরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

গরু কেন দুধ দিস্ না ?

গরু প্রত্যুত্তরে বলিতেছে—রাখাল কেন চরায় না ?

এই প্রকার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে—রাখাল কেন চরাস্ না ?
বৌ কেন ভাত দেয় না ?
বৌ কেন ভাত দিস্ না ?
কলাগাছ কেন পাতা দেয় না ?
কলাগাছ কেন পাতা দিস্ না ?
বৃষ্টি কেন হয় না ?
বৃষ্টি কেন হ'স্ না ?
ব্যাঙ্ কেন ডাকে না ?
ব্যাঙ্ কেন ডাকিস্ না ?
সাপে কেন খায় ? ইত্যাদি।

ইহার প্রত্যেকটী কথায় একের সহিত অন্যের এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। যদি বাঁচিতেই হয়, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাল করিয়া বাঁচা। তজ্জন্য শরীরপোষণের উপকরণ চাই। সেই উপকরণ সরবরাহ করে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। কোঁত (Comte) বলিয়াছেন—"Knowledge is foresight, and foresight is power." উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সম্বন্ধে এই "জ্ঞান" আহরণ করা যায় কেবলমাত্র জীববিদ্যার সাহায্যে।

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শুধু শরীরপোষণ করিয়া দেহে শক্তিসঞ্চয় করিলেই চলিবে না, দেহকে নীরোগ রাখিতে হইবে। প্রথমে যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, আবার রোগাক্রান্ত হইলে তাহার নিদান ঠিক করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পথ্যাপথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। এ সমস্ত করিবে কে ?

জীবাণুর (microbes) সন্ধান যখন মানব পায় নাই, তখন এক একটা মহামারিকে সে ভগবানের অভিশাপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মরণকে বরণ করিয়াছে। এখনও কোথাও কোথাও তেমনিভাবে মানুষ মরে। কিন্তু পাস্তুরের আবিষ্কারের পর মহামারির কারণ আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত জীবাণু যাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাদিগকে এখন আমরা অনায়াসে আয়ত্তে আনিতে পারি এবং তাহাদিগের শত্রুতাকে আগের মত আর আমরা ভয় করি না। শত্রুকে শত্রুর মত আয়ত্তে আনিবার উপায় ও শত্রুজয়ের আনন্দলাভের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন জীববিদ্যাবিৎ। যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি উৎপাদনকারী জীবাণুর প্রকৃতি আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যে তাহাদিগকে আমরা জয় করিতে পারিব সে আশা দুরাশা বলা চলে না।

কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার বা জয়ী হইবার কৌশলটী জানাই জীববিদ্যার চরম সার্থকতা নহে। শরীর নীরোগ রাখিবার উপায়গুলিও আমরা জীববিদ্যার সাহায্যেই জানিতে পারি। সুস্থ শরীরে ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা কি, শরীরের শক্তি বজায় রাখিতে কোন্ প্রকার খাদ্য চাই, হরমোনের (hormone) সহিত শরীর এবং স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কোথায়—এইসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন জীববিদ্যাবিৎ।

সভ্যতার নিদর্শন জামাকাপড়ের উপাদান যোগায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। প্রাতঃকালে উঠিয়া চা খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শুইবার বিছানাপত্রের উপাদান যাহা কিছু সমস্তই আমরা জীবজগৎ হইতে সংগ্রহ করি।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর নিকটই আমরা সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির প্রথম আদর্শ পাই। মানুষ ফুলের বাগান করিয়া, প্রজাপতির পিছনে ছুটিয়া সৌন্দর্য্যের সাধনা করে। শিল্পী সেই সৌন্দর্য্য তুলিতে আঁকিয়া নিজের ও দশজনের আনন্দের খোরাক যোগায়, কবি ছন্দে ও সুরে গাঁথিয়া সেই সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলে।

রবার্ট ব্রুস যখন জীবনে হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী মাকড়সা তাহার অধ্যাবসায়ের আদর্শ তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া জীবনসার্থক করিয়াছিল। কর্ম্মী-পিপীলিকার আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মানুষের অনুকরণীয়। এই রকমে মানুষের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে, মানুষকে কর্ম্মে অনুপ্রেরণা দিতে এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিতে জগতে মানবেতর প্রাণীর তুলনা নাই।

মানুষ সভ্যতাবিকাশের প্রথম যুগ হইতেই তাহার জাতির, তাহার বংশের উন্নতিবিধান কি করিয়া করা যায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে মাথা ঘামাইয়াছে। চরক, সুশ্রুত এতদুদ্দেশ্যে নানাপ্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক

উপনিষদে সন্তানের গুণাবলীর বিকাশের উপর খাদ্যাখাদ্যের প্রভাবের বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। জার্ম্মেণীতে হিট্‌লার অনার্য্য ইহুদির রক্ত যাহাতে আর্য্যশরীরে স্থান না পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক। হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণভেদ যে গভীর উৎকর্ষসাধন জন্য অবলম্বিত হয় নাই একথা জোর করিয়া বলা চলে না।

কিন্তু মানবজাতির উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর করিয়াছে একজন জীববিদ্যাবিদের সাধনা। তিনি নিভৃতে সাধনা করিয়া উদ্ভিদের উৎকর্ষসাধন করিবার পথটী আবিষ্কার করিলেন। মানবজাতির উৎকর্ষবিধানেরও সূচনা এই আবিষ্কার। মেণ্ডেল ও তাঁহার আবিষ্কারের কথা আমরা পূর্ব্বে* বলিয়াছি। এই আবিষ্কারের পর জীববিদ্যাবিদ্‌গণ ভাবিতে লাগিলেন মানুষ যদি তাহার গাছের উন্নতি করিতে পারে, একই পন্থা অবলম্বন করিয়া সে যদি তাহার গরু, ভেড়া, মহিষের উন্নতি-সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার জাতির উন্নতি করিতে পারিবে না কেন? এই প্রশ্ন প্রথম উত্থাপন করেন গ্যালটন (Galton)। তিনিই এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। একটী সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট বংশের পরিকল্পনা—যাহার অধিকারী হইতে মানুষ চিরকাল কামনা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার সম্ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন জীববিদ্যাবিৎ।

মানবসভ্যতার উপাদান যোগাইতে জীববিদ্যাবিদের কৃতিত্বের সম্পূর্ণ হিসাব এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়, মোটামুটি একটু আলোচনা করিলাম মাত্র। প্রত্যেকেই যদি তাঁহার জীবনযাপনের প্রণালীটী মনে মনে চিন্তা করেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন তাঁহার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, অসুখ ও নিরানন্দের জন্য তিনি তাঁহার প্রতিবেশী জীবজগতের নিকট কতখানি ঋণী। শুধু তাহাই নহে। জীববিদ্যার সাহায্যেই আমরা বড়াই করিয়া বলি ভগবান মানুষকে পৃথকভাবে সৃষ্টি করেন নাই, এককোষ আদি-জীবের সন্তানসন্ততির ক্রমবিকাশের ফলই মানুষ। এই ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই পিতামাতার ঊর্দ্ধতন তিনচারি পুরুষের খবর লইয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির সংবাদ বলিয়া দেওয়া আজ সহজসাধ্য হইয়াছে।

* প্রকৃতি, ১১শ বর্ষ, ৩৯৯-৪১২ পৃঃ ; ১২শ বর্ষ, ১-১৩ পৃঃ।

পৃথিবীর পরিধিনির্ণয়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

অতি প্রাচীন কালে সাধারণ লোক তো দূরের কথা পণ্ডিতেরাও অনেকটা কূপমণ্ডুক ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ গ্রাম ও দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাতায়াত করিতেন না। সেকালে অবশ্য এখনকার মত দেশপর্য্যটন নিরাপদ এবং সহজসাধ্য ছিল না। প্রাণ হাতে করিয়া পরিব্রাজকদিগকে দূর দূরান্তে যাইতে হইত। এই সকল কারণে অনেকেই ইচ্ছা থাকিলেও বহু দূর দেশে গমনাগমন করিতে পরিতেন না। তবে তখনকার দিনেও দুই একজন অতি সাহসী সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক নানা দেশ দর্শন করতঃ সাধারণ লোকের মধ্যে আপন আপন অভিজ্ঞতা প্রচার করিতেন এবং এইরূপে প্রাচীন কালে লোকদিগের মধ্যে ভূগোল বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারলাভ করিত। ফলতঃ প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞান বড়ই ভ্রান্ত ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে স্থির বলিয়াই মনে হয়, কেন না ভূপৃষ্ঠ সামান্য পরিমাণে কম্পিত হইলেও সুদৃঢ় অট্টালিকাসমূহ মুহূর্ত্তের মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া যায়। ইহা হইতেই পৃথিবীকে অচল (অচলা পৃথ্বী) বলিয়া ধারণা জন্মে। আকাশকে দূরে গোল হইয়া ভূপৃষ্ঠের সহিত মিশিতেছে বলিয়া অনুমান হয়, এইজন্য সেকালের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীকে একখানি চ্যাপ্‌টা থালার ন্যায় গোলাকার পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিত। অনেক পণ্ডিতেরও ধারণা এইরূপ ছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে প্রাচীন লোকেরা চ্যাপ্‌টা পৃথিবীর প্রান্তভাগে নানাবিধ অত্যদ্ভুত বিভীষিকার কল্পনা করিত। সেইজন্য কলম্বস তথাকথিত অসীম আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিতে আসিবার চেষ্টা করিলে প্রথমে কোন জাহাজ বা মাঝি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে অনেক কষ্টে স্পেনের রাজা ও রাণীর অনুগ্রহে লোক সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কলম্বস কিন্তু নিজে একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"জলস্থলময় পৃথিবীকে আমি গোলাকার বলিয়া পড়িয়াছি। টলেমী (Ptolemy) এবং অন্যান্য প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রগ্রহণ এবং ভূপৃষ্ঠে অন্যান্য বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে জলস্থলময় পৃথিবী কমলা লেবুর ন্যায় বর্ত্তুলাকার, চ্যাপ্‌টা বা ত্রিকোণাকার নহে।"*

*Before the time of Columbus, navigators imagined all sorts of terrors at the edge of a flat earth and Columbus had difficulty in finding sailors who were willing to face these imaginary terrors • • • • Columbus stated "I have always read that the world

বলা বাহুল্য চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলের উপরে পড়ে। ঐ ছায়াকে বরাবরই গোলাকার দেখায়। আর সেই সময়ে পৃথিবী আহ্নিক গতি বশতঃ আপন মেরুদণ্ডের উপরে আবর্ত্তন করে। পৃথিবী গোলাকার না হইলে উহার ঘূর্ণায়মান অবস্থাতেও ছায়া কখনও গোল দেখাইত না। পৃথিবী চ্যাপ্‌টা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই সময়ে মধ্যাহ্ন হইত, কিন্তু তাহা হয় না। বিষুববৃত্তের উপরে দণ্ডায়মান দর্শকের পক্ষে ধ্রুব নক্ষত্রকে ভূচক্রের (horizon) সহিত মিশিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ দর্শক যদি উত্তর দিকে এক ডিগ্রী অগ্রসর হয়, তবে ধ্রুব নক্ষত্রকে ভূচক্রের ১° উপরে দেখিতে পায়; উত্তর দিকে ২° অগ্রসর হইলে ধ্রুব নক্ষত্রকে ভূচক্রের ২° উপরে অবস্থিত মনে হয়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধেও অনুরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশ্য সেখানে ধ্রুব নক্ষত্রকে দেখা যায় না।

এই সকল ও অন্যান্য অনেক দৃষ্টান্তের ফলে প্রাচীন পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে বর্ত্তুলাকার বলিয়া বুঝিতে পারেন। কলম্বসও পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তজ্জন্যই সাহসপূর্ব্বক অজানা আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিতে আসিবার কল্পনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর পরিধি যে কত বড় সে বিষয়ে তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ। কেন না এ সম্বন্ধে তিনি স্পেন রাজার সভায় কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এরাটস্থেনিস (Eratosthenes) নামক জনৈক গ্রীক্ জ্যোতিষী পৃথিবীকে কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং ইহার পরিধিনির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁহার পরীক্ষাটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, আবার তেমনি সহজ।

আমরা প্রত্যহ সূর্য্যকে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া অবশেষে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইতে দেখি। কিন্তু বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে একই বিন্দুতে প্রত্যহ সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত ঘটে না। ২২শে ডিসেম্বরে যেস্থানে সূর্য্যোদয় ঘটে, ২১শে জানুয়ারীতে তাহার অনেক উত্তরে সূর্য্যকে উঠিতে দেখা যায়; আবার ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আরও উত্তরে, এইরূপে ক্রমশঃ সূর্য্যকে উত্তর দিকে নিয়ত সরিয়া সরিয়া উঠিতে দেখা যায়। ২১শে জুনের সূর্য্য আকাশের যে বিন্দুতে উদিত হয় উহার উত্তরে আর সূর্য্যকে যাইতে দেখা যায় না। ঐ দিন উহা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আকাশের যে স্থান দিয়া চলে তাহাকে কর্কটক্রান্তিবৃত্ত (Tropic of Cancer) বলে।

comprising the land and the water is spherical, as testified by the investigations of Ptolemy and others, who have proved it by the eclipses of the moon and other observations made from east to west as well as by the elevation of the pole (pole or north star) from north to south."

Tarr and von Eugeln, *New Physical Geography* (1933), p. 2.

ফলতঃ ঐ তারিখে সূর্য্য কর্কটক্রান্তিবৃত্তের উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেই জন্য ঐ বৃত্তের ঠিক নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠের যে কোনও স্থানে দণ্ডায়মান দর্শক ঐ দিন দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যকে নিজের মস্তকের ঠিক উপরে দেখিয়া থাকে। আর ঐ স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপরে লম্বভাবে প্রোথিত বংশদণ্ড বা স্তম্ভ প্রভৃতির ছায়া তখন পূর্ব্ব বা পশ্চিম কোনও দিকেই পড়িতে পারে না, সুগভীর কূপ বা ইন্দারা প্রভৃতির আশেপাশে কোথাও বাধা না পাইয়া তদ্দেশ পর্য্যন্ত রৌদ্র পৌঁছায়। ফলতঃ প্রাচীন মিশরের সাইনে (Syene) নামক কোন নগরের একটি গভীর ইন্দারার মধ্যে ২১শে জুন তারিখে সূর্য্যরশ্মি খাড়াভাবে গিয়া জল পর্য্যন্ত পৌঁছিত, পার্শ্বদেশের কোথাও বাধা পাইত না।

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া গ্রীক্ জ্যোতিষী এরাটস্থেনিস (২৭৫-১৯৪ খৃঃ পূঃ) সাইনে নগরকে কর্কটক্রান্তির ঠিক উপরে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীর একটি খাড়া স্তম্ভের সহিত ২১শে জুন সূর্য্যরশ্মি ৭°১২′ (৭·২°) কোণ উৎপাদন করে। ঐ নগর সাইনের উত্তরে একই মাধ্যন্দিন রেখায় (meridian circle) অবস্থিত বলিয়া এরাটস্থেনিস মনে করেন।

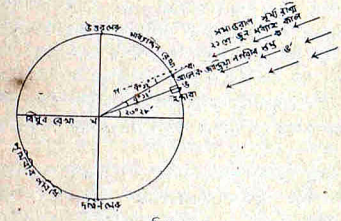

চিত্র—১

প্রাচীন গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ এরাটস্থেনিস কর্ত্তৃক পৃথিবীর পরিধিনির্ণয়

সূর্য্য হইতে পৃথিবী এত দূরে (প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) অবস্থিত যে সূর্য্যরশ্মি একপ্রকার সমান্তরালভাবেই ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় বলিয়া স্বীকার করা চলে। অতএব ১নং চিত্রের ক'গ রশ্মি ঙ'ঘ রশ্মির সহিত সমান্তরাল বুঝিতে হইবে।

জ্যামিতিশাস্ত্রে বলে যে কোন দুইটি সমান্তরাল সরল রেখার উপরে অন্য আর একটি সরল রেখা তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হইলে অন্তরস্থ একান্তর কোণদ্বয় (interior alternate angles) পরস্পর সমান হইয়া থাকে (ইউক্লিডের জ্যামিতি ২য় অধ্যায় ২৯শ উপপাদ্য)। কাজেই ∠গকঘ = একান্তর ∠কঘঙ = ৭°১২′।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর সাইনে সহরের ৫০০০ ষ্টাডিয়াম* উত্তরে ছিল। অতএব সাইনের ইন্দারা এবং আলেক্‌জান্দ্রিয়ার স্তম্ভের মধ্যে মোটামুটি ৫ হাজার ষ্টাডিয়াম ব্যবধান থাকিলে ত্রৈরাশিকের সাহায্যে পৃথিবীর পরিধিকে অনায়াসেই নির্ণয় করা চলে। বলা বাহুল্য প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ এরাটস্থেনিস এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে পৃথিবী একটি গোলাকার পিণ্ডবিশেষ, সুতরাং উহার পরিধিকে একটি বৃত্ত মনে করা যাইতে পারে। আর বৃত্ত মাত্রেরই কেন্দ্রস্থলে ৪টি সমকোণ অর্থাৎ ৩৬০° কোণ হয়। অতএব ৭°১২′ কোণের সমুখীন পরিধির পরিমাণ ৫ হাজার ষ্টাডিয়াম হইলে ৩৬০° কোণের সমুখীন পরিধি = ৭°১২ : ৩৬০° :: ৫০০০ : পৃথিবীর পরিধি ;

$$\therefore \text{পৃথিবীর পরিধি} = \frac{৩৬০^\circ \times ৫০০০}{৭^\circ ১২'} \text{ বা } ২৫০,০০০ \text{ ষ্টাডিয়াম} = ২৮,৭৪০ \text{ মাইল।}$$

আমরা জানি যে পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। সাইনে সহরের ইন্দারা ও আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীর স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপিতে পারিলে এরাটস্থেনিসের গণনা অবশ্যই নির্ভুল হইতে পারিত। দুঃখের বিষয় উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ আধুনিক কালের উন্নত যন্ত্রের সাহায্য পান নাই। বিশেষতঃ হয়ত পূর্ব্বোক্ত নগর দুইটি প্রকৃত পক্ষে একই মাধ্যন্দিন রেখার উপরে অবস্থিত ছিল না। সেই জন্যই এইরূপ ভুল ঘটিয়াছে। আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে এত সহজ উপায়ে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা যাইতে পারে।

* ১ ষ্টাডিয়াম = প্রায় ৬০৭ ফুট।

† উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সকল অর্দ্ধবৃত্ত বিষুবরেখাকে সমকোণে ছেদ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় উহাদিগকে মাধ্যন্দিন বা মাধ্যাহ্নিক রেখা (meridians) বলে। কোন একটি মাধ্যাহ্নিক রেখার উপরে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র একই সময়ে মধ্যাহ্ন হয়।

ষট্‌পদ প্রাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

পোকাদের আচরণ

সমস্ত জীবই রোদবৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম, আলোআঁধার অনুভব করে, নিজের খাবার যোগাড় করে, শত্রু প্রভৃতি হইতে আপনাকে রক্ষা করে,—অন্ততঃ খাবার যোগাড়ের এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সকলেই বংশ রাখিয়া যায়। তাহা না হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ পাইত।

বাটারফ্লাই বা দিনচর প্রজাপতিরা দিনের বেলা রোদে উড়িয়া বেড়ায়, সন্ধ্যা হইলে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসে এবং রাত্রিটা ঘুমাইয়া কাটায়। মথ বা নিশাচর প্রজাপতিরা দিনে বাহির হয় না, রাত্রি হইলে বাহির হয় ও উড়ে। অনেকে যদিও দিনের আলোতে বাহির হয় না, কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে আলো বা আগুন জ্বালিলে তাহাতে উড়িয়া আসিয়া পড়ে এবং আগুনে পুড়িয়া মরে। কালীপুজার সময় রাত্রে আলোতে কত সবুজ রঙের পোকা আসে। দিনের বেলা ঘরের যত মশা অন্ধকার কোণে, বাক্সের ভিতর, জুতার ভিতর বা কালো কাপড়ের ভাঁজের ভিতর যাইয়া লুকায়। মাছিরা রাত্রে উড়ে না, দিনে ঘরের কপাটজানালা বন্ধ করিলে যেখানে একটু আলো পায় সেইখানে যাইয়া জড় হয়; শার্শি দেওয়া জানালা থাকিলে কাচে যাইয়া ঠোক্কর খায়। আর্শলা, উইচিংড়ি, ছারপোকার মত অনেক পোকাই অন্ধকার জায়গায় লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে। মাটি খুঁড়িলে গোবরে পোকা ও এমন অনেক পোকা পাওয়া যায় যাহাদিগকে মাটির উপরে রাখিলেও সঙ্গে সঙ্গে মাটির ভিতর প্রবেশ করে। কোন কোন পোকা দুপুরের রোদে উড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসে। আবার কেহ কড়া রোদ সহ্য করিতে পারে না; হয়ত সকালসন্ধ্যায় খায়, দুপুর বেলা পাতার নীচে কিংবা মাটিতে যাইয়া লুকায়।

কতকটা গুড় জলে গুলিয়া দিন কতক ভিজাইয়া রাখিলে তাহাতে একটা গন্ধ হয়। এই জলে একটা কাপড় বা চট ভিজাইয়া যদি সন্ধ্যার সময় বাহিরে ফাঁকা জায়গায় ঝুলাইয়া রাখা যায় তাহাতে যে কত রকমের পোকা আসিয়া বসে তাহার ঠিকানা নাই। বসিয়া মধুগুল হইয়া রস খাইতে থাকে। তখন এমন কি তাহাদিগকে হাতে করিয়াও ধরা যায়। এই জলে একটু মদ বা তাড়ি মিশাইয়া দিলে আরও উত্তম হয়। গন্ধে অনেক দূর হইতে পোকারা আসিয়া জোটে।

এইরূপে নানারকম গন্ধওয়ালা ঔষধ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রকম রকম ঔষধে রকম রকম পোকা আসে। হয়ত কোন ঔষধে রাজ্যের এক রকম পোকা আসে, অপর পোকা আসে না। সিট্রনেলা তেলে নেকড়া ভিজাইয়া বাহিরে ধরিলে একরকম ফলের মাছি আসে। কিন্তু তাহাদের সকলেই মন্দা। ইহাতে মনে হয় মাদিদের দেহ হইতে এইরূপ কোন গন্ধ বাহির হয়।

অনেক পোকা যেমন রোদ সহ্য করিতে পারে না, রোদের সময় কোথাও যাইয়া লুকায়, তেমনি বৃষ্টির সময়েও পাতার বা ডালের নীচে যাইয়া বসে যেন গায়ে বৃষ্টি না লাগে। গ্রীষ্মকালে যখন প্রথমে বেশী বৃষ্টি হয় সেই সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কত উইচিংড়ি ও অপরাপর পোকা গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। পিপড়ারাও এই সময় দলে দলে সারি বাঁধিয়া তাহাদের বাচ্চাদিগকে মুখে করিয়া বাহির হয় এবং শুক্‌নো উঁচু জায়গায় লইয়া যায়।

পোকারা শীতগ্রীষ্ম বেশ বোধ করে। অনেক পোকা সমস্ত শীতকাল ঘুমাইয়া কাটায়, আদৌ বাহির হয় না; গরম পড়িলে তবে বাহির হয়। আবার অনেক পোকা আছে তাহারা সমস্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ঘুমায় এবং কেবল শীতকালেই বাহির হইয়া থাকে। শীতকালে মাছি ও মশা দেখা যায় না। ছারও প্রায় বাহির হয় না। মেড়ি ও কাটুই-এর পরিচয়ে দেখিয়াছি তাহারা গ্রীষ্মকালে ঘুমায়, শীতকালে বাহির হয়। এই ঘুম পোকাদের জীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বৎসরের মধ্যে হয়ত দশ মাসই ঘুমাইতেছে, ঘুম ভাঙ্গিয়াই হয়ত পতঙ্গ হইল, ডিম পাড়িল এবং বাচ্চারা খাইয়া বড় হইলেই তাহারা আবার ঘুম আরম্ভ করিল। কখনও কখনও কোন কোন পোকা কুম্ভকর্ণের মত দুই তিন বৎসরও ঘুমায়।

অনেক পোকা আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরে কেন? আমরা আগুনের কাছে যখন যাই তাপ অসহ্য হইলে আর অগ্রসর হই না। পোকারা কিন্তু যখন দূর হইতে উড়িয়া আসে নিজেদের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে আগুনে যাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা আগুন দেখিলে উড়িয়া আসে কেন? কেন তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে আগুনের এমন একটা টান তাহাদের উপর আছে যে সেই টানে তাহারা আপনাদিগকে সামলাইতে পারে না। সেইরূপ কোন কোন ঔষধেরও কোন কোন পোকার উপর বিলক্ষণ টান আছে।

এইরূপ আলোআঁধার, রোদবৃষ্টি এবং শীতগ্রীষ্মেরও পোকাদের উপর একটা প্রভাব আছে। এই প্রভাবে তাহারা আপনাদিগকে সামলাইতে পারে না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে যখন রোদ আছে প্রজাপতিরা বেশ উড়িয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ যদি মেঘ করিয়া একেবারে আঁধার না হোক, আঁধারের মতও হয় তাহা হইলে এই সকল প্রজাপতির স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায় এবং তাহারা যেখানে

পারে চুপচাপ বসিয়া পড়ে। কোন পোকা যে শীতকালে, আবার কেহ যে গ্রীষ্মকালে ঘুমায় বোধ হয় ঠাণ্ডা ও গরমের তেজে আপনাদিগকে সামলাইতে না পারিয়াই না ঘুমাইয়া পারে না।

কোন কোন পোকার উপর এই টান বা প্রভাব খাটে, আবার কাহারও উপর খাটে না; কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

পোকাদের খাদ্যসংগ্রহ

পোকাদের মধ্যে অনেকেই উদ্ভিদ্‌ভোজী। আমরা দেখিয়াছি এই সকল পোকার মাতা এমন জায়গায় ডিম পাড়ে যেখানে ডিম হইতে ফুটিয়াই বাচ্ছারা খাবার পায়। নেবুর প্রজাপতি নেবু গাছে, আকন্দর প্রজাপতি আকন্দ গাছে, করবরির প্রজাপতি করবরি গাছে এবং গান্ধিপোকা ধান গাছের উপর ডিম পাড়ে। কলাই-এর বিট্‌ল্ কলাই-এর উপর, চেলে পোকা বা কেরী চাউলের ভিতর, গোবরে পোকার বিট্‌ল্ সারকুড়ে গোবরের মধ্যে ডিম পাড়ে। এইরূপে পরনাশী পোকাও নিজ নিজ আশ্রয়দাতার গায়ে ডিম পাড়ে। আকন্দর কেটার্‌পিলারের পরনাশী মাছি এই সকল কেটার্‌পিলারের গায়ে আসিয়া ডিম পাড়ে। অতএব দেখিতেছি এই সকল পোকার বাচ্ছাদিগকে চেষ্টা করিয়া খাবার যোগাড় করিতে হয় না। ডিম হইতে ফুটিয়াই খাবার পায়। গাছ ফড়িঙ, মাঠ ফড়িঙ ও গঙ্গা ফড়িঙ মাটির ভিতর ডিম পাড়ে। তাহাদের বাচ্ছারা লাফাইয়া লাফাইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে এবং এইরূপে খাবার যোগাড় করিয়া লয়।

মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া, উই প্রভৃতি সামাজিক পোকারা খাবার যোগাড় করিয়া বাচ্ছাদিগকে খাওয়ায়।

পতঙ্গ অবস্থায় পোকারা উড়িয়া যাইয়া খাবারের যোগাড় করিয়া লয়। প্রজাপতি ও মৌমাছি ফুলের মধু খায় এবং উড়িয়া নানা ফুল হইতে তাহা যোগাড় করে। ৪০নং চিত্রের প্রদর্শিত মত অনেক বিট্‌লকে আমরা বিষ্ঠার গুলি গড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখি। গর্ত্তের ভিতর লইয়া যাইয়া ইহারা এই বিষ্ঠা খায়।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পোকার কথা বলিলাম তাহারা সহজেই খাবার পায় এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু হিংস্রক পরভোজী পোকাদিগকে অপর পোকা ধরিয়া খাইয়া বাঁচিতে হয়। সেই জন্য তাহারা নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে। আমরা দেখিয়াছি "পিপড়াচোর" কিরূপে ধূলাবালিতে ফাঁদ পাতিয়া পিঁপড়া ধরে। ৪১নং ক চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে তাহার নাম "মাণ্টিস্"। অনেক সময় কোন কোন মাণ্টিস্ আলোর কাছে আসে। ইহারা অন্য পোকা ধরিয়া খায়। পোকা ধরিবার জন্য ইহাদের সাম্‌নের পা দুটির গড়ন আলাদা। এই দুটি

পা ইহারা প্রায় সকল সময়েই উঁচু করিয়া রাখে যেন হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে। সেই জন্য ইহাদিগকে প্রার্থনাকারী মাণ্টিস্ বলে। পোকা ধরিবার জন্য মাণ্টিস্‌দের নানা রকম কৌশল আছে। কাহারও রঙ ঘাসের মত সবুজ, ঘাসের মধ্যে বসিয়া থাকিলে কাহার সাধ্য সহজে তাহাকে দেখিতে পায়। অপর পোকা শত্রু না দেখিতে পাইয়া কাছে আসিলে মাণ্টিস্ তাহাকে ধরে ও খায়। "গঙ্গাইলাস্" (৪১নং খ চিত্র) বলিয়া এক প্রকার মাণ্টিস্ আছে তাহার গড়ন ও রঙ এ রকম এবং সে এ রকমভাবে

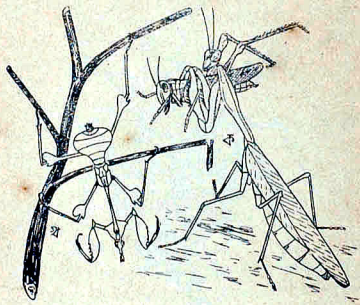

চিত্র—৪১

ক—মাণ্টিস্ পোকা ধরিয়া খাইতেছে।
খ—গঙ্গাইলাস; সাধারণতঃ ইহার সম্মুখের পা দুইটি মস্তক ও বক্ষের সহিত লম্ব থাকে, মাথা নীচের দিকে।

বসিয়া থাকে যেন লম্বা বোটার উপর কোন ফুল ফুটিয়া আছে। অপর পোকা আসিয়া ফুলে বসিতে যায় এবং গঙ্গাইলাসের হাতে প্রাণ হারায়। "রেদুভিড্" বলিয়া এক জাতীয় হেমিপতরা আছে। ইহারা অন্য পোকার গায়ে শুঁড় ফুটাইয়া দিয়া রস চুষিয়া খায় এবং তাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন কোন রেদুভিড্ কাঠির টুকরা, কুটো ইত্যাদি দিয়া নিজের দেহকে এমন ঢাকিয়া রাখে যে সহজে নজরে পড়ে না (৪২নং চিত্র)। তখন অন্য পোকা ইহাকে দেখিতে না পাইয়া সহজেই ধরা পড়ে ও প্রাণ হারায়। কোন কোন পরভোজী পোকা নিজের দেহে ধূলা মাখিয়া মাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং অপর পোকা আসিলেই ধরে ও খায়।

আবার কেহ মাটিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের মুখের কাছে নিজের মুখ রাখিয়া বসিয়া থাকে; কোন পোকা যেমন উপর দিয়া যায় অমনি তাহাকে ধরে ও গর্ত্তে টানিয়া লইয়া খায়। গাছের ডালেও কোন কোন পোকা এইরূপ গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতর অন্য পোকার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

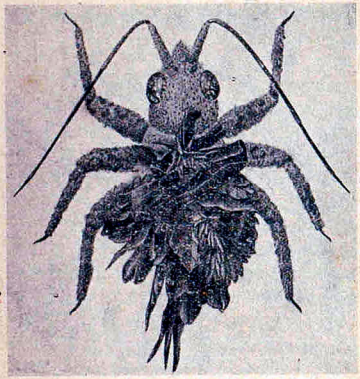

চিত্র—৪২

রেড্‌ভিড্ গড়কুটো দিয়া নিজের দেহ আবৃত করিয়াছে।

অনেক পরভোজী পোকা একমাত্র পায়ের জোরে অন্য পোকা ধরিয়া খায়। জল ফড়িঙ বা গোপালিয়া ফড়িঙ উড়িতে উড়িতে অন্য পোকা ধরে ও খায়। "আসিলিড্" বলিয়া এক জাতের মাছি আছে তাহারা অন্য পোকা, এমন কি মৌমাছি পর্য্যন্ত ধরিয়া মারে ও খায়। এই জন্য ইহাকে "ডাকু" মাছি বলে। অনেক বোল্‌তা অন্য পোকা ধরিয়া খায়। কোন কোন স্থানে এইরূপ বোল্‌তা এত মৌমাছি মারিয়া খায় যে সেখানে মৌমাছি পালন করা কঠিন। অনেক সময় আমরা কোন কোন পিঁপড়াকে দল বাঁধিয়া আসিয়া পোকা ধরিতে দেখি। দল বাঁধিয়া আসিয়া পিঁপড়ারা কিরূপে কেঁচো ধরে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কোন কোন গাছে যে এক রকম লাল-পিঁপড়া হয় একটু

লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহারা কিরূপে পোকা ধরিয়া অনেকে মিলিয়া গাছের উপর বহিয়া লইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-আমেরিকায় এবং আফ্রিকাদেশে এমন পিঁপড়া আছে যাহাদিগকে দেখিয়া বড় বড় জানোয়ারও প্রাণভয়ে পালায়।

উকুনের মত পরবাসী এবং ছার, মশা ও ডাঁসের মত রক্তপায়ী পোকা কিরূপে খাবার সংগ্রহ করে তাহা আমরা সকলেই জানি। হাতীর চামড়ার ভিতর শুণ্ড ঢুকাইয়া দিয়া ডাঁসকে রক্ত খাইতে দেখা গিয়াছে এবং ডাঁস হাতীকে যে স্থানে বিঁধিয়াছে সেই স্থান হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে।

পোকাদের আত্মরক্ষা

পোকাদের অনেক শত্রু। কত পোকা অপর পোকা খায় এবং পোকা খাইয়াই জীবনধারণ করে। এই রকম কয়েকটি পরভোজী, পরবেধী, পরশোষক ও পরনাশী পোকার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেমন—পিঁপড়াচোর, ঘুরঘুরে, মালকাঁকড়া, বোল্‌তা, পিঁপড়া, জল ফড়িঙ বা গোপালিয়া ফড়িঙ, আকন্দর কেটারপিলারের পরনাশী মাছি এবং রেশমের পুলুর পরনাশী মাছি বা কুজিমাছি। এইরূপ অসংখ্য পোকা আছে যাহারা অপর পোকা খাইয়া থাকে। অনেক মাকড়সা কেবল পোকা খাইয়াই বাঁচে। মাকড়সারা জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে; এই জালে মাছি প্রভৃতি কত উড়ন্ত পোকা আসিয়া ধরা পড়ে।

টিকটিকি, গিরগিটি ও বেঙ পোকা খায়। আমরা ঘরে সব সময়েই দেখিতে পাই টিকটিকি পোকা ধরিয়া খাইতেছে। সন্ধ্যার পর আলোতে যখন অনেক পোকা আসিয়া জোটে তখন টিকটিকির খুব আনন্দ, অনেক পোকা ধরিয়া খাইতে পায়। অনেক সময় কাঠ বেঙকে মৌমাছির বাসার কাছে আসিয়া বসিতে দেখা যায়। মৌমাছিরা যেমন বাহির হয় উহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খায়, মৌমাছিতে বিঁধিলেও গ্রাহ্য করে না। বাদলা পোকা যেখান হইতে উড়ে সেখানে কত বেঙ, টিকটিকি এবং কাক ও অপরাপর পাখী আসিয়া জোটে এবং বাদলা পোকাদিগকে ধরিয়া খায়।

কাক, ময়না, শালিক, ফিঙে প্রভৃতি পাখী পোকাদের বিষম শত্রু। ময়না, ফিঙে প্রভৃতি পাখী বেশীর ভাগ পোকা খাইয়াই বাঁচে। সাধারণতঃ পাখীরা যাহা খায় তাহার এক ভাগ বীজ ইত্যাদি এবং দুই ভাগ পোকা।

বাদুড় ও চামচিকা পোকা খায়। এখন জানা গিয়াছে যে ইহারা মশার বিষম শত্রু। সেই জন্য কোথাও কোথাও বড় বড় সহরে ইহাদের জন্য ঘর করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘরে ইহারা থাকে এবং ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়ে।

অনেক জানোয়ারও পোকা খায়। দক্ষিণ-আমেরিকায় "পিঁপড়াখাদক" বলিয়া একপ্রকার জানোয়ার আছে। ইহার মুখ সরু শুঁড়ের মত। ইহা পিঁপড়ার শত্রু এবং পিঁপড়া খাইয়াই জীবন ধারণ করে। আমাদের দেশে বেজী (নেউল) পোকা খায়।

ভালুকে উই খায়, এই জন্য ভালুককে উইঢিপি খুঁড়িতে দেখা যায়। অনেক সময় ভালুকে মৌচাকও নষ্ট করে। বাঁদরেও পোকা খায়। মাছ জলবাসী পোকার শত্রু। মাছেরা যাহা খাইয়া বাঁচে তাহার অর্দ্ধেক জলের পোকা। আমরা দেখিয়াছি মশার কীড়া জলে থাকে। আমাদের দেশের 'তেচোখো' ও অন্যান্য অনেক মাছ মশার কীড়া খায়।

শত্রু ছাড়া অনেক সময় রোগেও অনেক পোকা মরে। যাঁহারা রেশমের পলু পালেন তাঁহারা জানেন পলুর কত রকম রোগ হয়। কখনও কখনও পলুরা পাতুলা বান্ধে করে এবং হাজার হাজার পলু মরিয়া যায়। কখনও কখনও মরা পলুদের দেহ হইতে সাদা চুনের গুঁড়ার মত একটা জিনিষ বাহির হইয়া সমস্ত দেহটি ঢাকিয়া ফেলে। এই সময় পলুকে একটা চুনের কাঠির মত দেখায়। এই রোগকে "চুনা কাঠি" বলে। মানুষের দেহে কিসে দাদ (দক্ষ) হয় তাহা অনেকে জানেন না। ছত্রাক বা "ফাঙ্গাস" নামে এক রকম অতি ছোট উদ্ভিদ্ মানুষের চামড়ায় জন্মে বলিয়া দাদ হয়। এই ছত্রাকের বীজ এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না। ইহা দেহের অন্য জায়গায় লাগিলে সেখানেও দাদ হয়। এই জন্যই দাদ ছোঁয়াচে। পলুর চুনাকাঠি রোগও একরকম ছত্রাক হইতে জন্মে। অনেক পোকারই নানা রকম ছত্রাক রোগ হয়। কখনও কখনও দেখিতে পাই মরা মাছি কোন জায়গায় লাগিয়া আছে এবং উহার দেহ হইতে রেশমের মত একটা জিনিষ বাহির হইয়াছে। ইহাও ছত্রাক রোগ।

রোগ ছাড়া আবহাওয়ার দরুণও অনেক পোকা মরে। জোরে বৃষ্টি হইলে অনেক পোকা, বিশেষ করিয়া ছোট পোকা মারা পড়ে। শিলাবৃষ্টি হইলে পোকা ত দূরের কথা অপর প্রাণীও মরে। গ্রীষ্মকালে প্রথম যখন বেশী বৃষ্টি হয় তখন মাঠে জল দাঁড়াইলে কত পোকা গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইতে বাধ্য হয়। সেই সময় কাক প্রভৃতি পাখীতে অনেককে ধরিয়া খায়। অনেক পোকা জলে ডুবিয়াও মরে। ডিম, কীড়া, পুত্তলি এবং পতঙ্গ অবস্থায় অসংখ্য পোকা মাটির ভিতর থাকে। বৃষ্টি না হইয়া রোদে এবং শুকনো হাওয়ায় মাটি শুকাইয়া গেলেও অনেক পোকা, বিশেষ করিয়া ডিম ও পুত্তলি শুকাইয়া মরিয়া যায়, কীড়া এবং পতঙ্গও মরে, তবে তাহারা আরও নীচে যাইয়া বাঁচিতে পারে।

এই সকল শত্রুর মধ্যে পাখীরাই বেশীর ভাগ পোকা নাশ করে। পাখীরা উড়িতে পারে বলিয়া পোকা তাহাদের হাত হইতে সহসা উড়িয়া পলাইতে পারে না। অধিকাংশ পাখীই দিনের বেলা উড়ে এবং রাত্রিতে ঘুমায়। এই জন্যই বোধ হয় বেশীর ভাগ পোকা রাত্রিতে উড়ে এবং দিনের বেলা লুকাইয়া থাকে।

পোকার যখন এত শত্রু ও রোগ তখন পোকার কুল ধ্বংস হইয়া যায় না কেন? এই কথা অনেকেরই মনে হইতে পারে। বেশীর ভাগ পোকাই মারা পড়ে বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহাদের কুল নষ্ট হয় না। প্রধান কারণ হইতেছে তাহাদের

আশ্চর্য্যরূপ বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা। আমরা দেখিয়াছি অনেক পোকারই এক-একটিতে চারি পাঁচ শত ডিম পাড়ে। কেহ কেহ কয়েক হাজার পাড়ে। এক রকম মাছির এক-একটির কুড়ি হাজার সন্তান হইতে দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডিম ফুটিয়া বাচ্ছারা খাইয়া বড় হইতে এবং পতঙ্গ হইয়া আবার ডিম পাড়িতেও অনেকেরই বেশী দিন সময় লাগে না। ডিম হইতে ফুটিয়া খাইয়া বড় হইয়া আবার ডিম পাড়িবার সময়কে আমরা জীবনীচক্র বলিয়াছি। অনেক পোকারই জীবনীচক্র চৌদ্দ পনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে পূর্ণ হয়। মনে করা যাক একটা পোকা আজ ৫০০ ডিম পাড়িল। এই ডিম ফুটিয়া কীড়া হইল এবং কীড়ারা খাইয়া পুত্তলি হইয়া এক মাস পরে পতঙ্গ হইল। এই পাঁচ শত পতঙ্গের যদি ২৫০ মদ্দা ও ২৫০ মাদি হয় এবং এই ২৫০ মাদির প্রত্যেকেই যদি ৫০০ শত করিয়া ডিম পাড়ে তবে সওয়া লক্ষ (১২৫০০০) ডিম হয়। অতএব দেখিতেছি একটি পোকা হইতে প্রথম বংশেই এক মাস পরে সওয়া লক্ষ পোকা হইতে পারে এবং দ্বিতীয় বংশে দুই মাস পরে সওয়া তিন কোটি হয়। এইরূপে বংশ বাড়িতে পাইলে একটি পোকাতেই পৃথিবী ছাইয়া ফেলিত এবং অপর কোন প্রাণী বা গাছপালা কিছুই পৃথিবীতে থাকিত না। নানারকম শত্রু, রোগ ও আবহাওয়ার জন্য কোন পোকাই এইরূপে বাড়িতে পায় না। ৫০০ ডিমের মধ্যে গড়ে যদি দশটি পতঙ্গ হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট। অনেক সময় তাহাও হয় না। যাহাতে একেবারে কুল নষ্ট না হইয়া যায় সেই জন্য পোকাদেরও এত ডিম পাড়িতে হয়। কতক পাখী প্রভৃতি শত্রুতে খায়, কতক হয় ত খাবার অভাবে মরে, কতক রোগ ও আবহাওয়ার দরুণ বিনষ্ট হয়। এইরূপে অনেক মরিয়া কেবল অবশিষ্ট কয়েকটি মাত্র পতঙ্গ হইয়া ডিম পাড়ে।

শত্রুদের হাত এড়াইবার জন্য পোকাদের নানা রকম কৌশল দেখা যায়।

(ক) কেহ শত্রুকে ঠকাইয়া বাঁচিয়া যায়। আমরা জানি নেবুর প্রজাপতির কেটারপিলার ছোট বেলায় পাতার উপর পাখীর বিষ্ঠার মত দেখায়। অতএব পাখী প্রভৃতি দূর হইতে সহজে ইহাকে চিনিতে পারে না। আবার এই কেটারপিলার যখন বড় হয় এবং পাতা ছাড়িয়া ডাঁটার উপর থাকে, তখন ইহার রঙ ডাঁটার মত সবুজ হয় যাহাতে দূর হইতে সহজে ইহা নজরে না পড়ে। অধিকাংশ পত্রখাদক কেটারপিলারের রঙ পাতার মত সবুজ। পাতার উপর বসিয়া থাকিলে ইহাদের রঙ পাতার রঙের সঙ্গে মিলিয়া যায়। অনেক নিশাচর প্রজাপতি (মথ্), বিটল্ প্রভৃতির রঙ এরূপ যে গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া থাকিলে সহজে নজরে পড়ে না। মাটকড়িঙের রঙ মাটির মত। মাটির উপর বসিয়া থাকিলে দেখা যায় না। ঘাসবনে যাইয়া ঘাস নাড়া দিলে কত ফড়িঙ উড়িয়া অন্য জায়গায় গিয়া বসে। যখন উড়ে তাহাদের পিছনের ডানার রঙ বেশ চক্‌চকে দেখা যায়, কিন্তু যখন বসে তখন তাহাদের রঙ ঘাসের সঙ্গে এমন মিশিয়া যায় যে কোথায় বসিল ধরা যায় না।

করবরি ফুলের গাছে খোঁজ করিলে অনেক সময় কেটার্‌পিলার্‌ পাতা খাইতেছে দেখা যাইবে। ইহার গায়ে যদি ফুঁ দেওয়া যায় কিংবা ডালটি ধরিয়া নাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহা থমকিয়া দাঁড়ায়। তখন মনে হয় যেন ইহা একটি শুকনো ডাল, কেটার্‌পিলার নয়। ইহার রঙও সেইরূপ।

মান্টিসের ঘাসের পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকার কথা আগে বলিয়াছি। একপ্রকার পোকা আছে তাহাদের কাঠির মতই চেহারা (৪৩নং ক চিত্র), আর এক রকম পোকাকে পাতার গুচ্ছ বলিয়া ভুল হয় (৪৩নং খ চিত্র)।

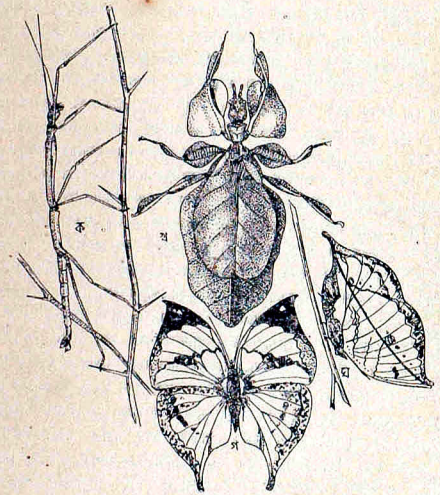

চিত্র—৪৩

ক—কাঠিপোকা শুক্‌নো ডালের নীচে বসিয়া আছে।
খ—এই পোকাকে পাতার গুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।
গ ও ঘ—কালিমা নামক প্রজাপতি ; যখন উড়ে ডানার উপরে হল্‌দে ও কালো রঙ দেখা যায় (গ)। যখন বসে ঠিক মনে হয় যেন একটি শুক্‌নো পাতা ডালে লাগিয়া আছে (ঘ)।

অনেক প্রজাপতি ও মথ্‌ যখন গাছের ডালে বসে তখন মনে হয় যেন ডালে শুকানো পাতা লাগিয়া আছে (৪৩নং ঘ চিত্র)। আবার কাহারও কাহারও ডানায় এমন বড় বড় দাগ থাকে যে এই দাগগুলিই প্রথমে পাখীর নজরে পড়ে এবং পাখী এই দাগই ধরিতে যায়, তাহাতে পোকা বাঁচিয়া যায়। তসরের ও মুগার চোক্‌ড়া চোকৃড়ীর ডানায় বড় বড় চোখের মত দাগ এই ধরণের (২১ ও ২২নং চিত্র)।

অনেক মাছি বোল্‌তার চেহারা নকল করে। এই মাছিদিগকে দেখিলে বোল্‌তা বলিয়া ভুল হয়। যে পাখী একবার বোল্‌তা ধরিয়াছে এবং তাহার বিঁধানি খাইয়াছে সে এই মাছিদিগকেও বোল্‌তা মনে করিয়া ভয়ে কখনও ধরে না। এইরূপে এক পোকা অপর পোকাকে নকল করিয়া শত্রুর হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

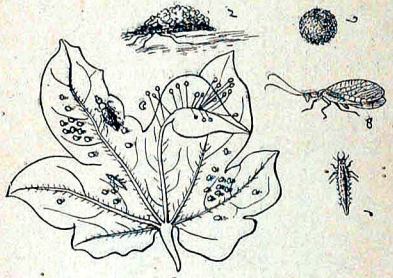

চিত্র—৪৪
ক্রাইসোপার জীবনী

(১) ক্রাইসোপা কীড়া, ইহা গাছ উকুনের রক্ত চুষিয়া খায়
এবং (২) উকুনের শোষিত চর্ম্মগুলি নিজের পিঠের উপর সাজাইয়া দেহকে ঢাকে।
(৩) বড় হইয়া কীড়া গোল গুটী করিয়া ইহার ভিতর পুত্তলি হয়
এবং (৪) শেষে পতঙ্গ হইয়া বাহির হয়।
(৫) যেখানে গাছ উকুন থাকে সেখানে পাতার উপর যেমন দেখানো হইয়াছে লম্বা সরু ডাঁটার উপর এক একটি ডিম পাড়ে। পাতার উপর গাছ উকুন ও ক্রাইসোপা কীড়া রহিয়াছে।

(খ) অনেক পোকা নানা রকমে লুকাইয়া থাকে। কোন কোন গাছে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই কতকটা থুথু রহিয়াছে। এই থুথুর ভিতর এক হেমিপ্‌তের্‌

পোকা থাকিয়া গাছের রস চুষিয়া খায় এবং নিজের দেহ হইতে এই থুথুর মত ফেনা বাহির করিয়া ইহার ভিতর লুকাইয়া থাকে। রেডুভিড্ কুটোমাটি দিয়া নিজের দেহকে ঢাকিয়া রাখে (৪২নং চিত্র), ক্রাইসোপা মরা গাছ উকুনের ছাল দিয়া নিজের দেহ ঢাকে (৪৪নং চিত্র), গাছ এঁটেলীর দেহ সাদা গুঁড়া ও তুলার মত জিনিষে ঢাকা থাকে। ঝিনুক ও স্কাইস-এর মত গাছ এঁটেলী দেহটি শক্ত খোলায় ঢাকিয়া রাখে।

রেশমের পলু ও অপর অনেক কেটার্‌পিলার্‌ যে গুটী করে তাহাও শত্রু হইতে ঘুমন্ত পুত্তলিকে নিরাপদ করিবার জন্য। অনেকে এইরূপ গুটী না করিয়া মাটির ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়।

ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে অনেক সময় চিঁড়ার মত জিনিষ চলিতে দেখা যায়। ইহার ভিতর একটি ছোট কেটার্‌পিলার্‌ লুকাইয়া থাকে। কেটার্‌পিলার্‌ মাথা ও পা বাহির করিয়া যখন চলে তখনই চিঁড়াটিও চলে (৪৫নং ক, খ, গ, ঘ চিত্র)।

এক প্রকার কেটার্‌পিলার্‌ ঘাসের পাতা বাঁধিয়া ৪৫নং ঙ চিত্রের মত ঘর করে ও তাহার ভিতর থাকে। বাবলা গাছে খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে কোন কোন কেটার্‌পিলার্‌ একটি শিঙের মত ঘর করিয়াছে, আবার কেহ বা কাঁটা কাটিয়া সাজাইয়া এইরূপ ঘর করিয়াছে।

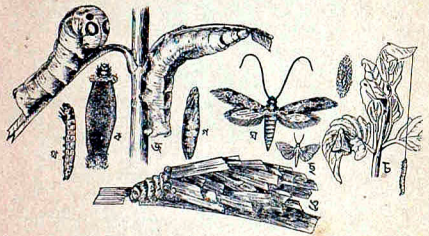

চিত্র—৪৫

ক, খ, গ, ঘ—চিঁড়া পোকা ; চ্যাপ্টা চিঁড়ার মত থলির ভিতর কেটার্‌পিলার্‌ (ক), কেটার্‌পিলার্‌ বাহির করিয়া দেখানো (খ), পুত্তলি বাহির করিয়া দেখানো (গ), মথ্ বা স্বরুই উড়ন্ত অবস্থায় (ঘ)।

ঙ—কেটার্‌পিলার্‌ ঘাসের পাতার টুকরা বাঁধিয়া ঘর করিয়াছে।

চ, ছ—তিলের পাতার পোকা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; গুটীর ভিতর পুত্তলি এবং বসা (চ) ও উড়ন্ত (ছ) মথ্ দেখানো হইয়াছে।

জ—করবরির কেটার্‌পিলার্‌ কিরূপে ভীতিজনক চেহারা করে।

(গ) অনেক পোকা অপর নানা রকম উপায়ে শত্রুর হাত এড়াইতে চেষ্টা করে। কেহ কেহ ছুঁইবামাত্র কুণ্ডলি পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। গাছের উপর থাকিলে এইরূপে কুণ্ডলি হইয়া মাটিতে পড়ে। কেহ বা মুখের রেশমের তারে শূন্যে ঝুলিতে থাকে (৪৫নং চ, চিত্র)। চেলে পোকাকে এবং তদপেক্ষাও বড় উইভিলকে ছুঁইলে এমন কি ইহাদের গায়ে ফুঁ দিলে ইহারা হাত-পা গুটাইয়া মরার মত পড়িয়া থাকে। শুঁয়া পোকাকে ধরিলে শুঁয়ার দরুণ পিছলাইয়া পড়িয়া যায়।

(ঘ) কেহ কেহ শত্রুকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইতে চেষ্টা করে।

নেবুর প্রজাপতির কেটার্‌পিলারের গায়ে হাত দিলে কিংবা গায়ে কাঁটা ফুটাইলে অথবা দেহটি চাপিয়া ধরিলে ইহা ঘাড় হইতে Y-আকারের নরম লাল শিঙ বাহির করে এবং শিঙ হইতে কাঁটালি চাঁপার ফুলের গন্ধের মত একটা কড়া গন্ধ বাহির হয়।

খোঁজ করিলে করবরি ও টগর ফুলের গাছে ৪৫নং জ চিত্রের মত এক বড় কেটার্‌-পিলার দেখা যায়। চিত্রে ডান দিকে ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় পাতা খাইতেছে। ছুঁইলে ইহা কিরূপে মাথা তুলিয়া এবং দেহের অগ্রভাগ বাঁকাইয়া বড় বড় দুইটি চোখের মত দাগ বাহির করে, বাঁ দিকের চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে।

ছার এবং নানা রকম গান্ধি পোকার গন্ধও শত্রু তাড়াইবার উপায় বলিয়া মনে হয়।

(ঙ) কেহ কেহ নানা উপায়ে শত্রুর সহিত লড়াই করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় সাপের মাসী (৪৬নং ক চিত্র) যেখানে

চিত্র—৪৬

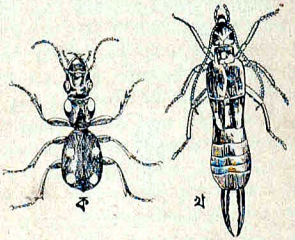

ক—সাপের মাসী বিট্‌ল্ খ—ফর্‌ফিকিউলা

সেখানে বেড়ায়। ইহাকে হাতে করিয়া ধরিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহ হইতে সামান্য শব্দের সহিত এমন একটা রস বাহির হইয়া হাতে লাগে যে তাহার দুর্গন্ধ এবং লাল্‌চে রঙ কয়েক দিন ধরিয়া হাত হইতে ছাড়িতে চাহে না।

গাছ ফড়িঙ ও উইচিংড়িকে ধরিলে উহাদের পিছনের পায়ের কাঁটা হাতে ফুটাইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়।

মৌমাছি বোল্‌তা, ভীমরুল এবং কোন কোনও পিঁপড়া কেমন বিঁধে তাহা অনেকেই জানেন। অধিকাংশ পিঁপড়াই কামড়ায়।

কোন কোন শুঁয়াপোকা আমাদের গায়ে লাগিলে চামড়ায় শুঁয়া ফুটিয়া যায়, তখন সেই স্থানটা চুলকায়, এমন কি ঘা হয়। এইরূপ শুঁয়াও শত্রু তাড়াইবার এক উপায়।

(চ) অনেক পোকার দেহের গড়ন এমন যে অনেক শত্রুর হাত হইতে ইহারা সহজেই বাঁচিয়া যায়। শুঁয়াপোকা সহজে পাখীতে খায় না। অধিকাংশ পতঙ্গেরই দেহের চামড়া শক্ত খোলার মত। গোবরে পোকা দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারি। তাহার উপর অনেকেরই দৌড়াইবার, লাফাইবার এবং উড়িবার ক্ষমতা অসাধারণ।

এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পোকা এবং তাহাদের শত্রুর মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। শত্রুদেরও আবার শত্রু আছে। পোকার শত্রু বেঙ, বেঙের শত্রু সাপ। পোকার শত্রু পাখী, পাখীদেরও আবার কত শত্রু। পরনাশী পোকার উপরও পরনাশী পোকা দেখা যায়। আবার এই দ্বিতীয় পরনাশী পোকার উপরে তৃতীয় পরনাশী পোকাও দেখা গিয়াছে। অতএব কোন পোকাই যেমন খুব বেশী বাড়িয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুরাও আবার বেশী বাড়িয়া কোন পোকাকেই একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না। শুধু পোকা কেন, পৃথিবীর অপর যে কোন প্রাণীই এইভাবে জীবনযাপন করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এমন সামঞ্জস্যরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন যেন পৃথিবীতে সকলেরই স্থান হয়।

বর্ণবিভ্রম

শ্রীসুধীরকুমার বসু

আমরা 'রাত-কাণা' ও 'দিন-কাণা' মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়া থাকি ও তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করি। কিন্তু অনেকেই হয় তো শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আমাদের মধ্যে চৌদ্দ আনা মানুষই 'রঙকাণা' অর্থাৎ রঙ বা বর্ণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিতে অসমর্থ। অথচ নিজেদের এই দৃষ্টিবিভ্রম সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অবগত নহি। একই রঙকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, এই অজুহাত দেখাইয়া কেহ কেহ নিজের বর্ণবিভ্রমের দোষ কাটাইবার চেষ্টা করিলেও বস্তুতঃপক্ষে রঙ সম্বন্ধে যে আমরা অনেকেই কাণা বা অন্ধ, বর্ত্তমানে পরীক্ষায় তাহা বেশ ধরা পড়িয়াছে।

ডালটনের নাম বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বর্ণবিভ্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার নিজের ত্রুটীও তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ধরিতে পারেন নাই। এরূপ শোনা যায়, একদিন তিনি সাজ-পোষাক পরিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহার ধারণা তিনি ফিকে ধূসর (sober grey) রঙের মোজা পরিয়া বাহির হইয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল যে তাঁহার পায়ে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের (scarlet) মোজা রহিয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথম নিজের দৃষ্টিবিভ্রম বুঝিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অনেক ব্যক্তিই কোন না কোন রঙ সম্পর্কে অন্ধ। শুধু তাহাই নহে, নিজেদের এই ত্রুটী সম্বন্ধেও অনেকে অবগত নহেন। কেহ কেহ আবার এই ত্রুটী আদৌ মানিয়া লইতে চাহেন না। তজ্জন্য সময় সময় কম অনর্থ ঘটে না! বিশেষতঃ, আধুনিক যুগে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে যে সব রঙবেরঙের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাহাতে রঙ সম্পর্কে দৃষ্টিক্ষীণতা বা অন্ধতা বিদ্যমান থাকিলে পদে পদে দুর্ঘটনা ঘটিবারও সম্ভাবনা। রঙ সম্পর্কে দৃষ্টিবিভ্রম এরূপ অনেক দুর্ঘটনার মূল বলিয়া পরীক্ষায়ও জানা গিয়াছে। কোন কোন ব্যবসায়ে রঙের যথার্থ ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং বর্ণান্ধ কাহাকেও এরূপ ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে।

লাল, নীল এবং পীত এই কয়টি রঙকে মূল রঙ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। সবুজ, জরদ (orange) এবং বেগুনী (violet) রঙ ঐ মূল রঙের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, যেমন—লাল ও নীলের সংমিশ্রণে বেগুনী, লাল ও পীতে জরদ, নীল ও পীতের সংমিশ্রণে সবুজ রঙের উৎপত্তি। এতদ্ব্যতীত মূল রঙেরও বিভিন্ন

প্রকার ভেদ রহিয়াছে, যেমন—সিঁদুরে লাল, গোলাপী, পিঙ্ক (pink), স্কারলেট, রক্তবর্ণ প্রভৃতি লালেরই বিভিন্ন রকমারি মাত্র। মূল রঙের প্রকারভেদ ছাড়িয়া দিলেও বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে আবার বহুবিধ রঙের উৎপত্তি হয়। যেমন ধূসর, বাদামী (brown), নিউট্রাল (neutral) প্রভৃতি। সকল প্রকার রঙের আবার বিভিন্ন ক্রম (gradation) রহিয়াছে, যেমন—গাঢ় ধূসর, ধূম্র-ধূসর, ফিকে ধূসর ইত্যাদি।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে ব্যক্তি 'লাল' রঙ সম্পর্কে অন্ধ, তাহার নিকট লাল রঙ 'গাঢ় ধূসর' বলিয়া প্রতিভাত হয়, সবুজ রঙ মনে হয়'ফিকে ধূসর'। এরূপ দেখা গিয়াছে যে রঙকাণা ব্যক্তি 'চেরি' ও তাহার পাতার রঙের মধ্যে কোন পার্থক্য ধরিতে পারে না। অধিকাংশ ব্যক্তিই অনেকক্ষণ কোন উজ্জ্বল লাল আলোকের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ রক্ত জবার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা 'কালো' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমাদের চোখদুইটি এমনিভাবে অনেক সময়েই প্রতারিত হয়। কোন একটা ফুলবাগানের কথা ধরা যাক। যখন বাগান হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া আমাদের চক্ষুর নার্ভের মূলদেশে পতিত হয়, তখন উহা আমাদের চোখেই পড়ে না; কিন্তু সেই আলোকই যদি আমাদের নেত্রপটের (retina) ঠিক কেন্দ্রস্থলে পতিত হয়, বাগানের বর্ণবৈচিত্র্য তখন আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। ঐ আলোক আবার নেত্রপটের একান্তে গিয়া পৌঁছিলে বাগানের ছবিখানি শুধু বিবর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

রঙ সম্পর্কে অন্ধতার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ রঙকাণা বা বর্ণান্ধ ব্যক্তিই নীল এবং সবুজ রঙের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন না। সিঁদুরে লাল, জরদ, পীত একদিকে এই তিন রঙের মধ্যে যেরূপ গোলমাল হইয়া যায়, তেমনি আবার নীল, বেগুনী এবং নীলাভ-লাল (purple) রঙের মধ্যেও কোন্‌টা ঠিক কোন্ রঙ বুঝা শক্ত হইয়া উঠে। ধূসর এবং মরকত-সবুজ (emerald green) এই দুই রঙের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেক সময় একটাকে অপর রঙ বলিয়া অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল করিয়া বসেন। অনেক বাদামী রঙের সঙ্গে লাল রঙের (Indian red) যেমন গোলমাল হইয়া থাকে, তেমনি কোন কোন নীলপ্রধান সবুজ রঙকে 'নীল রঙ বলিয়া ভুল হয়। ডালটনের নিজের কথাই এইখানে উদ্ধৃত করা যাক্; তিনি লিখিয়াছেন—"That part of the image which others call red, appears to me as little more than a shade or defect of light; after that the orange, yellow and green appear one colour, which descends pretty uniformly from intense to a rare yellow, making what I call different shades of yellow. The difference between the green part and the blue part

(of the spectrum) is very striking to my eye; they seem to be strongly contrasted. That between the blue and purple is much less." অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির যে অংশকে অপর লোকে 'লাল' বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আমার নিকট শুধু ঐ বর্ণের একটা অনুক্রমবিশেষ বা আলোর অল্পতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার পর জরদ, পীত ও সবুজ এই কয়টি রঙ আমার নিকট একই বোধ হয়, এক রঙই যেন গাঢ় পীত হইতে ক্রমে ক্রমে পীতবর্ণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফলে উহাদিগকে আমি এক পীত রঙেরই বিভিন্ন ক্রম (shades) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। (বর্ণচ্ছত্রের) সবুজ এবং নীল অংশের পার্থক্য আবার আমার চোখে বিশেষ স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। এই দুইটি রঙই সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, অথচ নীল এবং বেগুনী রঙের পার্থক্য তেমন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না।

উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ডালটন লাল রঙ সম্পর্কে কিরূপ অন্ধ ছিলেন। সবুজ রঙ সম্পর্কে অনুরূপ অন্ধ লোকও বিরল নহে। উভয় রঙ সম্পর্কে এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম অনেকটা একইভাবে ঘটিয়া থাকে। বর্ণান্ধ ব্যক্তিগণের চোখে সমগ্র পৃথিবীর রূপ শুধু মাত্র পীত, নীল এবং শ্বেত বা ধূসর এই তিন রঙের ভিতর দিয়াই প্রতিভাত হয়।

রঙ সম্পর্কে উল্লিখিত বিশেষ দৃষ্টিবিভ্রমের কথা ছাড়িয়া দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ত্রুটীও পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ত্রুটী অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে। লাল বা সবুজ রঙ সম্পর্কে যে অন্ধত্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার জন্য চোখের নার্ভের বিকলতাই যে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনও দেখা যায়, যাহাদের ঐ নার্ভ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে অর্থাৎ চোখে কোন দোষ নাই—তাহারাও অনেক সময় কোনও সূক্ষ্ম রঙের বিশ্লেষণ উপস্থিত হইলে সকলে একমত হইতে পারেন না। এইরূপ মতভেদ চিত্রশিল্পী, রঙজীবী (dyers) এবং রঙসম্পর্কিত নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের কারণ আমাদের চক্ষুস্থিত একপ্রকার পীতবর্ণ রঞ্জকপদার্থ (pigmentation)। এই বস্তু কাহারও কাহারও চক্ষুর স্বচ্ছ কাচ বা লেন্সের মধ্যে অবস্থিত থাকে, কাহারও বা আবার নেত্রপটের (retina) কেন্দ্রস্থলের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ইহা বিরাজ করে। সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধদের চক্ষুতে ঐ রঞ্জক পদার্থ প্রথমোক্তরূপে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা আরও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সুবিখ্যাত চিত্রকর টার্ণারের চিত্রাবলী লক্ষ্য করিলে উহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। টার্ণারের বৃদ্ধ বয়সের অঙ্কিত চিত্রে নীল রঙের প্রাধান্য একটু বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। চক্ষুস্থিত ঐ পীতবর্ণের রঞ্জক বস্তুটি দিবালোক হইতে খানিকটা নীল এবং বেগুনী রঙের বিলোপ সাধন করে। এইজন্যই টার্ণার তাঁহার শেষ

বয়সের চিত্রে যথাযথ রঙ ফলাইতে সমর্থ হন নাই। সাধারণ লোক কৃত্রিম আলোতে যেরূপ দেখিয়া থাকে, দিবালোকেই টার্ণারের তখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। এইরূপে চক্ষুতে পীতবর্ণের রঞ্জক বস্তুর পার্থক্যের ফলেই সূক্ষ্ম বর্ণবিশ্লেষণ ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমানে 'সি-গ্রীণ' (sea-green) রঙটি খুব প্রচলিত, কিন্তু উল্লিখিত একই কারণে এই রঙকে কেহ বা 'turquoise blue', কেহ বা 'ব্লু-গ্রীণ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন রঙের অস্তিত্ব কি ভাবে আমরা ধারণা করি, কোন কোন রঙ সম্পর্কে কি ভাবেই বা আমাদের বিভ্রমের উৎপত্তি ঘটে, তদ্বিষয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কোন একটিমাত্র মতবাদের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ঐরূপ জটিল বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে, তবে বৈজ্ঞানিক হেল্‌ম্‌হোল্‌জ (Helmholtz) প্রবর্ত্তিত মতবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আমাদের নেত্রপটে তিন প্রকারের নার্ভ আছে। কেহ কেহ উহাদিগকে তিনটি আলোক-রাসায়নিক বা 'ফোটো-কেমিক্যাল' পদার্থ বলিয়াও উল্লেখ করেন। এই তিন প্রকারের নার্ভ লাল, সবুজ ও বেগুনী এই ত্রিবিধ রঙ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচকিত বা অনুভূতিসম্পন্ন। যখন উহাদের কোন একটি নার্ভ অকর্ম্মণ্য হয় অর্থাৎ তাহার কার্য্যশক্তি ব্যাহত হয় তখনই ঐ রঙ সম্পর্কে অন্ধত্বের উৎপত্তি ঘটে।

হেরিং প্রবর্ত্তিত মতবাদেও এইরূপ তিনটি নার্ভের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—একটি বিশেষভাবে লাল ও সবুজ রঙের, একটি পীত ও নীল রঙের এবং অপরটি আলো ও আঁধার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচকিত। লাল ও সবুজ নার্ভের কার্য্য সম্পর্কে এই বলা হয় যে, লাল রঙের রশ্মিতরঙ্গগুলি যেমনই কোন আলোক-রাসায়নিক পদার্থের উপর গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া করে, সবুজ রঙের তরঙ্গগুলি তেমনই আবার তাহার উপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই মতবাদ অনুসারে যখন লাল ও সবুজ নার্ভের কার্য্যশক্তি ব্যাহত হয় তখনই এই দুই রঙ সম্বন্ধে অন্ধত্বের বা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তি ঘটে এবং শুধু পীত ও নীল রঙের নার্ভটি কার্য্য করিতে থাকে। এই মতবাদ সংক্ষিপ্ত ও সহজ হইলেও ইহা দ্বারা সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এড্রিজ গ্রীণ (Edridge Green) যে মতবাদের প্রবর্ত্তক তাহা উপরোক্ত উভয় মতবাদ হইতেই বিভিন্ন। তিনি বলেন,—বর্ণান্ধ ব্যক্তির চক্ষু সাধারণ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় সকল প্রকার আলোকরশ্মিতরঙ্গ সম্পর্কেই সচকিত। তফাৎ শুধু এই যে, যখন দুইটি আলোকরশ্মিতরঙ্গ অতি কাছাকাছি থাকে, তখন বর্ণান্ধ ব্যক্তি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। অনেকের কান যেমন সঙ্গীতের সুর ঠিক ধরিতে পারে না,—অনেক সময় একই সুরসপ্তক নির্ব্বিচারে খুব উঁচু বা নিম্ন গ্রামে গাহিয়া ফেলে, এই বর্ণান্ধতাও অনেকটা তাহারই অনুরূপ। এড্রিজ

গ্রীণের মতবাদ দ্বারা বর্ণান্ধতার সমস্ত সমস্যা ব্যাখ্যা করিতে না পারা গেলেও রঙ সম্পর্কে কাহার কিরূপ ধারণা এবং কোন্ ব্যক্তি কোন্ রঙ বিষয়ে অন্ধ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভবপর হইয়াছে। রঙীন্ আলোক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কোন অল্পবর্ণান্ধ ব্যক্তি আলোকটি তাহার নিকট হইতে দুই গজ পরিমিত দূরে অবস্থিত থাকিলে লাল বা নীল আলোর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়া দুই শত গজ হইলে আলোকের তীব্রতা যেমন হ্রাস পাইতে থাকে, বর্ণান্ধ ব্যক্তিও ততই ঐ দুই রঙের পার্থক্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হয়। অন্ধকার গৃহে বিভিন্ন রঙের আলোকের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই ভাবে কাহার কোন্ রঙ সম্পর্কে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। আরও নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা বর্ণান্ধতা নির্ণয় করা সম্ভবপর। সাধারণতঃ যে সকল রঙ সম্পর্কে মানুষের বর্ণান্ধতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ কোন ভ্রান্তি-উৎপাদক (confusion colour) রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের উপর যথোপযুক্ত রঙের অক্ষর বা সংখ্যা চিত্রিত করিয়াও বর্ণান্ধতার পরীক্ষা করা যাইতে পারে। সবুজ রঙের বিভিন্ন ফুটকিযুক্ত ভ্রান্তি-উৎপাদক ব্যাকগ্রাউণ্ডের উপর ফিকে চকোলেট রঙের ফুটকি দিয়া ইংরেজী "O" অক্ষরটি তুলিলে তাহা সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত চক্ষু ব্যতীত কোন বর্ণান্ধ ব্যক্তির চক্ষুতে কিছুতেই ধরা পড়িবে না। রঙ সম্পর্কে কোন্ ব্যক্তির দৃষ্টি কিরূপ তাহা আর একটি সহজ উপায়েও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। লাল, পীত ও নীল রঙের সংমিশ্রণে যে বাদামী বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বারা কোনও পশম রঞ্জিত করিলে দেখা যায় যে উহা জরদ্ ও সবুজের সংমিশ্রণে উৎপন্ন রঙ দ্বারা রঞ্জিত পশমের সহিত হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। এই উভয় উপায়ে রঞ্জিত পশমকে লাল রঙ সম্পর্কে অন্ধ কোন ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলে তিনি ত্রিবর্ণসংমিশ্রণে রঞ্জিত পশমের মধ্যে লাল রঙের অংশটা টের পান না বলিয়া উভয় প্রকারের পশমের রঙে কোন মিল নাই অর্থাৎ উভয়ে ম্যাচ (match) করে না মনে করিবেন। এই পরীক্ষাটি এত সহজ ও সূক্ষ্ম যে তদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণান্ধতার সামান্য পার্থক্যও ধরা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে লাল এবং সবুজ রঙ সম্পর্কেই প্রকৃত বর্ণান্ধতার দৃষ্টান্ত অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টিশক্তির সামান্য বিকার বশতঃ বেগুনী রঙ সম্পর্কেও বর্ণান্ধতা দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের বর্ণান্ধতা পীত ও নীল রঙ সম্পর্কে হইয়া থাকে। চক্ষুর পীড়া হইলে কিংবা নেত্র-নার্ভের গোলযোগ উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ এরূপ বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায়। সমস্ত পৃথিবীর রূপ তখন লাল, সবুজ এবং ধূসর বর্ণের মধ্যেই মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

বিবিধ

বিজ্ঞান ও অস্ত্রসম্ভার

বর্ত্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একপ্রকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই চলে। আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় সকলে প্রস্তুত হইতেছে, ফলে ইউরোপ যে এখনও একটি বারুদখানায় পরিণত হইয়াছে এবং সামান্য মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সভ্যতার সমাধি রচনা করিবে তাহার আভাস প্রতিদিন সংবাদপত্র মারফতে পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানের এইরূপ পরিস্থিতি দেখিয়া শান্তিকামী ব্যক্তিগণ একান্তই ব্যথিত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে যতদিন হিংসা, দ্বেষ ও রেষারেষি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন জগতে শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। যে ভ্রান্ত নীতির দ্বারা বর্ত্তমানে সকলে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে শক্তি শান্তিরক্ষায় প্রযুক্ত না হইয়া শুধু সভ্যতাবিধ্বংসী মৃত্যুদেবতার ক্ষমতাকেই বৃদ্ধি করিতেছে। জাতিগত বিদ্বেষ, মনের মলিনতা, পররাজ্যলিপ্সা প্রভৃতি দুর্ব্বল ও হীন প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে এরূপ অবস্থার আদৌ অবসান ঘটিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আত্মরক্ষার অজুহাতে যতই অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করিয়া দিতেছে মাত্র।

ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে তাহা যে বিবিধ অভিনব মরণাস্ত্রের প্রয়োগে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল মরণাস্ত্রের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে বর্ত্তমানে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রিটীশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার অত্যন্ত অমানুষিক এবং মানবসভ্যতার অধঃপতনসূচক। সুতরাং যুদ্ধে যাহাতে এরূপ গ্যাস বা বিষ-বাষ্প ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাব্যবসায়িগণের সহায়তায় এসোসিয়েসন সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘও অনেক কাল পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া কি ভাবে ইতালী নানারূপ বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতঃ একটা সুপ্রাচীন স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছে তাহার ইতিহাস এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভিমত যাহাই হউক না কেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধে যে উহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার আভাস এখন হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন দেশে বিষাক্ত

গ্যাসের শক্তি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম মুখোস প্রভৃতি নানা অভিনব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আবালবৃদ্ধবণিতাকে এইরূপ গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার পদ্ধতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও হইতেছে।

যুদ্ধমাত্রই ভয়াবহ, ধ্বংসই তাহার কাজ। সুতরাং যুদ্ধে কোন্ অস্ত্রব্যবহার করা হইবে না হইবে তাহা বিচার করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধকে সভ্যতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা একান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমানে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য একপ মরণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করা হয়, তাহার জন্য সকলের সমবেতভাবে চেষ্টিত হওয়া। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাহারা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদেরও বর্ত্তমানে এতৎসম্পর্কে বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। নাগরিক দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য এবং বিজ্ঞানের সুনামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্ত্তে যাহাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক অনৈক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যে বিজ্ঞানের বলে আমরা আজ অপরিমিত ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, সেই ক্ষমতা যাহাতে মানবের ধ্বংসাধনে ব্যবহৃত না হইয়া সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধনে নিয়োজিত হয় তৎপ্রতি সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিতে না পারিলে, শুধু দুই একটি মরণাস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব পূর্ব্বেও যেমন সফল হয় নাই, ভবিষ্যতেও সফল হইবে না।

বাংলায় মাছের চাষ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে সুবিস্তৃত নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতিতে মৎস্য-চাষের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু বাংলার এই সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া মৎস্যব্যবসায়ের বিকাশসাধনের কোন প্রচেষ্টা আজও পর্য্যন্ত তেমন ভাবে হয় নাই। মাছের চাষ, মাছধরা, প্রভৃতি মৎস্যসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা স্মরণাতীত কাল হইতে যেমন মামুলিভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এখনও তেমনি কতকগুলি নিরক্ষর এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হইতেছে। ফলে বর্ত্তমান যুগে অন্যান্য উন্নততর দেশে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ মাছের ব্যবসায়কে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, এদেশে সে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া দূরের কথা, বৎসরের পর বৎসর মৎস্যচাষের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অবিরত মাছ ধ্বংস করায় নদীমাতৃক বাংলাদেশেরও এই সম্পদ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। অনেক কাল পূর্ব্বে বাংলা গবর্ণমেণ্ট পরলোকগত স্যার কে, জি, গুপ্তের নেতৃত্বে মৎস্য সম্পর্কে তদন্তের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মৎস্যের চাষ তদারকের জন্য যে 'ফিসারী বিভাগ' খোলা হইয়াছিল, অর্থাভাবের অজুহাতে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে

বাংলার এই প্রাকৃতিক সম্পদ মোটেই বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশের মৎস্যব্যবসায় সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। যুগযুগান্তরের কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া ঐ সকল দেশের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিরাও এই ব্যবসায়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং নানাপ্রকার আবহাওয়ার মধ্যেও মৎস্যসমূহ যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের স্বাস্থ্যকর খাদ্যহিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তজ্জন্য অর্থব্যয় করিতেছেন। নদীজল এবং সাগরজল সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণামূলক কার্য্যে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বর্ত্তমানে বিশেষ অগ্রণী। সম্প্রতি রাজকীয় কৃষিগবেষণা সমিতির নিকটেও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিবিধ মৎস্যের রোগনির্ণয়, তাহাদের খাদ্য ও বৃদ্ধির হার এবং মৎস্য হইতে তৈল প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেও মৎস্য সম্পর্কে গবেষণার বিবিধ ব্যবস্থা হইতেছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তুলনায় নদীমাতৃক বাংলাদেশ যে উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা হইলে এই ব্যবসায়ে বিশেষ সন্তোষজনক ফললাভ করিতে পারিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মহামান্য বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতঃ অনেক বিষয়েই তাঁহার অধীনে পরিচালিত কৃষি-তদন্ত-কমিটির অনুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমাধানের প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। মৎস্যচাষ সম্পর্কে কৃষি-তদন্ত-কমিটি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অধীনস্থ ফিসারি বিভাগকে প্রথম হইতেই প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে সেই বিভাগকেই সংগ্রহ করিতে হইবে এই নীতি অবলম্বন করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। ফলে, তাহারা সন্তোষজনক কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারে নাই। তদন্ত-কমিটির মতে সমগ্র দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং দেশের মৎস্যসম্পদবিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সরকারী নীতি পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে কৃষি-তদন্ত-কমিটির অভিমত অনুসারে অনেক কাজই পরিচালিত হইতেছে। গৃহপালিত গোমহিষাদি জন্তুর সুপ্রজননের দিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে, তেমনি এদেশবাসীর খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিকারিতা শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতিও অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধিসাধনে টাটকা ও সতেজ মৎস্য যে বিশেষ সাহায্য করে তাহা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাপকভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে হইলে যে বাংলার মৎস্যসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন মৎস্যের বৃদ্ধির হার, তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য, কিরূপ আবহাওয়ায় ও জলে তাহারা বিশেষভাবে পুষ্টি-

লাভ করে, তাহাদের জীবনধারা কি, কোন্ মাছ খাদ্যহিসাবে কিরূপ পুষ্টিকর, এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত গবেষণা আবশ্যক। সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন কোন প্রতিষ্ঠান এতদ্বিষয়ে কিছু কিছু কার্য্য আরম্ভ করিলেও আমাদের মনে হয় যতদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি মৎস্যব্যবসায়ের বিকাশসাধনের দিকে আকৃষ্ট না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ করা যাইবে না।

মানববিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর ব্ল্যাকপুল, শহরে ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভার সভাপতিরূপে সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিৎ স্যার জোসিয়া ষ্ট্যাম্প "সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া" (Impact of Science on Society) বিষয়ে যে সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেসকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার ফল ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের প্রগতি দেখা গেলেও নৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের অনুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। সুতরাং বিজ্ঞান ও নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন দ্বারা যাহাতে সভ্যতাবিধ্বংসী আশঙ্কাসমূহ দূরীভূত হয় তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সভাপতি মহাশয় এতদুদ্দেশ্যে একটি অভিনব ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। যতই দিন যাইতেছে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারসমূহের প্রয়োগব্যবস্থার দ্বারা সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভূত প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি একটি Invention clearing house অর্থাৎ আবিষ্কারসমূহের মূল্যনির্ণয় ও বিনিময় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের সমবায়ে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইবে। খাঁটি ও ফলিত বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প ও সমাজের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনসমূহের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়সাধন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও তাহার প্রয়োগব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান দৃষ্ট হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তাহাও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। স্যার জোসিয়া ষ্ট্যাম্প বলেন, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান লণ্ডনে স্থাপিত হইতে পারে এবং উদ্ভাবক, শিল্পী ও সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে একটা নবপর্য্যায়ের নীতি-বিজ্ঞান প্রচলিত হয় এই প্রতিষ্ঠান তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে। বর্ত্তমানে অনেকের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, নীতিবিজ্ঞানসম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর শুধু মানুষের প্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সমাধান হইতে পারে; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আধুনিক কালে যেরূপ সঙ্ঘজীবনের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্যবসায় হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাবিভাগ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে নূতন ধরণের

নীতিবিজ্ঞানের ভাবধারা কার্য্যকরী হওয়া আবশ্যক। অভিভাষণ প্রসঙ্গে স্যার জোসিয়া ষ্টাম্প আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, শান্তির সময়ের গতির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করে। মানুষ সময় সময় এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় অল্প সময়ের জন্য যখন তাহার মনে কোন একটি ধারণা বদ্ধমূল থাকে। সুতরাং নূতন একটা কিছুর প্রবর্ত্তন হইতে সর্ব্বদাই খানিক বিলম্ব ঘটে। উহাতেই এক দল লোকের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জন্মে। মানুষের প্রত্যেক দিনটিই যদি 'চল্‌তি' দিবস হইত অর্থাৎ কোন নূতন ধারণা পোষণ করিবার মত সময় যদি সে না পাইত, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণের জন্যই তাহাকে একটা বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করিতে হইত। উহাতে মনের একপ চঞ্চলতা ও অস্বস্তি ঘটিত যে তাহা অশান্তিরই নামান্তর মাত্র। চির-অনাগত ভবিষ্যতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যটুকু আমাদিগকে সমগ্রভাবে নিষ্পেষণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্মব্যস্ত জগতে যে সকল অভাব অভিযোগের কথা সর্ব্বদাই শোনা যায় সভাপতিমহাশয়ের মতে ঐগুলি ফলিত বিজ্ঞানের ত্রুটি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি বলেন, আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন বেশ বুঝা যায় এসমস্ত দুঃখকষ্ট দূর করিতে হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কারের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে।

বিগত শতাব্দীতে সমাজের উপরে বিজ্ঞানের যে প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, আমাদের অপরিজ্ঞাত এবং ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ-ব্যবস্থার তুলনায় উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহাতে যতই আমরা সফলতা অর্জ্জন করি না কেন, যে পর্য্যন্ত না আমরা মানববিজ্ঞানের (science of man) গবেষণায় সমপরিমাণ সাফল্য অর্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ করিব, ততদিন আমাদের ব্যর্থতাও অপরিমেয় থাকিবে। বস্তুতান্ত্রিকতার মোহ পরিত্যাগ করিয়া মানুষের যথার্থ উন্নতির ব্যবস্থার দিকে মনসংযোগ করিবার যে সময় আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যুৎসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসম্বন্ধে সমালোচনা

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কর্ত্তৃক যে মূল্যে নগরবাসীদিগকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তাহা লইয়া সম্প্রতি অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্যুতের মূল্যের হারসম্পর্কে যে তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল, তাহাদের রিপোর্ট হইতে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কত এবং কি মূল্যে বিদ্যুৎ জনসাধারণকে সরবরাহ করিলেও কোম্পানীর কোনরূপ লোকসান হয় না তাহা জানা গিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে মূল্যসম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণ তেমন সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করে নাই। যাহা হউক, বিদ্যুতের মূল্যের

হার যে বিশেষভাবে হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্দেশে যে সকল বিদ্যুৎসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা কখনও জনসাধারণের উপকার বা হিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করেন না। 'ডিক্টেরি' চালে যেন জনসাধারণকে কৃপাকণা বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন এইরূপ একটা মনোভাব তাহাদের কার্য্যপ্রণালীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এসম্পর্কে বিগত জুলাই মাসে ফকটোনে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরস্ এণ্ড এলায়েড এসোসিয়েশনস্-এর (Electrical Contractors and Allied Associations) দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ এ, জি, ব্রুটি (A. G. Bruty) যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি অবিলম্বে যাহাতে সমস্ত বিদ্যুৎসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সস্তা দরে সুপ্রচুর বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে বাধ্য হন তাহার ব্যবস্থা করিতাম। মিটারের ভাড়া, বৈদ্যুতিক সংযোগসাধনের জন্য অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া প্রভৃতি বিবিধ বিরক্তিকর পদ্ধতিরও উচ্ছেদসাধনে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য করিতাম। তাহাদের অভিরুচি অনুসারে 'তার' বসান প্রভৃতি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুমতি দিতাম না এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে আপনাদিগকে এক একজন ডিক্টেটর প্রভৃতি অপরকে শুধু কৃপা বিতরণ করিতেছেন একপ মনে না করিয়া জনসাধারণের ভৃত্য হিসাবে তাহাদের সেবা করিবার ভার তাঁহাদের উপরে ন্যস্ত একপ মনে করেন তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতাম"। উল্লিখিত অভিভাষণ অবশ্য ইংলণ্ডের অবস্থা উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে আরও অনেক সস্তা দরে বিদ্যুৎসরবরাহ হইয়া থাকে। সেইখানে এ কারণে জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিদ্যুৎও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এদেশেও ঐরূপ সস্তা দরে বিদ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থা হইলে বিদ্যুৎব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ফলে এদেশেরও সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক শক্তির প্রচলন হওয়ায় শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত প্রসারলাভ ঘটিবে।

কয়লা হইতে পেট্রোল প্রস্তুত

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কয়লা হইতে 'পেট্রোল' উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই পেট্রোল অবশ্য এখন পর্য্যন্ত স্বভাবজাত 'পেট্রোল'কে হটাইতে পারে নাই। বর্ত্তমানে ইউরোপে যে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে, সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার মত 'পেট্রোল' যখন অন্য দেশ হইতে আমদানি করিবার সুবিধা থাকিবে না, তখন কৃত্রিম 'পেট্রোল'ব্যবহারের প্রচলন যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহা এখনই বলা যাইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন একপ কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত করিবার জন্য ইতোমধ্যেই বিরাট যন্ত্রপাতিসমন্বিত কারখানার পত্তন করিয়াছে।

ফ্রান্সের অন্তর্গত লিভিনে (Lievin) ইতঃপূর্ব্বেই কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেখানে অনুরূপ আর একটি কারখানাও নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুইটি কারখানাতে প্রতিদিন ৫০ টন পরিমিত কয়লা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোলে পরিণত করা হয় এবং বৎসরে প্রায় ১০,০০০ টন পেট্রোল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিনব উপায়ে কয়লাকে হাইড্রোজেনযুক্ত (hydrogenation) করাই এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ সমপরিমাণ কয়লা ও ভারী তৈল ৮৪০° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপাঙ্কে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ দ্বারা হাইড্রোজেনযুক্ত করা হয়। ফলে অল্প ও অধিক ভারী একপ্রকার তৈল এবং সামান্য পরিমাণ পেট্রোল উৎপাদিত হয়। অল্প ভারী তৈলকে পুনরায় ফারেনহাইট তাপাঙ্কের ৯৩০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে 'পেট্রোল' পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে বিমানপোত ও মোটরগাড়ী প্রভৃতির পরিচালনে পেট্রোলের ব্যবহার যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে পৃথিবীর সঞ্চিত স্বভাবজাত পেট্রোল হইতে এই চাহিদা ভবিষ্যতে কিরূপে মিটিবে ইহা ভাবিয়া অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন। বিজ্ঞানের মায়াদণ্ড স্পর্শে কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই আশঙ্কা দূরীভূত হইল। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মনীষায় কয়লা পূর্ব্বেও অনেক সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিস্ময়কর অভিনব পদার্থপ্রস্তুতের উপাদান যোগাইয়াছে, পেট্রোল সৃষ্টির ব্যাপারে কালো কয়লার উপযোগিতার আর একটি অভিনব পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

উষ্ণমণ্ডল ও নাতি-উষ্ণ মণ্ডলের (semi-tropics) অনেক স্থান প্রাকৃতিক 'বনাঞ্চল' বলিয়া খ্যাত। এই সমস্ত বনে উল্লেখযোগ্য তেমন ভাল কাঠ না পাওয়া গেলেও এগুলি গোচারণ ভূমি, শিকারকেন্দ্র প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বন্যার বারিপ্রবাহ রোধ করিতে অথবা স্বাভাবিক জলস্রোত ধরিয়া রাখিতে এই বনাঞ্চল বিশেষ কার্য্যকরী। দূরদর্শী বনবিশেষজ্ঞগণ এইরূপ বনাঞ্চল আবাদ করিবার বিরুদ্ধে বরাবর মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শাসকবৃন্দ তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দেন নাই। এই সমস্ত বনাঞ্চল আবাদ করিয়া তাহা হইতে লাভবান হইবার অতিরিক্ত আগ্রহে অনেক দেশেই নানারূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। এইরূপ বনাঞ্চল আবাদ হওয়াতে উত্তর আমেরিকার সুবৃস্তিত ভূখণ্ড বর্ত্তমানে অনাবৃষ্টি ও শস্যহানির কুফল ভুগিতেছে। যে বনভূমি প্রকৃতির অবারিত ঐশ্বর্য্যরূপে ঐস্থানকে সুজলা সুফলা রাখিত তাহার ধ্বংসসাধন হওয়ায় প্রকৃতি নির্ম্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকার ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এখন বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত

হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকাই একমাত্র দেশ নহে যেখানে বনাঞ্চল আবাদ করিয়া জমির অবনতি ঘটান হইয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগও এরূপ অদূরদর্শী আবাদী নীতির ফলে শঙ্কাজনক অবস্থা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই প্রকার নির্ম্মম প্রতিশোধের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও আমরা দেখিতে পাইতেছি। পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। উত্তর-ভারতের বন্যার প্রকোপও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বনাঞ্চল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে রক্ষকের ন্যায় উহার তীব্রবেগ মন্দীভূত করিয়া থাকে। বর্ষার জলধারার প্রবলতা হ্রাস করিয়া দৃঢ়ভাবে মাটিকে রক্ষা করাই বন্য বৃক্ষের কাজ। পাঞ্জাবের প্রাকৃতিক বনবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে বিনষ্ট করা হইয়াছে। বৃক্ষহীন শিওয়ালিক পর্ব্বত হইতে নির্গত প্রচণ্ড জলধারার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর বাহিত হইয়া আসে। এই প্রস্তর কোন কোন স্থানে জমিয়া নদীর স্বাভাবিক খাত বন্ধ করতঃ যেরূপ উহাকে পৃথক্ খাতে প্রবাহিত হইতে প্রবৃত্ত করে, তেমনি কোন কোন স্থানে নদীখাতের গভীরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়া সমূহ ক্ষতির কারণ ঘটায়। কেননা ইহাতে সাধারণ জমির সমতল হইতে নদীখাত বিশেষ নিম্নে থাকে বলিয়া স্বাভাবিক জলনিকাশের কার্য্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। সুতরাং মনসুন আরম্ভ হইলে বর্দ্ধিত জল যেমন চারিদিকে বন্যার আকারে ছড়াইয়া পড়ে, গ্রীষ্মকালে তেমনি নদীখাত বিশেষভাবে গভীর হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী জমির রস টানিয়া লইয়া ভূমি শুষ্ক করিয়া চাষবাসের অনুপযোগী করিয়া তোলে। যুক্তপ্রদেশের এটাওয়া জেলার প্রায় ২০০ বর্গমাইল সরস ও উর্ব্বর শালবৃক্ষ-সমন্বিত বনভূমি আবাদের ফলে আজ মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজ সেখানে মেষ চড়িবার উপযুক্ত তৃণভূমি পর্য্যন্ত একটু বিদ্যমান নাই। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল অপসারিত করিবার ফলে এইভাবে অনেক স্থানেরই বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের সীমা বাহিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত, যমুনার উৎসস্থানের সন্নিকটে এক সময় বনভূমি ছিল। সেই পার্ব্বত্য বনাঞ্চল অপসৃত হওয়াতে যমুনা নদীর অবস্থাও এখন ঐরূপ। প্রখর স্রোতের সহিত ভারী প্রস্তর বাহিত হইয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যেমন নদী ভরাট হইয়া আসিতেছে, তেমনি কোথাও আবার নদীখাতের গভীরতাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন বিগত ৫০০ বৎসরে যমুনার খাত প্রায় ৬০ ফুট গভীর হইয়াছে। শীতের সময় চারিদিকের সমতল ভূমি হইতে যমুনার জল ১৫০ হইতে ২০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত থাকে। ফলে চারিদিকের ভূমি হইতে যে জল নির্গত হয় তাহাতে নদীতীরস্থ পূর্ব্বেকার সরস ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া উঠে। কূপ ইত্যাদিও যেমন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, যমুনার তীরবর্ত্তী জমির ভাঙ্গনও তেমনি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বনাঞ্চলের উচ্ছেদসাধনের ফল যে এরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়

তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে বর্ত্তমানে জমির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য নানারূপ গবেষণা ও ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে বন্যায় এবং গ্রীষ্মে জলাভাবে চারিদিকে যে হাহাকার উত্থিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এদেশেও জমি ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই।

রেল ও মোটর প্রতিযোগিতা

মালবাহী মোটরলরী ও লোকবাহী মোটরগাড়ীর ব্যাপক প্রচলনের ফলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এক অভিনব সমস্যা রেল ও মোটরের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। বাষ্পীয় শকট বা রেলগাড়ী এদেশে বহু কাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালপত্র ও যাত্রী বহনের কাজ স্থলপথে রেল গাড়ীই এতকাল নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে। অধুনা মোটরযোগে মালপত্রাদি নেওয়া আনার ও লোকের যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় এই কাজ রেলকোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া অনেকাংশে এখন মোটরব্যবসায়িগণের করতলগত হইয়াছে। ফলে রেলের আয় দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। রেলকর্ত্তৃপক্ষের রেলপরিচালনা নীতি এই আয়হ্রাসের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী হইলেও মোটরের প্রতিযোগিতাই যে এরূপ অবস্থার মূলীভূত কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাষ্পশক্তি ও মোটরশক্তির এই প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয় না হইলেও ভারতের পক্ষে ইহা এক প্রবল সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিগত জুলাই মাসে এতৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েসের সভাপতিত্বে ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল বা যানবাহন-পরিচালন-পরামর্শ সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। রাজপথে পরিচালিত মোটর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের প্রতিযোগিতা হইতে রেলপথসমূহ যাহাতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং রেলের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া মোটর ব্যবসায়িগণের ন্যায্য অধিকারও ক্ষুণ্ণ না হয়—এই উভয় সমস্যা লইয়াই গভীর অভিনিবেশের সহিত সভায় নানাবিধ আলোচনা হয়। রেলপথনির্ম্মাণে রেলের অত্যধিক ব্যয় করিতে হয়, রাজপথনির্ম্মাণে মোটর ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত করভার বহন করে। সুতরাং কাহারও দাবী বড় তুচ্ছ নয়। বড়লাট উক্ত পরামর্শ-সমিতির নিকট যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি মোটরের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করেন। অল্প মূলধনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থায় যাত্রী ও মালবাহী মোটরগাড়ী পরিচালনাসম্পর্কে অসুবিধার সৃষ্টি হইলেও দেশের লোকজনের অধিকতর আরামে চলাচলের পথ প্রশস্ত হইবে। মোটরযান নিয়ন্ত্রণ আইনের সংস্কারসাধনের জন্য বর্ত্তমানে যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এবিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ীর প্রতিযোগিতা এইভাবে কতদূর হ্রাস পাইবে

বলা কঠিন। তবে আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত দেশে কোনপ্রকার অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না করিয়াও উভয় প্রকার যানেরই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে এখনও সর্ব্বত্র তেমনভাবে রাজপথনির্ম্মাণের প্রচেষ্টা হয় নাই। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সর্ব্বত্র রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হইলে মোটর গাড়ী চলাচলের নূতন ক্ষেত্র যেমন প্রস্তুত হইবে, রেলগাড়ীর সঙ্গে তাহার প্রতিযোগিতাও ততই হ্রাস পাইবে।

বিজ্ঞানশিক্ষার আদর্শ

বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োগ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই জ্ঞানলব্ধ শক্তি সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহা এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যে তাহাতে জগতের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। আধুনিক যুগে তাই অনেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অশান্তির জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান এজন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হইলেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজ্ঞান আজ অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি যেরূপ পারিবারিক উন্নতির জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও বিরাট মানব পরিবারের উন্নতিসাধনের জন্য তেমনি সকল বৈজ্ঞানিককে সচেষ্ট হইতে হইবে। যে সমস্ত সমস্যার সমাধানে মানবের জীবনযাত্রার পথ সুগম হইতে পারে বিজ্ঞানসাধকগণের সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কিছুকাল পূর্ব্বে স্যার উইলিয়ম ব্র্যাগ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাস্থাপনের প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা বিশেষজ্ঞ হইব বটে, কিন্তু শুধু বিশেষজ্ঞ হইলেই চলিবে না, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ যাহাতে সুদৃঢ় হয় তজ্জন্য আমাদের প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান কাপড়ের বিভিন্ন তন্তুর মতই একত্র আসিয়া মিলিত হওয়া আবশ্যক। প্লেটো রাষ্ট্রের আদর্শ অধিপতির যে কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামরিক কৌশল, লোকহিত প্রভৃতি সকল গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক যুগে এরূপ অতি-মানব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঐ সকল বিভিন্ন গুণের সন্ধান অনায়াসেই লাভ করা যাইতে পারে। এই ধরণের ব্যক্তিসমূহের সমবায়ে গঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের সকল প্রকার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আধুনিক যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ শিক্ষার প্রচলন হইলে, আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান মানবের হাতে যে অপরিমিত শক্তি তুলিয়া দিয়াছে তাহার অপব্যবহার হইবে না।

তাপপরিমাণের সূক্ষ্ম ব্যবস্থা

তাপমান যন্ত্রসমূহের প্রস্তুতপ্রণালীতে বর্ত্তমানে যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরল পারদ ব্যবহার না করিয়া পারদবাষ্পের সাহায্যে বর্ত্তমানে তাপমান যন্ত্রসমূহ প্রস্তুত হওয়াতে সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কের ৩৫০° ডিগ্রি হইতে ৮০০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপের পরিমাণও আজকাল যন্ত্রসাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভবপর। বিশুদ্ধ প্লাটিনাম ও সংমিশ্রিত ধাতু (alloy) প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় থার্ম্মোকাপ্‌ল্ (thermo-couple)এর সাহায্যেও বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় অধিকতর সূক্ষ্মভাবে তাপপরিমাপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। পূর্ব্বে অবিমিশ্র প্লটিনামের সহিত শতকরা ১০ ভাগ পর্য্যন্ত রোডিয়মযুক্ত প্লাটিনাম একত্রে ব্যবহার করিয়া যে থার্ম্মোকোপ্‌ল্ প্রস্তুত করা হইত, দেখা গিয়াছে প্লাটিনামে রোডিয়মের অংশ শতকরা ১৩ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিলে অধিকতর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। বিবিধ শ্রমশিল্পে ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন ধরণের তাপমান যন্ত্র ও পাইরোমিটার বর্ত্তমানে এরূপভাবে নির্ম্মিত হইতেছে যে তাহাদের সাহায্যে অতি সূক্ষ্মভাবে যে কোন তাপপরিমাণ নির্ণয় করা চলে। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া নানাবিধ বৈদ্যুতিক তাপমান যন্ত্রও নির্ম্মিত হইতেছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এইপ্রকার উন্নতি বস্তুতঃপক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

সৌরশক্তির ব্যবহার

বর্ত্তমানে কয়লা, পেট্রোল, তৈল প্রভৃতি পরোক্ষভাবে আমাদের শক্তির যোগান দিয়া থাকে। অনেকে মনে করেন পৃথিবীতে এই সকল শক্তির স্বাভাবিক উৎস বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ এবং অনতিদূর ভবিষ্যতে উহারা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা তাই এখন নূতন নূতন শক্তিকেন্দ্র আবিষ্কার করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। সকল শক্তির আধার সূর্য্যদেবকে এখনও আমরা তেমনভাবে কাজে লাগাইতে পারি নাই, যদিও এই অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডারকে কাজে লাগাইবার কথা মানুষ অনেক দিন যাবৎ চিন্তা করিতেছে। আর্কিমিডিসের জীবনী পাঠে জানা যায় শক্তিশালী কাচের সাহায্যে তিনি সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া এমনভাবে তাহা শত্রু সৈন্যের জাহাজের উপর ফেলিয়াছিলেন যে সৌরতেজে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া আরোহীসহ ঐ সকল জাহাজ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। আর্কিমিডিস্ যাহাই করিয়া থাকুন, একথা সত্য যে ইচ্ছাহুযায়ী সকল সময় আমরা এই শক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি না। অথচ এই শক্তির তেজ এত যে ২০০ বর্গ ফুট ছাদের উপরে পতিত সূর্য্যালোক হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিতে পারিলে তাহা দ্বারা গৃহের সকল প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র অনায়াসে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। থার্ম্মোকাপ্‌লের উপর

সূর্য্যালোক পাতিত করিয়া এখন পর্য্যন্ত তেমন সন্তোষজনক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় নাই, সুবৃহৎ ফটো-ইলেকট্রিক সেল সূর্য্যকিরণে রাখিয়াও আশানুরূপ বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশসাধন করিতে পারা যায় নাই; তবে বৈজ্ঞানিকের সাধনা এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সৌরশক্তিকে কাজে লাগাইবার আন্তরিক বাসনা তাহার একদিন ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমেরিকার স্মিথসোনিয়ন ইনষ্টিটিউসনের সম্পাদক প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি, জি, এবট একরূপ একটি ষ্টীম ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহা সৌর-শক্তির বলে পরিচালিত হইবে। এই ইঞ্জিনের তাপদায়ক যন্ত্র (heater) তিনটি প্রধান উপাদানে প্রস্তুত। প্রথমতঃ তিনটি ধাতব পাতের সাহায্যে সূর্য্যকিরণকে প্রতিফলিত করিয়া তাপরোধক (heatproof) পাইরেক্স কাচনির্ম্মিত কয়েকটি টিউবের মধ্য দিয়া চালিত করা হয়। টিউবগুলির মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ রাখা আছে। সূর্য্যকিরণে ঐ রাসায়নিক পদার্থের তাপ ফারেনহাইট তাপাঙ্কের প্রায় ৪০০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে। ঐ টিউবগুলি ইঞ্জিনের 'বয়লারের' সঙ্গে যুক্ত থাকায় এইভাবে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা বয়লারের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ইঞ্জিনকে পরিচালিত করে। ডাঃ এবট সৌরতাপ প্রয়োগ করিয়া যে ইঞ্জিনটি চালাইয়াছেন তাহা অবশ্য অত্যল্প শক্তিবিশিষ্ট,—মোটে অর্দ্ধ-অশ্বশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু তিনি আশা করেন এইভাবে যে কোন শক্তিশালী যন্ত্রই পরিচালনা করা সম্ভবপর হইবে। এই আবিষ্কারের ফল বর্ত্তমানে যাহাই হউক না কেন ভবিষ্যতে যে ইহা বহু নূতনতর শক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিম্নজীবের অন্যোন্যজীবিত্ব

নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহাতে পরস্পরের হিতার্থে বিভিন্ন বীজাণু, পদার্থ বা প্রাণীর মধ্যে সহযোগিতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কীট-পতঙ্গ এবং পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উদ্ভিদ্ যেমন একদিকে বিবিধ সুগন্ধি তৈল, সুবাস এবং নাইট্রোজেনপূর্ণ পরাগ-খাদ্যের সম্ভার লইয়া তাহার বিচিত্র অতিথিবর্গের মন ভুলাইবার জন্য নানা বর্ণে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে, পতঙ্গসকল তেমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলের পরাগসঙ্গম ঘটাইয়া বনভূমিকে সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া তোলে। এই যে সহযোগিতা আমরা প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর।

এতদ্ব্যতীত এরূপ সহযোগিতাও আমরা প্রকৃতিতে দেখিতে পাই যেখানে বন্ধন আরও নিবিড়, যেখানে একের সহযোগিতা ব্যতীত অপরের পক্ষে শ্রীবৃদ্ধিলাভ বা জীবনধারণ অসম্ভব। এরূপ সহযোগিতাকে আমরা 'যোগ-জীবন' বা

অন্যোন্যজীবিত্ব (Symbiosis) বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রে একজনকে অপরের দাস বলিয়া মনে হইলেও একথা স্বীকার্য্য যে এই সহযোগিতা উভয়ের পক্ষেই হিতকর। অনাবৃত প্রস্তর এবং বনবৃক্ষের মোচড়ান বা গ্রন্থিল (gnarled) শাখাপ্রশাখা এক্রূপ শৈবালে আচ্ছাদিত হইতে দেখা যায়। এই শৈবাল একপ্রকার বর্ণহীন ছত্রাক এবং অতিসূক্ষ্ম এককোষ জলজ সবুজ উদ্ভিদ্ 'এলগি'র (algaė) সমবায়ে গঠিত। ছত্রাক খনিজ লবণ উৎপদান করিয়া 'এলগি'র কোষকে জলাভাবের ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, সবুজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌টি আবার সূর্য্যকিরণ সহযোগে যে শর্করা জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করে তদ্দারা ছত্রাকের প্রাণরক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে। পরস্পরের প্রাণরক্ষার যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া এই যে তাহারা পরস্পরকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার ফলে ঐ শৈবালকে 'সুমেরু' অঞ্চল পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্তরূপে টিকিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই শৈবালই উক্ত অঞ্চলের বল্‌গা হরিণ প্রভৃতির প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অনেক বনবৃক্ষ, গুল্ম ও অন্যান্য উদ্ভিদের মূলে একপ্রকার ছত্রাক জন্মিয়া থাকে। এই ছত্রাক উদ্ভিদ্‌গুলিকে মাটি হইতে তাহাদের খাদ্যসংগ্রহ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে, উদ্ভিদ্‌সমূহও পরিবর্ত্তে তাহাকে শর্করাজাতীয় পদার্থ উপহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। নাইট্রোজেনসংযোজক এইরূপ বীজাণু (bacteria) এবং মটর কলাই প্রভৃতি শিম্বীবর্গীয় (leguminous) উদ্ভিদের মধ্যে এই সহযোগিতা বা অন্যোন্যজীবিত্বের ফলে উদ্ভিদ্‌সমূহ যেরূপ উপকৃত হয়, ভূমির সরসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিরও কম সহায়তা হয় না।

ঘাস এবং কাষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ (cellulose) এবং লিগনিন্ (lignin) রহিয়াছে। উহারা এরূপভাবে গঠিত যে অনেক কাল পর্য্যন্ত রাসায়নিকগণ উহা বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন নাই। মানুষের শরীরের পরিপাকযন্ত্রে যে সমস্ত কিণ্ব আছে তাহারাও ঐ দুইটি পদার্থের নিকট হার মানিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি মানুষের পক্ষে যে কার্য্য অসম্ভব উই বা টারমাইট (termite) তাহা সহজে নিষ্পন্ন করিতে পারে,—উহারা নির্ব্বিবাদে ঘাস, পাতা, কাঠ ভক্ষণ করিয়া হজম করিয়া ফেলে। পরীক্ষায় জানা যায়, উইএর পরিপাক শক্তির মূলে রহিয়াছে অতিসূক্ষ্ম এককোষ ফ্লাগেলেট্ (flagellates) নামক একপ্রকার প্রাণী, উহারা অন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। শক্ত কাঠ জীর্ণ করিবার মত প্রয়োজনীয় কিণ্বরস এই ফ্লাগেলেটের দেহ হইতেই নির্গত হয়। উই বা টারমাইট একদিকে যেমন কাষ্ঠের প্রয়োজনীয় তাপ সংরক্ষণ করে, তেমনি ফ্লাগেলেটের সহায়তায় কাষ্ঠ হইতে খাদ্যও সংগ্রহ করিয়া লয়। এরূপ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত পশুপাখীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গাভী শায়িত অবস্থায় রোমন্থন করিতে থাকে, আর একটি কাক তাহার গায়ে বসিয়া খুঁটিয়া

খুঁটিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে এরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে অতি সামান্য ঘটনা বলিয়া বোধ হইলেও এইরূপ কার্য্যের ফলে যে উভয়েই উপকৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই,—গাভীর দেহ পরিষ্কৃত হইয়া যায়, কাকও নিজের উপযোগী খাদ্যসংগ্রহ করিয়া লয়। দক্ষিণ-আমেরিকায় এরূপ একপ্রকার পাখীর কথা শুনা যায় যাহারা নির্ভয়ে বিশ্রামশীল কুমীরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাহার দাঁত খুঁটিয়া অপরিষ্কার পদার্থগুলি বাহির করিয়া লয়। কুমীর এই উপকার পায় বলিয়া তাহার কোনই অনিষ্ট করে না। সামান্য বীজাণু হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গ, পশুপাখী প্রভৃতির মধ্যে যে সহযোগিতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে মানবও বহু শিক্ষালাভ করিতে পারে।

শাকসব্জী উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহার

উদ্ভিদ্‌জীবনের উপর বিদ্যুৎশক্তি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, বর্ত্তমানে তৎসম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উদ্ভিদ্ সমূহের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা যাইতে পারে কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, ভীষণ ঝড়-বিদ্যুৎসমন্বিত আবহাওয়ায় কোন কোন শস্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক তাপ ব্যতীত বিদ্যুতের সাহায্যে উৎপন্ন আলোক বিবিধ শস্যের উপর প্রয়োগ করিয়াও নানারূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোনও উদ্ভিদের খুব সতেজ বৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ চারি ঘণ্টা সূর্য্যকিরণ এবং সর্ব্বসমেত প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা পরিমাণ দিবালোক প্রয়োজন হইয়া থাকে। চারবাতি শক্তিবিশিষ্ট কোন বৈদ্যুতিক আলোক প্রতি রাত্রিতে ১০ ঘণ্টা-কাল 'প্যান্সি' (pansy) নামক উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে ৮৩ দিন পর উহার প্রত্যেক গাছটিতে ১৬টা করিয়া ফুল ফুটিয়াছে। আলোক ব্যবহার না করিলে তাহাতে সাধারণতঃ ঐ সময়ে দুইটির বেশী ফুল প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায় না। 'আষ্টার' (aster) নামক গাছে সাধারণতঃ যে সময়ে ফুল ফুটিয়া থাকে, ঐরূপ আলোকের প্রয়োগ ফলে তাহা অপেক্ষাও ৩০ দিন কম সময়ে উহাতে পুষ্পোদ্গম হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, লাল ও পীত আলোকরশ্মি উদ্ভিদের পত্রহরিৎ পদার্থটিকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করতঃ কার্ব্বনিক-এসিড হইতে কার্ব্বনগ্রহণের সৌকর্য্যসাধন করিয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে। বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করিয়া জমির উত্তাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে আশাতীত কম সময়েও শস্য-উৎপাদন সম্ভবপর। আধুনিক যুগ বিদ্যুতের যুগ, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারে যে সকল বিস্ময়কর ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানের কৃতিত্বই বিঘোষিত হইতেছে।

'পত্রহরিৎ' সম্পর্কে গবেষণা

যাহা হইতে উদ্ভিদের সবুজবর্ণের উৎপত্তি ঘটে, জৈব রসায়নের সেই বিস্ময়কর পদার্থ "পত্রহরিৎ" সম্পর্কে বর্ত্তমানে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। আমরা জানি উদ্ভিদ্‌মাত্রেই এই জিনিষটি বিদ্যমান। 'ফোটোসিন্থেসিস' (photo-synthesis) নামক এক রহস্যজনক প্রক্রিয়ার সহায়তায় পত্রহরিৎ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে বায়ুস্থিত 'কার্ব্বন ডায়ক্সাইড'কে শর্করা, ষ্টার্চ্চ, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থে পরিণত করিয়া প্রাণিজগতের আহার্য্যের সংস্থান করিয়া দেয়। 'পত্রহরিৎ' ব্যতীত কোন উদ্ভিদ্‌ই বাঁচিতে ও বৃদ্ধি পাইতে পারিত না, ফলে জীবজগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

জীবনের গূঢ় রহস্যের সন্ধানলাভ করিতে হইলে পত্রহরিৎ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হারভার্ড কলেজের ত্রিশততম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলা ও বিজ্ঞানের যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে পত্রহরিৎ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ হান্স ফিসার (Dr. Hans Fischer) পত্রহরিতের গঠন সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হারভার্ডের প্রেসিডেন্ট ব্রায়েন্ট কোনাণ্টও পত্রহরিতের রসায়নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এই সমস্ত মণীষিগণের গবেষণাফলে উদ্ভিদের সবুজবর্ণোৎপাদক পদার্থটির সহিত "হেমিন" (hemin) নামক রক্তের লোহিতবর্ণোৎপাদক পদার্থটির বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। "হেমিন" এবং "পত্রহরিৎ" উভয়ের মধ্যেই পাইরল্‌ (pyroll) নামে একপ্রকার উদ্বায়ী ক্ষারপদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। পাইরলের গঠন সম্প্রতি যথাযথভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা হইতে পরফিরিন (porphyrins) নামক একপ্রকার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। উদ্ভিদের পরফিরিন এবং রক্তের পরফিরিন অনেকটা একপ্রকার। উভয়ের মধ্যে শুধু একটিমাত্র কার্ব্বন-পরমাণু ও কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ১৯২৫ সালে বৈজ্ঞানিক ফিসার কৃত্রিম উপায়ে পরফিরিন প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রহরিৎকে এপর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় নাই।

মিউনিক্‌নিবাসী বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ রিচার্ড উইলস্‌টেটার দুই প্রকার পত্রহরিতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে আবার দুই প্রকারের পীত রঞ্জকপদার্থ (pigments) বিদ্যমান। একটি 'কেরোটিন' (carotin) এবং অপরটি 'জ্যানটোফিল' (xantophyll)। 'কেরোটিন'ই জীবদেহ দ্বারা খাদ্যপ্রাণ 'এ'তে পরিবর্ত্তিত হয়। অনেকে মনে করেন 'জ্যানটোফিল' হইতে খাদ্যপ্রাণ 'ও'র (E) উৎপত্তি ঘটে। উদ্ভিদের সবুজবর্ণোৎপাদক পদার্থ এবং রক্তের লোহিত-

বর্ণোৎপাদক পদার্থের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে জীবনের বিবর্ত্তনপ্রণালী সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ক্রমবিবর্ত্তনের কোন একটি বিশিষ্ট অবস্থাতেই উদ্ভিদের রঞ্জকপদার্থ হইতে রক্তের রঞ্জকপদার্থটির উৎপত্তি ঘটিয়াছে। রক্তের রঞ্জকপদার্থটিতে 'লৌহ' বিদ্যমান, পত্রহরিতে 'ম্যাগনেসিয়ম' দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি যে অবস্থায় আসিয়া ম্যাগনেসিয়মের পরিবর্ত্তে লৌহ গ্রহণ করিয়াছেন, সেস্থানেই উদ্ভিদ্‌ হইতে প্রাণিজীবনের সৃষ্টিপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ উইলস্‌টেটার মনে করেন যে রক্তমধ্যস্থিত লোহিত রঞ্জকপদার্থের লৌহের সহিত অক্সিজেনের সংযোগসাধন যেমন প্রাণিজীবনের বৈশিষ্ট্য তেমনি উদ্ভিদ্‌দেহস্থ সবুজ রঞ্জকপদার্থের ম্যাগনেসিয়ম কর্ত্তৃক অক্সিজেনের বিয়োগসাধনই উদ্ভিদ্‌জীবনের রাসায়নিক বৈচিত্র্য। পত্রহরিৎ সম্পর্কে এবম্বিধ গবেষণার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে বলিয়া আশা হয়। পত্রহরিৎকে লৌহের সহিত ব্যবহার করিয়া রক্তহীনতার চিকিৎসায় ইতোমধ্যেই বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। উহার অন্যান্য ব্যবহার সম্পর্কেও পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণাগারসমূহে পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। পত্রহরিতের অচ্ছাদন দ্বারা খাদ্যদ্রব্য বা চারা গাছ প্রভৃতি অনেক কাল রক্ষা করা যাইতে পারে। এরূপ সবুজ রঙের আচ্ছাদন ব্যবহারে সূর্য্যের অনিষ্টকর রশ্মিগুলি প্রতিহত হয়, ফলে খাদ্যদ্রব্য বা উদ্ভিদাদির পক্ষে যাহা হিতকর শুধু সেই সকল রশ্মিই উহাদের দেহে লাগিয়া উহাদিগকে সতেজ ও অক্ষুণ্ণ রাখে। অনেক বৎসরের বৈজ্ঞানিক সাধনার ফলে মানুষ বসন্তের কচি পাতার রঙকে এবং হেমন্তের লাল ও পীত পত্রকে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উপকারের জন্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

বিশ্বরশ্মির বৈশিষ্ট্য

সৌরজগৎ ছাড়িয়াও বহু দূরদূরান্ত হইতে যে রহস্যজনক রশ্মি পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়, তাহার উৎপত্তি, কার্য্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানবের মন স্বতঃই কৌতূহল বোধ করিয়া থাকে। এই বিশ্বরশ্মি বা 'কস্‌মিক রে' অবলম্বনে বৈজ্ঞানিকগণ নানাভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন। সম্প্রতি কালিফোর্ণিয়ার ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ডাঃ কার্ল, ডি, এণ্ডারসন ও ডাঃ শেঠ, এইচ, নেডারমেয়ার আমেরিকার কলরেডো ষ্টেটের 'পাইকস্‌ পিক' পর্ব্বতস্থিত গবেষণাগারে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে এই দূরান্তরের রশ্মি সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের গবেষণা ফল হইতে মনে হয়, এই রশ্মির কার্য্যাবলী যত সরল বলিয়া বৈজ্ঞানিক-গণের ধারণা ছিল বস্তুতঃ তাহা নহে। জটিলতায় বিশ্বরশ্মি সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিবে বলিয়া মনে হয়। উইলসন্‌প্রবর্ত্তিত মেঘপ্রকোষ্ঠ বা

'ক্লাউড চেম্বার' নামক বিশেষভাবে নির্ম্মিত পরমাণু ফাঁদের (atomic trap) সাহায্যে হাজার হাজার ফটো তুলিয়া দেখা যায়, বিশ্বরশ্মি প্রতিনিয়ত অণু-পরমাণুর বিয়োগ বা ধ্বংসসাধন করিতেছে। বিশ্বরশ্মির এই ক্ষমতা বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব আবিষ্কার। মেঘপ্রকোষ্ঠে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে দেখা যায় যে 'ফোটন' (photon) নামে বিশ্বরশ্মির যে এক উপাদান আছে এবং যাহা অবিমিশ্র শক্তিসমষ্টি (bundles of pure energy) ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহার সাহায্যে 'সীসা'র ন্যায় ভারী পদার্থের পরমাণুকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করা যাইতে পারে। অতিক্ষুদ্র ইলেক্‌ট্রনসমূহ পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া পদার্থের নিউক্লিয়স হইতে এমন কণা উৎপাদন করে যাহার ওজন ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা অত্যধিক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সকল বিশ্বরশ্মি আসিয়া পর্ব্বত-শিখরে আঘাত করে, তাহাদের শক্তি যে রশ্মিগুলি আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের সমতলক্ষেত্রে পতিত হয় তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে তাহারা পরমাণু-সমূহের অভ্যন্তর হইতে তড়িৎশক্তিবিহীন প্রবল শক্তিশালী 'নিউট্রন'কণাকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। এই বিচ্ছিন্ন বস্তুকণাই অপরাপর পরমাণুর বিয়োগসাধন করিয়া মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটায়। বিশ্বরশ্মির এই তথ্য পরমাণবিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিশেষভাবে সহায়তা করিবে।

ধাতুনির্ম্মিত ব্লটার

আধুনিক বিজ্ঞানশিল্পিগণের নিকট কিছুই অসাধ্য নাই। টেবিলে কালি ঢালিয়া ফেলিলে এতদিন আমরা তাহা কাগজনির্ম্মিত শোষক বা ব্লটারের সাহায্যে শুষিয়া লইয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন কোন ধাতুকে ঐরূপ ব্লটারের কার্য্যে ব্যবহার করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি প্রদীপের 'পলিতা' হিসাবে পর্য্যন্ত ধাতু ব্যবহৃত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ধাতুকে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত করিয়া (porous) এমন ভাবে নির্ম্মিত করা প্রয়োজন, যাহাতে অনায়াসে কাগজনির্ম্মিত ব্লটারের মতই উহা তরল পদার্থ শুষিয়া লইতে পারে। এইজন্য প্রথমতঃ বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক উপায়ে ধাতুবিশেষকে পাউডারের ন্যায় চূর্ণ করিয়া ঐ পাউডারসদৃশ পদার্থের প্রতি বর্গইঞ্চিতে কয়েক সহস্র পাউণ্ড পরিমাণ চাপ প্রযুক্ত হয়, ফলে ধাতুর পাউডার যে আকৃতি ধারণ করে তাহা বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক চুল্লীতে উত্তপ্ত করিয়া লইলে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার ধাতুদ্রব্যে পরিণত হইয়া যায়। এই সচ্ছিদ্র ধাতব পদার্থটি দেখিতে ঠিক সাধারণ ধাতুদ্রব্যের মত হইলেও ওজনে ইহা বেশ হাল্কা। উপরোক্ত উপায়ে চাপপ্রয়োগে পাউডারের কণাগুলিকে একত্রিত করিবার ফলে বিভিন্ন কণার মধ্যে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁক থাকিয়া যায়। উহারা এত সূক্ষ্ম যে খালিচোখে তাহা ধরা

অসম্ভব। কাগজনির্ম্মিত ব্লটার যেমন তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কালি বা অন্য কোন তরল পদার্থ শুষিয়া লয়, এই অভিনব ধাতব পদার্থটির সূক্ষ্ম ফাঁকের মধ্যেও এইভাবে তরল পদার্থসমূহ স্থানলাভ করিয়া উহাকে ব্লটারের কার্য্যের উপযোগী করে। এরূপ সচ্ছিদ্র ধাতুনির্ম্মিত পদার্থ পলিতার ন্যায়ও ব্যবহার করা চলে। সূত্রনির্ম্মিত পলিতা যেমন কেরোসিনের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে তাহা বাহিয়া তৈল উঠে, এরূপ ধাতুনির্ম্মিত পলিতার মধ্যস্থ ছিদ্রপথেও তেমনি তৈল উপর দিকে বাহিত হয়; সুতরাং সাধারণ পলিতার মত ইহাতেও অগ্নিসংযোগ করিয়া লণ্ঠনে ব্যবহার করা চলে।

'ষ্ট্রাটোস্ফিয়রে' বিষাক্ত গ্যাস

বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধে 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়র' সম্পর্কে বর্ত্তমানে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। ফলে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়র' বা সমতাপমণ্ডলের বিবিধ স্তর সম্বন্ধেও অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন যে পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল ঘিরিয়া ষ্ট্রাটোস্ফিয়রের উর্দ্ধস্তরে একপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে গ্যাসটি আমাদের বহু কালের পরিচিত ওজোন (ozone)। আমরা ওজোনকে চিরকাল বিশুদ্ধ বায়ুর নামান্তর বলিয়াই জানিতাম। ফুসফুসসম্পর্কিত রোগে এই গ্যাস বিশেষভাবে হিতকর হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল, কিন্তু উচ্চস্তরের গবেষণায় ওজোন সম্বন্ধে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে এই ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়াই মনে হয়। তবে কি পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা যে ওজোন গ্যাসের সাক্ষাৎ পাই,—যাহা এতকাল জীবনধারণের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতাম তাহা একান্তই মিথ্যা? তাহা নহে, কারণ স্থানবিশেষের গুণে একই পদার্থ বিভিন্ন গুণ দেখাইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৫।২০ মাইল উর্দ্ধে এই ওজোন গ্যাসই সূর্য্য হইতে নির্গত ভয়ঙ্কর আলট্রাভায়োলেট রশ্মিগুলিকে ঠেকাইয়া রাখিতেছে। উহাদের তীব্র প্রভাব এইভাবে ব্যাহত না হইলে পৃথিবীবক্ষে আমাদের জীবনধারণ একান্ত অসম্ভব হইত। অথচ এই পরম হিতকর গ্যাসটিই যদি এক মাইল উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলে সমভাবে বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে ইহার প্রভাবে কয়েক ঘণ্টায় না হইলেও কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাণিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

কয়েক বৎসর যাবৎ মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ, বি, ম্যাকডনেল বিভিন্ন ওজোন গ্যাসের সহায়তায় বিভিন্ন রোগনিরাময়, বিশেষতঃ যক্ষ্মাব্যাধি উপশম করা সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। তিনিও পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে অত্যধিক ঘন ওজোন গ্যাস নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বিষের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে। ঝিল্লীর প্রদাহ ঘটাইয়া উহা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যে অতিরিক্ত পরিমাণে

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ঘন ওজোন ব্যবহার করিলে ২।১ মিনিটের মধ্যেই ফুসফুসে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। ঘন ওজোন অল্প পরিমাণে ব্যবহারেও নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি ঘটে। আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘন ওজোন যেমন বীজাণু ধ্বংস করে, তেমনি ইহা মানবদেহের পক্ষেও মারাত্মক হইতে পারে।

অক্সিজেনের রূপান্তর ঘটিয়াই ওজোনের উৎপত্তি; সাধারণ অক্সিজেন হইতে উহা দেড় গুণ অধিক ভারী। বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বর্ণ-বিশ্লেষণ প্রণালীতে (spectrographic method) ওজোনের মোট পরিমাণ নির্ণয়ের নানারূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে অধিকাংশ ওজোনই 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়রে' দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে বায়ুর ঘনত্ব সমুদ্রসমতল হইতে শতকরা দুই ভাগ কম। ওজোনের পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হইলেও দেখা গিয়াছে যে স্বাভাবিক (normal) তাপ ও চাপ বিদ্যমান থাকিলে উহার গড় পরিমাণ তিন মিলিমিটার পুরু স্তরসমন্বিত অতিবিশুদ্ধ ওজোনের এবং পাঁচ মিলিমিটার পুরু বায়ুস্তরের সমান হইবে। এই পরিমাণ ওজোন যদি বায়ুমণ্ডলের প্রথম এক মাইলের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে প্রতি ১৯ লক্ষ ভাগ বায়ুতে ওজনে প্রায় ৪০ ভাগ ওজোন গ্যাস বিদ্যমান থাকিত; ফলে উহার প্রভাবে উচ্চতর প্রাণিসমূহ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

নন্দাদেবী গিরিশৃঙ্গে আরোহণ

বিগত ২৯শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটীশ-আমেরিকান অভিযাত্রীদলের ওডেল ও টিলম্যান নামক দুই জন সদস্য ব্রিটীশ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশিখর নন্দাদেবী পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিবার প্রচেষ্টা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাঁহাদের সাফল্যের সংবাদে সকলেই এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদলকে অভিনন্দিত করিবেন। ব্রিটীশ-আমেরিকান অভিযাত্রীদলের নেতা ছিলেন কাডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রাহাম ব্রাউন এবং সর্ব্বশুদ্ধ সাত জন সদস্য এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। দলের সকল সদস্য সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ না হইলেও সকলেই ২৩,৫০০ ফুটের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। ইঁহাদের সর্ব্বনিম্ন ক্যাম্প বিগত ৭ই আগষ্ট তারিখে ১৬,৮০০ ফুট উচ্চে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত উপরে আরও ছয়টি ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল। মালপত্র বহনের জন্য ৩৭ জন কুলি নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ছয় জন কুলি সর্ব্বনিম্ন ক্যাম্প অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং অনেক সময় মালপত্র তাঁহাদের নিজেদেরই পৃষ্ঠে বহন করিয়া উঠিতে হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Zygophylleae গোক্ষুরবর্গ				
Tribulus terrestris L. গোক্ষুর	ভূমিশায়ী, রুক্ষ রোমযুক্ত ওষধি	ফল	সর্ব্বত্র	মূত্র ও স্নিগ্ধকারক, শুক্রমেহপ্রশমক
Geraniaceae আমরুলবর্গ				
Oxalis corniculata L. আমরুল শাক	বর্ষ কিংবা দ্বিবর্ষজীবী, ধাবক	গাছ	ঐ	সঙ্কোচক, স্বাভিনাশক, শৈত্য-উৎপাদক, অগ্নি-বর্দ্ধক
Rutaceae জম্বীরবর্গ				
Citrus medica L. V. Limonum কর্ণ লেবু	বৃহৎ গুল্ম	ফলত্বক ও উহার তৈল, ফলরস	রোপিত	বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক
C. medica V. acida কাগজী ও পাতিলেবু	ঐ	ফলরস	হিমালয়ের পাদদেশ, অন্যত্র রোপিত	ঐ
Citrus aurantium L. কমলালেবু	ঐ	ফলত্বক ও রস	ঐ	ঐ এবং পোষক
Aegle marmelos Corr.	মধ্যমাকার তরু	ফলের শাঁস	ঐ	উদরাময় ও অতিসারে ব্যবহৃত
Meliaceae নিম্ববর্গ				
Melia azadirachta L. নিম	বৃহৎ তরু	ত্বক, পত্র, বীজের তৈল	সর্ব্বত্র	জ্বরঘ্ন, চর্ম্মরোগনাশক, জীবাণুপ্রতিষেধক
Amoora rohituka W. & A. তিক্তরাজ, রড়া	মধ্যমাকার তরু	বীজের তৈল	পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট	মর্দ্দকরূপে বাতে ব্যবহৃত
Celastrineae কাঞ্চনীবর্গ				
Celastrus paniculata Willd. কাঞ্চনী	বৃহৎ লতানিয়া গুল্ম	বীজ ও বীজতৈল	উত্তরবঙ্গ	উত্তেজক, কামোদ্দীপক, স্মৃতিবর্দ্ধক

Missing Page(s)

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Rhamnaceae বদরীবর্গ				
Ventilago madraspatana Gaertn. রক্তপিত্ত	বৃহৎ লতা	মূলত্বক	পশ্চিমবঙ্গ	বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক
Zizyphus jujuba Lamk. কুল	মধ্যাকার তরু	ফল	রোপিত	কফনাশক ; রক্তরোধক
Ampelidae দ্রাক্ষাবর্গ				
Vitis quadrangularis Wall. হাড়জোড়া	দীর্ঘ কাণ্ডযুক্ত লতা	কাণ্ড	সর্ব্বত্র	বেদনায় ও অনিয়মিত রজঃস্রাবে ব্যবহৃত
V. pedata Vahl. গোয়ালে	লতা	পত্র	ঐ	স্থানীয় উত্তেজক
Leea macrophylla Roxb. ঢোল সমুদ্রিয়া	গুল্ম	মূল	পূর্ব্ববঙ্গ	সঙ্কোচক, দদ্রুনাশক
Sapindaceae ফেনিলবর্গ				
Cardiospermum halicabum L. লতাফটকি	লতানিয়া বর্ষজীবী	মূল, পত্র, বীজ	সর্ব্বত্র	রেচক, বমনকারক, উগ্রতাসাধক
Sapindus mukorossi Gaertn. রিঠা	বৃহৎ তরু	ফল	রোপিত	বমনকারক, ক্রিমিনাশক, কফনিঃসারক
Anacardiaceae আম্রবর্গ				
Mangifera indica L. আম	বৃহৎ তরু	ফল, ফলের শাঁস, পত্র, ত্বক	সর্ব্বত্র	সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক, পোষক
Odina Wodier Roxb. জিওল	মধ্যাকার তরু	ত্বক	ঐ	সঙ্কোচক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Semecarpus anacardium L. ভেলা	ঐ	ফল	পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ	উত্তেজক, পাচক, স্নায়ুরোগনাশক
Spondias mangifera Willd. আমড়া	ঐ	ঐ	সর্ব্বত্র	পিত্ত ও স্কাভিরোগনাশক, কষায়
Moringeae শোভাঞ্জনবর্গ				
Moringa pterygosperma Gaertn. সজিনা	তরু	মূলত্বক	রোপিত	উত্তেজক, মূত্রকারক, উগ্রতাসাধক
Leguminoseae শিম্বীবর্গ				
Trigonella fœnum-græcum L. মেথী	বর্ষজীবী	বীজ	কর্ষিত	বায়ুনাশক, বলকারক
Psoralea corylifolia L. বুচকি	ক্ষুদ্রগুল্ম	বীজ	সর্ব্বত্র	শ্বেতকুষ্ঠের ঔষধ
Tephrosia purpurea Pers. বননীল	বহু শাখাযুক্ত, প্রায় ১॥ হাত উচ্চ	মূল, বীজ	ঐ	রক্তশোধক, পিত্তনাশক, রেচক
Sesbania aegyptiaca Pers. জয়ন্তী	বৃক্ষাদ্যরূপ ওষধি	বীজ, পত্র	ঐ	প্লীহাবৃদ্ধিরোধক, কোষবৃদ্ধিতে প্রলেপ
S. grandiflora Pers. বক	স্বল্পজীবী তরু	ত্বক, পত্র, ফুল	রোপিত	কফনিঃসারক, সঙ্কোচক, নাসিকারক্তপ্রদাহে প্রযুজ্য
Uraria lagopoides Dc. চাকুলিয়া	গুল্ম	গাছ	সর্ব্বত্র	পরিবর্ত্তক, বলকারক
Desmodium gangeticum Dc. শালপানি	ঐ	ঐ	ঐ	জ্বরঘ্ন, কফনাশক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Abrus precatorius L. কুঁচ	লতা	মূল, বীজ	ঐ	রেচক, চর্ম্মকীটনাশক, বেদনানিবারক
Mucuna pruriens Dc. আলকুশী	লতা	বীজ, মূল, ফলের রোম	ঐ	কামোদ্দীপক, ক্রিমিনাশক, মূত্রকারক
Erythrina indica L. পালিতা মাদার	তরু	ত্বক, পত্র	ঐ	জ্বরঘ্ন, পিত্তনাশক, মূত্রকারক
Butea frondosa Roxb. পলাশ	ঐ	গঁদ, বীজ	পশ্চিমবঙ্গ	সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক, জ্বরঘ্ন
Phaseolus aconitifolius L. মাষকলাই	বর্ষজীবী	বীজ	কর্ষিত	স্নায়বিক রোগে ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত
Clitoria ternatea L. অপরাজিতা	লতা	বীজ, মূল	সর্ব্বত্র	জ্বরঘ্ন, রেচক, মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহে ব্যবহৃত
Dolichos biflorus L. কুলথকলাই	বর্ষজীবী	বীজ	কর্ষিত	অশ্মরীনাশক
Pongamia glabra Vent. ডহর করঞ্জা	মধ্যমাকার তরু	বীজ, বীজ-তৈল	নিম্নবঙ্গ	চর্ম্ম রোগ ও বাতব্যাধিনাশক
Caesalpinia bonducella L. লাটা করঞ্জা	কণ্টকময় লতানিয়া গুল্ম	বীজ	সর্ব্বত্র	জ্বরঘ্ন
Cassia fistula L. সোঁদাল	মধ্যমাকার তরু	ফলের শাঁস	সর্ব্বত্র	রেচক
C. absus L. চাকুন্দ	বর্ষজীবী	বীজ	ঐ	রেচক, দক্রঘ্ন, চক্ষুপ্রদাহে ব্যবহৃত
Saraca indica L. অশোক	বৃহৎ তরু	ত্বক	পূর্ব্ববঙ্গ	জরায়ুর রক্তস্রাবে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Tamarindus indica L. তেঁতুল	ঐ	ফলের শাঁস	সর্ব্বত্র	মৃদু রেচক, পাচক, পিত্তনাশক
Bauhinia variegata L. কাঞ্চন	মধ্যমাকার তরু	ত্বক	ঐ	সঙ্কোচক, পরিবর্ত্তক, বলকারক
Acacia arabica Willd. বাবলা	ঐ	ত্বক, গঁদ	ঐ	সঙ্কোচক, স্নিগ্ধকারক
Acacia catechu Willd. খদির	ঐ	কাষ্ঠসার	উত্তরবঙ্গ	সঙ্কোচক, ধারক, শ্বেতপ্রদরে ব্যবহৃত
Crassulaceae হিমসাগরবর্গ				
Kalanchoe laciniata Dc. হিমসাগর	গুল্ম	পত্র	পূর্ব্ববঙ্গ	রক্তরোধক, ক্ষতপরিষ্কারক
Combretaceae হরিতকীবর্গ				
Terminalia chebula Retz.	তরু	ফল	পশ্চিমবঙ্গ	রেচক, বায়ুনাশক, বলকারক, সঙ্কোচক
T. bellerica Roxb. বহেড়া	বৃহৎ তরু	ঐ	ঐ	ঐ
T. Arjuna Bedd. অর্জ্জুন	ঐ	ঐ	ঐ	বক্ষঃপীড়ায় ও অস্থিভঙ্গাদিতে ব্যবহৃত
Myrtaceae জম্বুবর্গ				
Eugenia jambolana Lam. কালজাম	ঐ	ত্বক, বীজ	সর্ব্বত্র	সঙ্কোচক, বীজ বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত
Barringtonia acutangula Gaertn. হিজল	মধ্যমাকার তরু	মূল	সর্ব্বত্র	তিক্ত, জ্বরঘ্ন

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Lythraceae দাড়িম্ববর্গ				
Punica granatum L. ডালিম	ক্ষুদ্র তরু	ফল, ত্বক	রোপিত	সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক (ফিতাক্রিমি)
Passifloreae ঝুমকাবর্গ				
Carica papaya L. পেঁপে	ঐ	ফলের আটা	ঐ	ক্রিমিনাশক, পরিপাক-সহায়ক
Cucurbitaceae অলাবু বর্গ				
Trichosanthes di ca Roxb. পটল	বর্ষজীবী লতা	পত্র	সর্ব্বত্র	তিক্ত, বলকারক, জ্বরঘ্ন, মৃদুরেচক
Luffa echinata Roxb. বিন্দাল	ঐ	ফল	ঐ	উদরী ও কামলা রোগে ব্যবহৃত
Benicasa cerifera Savi. চালকুমড়া	ঐ	ঐ	কর্ষিত	স্নিগ্ধকারক, রক্তরোধক, পরিবর্ত্তক, পুষ্টিকারক
Cephalandra indica Naud. তেলাকুচা	ঐ	মূল	সর্ব্বত্র	বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত
Bryonia laciniosa L. মালা	বহুবর্ষজীবী লতা	গাছ	ঐ	তিক্ত, জ্বরঘ্ন, বলকারক
Ficoideae গীষ্মসুন্দরবর্গ				
Mollugo cerviana Sering গীমাশাক	বর্ষজীবী, আর্দ্র মৃত্তিকাবাসী	ঐ	ঐ	তিক্ত, রেচক, বায়ু-নাশক, জ্বরঘ্ন
Umbelliferae ধনাকবর্গ				
Hydrocotyle asiatica L. থুলকুড়ি	ভূমিশায়ী বহুবর্ষজীবী	ঐ	ঐ	পরিবর্ত্তক, রক্তশোধক, উপদংশে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থ	
Carum Roxburghianum Benth. রাঁধুনি	বর্ষজীবী	ফল	কর্ষিত	বায়ু বমনপ্রশ
Carum copticum Benth. জোয়ান	ঐ	ঐ	ঐ	বায়ুনাশক, উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, পাচক
Focniculum Vulgare Gaertn. পানমৌরী	ঐ	ঐ	ঐ	উত্তেজক, বায়ুনাশক
Peucedanum sowa Kurz. সুলফা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
Coriandrum sativum L. ধনিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	বায়ুনাশক, মূত্রকারক, বলকারক
Rubiaceae কদম্ববর্গ				
Hymenodictyon excelsum Wall. কুকুর কাঠ	বৃহৎ তরু	ত্বক	চট্টগ্রাম	তিক্ত, কষায়, জ্বরঘ্ন; ক্রিয়া সিঙ্কোনাসদৃশ
Oldenlandia corymbosa L. কৈতপাপড়া	বর্ষজীবী ক্ষুদ্র ওষধি	গাছ	সর্ব্বত্র	পিত্তাধিক্যে ও অবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত
Randia dumentorum Lam. ময়নাকাঁটা	কণ্টকময় গুল্ম	ত্বক, ফল	চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট	বমনকারক, সঙ্কোচক, আক্ষেপনিবারক
Vangueria spinosa Roxb. পিণ্ডালু	কণ্টকময় ক্ষুদ্র তরু	ফল	উত্তরবঙ্গ	স্নিগ্ধকারক, বলদায়ক, কফ ও পিত্তনিসারক
Ixora coccinea L. রঙ্গন	গুল্ম	ফুল	রোপিত	অতিসারে ব্যবহৃত
Paederia foetida L. গেঁদাল	লতানিয়া গুল্ম	পত্র	উত্তরবঙ্গ	রোগাস্তদৌর্ব্বল্যে, উদরাময়ে ও বাতে ব্যবহৃত

	প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
	রুক্ষ রোমযুক্ত, ভূমিশায়ী ওষধি	মূল, বীজ	পশ্চিমবঙ্গ	মূল সার্সাপ্যারিলার ও বীজ কফির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত ; পরিবর্ত্তক, উত্তেজক
Compositeae ভৃঙ্গরাজবর্গ				
Serratula anthelmintica Roxb. সোমরাজ	বর্ষজীবী	বীজ	সর্ব্বত্র	ক্রিমি ও চর্ম্মরোগনাশক, মূত্রকারক
Eupatorium ayapana Vent. আয়াপান	ক্ষুদ্র গুল্ম	পত্র	প্রবর্ত্তিত	উত্তেজক, বল ও ঘর্ম্মকারক, রক্তাতিসারে ও কাশে ব্যবহৃত ; বিশিষ্ট রক্তরোধক
Sphaeranthus indicus L. গোরক্ষ মুণ্ডি	ক্ষুদ্র ওষধি	বীজ, মূল	ধান্যক্ষেত্রে সাধারণ	অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পরিবর্ত্তক, কামোদ্দীপক
Xanthium strumarium L. বন ওকড়া	বর্ষজীবী	গাছ	সর্ব্বত্র	অবসাদক, মূত্রকারক, মেহ ও শ্বেত প্রদরে ফলপ্রদ
Enlydra fluctuans Lour. হিঞ্চাশাক	জলাশয়বাসী ওষধি	ঐ	ঐ	পিত্তনাশক, স্নিগ্ধকারক, চর্ম্ম ও স্নায়ুরোগে ব্যবহৃত
Eclipta alba Hassk. কেমুণ্ডে	বর্ষজীবী	ঐ	ঐ	যকৃৎ ও প্লীহাবৃদ্ধি রোগে, কামলা ও জ্বরে ব্যবহৃত ; কেশবর্দ্ধক
Wedelia calendulacea Less. ভৃঙ্গরাজ	বহুবর্ষজীবী ওষধি	ঐ	ঐ	পরিবর্ত্তক, বলকারক, কেশবর্দ্ধক
Chrysanthemum coronarium L. গুলদাউদি	বর্ষজীবী	ফুল	কর্ষিত	লালানিঃসারক, মেহ রোগে ব্যবহৃত
Echinops echinatus Dc. উটকাটরা	ঐ		পশ্চিমবঙ্গ	বল ও মূত্রকারক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Carthamus tinctorius L. কুসুম ফুল	ঐ	ফুল, বীজ তৈল	কর্ষিত	রেচক, ঘর্ম্মকারক, বীজ-তৈল বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত
Cichorium Intybus L. কাশনি	বহুবর্ষজীবী	ফুল, বীজ, মূল	কর্ষিত	স্নিগ্ধকারক, পিত্তনাশক, রজনিঃসারক
Sonchus oleraceus L. বনপালং	বর্ষজীবী	মূল, পত্র	সর্ব্বত্র	জরঘ্ন, বলকারক
Launea piunatifida Cass. টিক্‌চনা	বহুবর্ষজীবী, রস পীতবর্ণ	মূল	উপকূলভাগ	ট্যারাক্সেকামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত ; বাতব্যাধিতে বাহ্য প্রয়োগে
Tagetes patula L. গেঁদা	বর্ষজীবী	গাছ	কর্ষিত	বেদনানাশক, ক্যালেণ্ডুলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত
Plumbagineae চিত্রকবর্গ				
Plumbago zeylanica L. শ্বেত চিতা	ক্ষুদ্র গুল্ম	মূল	সর্ব্বত্র	বাহ্য প্রয়োগে, দাহক, ফোস্কা-উৎপাদক, বাতনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক,
P. rosea L. লাল চিতা				জরঘ্ন, লালানিঃসারক, উত্তেজক
Myrsineae বিড়ঙ্গবর্গ				
Embelia ribes Burm.	লতানিয়া গুল্ম	বীজ	চট্টগ্রাম	ক্রিমিনাশক, পরিবর্ত্তক,
E. robusta Roxb. বিড়ঙ্গ	ঐ	ঐ	মৈমনসিংহ	বলকারক, বায়ুনাশক
Sapotaceae বকুলবর্গ				
Achras sapota L. সপেটা	তরু	বীজ	প্রবর্ত্তিত	বলকারক, পিত্তনাশক, জরঘ্ন, মূত্রকারক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Mimusops elengi L. বকুল	তরু	ত্বক, অপক্ক ফল	রোপিত	দন্তমাড়ির শিথিলতায় ব্যবহৃত
Ebenaceae তিন্দুকবর্গ				
Diospyros embryopteris Pers. গাব	মধ্যমাকার তরু	ত্বক, ফল	পশ্চিমবঙ্গ	সঙ্কোচক, মূত্ররোগে ও মূত্রনালীপ্রদাহে ব্যবহৃত
Styraceae লোধ্রবর্গ				
Symplocos racemosa Roxb. V. composita লোধ	ক্ষুদ্র তরু	ত্বক	উত্তরবঙ্গ	সঙ্কোচক ; উদর, দন্ত ও চক্ষু পীড়ায় ও জরায়ুর শিথিলতায় ফলপ্রদ
Oleaceae যূথিকাবর্গ				
Nyctanthes arbortristis L. শিউলি	গুল্ম	পত্র	সর্ব্বত্র	পিত্ত ও জ্বরঘ্ন, ক্রিমিনাশক ; কটিস্নায়ু বাতে উপকারী
Jasminum grandiflorum L. চামেলি	ঐ	ঐ	রোপিত	চর্ম্মরোগ, মুখাভ্যন্তর ও কর্ণক্ষতে ব্যবহৃত
Apocynaceae করবীবর্গ				
Rauwolfia serpentina Benth. চাঁদ	ঐ	মূল	উত্তর ও মধ্যবঙ্গ	উন্মাদ, রক্তচাপাধিক্য ও উদরশূলে ফলপ্রদ
Plumeria acutifolia Poir. গোলক চাঁপা	তরু	দুগ্ধবৎ আটা	রোপিত	বিরেচক ; উগ্রতাসাধক, বাতে ব্যবহৃত
Tabernaemontana coronaria R. Br. টগর	গুল্ম	আটা, মূল	ঐ	চক্ষু ও দন্তরোগে প্রযুজ্য ; ক্ষতপ্রদাহপ্রশমক

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস গঠনে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

আগ্নেয়গিরির উৎপাত

বেশী দিনের কথা নয় মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, দ্রবীভূত শৈলনির্ম্মিত পৃথিবীর জমাটবাঁধা কঠিন আবরণের উপর অতি সন্তর্পণে মানুষের বাস। সেই অন্তর্নিহিত তাপের ভীষণ পরিচয়ও লোকে সহজেই পাইত। ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স্ দুইটি রোমক নগরী ধ্বংস করিল। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ জলন্ত তরল পদার্থের বাহির হইবার পথই হইল আগ্নেয়গিরিসমূহ। কিন্তু পৃথিবীর কথা আরও ভাল করিয়া যেদিন জানা গেল, উক্ত ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহও সেদিন হইতেই উপস্থিত হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মাইকেলসন, চেম্বারলিন ও মৌলটন ভূমিতরঙ্গ সম্পর্কে যে সুবিখ্যাত পরীক্ষা করেন, তাহাতে ইহাই দেখান হয় যে চন্দ্রের আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠের (মহাসমুদ্রের নহে) যে বিকৃতি ঘটে, তাহা একটা স্থিতিস্থাপক কঠিন বস্তুর পক্ষেই সম্ভবপর, কঠিন আবরণবিশিষ্ট তরল পদার্থের নহে। ভূমিকম্পের অত্যাচার লিখন ও পরিমাপকারী ভূকম্পবীক্ষণ যন্ত্রে (seismograph) দেখা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠরে এমন কম্পন প্রবাহিত হয় যাহা কোনও তরল পদার্থে ঘটা অসম্ভব এবং পৃথিবীরও ইস্পাতের ন্যায় স্থিতিস্থাপক কাঠিন্য বিদ্যমান। আগ্নেয়গিরির উৎপাতকে পূর্ব্বে যত সহজে ব্যাখ্যা করা গিয়াছিল, এখন আর উহা তত সহজসাধ্য নহে। এখন বস্তুতঃ উহা একটা অত্যন্ত কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আগ্নেয়গিরির উৎপাত সম্পর্কে নিত্যনূতন তথ্য প্রতি বৎসরই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি বটে, তথাপি উহার কারণ সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত।

আমরা অধুনা আগ্নেয়গিরির উৎপাত সম্পর্কে যতটুকু জানি, তাহাতে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থল হইতেই অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হয়, পূর্ব্বের কঠিন উপাদান হইতেই গলিত শিলা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বাস্তবিক গলিত নহে —অধিক তাপমাত্রায় ধাতু ও গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র (magma)। এই ধাতুমিশ্রণের উৎপত্তিস্থলের গভীরতা খুব সম্ভবতঃ কয়েক দশক মাইল এবং যে বাষ্পরাজি নির্গত হয় তাহারা অংশতঃ বায়ুমণ্ডলের উপাদান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ; ভূপৃষ্ঠে যে সমস্ত বাষ্প ছিল, তাহাই যে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিল, এমন নহে।

অনেকটা তরল পদার্থের ন্যায়ই ম্যাগ্‌মা অত্যন্ত মন্থর গতিতে উপর দিকে উঠিয়া আসে। প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গমের কারণ এই যে বাষ্পগুলি অধিকতর দ্রুত গতিতে উত্থিত হইয়া ম্যাগ্‌মার উপরিভাগকে আঘাত করতঃ উহাকে অত্যন্ত স্ফোটনশীল করিয়া তোলে। সমস্ত ম্যাগ্‌মাই গৈরিকস্রাবে পরিণত হয় না অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠিয়া আসে না। উহার অনেকখানিই একটা শৈলাবরণের নিম্নে ঠাণ্ডা হইয়া প্রস্তরমণ্ডলের সঙ্গে কঠিন স্ফটিক (granite) বা মোটা দানাদার আগ্নেয়শিলারূপে জুড়িয়া যায়। ক্ষয়ীভবনের (erosion) ফলে উহা পরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

যে কৌশলে শৈল-সঞ্চালন (diastrophism) ঘটে, ঠিক সেইভাবেই ম্যাগ্‌মার উদ্ভব ও আগ্নেয় ক্ষেত্রের অবস্থানের সন্ধান মিলে বলিয়া বোধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের গ্রহাণুবস্তু পতন দ্বারা পৃথিবীদেহ বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহার সঙ্কোচন ও ঘনত্বপ্রাপ্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অধিকতর ঘনত্বের কাছাকাছি যে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতেই তাপ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপও এইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও বাড়িতে পারে। পরিণামে, অনুকূল প্রদেশে কঠিন বস্তুর পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে যে 'সিলিকেটে'র দ্রাবণ সৃষ্ট হয়, তাহাকে আমরা ম্যাগ্‌মা বলিয়া থাকি। শৈল-সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীগাত্রে যে স্থানে যে সময়ে ক্ষীণতা উপস্থিত হয়, তাহাই উক্ত তরল শিলার বহির্দ্দেশে আসিবার স্থান ও কাল নির্ণয় করিয়া থাকে। এইভাবে গঠিত স্থানের উপরই অনেক আগ্নেয়গিরির মুখ অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের চতুর্দ্দিক নবীন পর্ব্বতমালা ও সচরাচর ভূকম্পপীড়িত স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া উহাকে 'অগ্নি-বলয়' পরিবৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ভূপঞ্জরের ইতিহাস

পৃথিবীর বয়স ও তাহার প্রাকৃতিক ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে হইলে কোনও পুস্তক অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ পৃথিবীগাত্রেই উহা সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রস্তরমণ্ডলের শিলাস্তূপই তাহার ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করা কিন্তু একটু কঠিন, কারণ উহা চিত্রলিপিতে অঙ্কিত এবং অত্যন্ত খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বিক্ষিপ্ত। এই নিমিত্ত উহার পাঠোদ্ধার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত খণ্ড পাওয়া যায় নাই, অধুনা তাহার অনেকগুলি প্রায় সংগৃহীত ও একত্র গ্রথিত হইতেছে।

তিনটি সুবৃহৎ ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার—নগ্নীভবন (gradation), শৈল-সঞ্চালন (diastrophism), ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত (vulcanism)—প্রত্যেকটিই শৈলগাত্রে তাহার অসংখ্য রূপ অঙ্কিত করিয়া রাখে। নগ্নীকরণ স্থলভূমিকে ক্ষয় করিয়া থাকে, আর তাহার ক্ষয়িত বস্তু বহুবিধ স্তরীভূত পলির সৃষ্টি করে। আগ্নেয়গিরির

উৎপাত (vulcanism) পলি-রচিত শিলা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের অসংখ্য আগ্নেয়গিরির জন্ম প্রদান করে। শৈল-সঞ্চালন আগ্নেয় ও পলি-রচিত উভয়বিধ শিলাস্তূপেরই পরিবর্ত্তন নিশ্চিতরূপে ঘটাইয়া থাকে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, উহার প্রতিবাদ করার কাহারও সাধ্য নাই। যে সমস্ত শৈল বা স্থলদেশের উৎপত্তির কোনও সাক্ষী নাই, অধুনা-উৎপন্ন শৈল বা স্থলভূমির সঙ্গে যদি তাহাদের সাদৃশ্য থাকে, তবে নিশ্চয় আধুনিক শৈলবৃত্তান্ত হইতেই আমরা ঐ সমস্ত পুরাকালীন শৈলের বিবরণ জানিতে পারিব।

প্রকৃতপক্ষে ভূতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর ইতিহাস জানিয়াছেন সেই ভাবেই। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্ব্বতশ্রেণীস্থ অসংখ্য উপত্যকা, পৃথিবীবক্ষের স্তরোদ্গাম, পার্ব্বত্য নদীর বিরাট খাত, খনি ও গভীর কূপ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হইয়াছেন। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের এই আংশিক ইতিবৃত্ত যোজনা করিয়াই সমগ্র ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত বিবরণগুলি কেমন করিয়া একত্রিত করা যায়? আমরা কি বলিতে পারি যে, পৃথিবীর এক অঞ্চলে প্রাপ্ত রক্তবর্ণ বালুকাস্তর ভূপৃষ্ঠের অন্য অঞ্চলে প্রাপ্ত রক্তবর্ণ বালুকা স্তরেরই অংশ? চূর্ণপ্রস্তর বা ঘুটিও এই উভয় অঞ্চলে একই সময়ে জমাট বাঁধিয়াছিল—এ কথা আমরা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারি কি? না, এ সকল কথা জোর করিয়া বলা শক্ত। আমাদের এমন একটা বস্তুর সন্ধান পাওয়া চাই, যাহা সকল স্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হয় এবং যাহা একবারেই অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে; তাহা হইলে সেই বস্তুর সহায়তায় আমরা আমাদের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের অধ্যায়গুলি একত্র যোজনা করিতে পারি। সেই অমূল্য বস্তুর নাম শিলীভূত উদ্ভিজ্জ বা জান্তব অস্থিপঞ্জর। তাহার সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস উদ্ঘাটিত করা সম্ভবপর হইত না।

অতীতের সজীব পদার্থের (organism) যে চিহ্ন বা অবশেষ পাহাড়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শিলীভূত অস্থিপঞ্জর (fossil)। সজীব পদার্থের কঠিন অংশসমূহই সাধারণতঃ শিলীভূত হইয়া থাকে, কারণ ঐ কঠিন অংশগুলিই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদেরই ভূগর্ভে নিহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু একটি বৃক্ষপত্রের ছাপ, একটা জন্তুর পদচিহ্ন অথবা সমুদ্রতীর-বর্ত্তী বালুকাভ্যন্তরে একটি কীটের গর্ত্ত যদি পলি-রচিত শৈলমধ্যে রক্ষিত হয়, তাহাও শিলীভূত অস্থি বা fossil।

পূর্ব্বকালে এই শিলীভূত বস্তুর নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। যেমন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় প্রাপ্ত একখণ্ড শিলীভূত কাষ্ঠকে লোকে 'বকাসুরের হাড়' বলিয়া

প্রচার করিয়া থাকে। মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শিলীভূত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি। উইলিয়ম স্মিথ নামক তখনকার আমলের একজন ইঞ্জিনিয়ার আবিষ্কার করেন যে, শিলীভূত বস্তুর সাহায্যে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-সমুদ্রতীরের স্তরের সহিত পূর্ব্ব তীরের স্তরের সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভবপর, যদিও এই উভয় অঞ্চলের বরাবর কোনরূপ সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা যায় না। তিনি দেখিতে পান যে প্রত্যেক স্তরের গঠন একটি বিশেষ শ্রেণীর শিলীভূত অস্থি দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট এবং অধিকাংশ শিলীভূত অস্থি নির্দ্দিষ্ট স্তরে স্তরে সীমাবদ্ধ।

স্মিথ তাহার আবিষ্কারের মধ্যে জীবতত্ত্বসম্পর্কিত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে কেহই তাহা পারেন নাই, কারণ তখন লোকের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রাচীন জীবজন্তুবিৎ পণ্ডিতগণ যতই বিভিন্ন দেশ ও কালের শিলীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, স্তরবিজ্ঞানবেত্তা ততই সেই বিষয়-সমূহ অবলম্বনে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ভূতাত্ত্বিকগণ অতীতের শৈল-সঞ্চালনের সময় নির্ণয় করিলেন এবং জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকালব্যাপী ক্রমিক জৈবিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বিবর্ত্তনবাদের মৌলিক পরিকল্পনা প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইলেন। এইরূপে বিভিন্ন স্তরের ভূতত্ত্বসম্পর্কিত ধারা নির্ণীত হইল এবং জানা গেল একই ধারামধ্যস্থ পরস্পরসংলগ্ন স্তরের জন্তুনিচয় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রত্যেক ধারাটিতে এক একটা যুগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। বিভিন্ন ধারা পরস্পরের নিকট হইতে সাধারণতঃ অসঙ্গতি দ্বারা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অসঙ্গতি স্থলদেশের ক্ষয়ীভবনের (erosion) চিহ্ন। কাজেই সাধারণ-ভাবে এই কথা মোটামুটি বলা চলে যে, আমাদের আলোচ্য মহাদেশসমূহ পুনঃ পুনঃ সমুদ্রসীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং পুনঃ পুনঃ অংশতঃ অগভীর সমুদ্রতলে নিমজ্জিত হইয়াছে। আর সমস্ত মহাদেশেই এই পরিবর্ত্তন প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যখনই সমুদ্র দূরে অপসৃত হইয়াছে, তখনই কোথাও না কোথাও পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত স্থল ও জলের স্থানপরিবর্ত্তনকারী শৈল-সঞ্চালন (diastrophism) পৃথিবীব্যাপী এবং তাহা ছন্দের ন্যায় তালে তালে ঘটিয়াছে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠরের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের ফলে মধ্যে মধ্যে শৈল-সঞ্চালন সংঘটিত হইয়া স্থলভাগ অপেক্ষা সমুদ্রতলকে অধিকতর নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করতঃ সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে সুশৃঙ্খলভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে।

বৃহত্তর অসঙ্গতির যুগে তৎকালীন ও তদ্দেশজ জন্তুনিচয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন এতই বেশী যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা করা হইত বিচ্ছেদের সময়ে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া আবার বিচ্ছেদান্তে নূতন সৃষ্টি ঘটিয়াছে। যদিও আমরা এক্ষণে জানি যে, কোন কোন মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর গঠন কয়েক ভূতাত্ত্বিক যুগ ধরিয়া বিদ্যমান, তথাপি সাধারণভাবে যুগে যুগে দেশ ও কাল অনুযায়ী জীবের পরিবর্ত্তন বিশেষভাবেই ঘটিয়াছে।

যে সময়ে শৈল-সঞ্চালন আরম্ভ হয়, তখনকার অগভীর জলের সামুদ্রিক জীব-জন্তুর কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। এই সমস্ত অগভীর সমুদ্রগুলি শুষ্ক হইবার ফলে জীবজন্তুসমূহ হয় অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, নয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেশান্তরে যাওয়ার অর্থও অনেক জীবের পক্ষেই ধ্বংস হওয়ার নামান্তর, কারণ বরাবর এক স্থানে থাকিয়া তাহারা এইরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের ইচ্ছানুসারে দেহগঠন করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছিল। স্থানান্তরগমনে নূতন সমুদ্রের গভীরতা, তাপমাত্রা, জলের পরিচ্ছন্ন বা ঘোলাটে ভাব, সমুদ্রের তলদেশের অবস্থা ও খাদ্যের অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটে, কাজেই নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য বই কি? ফলে এই ধরণের একটা বৃহৎ বিচ্ছেদের পূর্ব্বে যেখানে ১০,০০০ সমস্র রকমের জীব বিদ্যমান ছিল, নূতন সমুদ্রে গিয়া তাহাদের মাত্র ৩০০ রকম বাঁচিয়া রহিল! শতকরা ৮৭টিই ধ্বংস হইয়া গেল। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের দরুণই এইরূপ দেশকাল অনুযায়ী জীবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত শৈল-সঞ্চালন শুদ্ধ যে স্থল ও জলের সীমা, স্থলদেশের সবিশেষ বিবরণ ও পলি-রচিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির বিস্তৃতি নির্দ্দেশ করে এমত নহে, জীবের আকৃতির বিরাট ও দ্রুত পরিবর্ত্তনও নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে।

কাজেই প্রাচীন জীবতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত জীবের বিবর্ত্তনমূলক ক্রমবিকাশের দুইটি গতি কল্পনা করিয়া থাকেন। যখন প্রাকৃতিক অবস্থা এক ভাবেই থাকে, তখন উহার একটি প্রত্যক্ষ করা যায়, আর শৈল-সঞ্চালনরূপ উৎপাত যখন তৎকালীন জীবজন্তুর প্রাণধারণের সহজ ধারার পরিবর্ত্তন ঘটায় তখন অপরটি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই শেষেরটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত গতিবিশিষ্ট।

আবহাওয়ার কথা

আবহাওয়ার আমূল পরিবর্ত্তনের বিবরণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ কাহিনী। ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে এই আবহাওয়া-পরিবর্ত্তনের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচীন মতানুযায়ী আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা খুব সহজ ছিল। লা-প্লাসের 'প্রাচীন পৃথিবীর তরলিত অবস্থা' মতবাদের সঙ্গে তাহার খুব সামঞ্জস্য ছিল। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, ক্রমশঃ তাপবিকীরণের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ কমিয়া যাওয়াতে পরিণামে উহার বহির্দ্দেশে একটি কঠিন আবরণ দেখা দিয়াছে। কঠিন আবরণটি ক্রমাগতই পুরু হইতেছে আর আবহাওয়াও দিন দিন ঠাণ্ডা হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু এই মত এখন আর গ্রাহ্য নহে। প্রাচীনতম বারুণী শিলার (granite) (প্রাচীন মতানুযায়ী আদিম কঠিন আবরণ) উপরিস্থিত পলি-রচিত শিলাস্তূপে এবং উত্তর-আমেরিকার সমস্ত কিট্টাত্মক স্তরের তলদেশে তুষারসঞ্চয়ের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। প্রাচীন মতানুসারে তখনও বারুণী শিলার আবরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আধুনিক সমুদ্রগুলি বিরাজ করিত।

ভূপৃষ্ঠের স্তরাঙ্কিত ইতিহাস (stratigraphic) তুষারসঞ্চারেই আরম্ভ, আর তুষারসঞ্চারেই শেষ একথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। শুধু তাই নয়; পৃথিবীর এই ইতিহাসের কমবেশী শতকোটী বৎসরের মধ্যে কয়েকবারই তুষারসঞ্চার হইয়া গিয়াছে (যদিও ইহার অধিকাংশ সময়েই পৃথিবীর আবহাওয়া প্রশান্ত ও সমভাবাপন্ন ছিল)। এই তুষারসঞ্চারের মধ্যে একটি আবার প্রাচীন ও নবীন সকল সঞ্চার অপেক্ষা একটু বিশেষত্বপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষে সমুদ্রপৃষ্ঠে (যাহার অক্ষাংশ ১৯° উ) পর্য্যন্ত বরফ সঞ্চিত হইয়া নিরক্ষবৃত্ত হইতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে অপসৃত হইয়াছিল। হিম যুগগুলিই আবার পৃথিবীর শুষ্কতার যুগ গিয়াছে, লবণ ও জিপ্‌সাম (gypsum)-এর সঞ্চয় হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজও পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ তুষারসঞ্চিত বরফে আচ্ছন্ন, আবার তদপেক্ষা বৃহত্তর অঞ্চল শুষ্ক অবস্থায় বিদ্যমান। শুষ্কতা ও তুষারসঞ্চার স্থলদেশীয় আবহাওয়ার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং সামুদ্রিক আবহাওয়ার সঙ্গে এখানেই তাহাদের পার্থক্য।

আজকালকার পৃথিবীর স্থলভাগ যেমন বিস্তৃত ও উচ্চ এবং সমুদ্রগুলি সীমাবদ্ধ, আবহাওয়াও আবার তেমনই কোথাও বা শুষ্ক কোথাও বা তুষারমণ্ডিত। অতীত কাল সম্পর্কেও আমরা এইরূপ কল্পনাই করিতে পারি। তখনও স্থলভাগ বিস্তৃত ও উচ্চ ছিল, আবহাওয়াও শুষ্ক ও তুষারমণ্ডিত ছিল। ইহার বিপরীতও আশা করা যায়—অর্থাৎ সমুদ্র সীমাবদ্ধ না হইয়া যখন বিস্তৃতিলাভ করিত ও স্থলভাগ নিম্ন ও সীমাবদ্ধ হইত, তখন দেশের আবহাওয়াও সমভাবাপন্ন ছিল। ভূতাত্ত্বিক বিবরণ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাই। বিরাট শৈল-সঞ্চালনকারী বিপর্য্যয়ের মধ্যে ও অব্যবহিত পরেই তুষারসঞ্চার ও শুষ্কতার যুগ দেখা দিয়াছে, আর শৈল-সঞ্চালন কার্য্যের বিরতির মধ্যেই সমভাবাপন্ন আবহওয়া বিরাজ করিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নম্রীভবন ও শৈল-সঞ্চালনকারী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়াই আবহাওয়ারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

এই ব্যাপারটা কাকতালীয় ন্যায়ের মত আকস্মিক মিলন হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সঙ্ঘটিত সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু স্থল ও জলের ক্ষয়-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তনই আবহাওয়া-পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত কারণ

বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। ডাঃ টি, সি, চেম্বারলিন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইডের মাত্রার ইতরবিশেষই এইরূপ আবহাওয়া-পরিবর্ত্তনের কারণ। আবার উক্ত বাষ্পের পরিমাণও শৈল-সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল।

উক্ত মতবাদের প্রধান বিষয়গুলি আমরা নিম্নে আলোচনা করিব—

১। গভীরভাবে আসক্ত শৈলগুলির খনিজ পদার্থসমূহ বায়ুমণ্ডল ও উদ্‌গমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিলেই তাহাদের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। জলবায়ুসংস্পর্শে রূপান্তরের সাধারণ প্রক্রিয়াতেই জল, কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ ও অক্সিজেন তাহাদের ধাতুগুলির সঙ্গে মিশিয়া যায়; ফলে বায়ুমণ্ডল ও উদ্‌গমণ্ডলের উক্ত উপাদানগুলির পরিমাণে কিছু ঘাটতি পড়ে। আজকালকার বাতাসে যে পরিমাণ কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ আছে, প্রস্তরমণ্ডলের চুণা পাথর ও কয়লার মধ্যে তাহার ৩০,০০০ গুণ বাষ্প জমা আছে। ইহার অধিকাংশই সুদূর ভূতাত্ত্বিক অতীতে বায়ুর মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

২। বর্ত্তমান সময়ে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সমস্ত বায়ুমণ্ডলের ওজনের ১/৩,৩০০ অংশ। ভূমণ্ডলের দীর্ঘ তরঙ্গবিশিষ্ট বিকীর্ণ তাপ এই কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইডের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না, অথচ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গবিশিষ্ট সূর্য্যের বিকীর্ণ তাপ পৃথিবীবক্ষে সহজেই পৌঁছিতে পারে।

৩। ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষে যে শৈল-সঞ্চালনরূপ আলোড়ন ঘটে, তাহার ফলে অগভীর সমুদ্রগুলি গভীর মহাসমুদ্রে পরিণত হয়, স্থলভাগের বিস্তৃতি ও উচ্চতা খুব বৃদ্ধি পায়, বিশাল উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়; কাজেই অনেক অবিচূর্ণীত (unweathered) শিলাস্তূপ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। তখন জলবায়ু-সংস্পর্শে রূপান্তরের কাজে বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ব্যয়িত হয়। এই অপচয়ের ফলে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র উত্তাপের মাত্রা কমিয়া যায়। বাতাস অধিকতর ঠাণ্ডা হাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণও হ্রাস পায়, এবং তাপসংরক্ষক হিসাবে জলীয় বাষ্প আবার কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হওয়ায় কার্ব্বন-ডাইঅসক্সাইডের পরিমাণ কমিবার ফলই এখানে আরও প্রকট হয়। সমুদ্রের তাপমাত্রা কমিয়া যাওয়ার ফলে সেখানকার জলের বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ গলাইয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃই অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের আধুনিক আবহাওয়ার সঙ্গে এই সমস্ত অবস্থার সম্পূর্ণ মিল আছে। বিস্তৃত ও উচ্চ স্থলভূমি, সীমাবদ্ধ সমুদ্র এবং ঠাণ্ডা জলের মহাসমুদ্র প্রভৃতি থাকার দরুণ আমরা বর্ত্তমানে এমন একটি যুগে বাস করিতেছি, যখন বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুবই কম। কাজেই ভূপঞ্জরের শৈল-সঞ্চালনরূপ

পরিবর্ত্তনের অন্তিম যুগে বা তাহার অব্যবহিত পরের অবস্থাতেই আমরা এক্ষণে অবস্থান করিতেছি। পৃথিবীর সেই প্রশান্ত, সমভাবাপন্ন আবহাওয়া আবার ফিরিয়া আসার পক্ষে দুইটি বিষয় প্রয়োজন।

(ক) নূতন ক্ষয়ীভবনের (erosion) দ্বারা স্থলভূমির নিম্নাপসরণ; ইহাতে জলবায়ু-সংস্পর্শে ক্ষয় দ্বারা যে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ শোষিত হয় তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং স্থলভাগের উপর মহাসমুদ্রের প্লাবন আসিয়া স্থলদেশের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

(খ) আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণবৃদ্ধি এবং যে পরিমাণ অপচয় ঘটিয়াছিল পরিণামে তাহার পূরণ। বস্তুতঃ পৃথিবীবক্ষে যদি আগ্নেয়গিরির উৎপাত না ঘটিত, তবে খুব সম্ভবতঃ বায়ুমণ্ডল ও উদ্ভিদমণ্ডল বহু দিন পূর্ব্বেই তাহাদের কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ হারাইয়া ফেলিত এবং পৃথিবীতে জীবন অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

পৃথিবীর বয়স

যে সমস্ত বৃহৎ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া পৃথিবীর বুকে ক্রীড়া করিতেছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—"কতদিন যাবৎ এই প্রক্রিয়া চলিতেছে?" অর্থাৎ "পৃথিবীর বয়স কত?" তিন রকম প্রমাণের দ্বারা আমরা এই বিষয়টি নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

(১) মহাসমুদ্রের লবণের পরিমাণ, (২) পলি-রচিত শৈলের পুরুত্ব ও (৩) আগ্নেয়গিরির স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থ।

মহাসমুদ্রের লবণ

স্থলভাগের শৈলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে জল বহুবিধ বস্তু গলাইয়া দ্রবাকারে সমুদ্রে লইয়া যায়। সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত বস্তুর মধ্যে একমাত্র সাধারণ লবণই জমাট বাঁধে। অন্য সমস্ত পদার্থ ক্ষয়িত, অথবা জৈব, অথবা রাসায়নিক বস্তুতে পরিণত হয়, কাজেই যদি আমরা সমুদ্রের সমস্ত লবণের (sodium chloride) পরিমাণ এবং প্রতিবৎসর কি পরিমাণ লবণ নদীস্রোতে সমুদ্রে বাহির হইতেছে তাহা জানিতে পারি, তাহা হইলে কত বৎসর যাবৎ এই কার্য্য চলিতেছে তাহা সহজেই নির্ণয় করিতে পারিব অর্থাৎ সমুদ্রের বয়স ও পলি-রচিত শৈলের বয়সের পরিমাণ জানা যাইবে। কিন্তু এই পন্থার মধ্যে কয়েকটি অনিশ্চিত বস্তু রহিয়া গিয়াছে। (১) বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতে হয়ত স্থলভাগের গড় পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, কাজেই নদীস্রোতে বর্ত্তমানের ন্যায় এত অধিক বস্তু প্রবাহিত হয় নাই। (২) সমুদ্রের লবণ কতক হয়ত সমুদ্রতটের শৈল ও সমুদ্রগর্ভের শৈল হইতে প্রাপ্তয়া

গিয়াছে। (৩) আবার কতক লবণ অতীতে সমুদ্রগর্ভের তলদেশে জমাট বাঁধিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমাদের সৈন্ধব পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কারণ আছে, এখানে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের মূল্য যতদূর সম্ভব নির্দ্ধারণ করিয়া বিভিন্ন হিসাবে সমুদ্রের বয়স মোটামুটি দশ কোটি বৎসর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

আর একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য উপায় এই যে আগ্নেয়গিরিসমূহ হইতে বর্ত্তমানে ক্লোরিন্ বাষ্পবিরহিত অবস্থায় যে পরিমাণ সোডিয়ম পাওয়া যাইতেছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গণনা করা। কিন্তু সে স্থলে ইহা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে যে সমুদ্রে প্রবেশ করিবার পরে সোডিয়মের সঙ্গে ক্লোরিনের মিলন ঘটে। যে ভাবেই হউক, লবণের অধিকাংশ ক্লোরিনই শৈলগাত্র হইতে দৌত হইয়া আসে নাই বলিয়া মনে হয়। আগ্নেয় শৈলের গ্যাস হইতেই এই ক্লোরিন্ আসিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ক্লোরিনবিরহিত সোডিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া সমুদ্রের আধুনিক লবণভাণ্ডার জমা হইতে ১০০,০০০,০০০ বৎসর প্রয়োজন বলিয়া দাবী করা হয়। এই পন্থারও উপরোক্ত কয়েকটি ত্রুটি রহিয়াছে।

পলি-রচিত শিলার পুরুত্ব

আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক সুশৃঙ্খলিত স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মোট পুরুত্বকে স্তরসঞ্চিত হইবার হার বা মাত্রা দিয়া ভাগ করিলেই একটি সহজতম উপায়ে ভূতাত্ত্বিক সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। যতগুলি স্তর অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরুত্বের পরিমাণ জানা কঠিন নহে। গড়ে প্রায় ৭০ মাইল জমিয়াছে বলিয়া একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু স্তর বা পলি-সঞ্চয়ের হার নির্ণয় করাই শক্ত। বৃহৎ নদীগুলির মোহনায় যে পরিমাণ পলি পড়ে, তাহা নদীর মোহনাশূন্য সমুদ্রতীর অপেক্ষা অনেক দ্রুত। আবার সমুদ্রতটে যে পলি পড়ে, তাহা তট হইতে দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা অনেক দ্রুততর। পাথরের কুচি যে হারে জমা হয়, চুনা পাথরের পলি তাহা অপেক্ষা মন্থর গতিতেই পড়িয়া থাকে। কাজেই এই ব্যাপারেও একটা আনুমানিক হিসাবই করা যাইতে পারে। ৮৮০ বৎসরে ১ ফুট পলি সঞ্চিত হয় বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে পলি-রচনার দিন হইতে আরম্ভ করিলে পৃথিবীর বয়স ৩০০,০০০,০০০ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করা যায়।

কিন্তু পলি-রচিত ধারার মধ্যে যে অনিশ্চিততা বিদ্যমান, তাহার হিসাব করে কে? অধিকন্তু, আমরা যে পলি পরীক্ষা করিয়া তাহার পুরুত্ব পরিমাপ করিতেছি, সে পলি তো সঞ্চিত হইয়াছিল মহাদেশের নিকটস্থ অগভীর সমুদ্রে। কিন্তু স্থলদেশ যখন

বহুদূরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তখন যে মাটির পলি দূর সমুদ্রে গিয়া অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার হিসাব তো আমরা এক্ষণে পাই না। কাজেই পলির হিসাব করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিতে হইলে তাহা ৩০০,০০০,০০০ বৎসর হইতে অনেক বেশী বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

স্বতঃকিরণপ্রসারী বস্তু

পৃথিবীদেহের উপাদান ইউরেনিয়ম্ ও থোরিয়ম্ ধাতু হইতে স্বতঃকিরণপ্রসারী বস্তু পাওয়া যায়। এই মৌলিক পদার্থগুলির প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে নিয়মিতরূপে ভাঙ্গিয়া অনবরত হিলিয়ম্ গ্যাস্ ও পরিণামে সীসক উৎপন্ন করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক খণ্ড ইউরেনিয়ম্ বিশ্লিষ্ট হইয়া অর্দ্ধ পরিমাণ হইতে ৬,০০০,০০০,০০০ বৎসর প্রয়োজন হয়। যদি কোনও আগ্নেয় শৈলে ইউরেনিয়ম্, হিলিয়ম্ ও সীসক বিদ্যমান থাকে, আর সমস্ত হিলিয়ম্ ও সীসক যদি উক্ত ইউরেনিয়মের বিশ্লেষণের ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই বিশ্লিষ্ট হিলিয়ম্ ও সীসকের সমস্তটাই যদি এখনও সেই শৈলেই আবদ্ধ থাকে, তবে সে শৈলের বয়স (অর্থাৎ সেই আগ্নেয় magma যেদিন হইতে কঠিন হইয়াছে সেই সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত) গণনা করা যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে আগ্নেয় শৈল গঠিত হইয়াছে। তাহাদের বক্ষে যখন শিলীভূত কঙ্কাল নাই, তখন শিলীভূত কঙ্কালবিশিষ্ট স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাব করিয়াই তাহাদের বয়স গণনা করিতে হইবে। এই বিষয়টি আমরা জানিতে পারিলে এবং আগ্নেয়গিরির প্রথম জমাট বাঁধার বয়স নির্ণয় করিতে পারিলেই কোন্ কোন্ যুগ কতকাল বিদ্যমান ছিল তাহা বলিতে পারিব।

ইউরেনিয়ম্ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বেশী নির্ভরযোগ্য হিসাব করা হয় নাই। তবে দুইটি প্রাচীনতম বারুণী শিলা (granite) পর্য্যালোচনার ফলে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত শিলা দুইটি ১,১২৫,০০০,০০০ এবং ১,৫০০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে তরল অবস্থা হইতে কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই উপায়ে হিসাবের ভুল শতকরা ২০ হইতে ২৫ এর বেশী নহে।

শৈলাভ্যন্তরে অত্যন্ত চাপ ও উত্তাপের ফলে ইউরেনিয়মের বিশ্লেষণের মাত্রা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে। পাহাড়ের বহির্দ্দেশের মাত্রা অপেক্ষা অভ্যন্তরের মাত্রা অত্যন্ত কম হওয়াই সম্ভবপর। যাহা হউক পৃথিবীর বয়সের পরিমাণের একটা ধারণা মোটামুটি নির্ভুলভাবেই পাওয়া যাইতেছে।

ষট্‌পদ প্রাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

পোকাদের বুদ্ধি আছে কিনা

মানুষ, পশু, পাখী প্রভৃতি অপর সকল প্রাণীর মত পোকারাও খায় ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাস লয়, শীতগ্রীষ্ম, আলোআঁধার বোধ করে, ভয় দেখাইলে ভয় পায় এবং আপনাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানারকম চেষ্টা করে। সকল পোকা না করুক, অনেকে যে করে তাহা দেখিয়াছি।

কিন্তু কখনও কোন পোকা পোষ মানে না। তাহাদিগকে ভালবাসিলে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যে জায়গায় হাজার হাজার পোকা মারা পড়ে, তাহারা আবার সেখানেই আসে। পোকারা যদি অগ্রপশ্চাৎ, ভালমন্দ বিচার করিয়া কাজ করিতে পারিত, তাহা হইলে অপর প্রাণীদের কি অবস্থা হইত বলা যায় না। মানুষ মৌমাছির মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু লয়। দেশের সকল মৌমাছি মিলিয়া যদি এইজন্য মানুষকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে কি হইত? অতএব মনে হয় পোকাদের বুদ্ধি নাই।

কিন্তু মৌমাছি, পিঁপড়া প্রভৃতি সামাজিক পোকার আচরণ দেখিয়া বোধ হয় তাহাদের কত বুদ্ধি! মৌচাক গড়া, মধু সঞ্চয় করা, সকলে একত্রে মিলিয়া কাজ করা প্রভৃতি যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলিতে চাই তাহা কিন্তু ঠিক বুদ্ধি নয়। মৌমাছিরা যে দেশে এবং যেখানেই থাকুক না কেন একইভাবে এই সমস্ত কাজ করে। কুমারিয়া পোকা কেমন সুন্দর মাটির ঘর গড়ে। সবদেশেই এই কুমারিয়া পোকার ঘর গড়ার পদ্ধতি সেই একইরূপ। অথচ তাহাকে কেহ ঘর গড়িতে শিখায় নাই। ঘরের মধ্যে ডিম, কীড়া ও পুত্তলি অবস্থায় থাকিয়া ঘর হইতে কুমারিয়া পোকা হইয়া বাহির হইলেই সে ঘর গড়িতে পারে। অতএব কুমারিয়া পোকা এই জ্ঞান লইয়াই জন্মে। রেশমের, তসরের, এণ্ডির ও মুগার পলু পাতা খাইয়া বড় হইলে গুটী করিবেই। অথচ গুটী করিতে তাহাদিগকে কেহ শিখায় নাই। তাহারা এই জ্ঞান লইয়াই জন্মে। পোকারা যেন একটা জীবন্ত কল। আমরা সেলাইএর কলকে যেখানেই রাখি এবং যেখানেই লইয়া যাই সব জায়গাতেই এই কল একইভাবে কাজ করিবে। তেমনি পোকারাও একইভাবে আচরণ করে। আমাদের দেশে যে পোকা বেগুনের পাতা খায় অন্য দেশে লইয়া গেলেও সে বেগুনের পাতা খাইবে, ধানের বা অন্য গাছের পাতা খাইবে না, বা ভাঁটা কুরিয়া খাইবে না। রেশমের পলু একইভাবে পাতা খাইয়া

বড় হইয়া গুটী করিবে এবং গুটী হইতে চোকড়া চোকড়ী হইয়া বাহির হইয়া ডিম পাড়িবে। সেলাইএর কলের কাজ সেলাই করা। তেমনি রেশমের পলুর কাজ পাতা খাওয়া, গুটী করা, চোকড়া চোকড়ী হইয়া ডিম পাড়া। মৌমাছির কাজ মৌচাক গড়া, মধু ও পরাগ আহরণ করা এবং বাচ্ছা পালন করা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজ করার জ্ঞান বা ক্ষমতাকে আমরা বস্তুতঃ পক্ষে বুদ্ধি বলিতে পারি না। সকল পোকাই নিজের নিজের কতকগুলি সহজাত জ্ঞান বা প্রবৃত্তি লইয়া জন্মে। যার যেমন প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তির বশে সে জীবন কাটায়।

পোকা কত দিন বাঁচে

পূর্ণবয়স্ক পোকা বা পতঙ্গ হয়ত মাত্র কয়েক দিন বাঁচে। মাদিদের চেয়ে মদ্দারা অল্প দিন বাঁচে। মাদিরাও প্রায় ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। কিন্তু ডিম হইতে কীড়া, কীড়া হইতে পুত্তলি এবং পুত্তলি হইতে পতঙ্গ হইতে অনেক দিন লাগিতে পারে। অনেক মশা, মাছি আছে যাহাদের জীবনচক্র পূর্ণ হইতে হয়ত ৭।৮ দিনের বেশী লাগে না। অধিকাংশ পোকারই জীবনচক্র প্রায় এক মাস হইতে দুই মাসের ভিতর পূর্ণ হয়। কাহারও কাহারও জীবনচক্র পূর্ণ হইতে এক বৎসর, দুই বৎসর বা তিন বৎসরও লাগে। আমেরিকায় ঝিঁঝির জাতের দুইটি হেমিপতর্ পোকা আছে, তাহাদের জীবনচক্র পূর্ণ হইতে ১৩ ও ১৭ বৎসর লাগে।

পোকাদের গৃহস্থালি

মানুষ বড় হইলে বিবাহ করে এবং সন্তানসন্ততি পালন করে। ইহার নাম গৃহস্থালি। পোকাদেরও পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ পতঙ্গ হইলে প্রধান কাজ স্ত্রীপুরুষসঙ্গম অর্থাৎ বিবাহ এবং বংশরক্ষার জন্য ডিম পাড়া। ডিম পাড়িবার পর অধিকাংশ পোকাই মরিয়া যায়।

কোন কোন পোকা ডিমের যত্ন করে, কেহ কেহ বাচ্ছাদের ঘর তৈয়ারি করিয়া তন্মধ্যে খাবার রাখিয়া তবে ডিম পাড়ে। সামাজিক পোকারা বাচ্ছাদিগকে রোজ রোজ খাবার যোগাইয়া এবং যত্ন করিয়া লালনপালন করে। সকল পোকার সম্বন্ধেই এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে এবং যে পোকার আচরণ লেখা হইল সেই পোকাটিকেও রাখিয়া দিলে সেই বিবরণের মূল্য খুব বেশি হয়।

পোকার বিবাহে ঘটকালি দরকার হয় কিনা এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অধিকাংশ স্থলে বরই কনেকে খুঁজিয়া লয়। আবার কোন কোন স্থলে কনে বরকে খুঁজিয়া বাহির করে বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা পোকাদের জন্য মিলনের নানা উপায় করিয়া দিয়াছেন। অনেক স্থলে পুরুষ দেহের ও ডানার রঙে ও বিচিত্রতায়

স্ত্রী অপেক্ষা সুন্দর মনে হয়,—কনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং মন ভুলাইবার জন্য এই বন্দোবস্ত। এ সম্বন্ধে বাটারফ্লাই ও গোপালিয়া ফড়িঙদের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেক স্ত্রী-পতঙ্গের দেহ হইতে গন্ধ বাহির হইয়া পুরুষদিগকে আকৃষ্ট করে; তদ্বর পলুর মধ্যে দেখিয়াছি বহু দূর হইতে অনেক বর কনের কাছে আসিয়া জুটে। গাছ- ফড়িঙ, উইচিংড়ি, ঝিঁঝি পোকার শব্দ বা গানেরও প্রধান উদ্দেশ্য বিবাহ। পুরুষেরাই এই শব্দ বা গান করে। কনেরা বরের গানে মুগ্ধ হইয়া আসে।

বিবাহের পর ডিম পাড়া হয়। অধিকাংশ স্থলে জননী এমন স্থানে ডিম পাড়ে যেখানে বাচ্ছারা ডিম হইতে বাহির হইয়াই খাদ্য পায়; ডিম পাড়িবার পর জননী আর কোন খবর লয় না। কোন কোন পোকা ডিমের যত্ন করে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আমাদের গৃহের আর্শলা প্রায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়াছে এমন অবস্থায় ডিম বা ডিমকোষটি বহন করিয়া বেড়ায়। শুকনো জায়গায় পড়িয়া আছে এমন পাথর বা কাঠ উল্টাইলে ৪৬ নং (খ) চিত্রের মত পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ডিমগুলি যত্নে পাহারা দেয়। যদি ডিমগুলি ছড়াইয়া দেওয়া যায় পোকা একটি একটি করিয়া মুখে বহন করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় একত্র করে। তার পর বাচ্ছা হইলে কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত জননী বাচ্ছাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া পালন করে।

কুমারিয়া পোকা মাটির ঘর গড়িয়া সেই ঘরে মাকড়সা কিংবা কেটারপিলার রাখিয়া উহাদের উপর ডিম পাড়ে। সেই মাকড়সা ও কেটারপিলার খাইয়া বাচ্ছা বড় হয়। নানাপ্রকার বোল্‌তা কিরূপে বাচ্ছার জন্য খাবারসংগ্রহ করিয়া রাখে তাহা লক্ষ্য

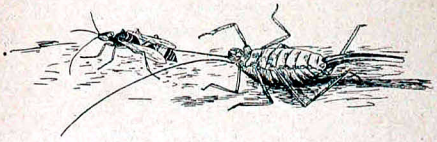

চিত্র—৪৭

বোলতা উইচিংড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছে

করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে কীটজীবনীর অনেক গূঢ় কথা জানা যায়। ৪৭নং চিত্রে এক বোল্‌তা বাচ্ছার খাদ্যের জন্য উইচিংড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আর্শলাকেও এইরূপ টানিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। মাটির ভিতর গর্ত্তে মৃতপ্রায় উইচিংড়ি ও আর্শলা রাখিয়া তাহার উপর বোল্‌তা ডিম পাড়ে। ভ্রমরেরা মাটি, কাঠ বা বাঁশের গর্ত্তে ফুলের মধু ও পরাগ ভরিয়া তবে ডিম পাড়ে।

মৌমাছি এবং পিপীলিকারা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহারা ডিমে তা দিয়া ডিম ফুটায়, বাচ্ছা বা কীড়াদিগকে রোজ রোজ খাবার যোগাইয়া পালন করে। এইরূপে পালিত না হইলে কীড়ারা বাঁচিতে পারে না। ইহাদের জীবনেই গৃহস্থালির চূড়ান্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মৌমাছিদের কার্য্যকলাপের বিবরণ জানিতে হইলে লেখক প্রণীত 'মৌমাছি পালন' পুস্তক পাঠ করিবেন।

পোকাদের সমাজ

কখনও কখনও অসংখ্য কেটারপিলার্ এক সঙ্গে জন্মে ও যাহা পায় তাহাই খাইয়া ফেলে। বিষ্ঠা বা গোবরে অসংখ্য মাছির কীড়া জন্মিয়া একত্রে আহার করে। বহু গাছ ফড়িঙ একত্রে উড়িয়া পঙ্গপাল হইয়া আসে। এইরূপ কীড়ার পাল ও পঙ্গপালের দলে এক সঙ্গে বহু পোকা একত্রিত হইলেও এগুলিকে সমাজ বলা যায় না। কারণ ইহারা একত্রে থাকে মাত্র, কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না। এগুলি জনতা মাত্র, সমাজ নয়।

কেমন করিয়া সমাজগঠন সুরু হইয়াছে ও বাড়িয়াছে নানাবিধ পোকার আচরণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। সন্তানপ্রতিপালন কার্য্য পরিবার বা দল বা সমাজগঠনের ভিত্তি। বিড়াল, কুকুরের বাচ্ছারা যত দিন মাই খায় তত দিনই মায়ের সঙ্গে থাকে। অধিকাংশ পোকাই ডিম পাড়িবার পর আর ডিম বা বাচ্ছাদের খোঁজখবর লয় না। কুমারিয়া পোকা মাটির ঘর করিয়া সেই ঘরের ভিতর ভবিষ্যৎ বাচ্ছার খাদ্য রাখিয়া তবে ডিম পাড়ে। অনেক বোল্‌তা দেওয়ালে বা কাঠে ছিদ্র পাইলে সেই ছিদ্রকে বাচ্ছাপালনের ঘররূপে ব্যবহার করে; অনেক সময় বাক্স, আলমারির তালার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়। বহির মলাটের পিছনের ফাঁকেও বোলতাকে ঘর তৈয়ারি করিতে দেখা যায়। অনেক কুমারিয়া পোকা প্রত্যেক বাচ্ছার জন্য আলাদা ঘর গড়ে। অনেকে বহু ঘর একত্রে গড়িয়া সবগুলি একসঙ্গে ঢাকা দিয়া দেয়। কেহ কেহ মাটি দিয়া কিংবা গাছের পাতা কাটিয়া পাতার টুকরাগুলি সাজাইয়া সাজাইয়া প্রত্যেক বাচ্ছার জন্য আলাদা কক্ষ তৈয়ারি করিলেও কক্ষগুলি পর পর সাজাইয়া রাখে। অনেক মৌমাছি জাতের পোকা এবং ভ্রমরেরাও এইরূপে বাচ্ছা পালন করে। মধু ও ফুলের পরাগ একত্রে মিশ্রিত পিটুলি ইহাদের বাচ্ছাদের খাদ্য। বোল্‌তারা প্রায় কেটারপিলার্, মাকড়সা ও অন্যান্য পোকা বাচ্ছাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। অনেক ভ্রমর, বোল্‌তা একা একা এইরূপে ঘর গড়িয়া এবং খাদ্যসংগ্রহ করিয়া বাচ্ছাপালনের বন্দোবস্ত করে। ইহারা পরিবার প্রতিপালন করিলেও সমাজবদ্ধ জীব নয়। দেখিতে পাই বহু ভ্রমর একই মাটির বা কাঠের গর্ত্তে তাহাদের বাচ্ছাপালনের

বন্দোবস্ত করে। ইহারাও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজবদ্ধ নয়। সমাজগঠনের সিঁড়ির এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে মাত্র।

যখন বাচ্ছাদিগকে রোজ রোজ খাদ্য যোগাইয়া পালন করিতে হয় তখনই প্রকৃত সামাজিক জীবনের সুরু হয়। আমাদের গৃহের ছাদের বা চালের নীচে যে হল্‌দে বোল্‌তা চাক করে তাহারা এইরূপ সমাজবদ্ধ। অনেক বোল্‌তা গাছের উপর বড় হাঁড়ির মত চাক গড়ে। কেহ কেহ মাটির গর্ত্তে চাক গড়ে।

মৌমাছিরা সমাজগঠনে আরও উন্নত হইলেও মৌমাছির দলকেও ঠিক সমাজ বলা যায় না; কারণ মৌমাছির এক একটি দল এক একটি বৃহৎ পরিবার মাত্র। দলের সমস্ত মৌমাছি এক জননীর বা রাণীর সন্তান। কিন্তু দলের হিতের জন্য এবং কাজের সুবিধার জন্য মৌমাছিদের শ্রমবিভাগ ও জাতিবিভাগ আছে। রাণী কেবল ডিম পাড়ে, আর কোন কাজ করে না। দাসীরা নিজেদের দেহ হইতে মোম বাহির করিয়া চাক গড়িতে ও 'দুধ' বাহির করিয়া শিশু-কীড়াদিগকে এবং পরাগ ও মধু আহরণ করিয়া বড়-কীড়াদিগকে খাওয়ায় ও পালন করে। নরেরা কোন কাজই করে না এবং তাহাদিগকে নূতন রাণীর বিবাহের সময় ছাড়া অন্য সময় দলে থাকিতেই দেওয়া হয় না।

পিঁপড়াদের মধ্যেই আমরা প্রকৃত এবং পূর্ণ সমাজ দেখিতে পাই। ইহাদের দলে শ্রমবিভাগ ও জাতিবিভাগ মৌমাছিদের দলের অপেক্ষা বেশি। দলে রাণী ও নর ছাড়া দাসীদেরও কার্য্যের জন্য আবার দুই জাত রহিয়াছে। এক জাত দাসীর আকার ছোট এবং অপর এক জাতের আকার, মস্তক ও দন্তপাটি বড়। বড় ছোট কোন দাসীরই ডানা হয় না। অনেক প্রকার পিঁপড়ার দাসীরা অন্ধ এবং গন্ধ ও স্পর্শ দ্বারা চালিত হইয়া কাজ করে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, মানুষ প্রথমে শিকার দ্বারা, তারপর পশুপালন দ্বারা এবং সর্ব্বশেষে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার উপায় করিয়াছে ও সমাজবদ্ধ হইয়াছে। পিঁপড়াদের মধ্যেও এই স্তরগুলি দেখা যায়। পিঁপড়ারা যে অন্য পোকা ইত্যাদি শিকার করিয়া খায়, তাহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। দক্ষিণ-আমেরিকায় এক রকম শিকারি পিঁপড়া আছে, যাহাদের ভয়ে অজগর সাপ এবং বড় বড় বন্য জন্তুরাও পালায় এবং আক্রান্ত হইলে মারা পড়ে ও ভক্ষিত হয়। লক্ষ্য করিলে পিঁপড়াদের মধ্যে পশুপালন বৃত্তি সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। গাছ উকুন (aphis), গাছ এঁটেলি (coccids), কয়েক জাত প্রজাপতির কেটারপিলার প্রভৃতির দেহ হইতে 'হনিডিউ' মধু বাহির হয়। এই 'হনিডিউ' মধু পিঁপড়াদের খুব প্রিয়। ইহার জন্য পিঁপড়ারা গাছ উকুন ও গাছ এঁটেলির কাছে দলে দলে আসে এবং উহাদের দেহ দন্তপাটি ও শুঙ্গ দ্বারা চুলকাইয়া দেয়। অনেক সময় গাছ উকুন প্রভৃতিকে ইহারা যত্নে রক্ষা করে এবং

আশ্রয় গঠন করিয়া দেয়। রাখাল যেমন গরু চরায়, পিঁপড়ারাও তেমনি লাইসিনাদি দলের (Lycænidae) প্রজাপতির কেটার্‌পিলারের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মধু খাইয়া বাসায় যাইয়া পুনরায় উদ্গার করিয়া উহার কতক বাচ্ছাদিগকে ও অপর পিঁপড়াকে খাওয়ায়। এইরূপ মধুসংগ্রহকারী এক রকম পিঁপড়ার দাসীদের পেট ফুলিয়া বড় বলের মত হয়। তাহারা তখন আর কাজ করে না, মধুভাণ্ডের মত নিজেদের বাসার ছাদে ঝুলিতে থাকে। অপর দাসীরা তখন ইহাদিগকে খাওয়ায়। আমেরিকার এক রকম পিঁপড়া গাছের পাতা কাটিয়া লইয়া যায় এবং পাতাগুলি টুকরা টুকরা করিয়া নিজের গর্ত্তে মাটির নীচে রাখে। এই পাতার উপর যে বেঙের ছাতা জন্মে তাহা ইহারা খায়।

কোন কোন পিঁপড়া অপর পিঁপড়াদের দাসীদিগকে নিজের পরিবারে ক্রীত দাসদাসী-রূপে ব্যবহার করে। সদল বলে যাইয়া ইহাদের পরিবার আক্রমণ করতঃ কীড়া ও পুত্তলিদিগকে নিজেদের বাসায় লইয়া আসে। এই সকল অপহৃত কীড়া ও পুত্তলি হইতে দাসীরা জন্মিয়া পরিবারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রমণকারী পরিবারের রাণী বা রাণীরা আক্রান্ত পরিবারের রাণীকে হত্যা করে এবং আক্রমণকারী পরিবার পরাজিত পরিবারের স্কন্ধে চড়িয়া বসে।

পিঁপড়াদের আচরণ হইতে বহু বিষয় শিক্ষা করা যায়। আমাদের দেশের পিঁপড়াদের আচরণ খুব কমই জানা গিয়াছে। সুতরাং এদেশে পর্য্যবেক্ষণের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকগণ ই, এম, হুইলার, এ, ফোরেল এবং এইচ, কে, ডনিসথ্‌প লিখিত পুস্তকসকল পাঠ করিলে পিঁপড়াদের আচরণ সম্বন্ধে বহু বিষয় জানিতে পারিবেন।

উইও সামাজিক পোকা। পিঁপড়া, মৌমাছি প্রভৃতি হেমনপতর্‌ পোকার দাসীরা সবই অপরিণত স্ত্রী-পোকা। কিন্তু উইদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ দুই-ই অপরিণত থাকিয়া দাসদাসী হইয়া কার্য্য করে। এই দাসদাসীদের কতক বড় বা সৈনিক। ইহাদের দেহ, মাথা এবং দাঁড়া সাধারণ উই অপেক্ষা বড়। আমরা যে সকল উই দেখিতে পাই তাহারা সকলেই কর্ম্মী। ইহারা কাঠ, খড় ইত্যাদি কাটিয়া আনে, মাটির নীচে বিস্তৃত বাসা তৈয়ারি করে, উই মেকা বা স্পঞ্জ তৈয়ারি করিয়া উহাতে বাচ্চার জন্য একপ্রকার ক্ষুদ্র বেঙের ছাতা জন্মায়, ডিমের যত্ন করে, বাচ্ছাদিকে খাওয়াইয়া পালন করে এবং অনেক স্থলে মাটি উঠাইয়া বড় বড় উই-ঢিবি তৈয়ারি করে। আমাদের দেশে কোন কোন উই-ঢিবি মানুষ সমান উঁচু হয়। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে পনর, ষোল হাত পর্য্যন্ত উঁচু উই-ঢিবি দেখা যায়।

পোকাসংগ্রহ

(ক) পোকাসংগ্রহ

পোকা ধরিবার জন্য প্রয়োজন—

(১) হাত জাল—চিত্রের মত মশারীর কাপড় বা নেট্ কাটিয়া ও থলির মত সেলাই করিয়া হাত জাল করা যায়। দুই হাত লম্বা বেত বা বাঁশের কঞ্চি গোল চক্রের মত বাঁধিয়া উহার মুখে থলির মুখ সেলাই করতঃ চিত্রের মত বাঁশের কঞ্চি হাতলের

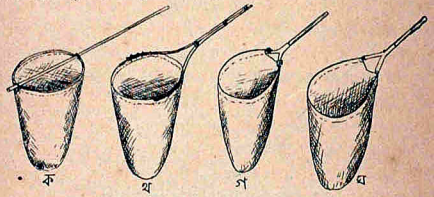

চিত্র—৪৮

হাত জাল

বাঁশের কঞ্চি বা বেত দিয়া নানারূপে তৈয়ারি করা যায়; ডান দিকের (ঘ) মত হাত জাল কিনিতে পাওয়া যায়।

জন্য বাঁধিয়া দিতে হয়। হাত জাল তৈয়ারী করিবার ইহাই সহজ উপায়। তবে মুখের উপর কাঠি থাকা অসুবিধাজনক। দুইটি কঞ্চি বাঁকাইয়া জালের মুখের দুই ধারে বাঁধিয়া দিলে উত্তম জাল হয়। Y-মত কঞ্চি মুখে বাঁধিয়া দিলেও চলে।

(২) মারণ বোতল—চিত্রে বড় কর্কের ছিপিওয়ালা বোতল দেখান হইয়াছে। বড় মুখ এবং কাচের ছিপিওয়ালা বোতল হইলেও হয়। সর্ব্বাপেক্ষা তেজযুক্ত ৯৮% পটাস সায়েনাইড্ (potassium cyanide)এর কতকগুলি টুকরা বোতলের তলায় রাখিয়া প্যারিস প্লাষ্টার (Plaster of Paris) গুলিয়া টুকরাগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। শীঘ্রই প্লাষ্টার শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায়। বোতলের মুখ সকল সময় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এক দিন পরেই বিষের গ্যাসে বোতল ভরিয়া উঠিবে। পোকা ধরিয়া এই বোতলের ভিতর রাখিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায়। প্রজাপতি, মথ প্রভৃতির দেহের আঁইসে বোতলের ভিতর ময়লা জমে। এই কারণে এক-দু'খানা ব্লটিং কাগজ গোল করিয়া কাটিয়া প্যারিস প্লাষ্টারের উপর বসাইয়া দিলে এবং ব্লটিং কাগজের উপর মসৃণ টিস্যু কাগজ অঙ্গুষ্ঠ ভাবে কাটিয়া বসাইয়া দিলে মথ্ প্রভৃতির ছটফটানির দরুণ গায়ের ও ডানার আঁইস উঠিয়া

যাইবে না। মধ্যে মধ্যে কাগজগুলি বদলাইয়া দিতে হয়। পটাস্ সায়েনাইড তীব্র বিষ। টুকরাগুলি আঙ্গুলে না ধরিয়া চিম্‌টা দ্বারা ধরা উচিত এবং বোতলও

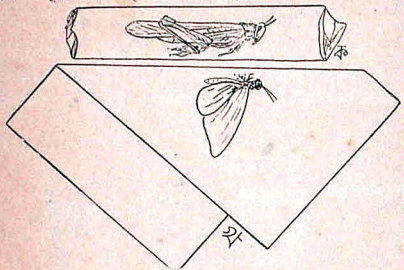

চিত্র—৪৯

ক—কাগজের মোড়কে ফড়িঙ রক্ষা করা
খ—কাগজের মোড়কে প্রজাপতি ও মথ রক্ষা করা; পরে সময় মত সেট করা যায়।

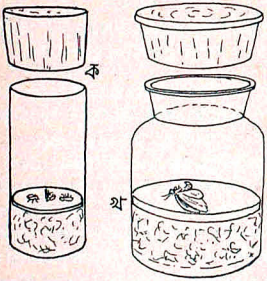

চিত্র—৫০

ক—মারণ টিউব খ—মারণ বোতল

(ছিপি তুলিয়া দেখানো)

সাবধানে রাখা উচিত যেন যেখানে সেখানে ভাঙ্গিয়া গিয়া কোন বিপদ না ঘটে। একবার তৈয়ারি করিলে মারণ বোতলের তেজ কয়েক মাস অক্ষুণ্ণ থাকে।

জাল এবং মারণ বোতল হইলেই সাধারণ কাজ চলে। কিন্তু জালে কোন বোলতা ধরিলে তাহাকে বোতলে ভরাই দায়। সুবিধা পাইলেই সে বিঁধিবে। এজন্য একটি কি দুইটি মারণ টিউব তৈয়ারি করিয়া সঙ্গে রাখা ভাল। কোন জীবন্ত কীড়া বা পোকা পালন করিতে ইচ্ছা হইলে সেগুলি সংগ্রহের জন্য কয়েকটা ছিপি-ওয়ালা কাচের টিউব এবং টিনের দন্ত মজ্জনের কৌটার মত কৌটা কয়েকটি হইলে ভাল হয়। কৌটাগুলির ঢাক্‌না কাচের হইলে আরও ভাল।

(খ) পিন্ ও সেট্ করা

ধৃত পোকা মরিয়া যাইবার পর সেগুলিকে আল্‌পিনে গাঁথিয়া শুকাইতে হয় এবং সম্পূর্ণ শুকাইলে বাক্সে সাজাইয়া রাখিতে হয়।

কড়াপতরা, হেমিপতরা, হেমনপতরা কেবল পিনে গাঁথিয়া দিলেই হইল। লেপিত-

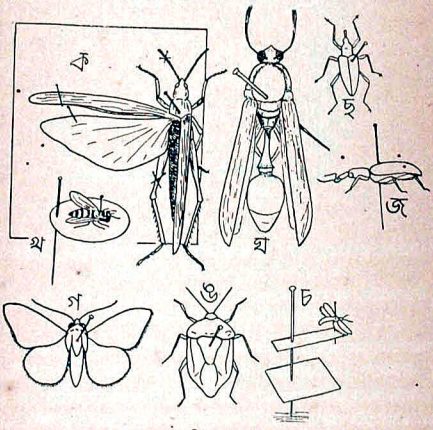

চিত্র—৫১

ক—গাছ ফড়িঙ সেট্ করা; খ—দ্বিপতরা শক্ত কাগজে পিন করা; গ—বাটারফ্লাই ও মথ পিন করা; চ—ছোট মথ শক্ত কাগজে পিন করা এবং নীচে লেবেল লাগানো; ঘ—হেমনপতর্ পিন করা; ঙ—হেমিপতরা পিন্ করা; ছ, জ—কড়াপতরা পিন করা।

পতঙ্গার ডানাগুলি বিছাইয়া বা সেট্ করিয়া রাখিতে হয়। বড় লেপিডপতঙ্গার জন্য সেট্ করিবার বোর্ড বা সেটিং বোর্ড আবশ্যক। ছোট মথ কর্কের পাতে সেট্ করিতে পারা যায়। অর্থপতঙ্গার বা দিকের ডানাদুইটি সেট্ করিতে হয়।

নিরাপতঙ্গার ডানাগুলি বিছাইয়া শুকাইলে ভাল। ঝিপতঙ্গা কাগজের বা কর্কের টুকরা কাটিয়া তাহার উপর পিন করিতে হয়। অপতঙ্গাও কাগজের উপর পিন করা যায়।

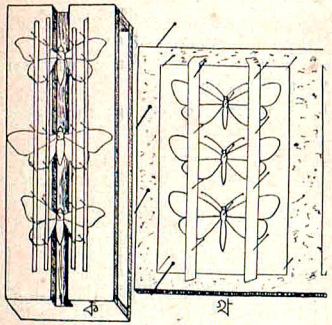

চিত্র—৫২

ক—প্রজাপতি ও মথ সেট্ করা; উপরেরটির মত সেট্ করা ঠিক, নীচের দুইটি ঠিক নয়
খ—ছোট মথ কর্ক বা সোলার 'সিটে' সেট্ করা।

টিস্থ কাগজের সরু ফালি ডানার উপর বসাইয়া আল্‌পিন্ দ্বারা আট্‌কাইয়া দেওয়া হয় এবং ডানাগুলি যেমনভাবে ইচ্ছা সাজান যায়।

বাটারফ্লাই, মথ, ফড়িঙ প্রভৃতি মরিয়া যাইবার কতক্ষণ পরে শক্ত হইয়া যায়। ভিজা স্যাঁৎসেতে হাওয়াপূর্ণ বাক্সে বা কাচের বোতলে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলেই উহারা আবার নরম হয় এবং তখন ডানা, পা ইত্যাদি যেমনভাবে ইচ্ছা নাড়িয়া সেট্ করা চলে। ভিজা ব্লটিং কাগজ কিংবা ভিজা কাঠের গুঁড়ার উপর ব্লটিং কাগজ বসাইয়া নরম করার বাক্স বা বোতল নির্ম্মাণ করা যায়। ব্লটিং কাগজ ও কাঠের গুঁড়ায় কয়েক ফোঁটা কার্বলিক এসিড দিতে হয় যাহাতে ছাতা না ধরে।

সাধারণ আলপিনে পোকা পিন করা যায় না। পোকার জন্য ১৬নং বড় এবং ২নং ছোট পিন হইলেই প্রায় সমস্ত কাজ চলে।

পিন্ ও সেট্ করিয়া পোকাগুলি মিট্‌সেফের ভিতর অথবা এমন স্থানে রাখা উচিত যেন হাওয়া পায় এবং পিঁপড়া ইত্যাদিতে নষ্ট না করে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে আমাদের দেশে ৬।৭ দিনেই পোকা শুকাইয়া যায়। তখন উঠাইয়া উহাকে বাক্সের মধ্যে রাখিতে হয়। হাওয়া স্যাঁৎসেতে হইলে শুকাইবার বাক্স তৈয়ারি করা প্রয়োজন। হাওয়া না ঢোকে এইরূপ কাঠের ছোট আলমারিতে কয়েকটি তারের জালের তাক করিয়া দিতে হয় এবং নীচে কাচের পাত্রে ক্যাল্‌সিয়ম ক্লোরাইড রাখিয়া উপরন্তু কতকগুলি ন্যাপথালিন্ গুলি তাকে তাকে রাখিলে ভাল হয়। আলমারির দরজা যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ক্যাল্‌সিয়ম ক্লোরাইড জল হইয়া গেলে মাটির পাত্রে আগুনের উপর জাল দিয়া শুকাইয়া আবার ব্যবহার করা চলে।

পিন্ ও সেট্ করার জন্য প্রয়োজন—

১। পোকার পিন্ (entomological pin) ১৬নং ও ২নং, এক বাক্স করিয়া
২। কর্কসিট্ বা সোলার বোর্ড দুইটি কি তিনটি
৩। চিমটা ১টি
৪। হাতল লাগান পিন্ ১টি
৫। সেটিং বোর্ড (বিভিন্ন আকারের ছোট বড় প্রজাপতি, মথ প্রভৃতির জন্য) ৬টি
৬। ছোট কাঁচি একটি
৭। শক্ত কাগজ ও টিস্থ কাগজ কিছু
৮। শুকাইবার বাক্স
৯। নরম করিবার বাক্স বা বোতল

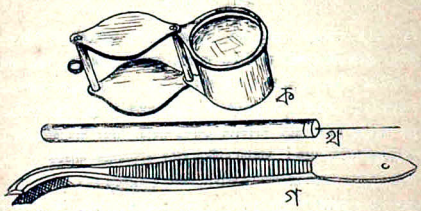

চিত্র—৫৩

ক—লেন্স বা আতস কাচ; খ—সেটিং পিন বা হাতলওয়ালা পিন, প্রজাপতি প্রভৃতি সেট্ করিবার জন্য আবশ্যক; গ—সেটিং ফরসেপ্‌স্ বা পিন সেট্ করিবার চিমটা।

(গ) সংগৃহীত পোকা রক্ষা করা—

সংগৃহীত পোকা এমনভাবে রাখা উচিত যেন অন্য কোন পোকা প্রভৃতিতে নষ্ট করিতে না পারে এবং স্যাঁৎসেতে জলীয় হাওয়া বা জল উহাতে না লাগে, অথবা ছাতা ধরিয়া পোকাগুলি নষ্ট না হয়। বাক্সের ঢাক্‌নার তলায় আর একটি কাচের ঢাকনা আঁটিয়া দিলে উপরের ঢাক্‌না খুলিলে হাওয়া লাগা বা ধুলা পড়ার ভয় থাকে না, অথচ কাচের ঢাক্‌নাটি থাকায় পোকাগুলি বেশ দেখা যায়। বাক্সের ভিতর চারিধারে ন্যাপ্‌থালিন থাকায় পোকা লাগিতে বা ছাতা ধরিতে পারে না। বাক্সর মেঝেতে সিরিষ দিয়া কর্কসিট্ বসাইয়া তাহার উপর কাগজ লাগাইতে হয়। সকল পোকার সঙ্গেই একটি পরিচয়সূচক লেবেল রাখা প্রয়োজন। ইহাতে কোথায়, কোন্ তারিখে পোকাটি সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সংগ্রহকারীর নাম প্রভৃতি লেখা থাকে। যেমন—বেগুন পাতা, বরাহনগর, ১লা জুন, ১৯৩৪, হীরেন দত্ত।

পকেট লেন্স্—ছোট ছোট পোকা এবং উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ইত্যাদি দেখিবার জন্য একটি পকেট লেন্স্ বিশেষ আবশ্যক। ইহা দ্বারা আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ হয়। দশ গুণ বড় দেখায় এমন একটি লেন্স্ হইলেই সকল কাজ চলে।

বাক্স, সেটিংবোর্ড, কর্কসিট্, আলপিন, চিম্‌টা, জাল, কাচের টিউব্, কৌটা, লেন্স্ প্রভৃতি সমস্তই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। উপরে বর্ণিত রূপ পোকা রাখার বাক্স কিন্তু তৈয়ারী করাইয়া লইতে হয়, তাহাতে খরচও কম পড়ে।

পোকা পালন

ডিম, কীড়া, কেটারপিলার্, পুত্তলি গাছপালায় খোঁজ করিলেই বহু পাওয়া যায়। এইগুলিকে পালন করিয়া পতঙ্গ না করিতে পারিলে ইহাদের নাম স্থির করা যায় না। পালন করিতে করিতে ইহাদের আচরণ লক্ষ্য করা খুব আনন্দদায়ক। কীড়াপালন করা কঠিন কাজ নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে কীড়া যেমন থাকে, যতদূর সম্ভব তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিতে হয়। তবে অধিকাংশ পোকা, যাহারা পাতা খায় তাহাদিগকে পাতা খাইতে দিলেই বাঁচিয়া থাকে। যাহারা মাটিতে থাকে তাহাদিগকে মাটিতে এবং যাহারা ডাঁটার ভিতর কুরিয়া খায় তাহাদিগকে ডাঁটার ভিতরেই রাখিতে হয়।

প্রায় সকল পোকাকেই কাচের গ্লাসে কি 'জারে' পালন করা চলে। গ্লাসের বা জারের মুখ কাপড় বাঁধিয়া বা কাচের খণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয় যেন পোকা না পালায়। রোদ না লাগে এমন জায়গায় বারান্দার কিংবা গৃহের এক কোণে টেবিলের উপর পালন পাত্রগুলি রাখিতে হয় এবং যাহাতে পিঁপড়া না লাগে তন্নিমিত্ত টেবিলের পাগুলি জলে বসাইতে হয়। আলাদা আলাদা কাগজে পালনের বিবরণ রাখা উচিত। নিম্নে ইহার

একটি নমুনা দিলাম। রোজ পোকাগুলিকে দেখিতে হয় এবং যেমন প্রয়োজন পাত্রগুলি পরিষ্কার করিতে এবং তাজা খাবার দিতে হয়।

ডিম, কীড়া ইত্যাদির মাপ রাখিবার জন্য কাচের মিলিমিটার (১ ইঞ্চির ২৫ ভাগের এক ভাগ) মাপ একটি রাখা উচিত। ডিম ইত্যাদির উপর ধরিলেই মাপ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রত্যেক বার মিলিমিটার না লিখিয়া সংক্ষেপে মি.মি লেখাও চলে।

কীড়াপালন বিবরণপত্র

নং—৩৫ বর্গ—লেপিডপতরা

স্থান—বেলুড় দল—প্যাপিলিওনাদি

তারিখ—২রা জ্যৈষ্ঠ নাম—প্যাপিলিও ডিমোলিউস্

সংগ্রহকারী—শ্রীশ রায় খাদ্য—নেবুর পাতা

২রা জ্যৈষ্ঠ—নেবুর কচি পাতার উপর একটি গোল মুক্তার মত ডিম পাইলাম। ডিমের আকৃতি গোল ; মাপ ২ মি.মি ; রঙ মুক্তার মত ; গা মসৃণ, কোনরূপ দাগ নাই।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—ডিমের রঙ বদলাইয়া কালচে হইয়াছে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—ডিম ফুটিয়া ছোট কীড়া বাহির হইয়াছে। কীড়া ডিমের খোলার অধিকাংশ খাইয়াছে। (ডিম ফুটা লক্ষ্য করিলে কেমন করিয়া কীড়া বাহির হইল লিখিয়া রাখিতে হয় ; কীড়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, রঙ, গায়ে শুঁয়া বা কাঁটা আছে কি নাই, পেটের পা কয় জোড়া ইত্যাদি বিবরণ লিখিতে হয়)। কাচের গ্লাস পালনপাত্র রূপে ব্যবহৃত। পাত্রে কচি নেবুর পাতা দিলাম।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—কীড়া পাতা খাইতেছে (কেমন করিয়া খাইতেছে লিখিতে হয়—কিনারা হইতে কাটিয়া, কি মধ্যে ছিদ্র করিয়া, কি পর্দা কুরিয়া, কি পাতা গুটাইয়া তাহার ভিতর লুকাইয়া ভিতর হইতে ইত্যাদি যেমন লক্ষ্য করা যায়)।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—কীড়া প্রথম বার খোলস ছাড়িয়াছে। (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রঙবদল ইত্যাদি লিখিতে হয়। খোলস ছাড়িবার প্রথা লক্ষ্য করিলে বিবরণ লিখিতে হয়)।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—দ্বিতীয় বার খোলস ছাড়িয়াছে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি বিবরণ লিখিতে হয়)।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—তৃতীয় বার খোলস ছাড়িয়াছে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি বিবরণ লিখিতে হয়)।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—কীড়া পুত্তলি হইবার জন্য গ্লাসের উপর বসিয়াছে। (কেমন করিয়া পুত্তলি হইল এবং পুত্তলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকৃতি, রঙ ইত্যাদির বিবরণ লিখিতে হয়)।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—পুত্তলি হইয়াছে (পুত্তলির রঙ বদল হইলে তারিখ দিয়া লিখিতে হয়)।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—প্রজাপতি বাহির হইয়াছে (প্রজাপতি কেমন করিয়া বাহির হইল লক্ষ্য করিলে লিখিতে হয়)।

প্রজাপতিকে বধ করিয়া পিন ও সেট্ করিয়া শুকাইলে বাক্সে রাখিতে হয় এবং পিনের সঙ্গে কাগজের লেবেল দিতে হয়। উক্ত প্রজাপতিটির লেবেলে হইবে—পালন নং ৩৫, নেবুপাতা, বেলুড়, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, শ্রীশ রায়। ভবিষ্যতে লেবেল হইতেই প্রজাপতিটি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ লাভ হইবে। পালন বিবরণপত্র দপ্তরে থাকিবে এবং যখন প্রয়োজন ব্যবহৃত হইবে।

বিবরণপত্রে পালনকর্ত্তা যাহা কিছু লক্ষ্য করেন লিখিয়া রাখিতে হয়। পালন করিবার জন্য কীড়াকে স্বল্প স্থানে আটক রাখা ভাল। গাছের উপর কীড়া যখন স্বেচ্ছায় যায় ও চলা-ফেরা করে, তখন তাহার আচরণ কিরূপ তাহা লক্ষ্য করিয়া বিবরণপত্রে লিখিয়া রাখিলে সেই বিবরণের মূল্য খুব বেশি হয়।

বিবরণপত্রে দলের ও পোকার নাম দিয়াছি। ইহা সকলের পক্ষে লেখা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বর্ণের নাম লেখা সহজ। পরে বিশেষজ্ঞের দ্বারা বা মিউজিয়মের সাহায্যে দল ও নাম জানিয়া লওয়া যায়। কিছু দিন অভ্যাসের পর দলগুলির সহিত পরিচয় হওয়াও সম্ভবপর, কিন্তু নামের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন।

ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত

ভিটামিন আবিষ্কার হইয়াছে মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে এত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে সেগুলির ক্ষুদ্র বিবৃতি মাত্র দিলেও একটা বড় রকমের পুস্তক হয়। ভিটামিন আবিষ্কারের জন্য সার ফেড্রিক হপকিন্স, আইজকম্যান ও অয়লার নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রায় চারি রকম ভিটামিনের খবর আমরা বহু দিন হইতে রাখি, কিন্তু মজা এই যে ইহাদের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল না; বর্ত্তমানে নানারকম গবেষণার ফলে কতকগুলি ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি। এখন ভিটামিনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় বারটা।

ভিটামিন 'এ'র অভাবে শরীর নানারকম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় বলিয়া মিলান্‌বি (Mellanby) ইহাকে পীড়াসংক্রামণরোধকারী (anti-infective) ভিটামিন বলিয়া অভিহিত করেন। কোন পদার্থে ভিটামিন আছে কিনা জানিতে হইলে সেই পদার্থ প্রাণিশাবকদের খাইতে দিয়া ফলাফল লক্ষ্য করিতে হয়। এই-ভাবে পরীক্ষা করার ফলে জানা যায় যে সবুজ গাছে ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' তৈলজাতীয় পদার্থের ন্যায় ইথরে (ether) ও সুরাসারে (alcohol) দ্রবণীয়। তেলের ভিতর ভিটামিন 'এ' আছে, কিন্তু এই ভিটামিন সংগ্রহ করা এক সমস্যা ছিল। ১৯২০ সালে জানা যায় যে তেল হইতে সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহাতে ভিটামিন 'এ' নষ্ট হয় না, অথচ যে অংশ সাবানে পরিণত হয় না তাহাতে ভিটামিন 'এ' থাকে। তেল সাবানে পরিণত করিয়া উহা হইতে সাবান পৃথক করিয়া লইলে অবশিষ্টাংশ হইতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

ড্রামণ্ড (Drummond) এ সম্বন্ধে দশ বৎসর ধরিয়া বহু গবেষণা করেন। কিন্তু নানারকম তেল, বিশেষতঃ কড্ মাছের তেল হইতে ভিটামিন 'এ' পৃথক করিয়া উহার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

অনেক দিন হইতেই জানা ছিল যে কড্‌লিভার তেলে সালফিউরিক এসিড (sulphuric acid) দিলে উহা বেগুনে রং ধারণ করে। প্রথমতঃ সকলেই মনে করেন যে অন্য কোন পদার্থের জন্য এইরূপ রং হইয়া থাকে, কারণ তখনকার দিনে কড মাছের যকৃৎগুলি

পচাইয়া তেল করা হইত এবং পিত্তকোষ পৃথক করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। যখন দেখা গেল যে শুধু যকৃতের জন্যই তেল বেগুনে রঙের হয়, তখন অন্য কোন তেলে কড্ মাছের যকৃৎ মিশান আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য সালফিউরিক এসিড দিয়া দেখা হইত যে রং পরিবর্ত্তিত হয় কিনা। কিন্তু পরে দেখা গেল যে-সকল তেলে যকৃৎ থাকার সম্ভাবনা নাই—যেমন উদ্ভিজ্জ তেল, তাহাও সালফিউরিক এসিডের সংমিশ্রণে বেগুনে রং ধারণ করে। এমত অবস্থায় এই পরীক্ষায় কোন লাভ হইল না। ১৯২২ সালে ড্রামণ্ড ও ওয়াটসন জানিতে পারেন যে ভিটামিনের সঙ্গে উক্ত রং পরিবর্ত্তনের কোন সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে ভিটামিনের পরিমাণ যত বেশী হয় রঙের গাঢ়তাও তত বাড়ে, কিন্তু ঐ রং বেশী ক্ষণ স্থায়ী হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা পরীক্ষা সম্ভবপর নয় বলিয়া ড্রামণ্ড আর্শেনিক ট্রাইক্লোরাইড (arsenic trichloride) বা এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড (antinomy trichloride) সংযোগে ভিটামিন 'এ'র পরীক্ষা করেন। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দুটির সংস্পর্শে ভিটামিন 'এ'র রং নীল হয় এবং এই রং স্থায়ীও হয় অনেক বেশী।

গাছের পাতায় নানারকম রঙিন পদার্থ পাওয়া যায়। এই পদার্থগুলি আর্শেনিক ট্রাইক্লোরাইডের সংস্পর্শে নীলাভ হয় বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেন যে ঐ সব রঙিন পদার্থই ভিটামিন 'এ'। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ষ্টীনবক (Steenbock) লক্ষ্য করেন যে খাদ্যের ভিতর ঐ সব রঙিন পদার্থ থাকিলে ভিটামিন 'এ'র অভাব পূর্ণ হয়। তিনি সাদা ভুট্টা প্রাণিশাবকদের খাওয়াইয়া দেখেন যে উহাতে ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ অতি কম, অথচ হল্দে ভুট্টাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। বিখ্যাত সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক অয়লার (Euler) বলেন গাজরে যে এক রকম রঙিন পদার্থ আছে, ভিটামিন 'এ' অনেকটা ঐ ধরণের পদার্থ। অয়লার বলেন দৈনিক '০০৫ হইতে '০১ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যারোটিন (গাজরের রঙিন পদার্থ) খাইতে দিলে ভিটামিন 'এ'র অভাব পূর্ণ হয়। গাছের পাতায় ক্লোরোফিল, জ্যান্‌থোফিল প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ক্যারোটিনও পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে গাঢ় কমলা বর্ণের (brown)। ক্যারোটিন প্রাণিদেহের যকৃতে গিয়া অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া ভিটামিন 'এ' তে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকরা ইহার রাসায়নিক গঠনের একটা মোটামুটি খসরাও (C_{20} H_{30} O) উপস্থিত করিয়াছেন। সম্প্রতি ভিটামিন 'এ' সংশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এখন ভিটামিন 'ডি' সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। রিকেট রোগের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এক দল বৈজ্ঞানিক বলিতেন যে খাদ্যের দোষে রিকেট হয়; অপর দলের মতে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলে রিকেট হয়, খাদ্যের সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক নাই। ১৯১৯ সালে হল্ডজিনস্কি (Huldschinsky) এই দুই

মতের ঐক্য সাধন করেন। তিনিই প্রথম পারদ-রশ্মির সাহায্যে রিকেট আরোগ্য করেন। তাঁহার গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে খাদ্য ও আলোক উভয়ই রিকেটের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ষ্টীনবক ভিটামিন 'ডি' সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে-সকল খাদ্য খাইতে দিলে ইঁদুরের রিকেট হইতে দেখা যায়, সেই সকল খাদ্য যদি আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সম্পৃক্ত করিয়া খাইতে দেওয়া হয় তবে রিকেট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে সব খাদ্য এইরূপ রশ্মিসম্পৃক্ত করিয়া খাইতে দিয়া রিকেট আরোগ্য করা সম্ভবপর হইয়াছে, সেই খাদ্যে কলেষ্টেরল ও ফাইটোষ্টেরল নামে ষ্টেরল (sterol) জাতীয় পদার্থ আছে। ষ্টীনবকের তাই প্রথম সন্দেহ হয় যে কলেষ্টেরলই আলোকের প্রভাবে ভিটামিন 'ডি'তে পরিণত হয়। ঐ সময় অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে কলেষ্টেরলে অন্য রকম পদার্থ ময়লা (impurity) রূপে থাকাতে এই রকম পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বহু বার কলেষ্টেরল পরিশুদ্ধ করার পরও দেখা গিয়াছে যে উহা আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে ভিটামিন 'ডি'তে পরিণত হইতেছে। এই সময় রোজেনহাইম ও ওয়েবষ্টার (Rosenheim and Webster) দেখান যে কলেষ্টেরলঘটিত যৌগিক পদার্থ (dibromide of cholesterol) হইতে কলেষ্টেরল পৃথক করিয়া রাখিলে আলোতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় ও ভিণ্ডাউস (Windaus) প্রমাণ করেন যে আর্গোষ্টেরল (ergosterol) আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে রাখিলে ভিটামিন 'ডি'তে রূপান্তরিত হয়। রশ্মিসম্পৃক্ত আর্গোষ্টেরল দৈনিক ১/১০০০০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ খাইতে দিলে ইঁদুরদের রিকেট হইবার ভয় থাকে না। এত সামান্য পরিমাণেও ইহা এত কার্য্যকরী হয় বলিয়া এবং কলেষ্টেরলের সঙ্গে ইহা খুব সামান্য পরিমাণে মিলিত থাকিলেও প্রাণিদেহের উপর সুফল প্রকাশ করে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই যে কলেষ্টেরলই ভিটামিন 'ডি'তে পরিণত হয়, না অন্য কোন পদার্থ আলোকের প্রভাবে ভিটামিন 'ডি' হয়।

১৯৩১ সালে অধ্যাপক ভিণ্ডাউস আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিসম্পৃক্ত করিয়া আর্গোষ্টেরল হইতে দুইটি বিভিন্ন পদার্থ বিশুদ্ধাবস্থায় পান। উহাদিগকে তিনি যথাক্রমে ভিটামিন 'ডি১' ও 'ডি২' নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন এই উভয় পদার্থেরই রিকেট আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার পর বিলাতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটুটের বুরডিলোঁ (Bourdillon), ক্যালোঁ (Callon) প্রভৃতি রাসায়নিকেরা আর্গোষ্টেরল আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিসম্পৃক্ত করিয়া অতিশয় বিশুদ্ধাবস্থায় ভিটামিন 'ডি২' পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হাড়ের গঠনের সহায়তা করে বলিয়া তাঁহারা এই পদার্থের নাম দিয়াছেন ক্যালসিফেরল (calciferol)। ভিণ্ডাউস ও লিনসার্ট যে পদার্থকে ভিটামিন 'ডি২' বলিতেন সেইটাই ক্যালসিফেরল। ভিণ্ডাউস যাহাকে ভিটামিন 'ডি১' বলিতেছেন তাহা ক্যালসিফেরল ও অপর একটি নিষ্ক্রিয় পদার্থের (sterol x) মিশ্রণ। ক্যালসিফেরলের আণবিক গঠন

নির্ণয় করিবার জন্ম গত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া বহু চেষ্টা হইতেছে। প্রকৃত গঠন এখনও জানা যায় নাই, তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে উহার আণবিক গঠন অনেকটা আর্গোষ্টেরলের ন্যায়, কেবল অণুগুলি অন্যভাবে সাজানো।

ভিটামিন 'সি'এর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করেন আপশালার (Upsala) অটো রিঘ, আনগট রিঘ ও পার-লা-ন্যাণ্ড। তাঁহারা বলেন যে কাঁচা ফলফলাদিতে নারকোটিন আছে। ফল যতই পাকিতে থাকে নারকোটিনের পরিমাণও ততই কমিতে থাকে। তাঁহারা ২০ কিলোগ্রাম বিলাতি বেগুন হইতে ২০ মিলিগ্রাম, ১০০ কিলোগ্রাম বাঁধা কপি হইতে ৪০ মিলিগ্রাম নারকোটিন পাইয়াছেন। নারকোটিন আলোকের প্রভাবে ভিটামিন 'সি'তে রূপান্তরিত হয় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রিঘদ্বয় নারকোটিন আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিসম্পৃক্ত করিয়া ইঁদুরদের খাইতে দিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বুঝিবার জন্য অন্য একদল ইঁদুরকে শুধু নারকোটিন খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রে ইঁদুরদের একই সময় মৃত্যু ঘটে। কিন্তু শরীরব্যবচ্ছেদ করতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে-সকল ইঁদুরদের বিশুদ্ধ নারকোটিন খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের দেহে স্কার্ভি রোগের লক্ষণ পুরামাত্রায় বর্ত্তমান, কিন্তু রশ্মিসম্পৃক্ত নারকোটিন যাহাদের খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের স্কার্ভির কোন লক্ষণ ছিল না। তাঁহারা বলেন মিথাইল-নর-নারকোটিন (methyl nor narcotine) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্কার্ভিরোগপ্রতিষেধক।

ডানমার ও মল বলেন যে রিঘদ্বয় যে মিথাইল-নর-নারকোটিন তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। তাঁহারা আরও বলেন অন্য কোন পদার্থ উহাতে মিশ্রিত থাকাতে স্কার্ভি আরোগ্য হইয়াছে। এই সময় হাঙ্গারী হইতে জেণ্ট গিওরগী (Szent Gyorgyii) বলেন যে কমলানেবু, পাতিনেবু প্রভৃতিতে একরকম অম্লজ পদার্থ আছে এবং এই অম্লজ পদার্থই (hexuronic acid) ভিটামিন 'সি'। তিনি প্রাণিদেহ (adrenal cortex) হইতে এই অম্লজ পদার্থ সংগ্রহ করেন। অতিসামান্য মাত্রাতে ইহা স্কার্ভিরোগ আরোগ্য করে। গিওরগী ও হাওয়ার্থ (Gyorgyii and Hawroth) এই অম্লজ পদার্থের রাসায়নিক গঠন (C_6H_8O) নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা ভিটামিন 'সি'এর নাম দিয়াছেন এস্কর্ভিক এসিড। এই তত্ত্ব আবিষ্কার হইবার পর রিঘদ্বয় মনে করেন যে ভিটামিন 'সি' মিথাইল-নর-নারকোটিন ও এস্কর্ভিক এসিডের মিশ্রণ। কিন্তু ডান (Dann) নানারকম পরীক্ষার পর প্রমাণ করেন যে মিথাইল-নর-নারকোটিনের স্কার্ভি আরোগ্য করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। বর্ত্তমানে এস্কর্ভিক এসিডই যে ভিটামিন 'সি' সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কোন সন্দেহ নাই। ইহার যাবতীয় রাসায়নিক গুণ পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভিটামিন 'সি' সংশ্লেষণ করিবার বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই চেষ্টা যে সফল হইবে তাহা রেক্সটাইন, গ্রসনার, ওপেনায়ার (Rechstein, Grossner, Oppenaur) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা হইতে জানা যায়।

আইজকম্যান, ফাঙ্ক, ফ্রেজার, স্ট্যাটেন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে ভিটামিন 'বি' আবিষ্কৃত হয়। বর্ত্তমানে জানা যায় ভিটামিন 'বি' অন্ততঃ ৬।৭টি ভিটামিনের মিশ্রণ। নানারকম পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকাতে ইহার রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। ভিটামিন 'বি$_১$'এর অভাবে শরীর দুর্ব্বল হয়, ওজন কমে এবং নার্ভসমূহ আক্রান্ত হইয়া বেরীবেরী হয়। ১৯১৩ সালে ফাঙ্ক ভিটামিন 'বি$_১$' বিশুদ্ধাবস্থায় পৃথক করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বপ্রথম দাবী করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার আবিষ্কৃত পদার্থের দ্বারা প্রাণিশাবকদের দেহের উপর পরীক্ষা করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ১৯২৫ সনে কিনার্সলি ও পিটারস্ (Kinnersley and Peters) গাঁজলা হইতে ভিটামিন 'বি$_১$' পৃথক করেন। দৈনিক মাত্র ·০৮৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ উক্ত পদার্থ পায়রাদের খাইতে দিলে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে। ইহার কিছুকাল পরে জান্‌সেন ও ডোনাথ (Jansen and Donath) চাউলের তুষ হইতে একরকম দানাদার পদার্থ পান। তাঁহারা উক্ত পদার্থের রাসায়নিক গঠনও ($C_6\ H_{10}\ O\ N_2$) নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। মাত্র ·২ মিলিগ্রাম পরিমাণ এই পদার্থ প্রাণীদের খাইতে দিলে তাহাদের নার্ভসমূহের আক্ষেপ (convulsion) আরোগ্য হয়। কিনার্সলি ও পিটারস্ পরে এত ঘনীভূত ভিটামিন 'বি$_১$' তৈয়ারী করিতে পারিয়াছিলেন যে দৈনিক মাত্র ·০২১ মিলিগ্রাম খাইতে দিলেই ফল পাওয়া যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে জান্‌সেন ও ডোনাথ যে পদার্থ পাইয়াছেন তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অনেক কম, এই নিমিত্ত তাঁহারা ভিটামিন 'বি$_১$' বিশুদ্ধাবস্থায় পাইয়াছিলেন কিনা তাহাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে গটিংগেনের অধ্যাপক ভিণ্ডাউস গাঁজলা হইতে ভিটামিন 'বি$_১$' পৃথক করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৩২ সনে তিনি ভিটামিন 'বি$_১$' বিশুদ্ধাবস্থায় পৃথক করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উহার রাসায়নিক গঠনও ($C_{12}\ H_{17}\ N_3\ OS$) নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহার পর নানারকম গবেষণার ফলে আজ জানা গিয়াছে যে জান্‌সেন ও ডোনাথ, ভিণ্ডাউস, পিটারস্ প্রভৃতি রাসায়নিকেরা যে দানাদার পদার্থ পাইয়াছিলেন তাহা ভিটামিন 'বি$_১$'। কিন্তু সকলেই বিশুদ্ধ ভিটামিনের সহিত অল্পবিস্তর অন্য পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রথমাবস্থায় আণবিক গঠন নির্ণয়ব্যাপারে প্রত্যেকেই ভুল করিয়াছিলেন। আজ ভিটামিন 'বি$_১$' এর রাসায়নিক গঠন ($C_1\ H_{18}\ N_4\ O_2\ S$) সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই। জান্‌সেন, ডোনাথ, হারমানো, ইউবোনী এই দানাদার পদার্থ খাইতে দিয়া মানুষের বেরীবেরী আরোগ্য করিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

১৮৭৯ সালে উইন্‌টার ব্লাইদ (Winter Blyth) বলেন যে দুধে একরকম জলে-দ্রবণীয় রঙিন পদার্থ পাওয়া যায়, যাহার কার্য্যকারিতা অনেকটা ভিটামিনের মত। ইহার পর

অনেক দিন এ সম্বন্ধে আর কোন কাজ হয় নাই। ১৯২৫ সালে ব্লেয়ার ও কেলম্যান অনেকটা ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ সনে জানা যায় ডিমের ভিতরও ঐ জাতীয় একরকম রঙিন পদার্থ (ovoflavins) আছে। কুন (Kuhn), গিওরগী এবং ওয়ার্ণার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেন এই রঙিন-পদার্থ ভিটামিনের ন্যায় কার্যকরী। অয়লার ও কারার (Euler and Karrer) এই রঙিন পদার্থের আণবিক গঠনও ($C_{17}H_{20}N_4O_6$) নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমানে ষ্টার্ক ও কুন প্রভৃতি রাসায়নিকেরা এই পদার্থ সংশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা পেলেগ্রা আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু গিওরগী বলেন দুধের ভিতর যে রঙিন পদার্থ (lactoflavin) পাওয়া যায়, শুধু তাহা খাইতে দিলেই ইঁদুরের পেলেগ্রা আরোগ্য হয় না, উহার সহিত অন্য একটি ভিটামিন জাতীয় পদার্থ (B_1) মিশ্রিত থাকা দরকার। বর্ত্তমানে হ্যারিস্, চিক, কপিং প্রভৃতি রাসায়নিকরা গিওরগীর মত সমর্থন করিতেছেন।

অন্যান্য ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করিবার জন্যও অল্পবিস্তর কাজ হইতেছে। তাহাদের সম্বন্ধে এখনও বিশদভাবে কিছু জানা যায় নাই বলিয়া এখানে তাহাদের আলোচনা করিলাম না। একটি বিষয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে ভিটামিন সম্বন্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং গবেষণার গতি এতদ্রুত ও সাফল্য এত ব্যাপক হইয়াছে যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সকল রকম ভিটামিনই রসায়নাগারে প্রস্তুত হইবে, ইহাদের জন্য আর আমাদিগকে গাছ ও প্রাণীর উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহা

জলজ প্রাণিগণের ভূভাগ অধিকারের অতীত ইতিহাস লইয়া যতই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে উদ্ভিদ্ যদি প্রথম পথপ্রদর্শন না করিত তাহা হইলে এই বিজয় সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। উদ্ভিদ্ খাদ্য, রস এবং আশ্রয়ের সুব্যবস্থা না করিয়া দিলে শুষ্ক ভূমি যে প্রাণীর বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকিয়া যাইত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সুতরাং স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ ও পরিণতি আলোচনা যে জীবতত্ত্ববিদের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

স্থলজ উদ্ভিদের প্রথম বিকাশের পূর্ব্বে যে বহু বহু যুগ কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহা অনায়াসে অনুমান করা চলে। কেম্ব্রীয় (Cambrian), অর্ডোভিসীয় (Ordovician) ও সিলুরীয় (Silurian) স্তরসমূহে সামুদ্রিক উদ্ভিদের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ডিভনীয় (Devonian) স্তরের পূর্ব্বে স্থলজ উদ্ভিদের কোন প্রশিল (fossil) অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। এল্‌গিন্‌বাসী ডাঃ ম্যাকি (Dr. Mackie) এবার্ডিনসায়ারের অন্তর্গত রাইনী নামক স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে প্রশিলগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই স্থলজ উদ্ভিদের প্রাচীনতম নিদর্শন। অবশ্য ডিভনীয় যুগের পূর্ব্বেও স্থলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু সেগুলি এত নগণ্য ও অপরিণতদেহ ছিল যে তাহাদের কোন বিশিষ্ট শিলীভূত আকারগ্রহণ সম্ভবপর হয় নাই।

স্থলজ উদ্ভিদ্‌সমূহের বিকাশ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বহুজনগ্রাহ্য মতবাদটিকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে,—অতি সরলগঠন প্রাথমিক উদ্ভিদের জন্ম হয় সর্ব্বপ্রথমে সাগরজলে এবং তথায় যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু সহজাত সংস্কারের প্রেরণায় পৃথিবীর অনধিকৃত স্থানসমূহ দখল করিবার মানসে ক্রমশঃ সমুদ্রতট হইতে নদীমোহানায়, মোহানা হইতে নদীমধ্যে, নদী হইতে হ্রদে, হ্রদ হইতে বিলে এবং বিল হইতে জলাভূমি প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া অবশেষে শুষ্ক স্থলভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই-ভাবে অগ্রসর হইবার কালে কেহ কেহ হয়তো উপরোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে রহিয়া গিয়া তত্রত্য আবেষ্টনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া তথায় স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে, আবার কেহ হয়তো উৎকৃষ্টতর আরও কিছুর সন্ধানে তাহার অগ্রগতির পথে থামিয়া দাঁড়ায় নাই। ইহাদের মধ্যে কেহই যে একেবারেই সমুদ্রতট হইতে সোজাসুজি তটভূমিস্থ জলায় গিয়া উপনীত হয় নাই—সকলকেই যে তাহাদের প্রগতির পথে মিঠা পানীতে কিছুদিন কাটাইয়া যাইতে হইয়াছে এমন কথা হয়তো জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু সেই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; খুঁটিনাটি সমস্যার কথা না তুলিয়া মোটামুটিভাবে স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ সম্বন্ধে এই বলা যায় যে এককোষ এল্‌গি প্রভৃতির ন্যায় বহুপর্য্যায়নশীল নিতান্ত সরলগঠন উদ্ভিদ্‌রাই নব নব দেশাবিষ্কারের অভিযান অপ্রতিহতভাবে চালাইয়াছে। এই অগ্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে তাহারা স্থায়ীভাবে রহিয়া গিয়াছে তথাকার আবেষ্টনানুসারে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমপরিণতি ঘটিয়াছে।

উদ্ভিদসমূহের প্রজননক্ষম অঙ্গগুলি দেহবিচ্যুত হইয়া স্রোতের বিপরীত মুখে কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারে না, কিন্তু রেণুকোষসমূহ (spores) অনায়াসেই বাতাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হইতে পারে। এইরূপ স্থানান্তরসাধনে মৎস্যের সহায়তা-লাভও অসম্ভব নহে, কিন্তু এই কার্য্য করিতে পারে এমন কোন পাখীর সন্ধান সেই অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে মিলে না। অধিকন্তু ডিভনীয় যুগের পূর্ব্বে প্রকৃত বীজের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় নাই। সাধারণ ধারণা এই যে অত্যন্ত সরলগঠন উদ্ভিদ্‌সমূহই

এই পর্য্যটনের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিল। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যেখানেই তাহারা তাহাদের মনোমত ও বাসোপযোগী স্থান পাইয়াছে সেখানেই লিভারওর্ট (liverwort), শৈবাল (moss) ও ফার্ণ (fern) প্রভৃতি উদ্ভিদের বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। লবণাক্ত জলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্গুলি যেমন কালক্রমে জটিলগঠন হইয়া উঠিয়াছিল, স্থলের অভিনব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই উদ্ভিদ্গুলির দেহগঠনেও তেমনি কতকটা জটিলতার আবির্ভাব হয়। যে সকল উদ্ভিদ্ পৃথিবীর ভূভাগে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে রেণুকোষবিশিষ্ট (sporophyte) বংশগুলির অতিবৃদ্ধি এবং যৌনকোষসমন্বিত (gametophyte) বংশসমূহের হ্রাস কি করিয়া স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে—সপুষ্পক উদ্ভিদের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক এফ্, ও, বাওয়ার তাঁহার "দি অরিজিন অব এ ল্যাণ্ডফ্লোরা" নামক গ্রন্থে (১৯০৮) বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বংশহ্রাসবৃদ্ধি মূল প্রশ্ন নহে, জলজ উদ্ভিদ্ কিভাবে স্থলের উদ্ভিদে পরিণত হইল সেই সমস্যাই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নিরসনের চেষ্টা করিতে হইবে।

অক্সফোর্ডের কৃতী উদ্ভিদ্তত্ত্ববিৎ ডাঃ এ, এইচ, চার্চ্চ সম্প্রতি তাঁহার "থ্যালাসিওফাইটা এণ্ড দি সাবএরিয়েল ট্রান্স্মাইগ্রেশান" শীর্ষক প্রবন্ধে নূতন করিয়া এই সমস্যার একটা মীমাংসা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ডাঃ চার্চ্চের মতবাদের মোটামুটি কথা এই যে স্থলের উদ্ভিদ্সমূহ ক্রমোর্দ্ধগামী বেলাভূমির অত্যুন্নত সামুদ্রিক উদ্ভিদের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার মতে "স্থানান্তরগমন অর্থে একই স্থানে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি" এই বুঝায়। সর্ব্বপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু লইয়া ভূভাগ যখন ক্রমশঃ আদিম সাগরের বুকে ভাসিয়া উঠিল তখন স্থলগামী উদ্ভিদ্গুলির মধ্যে এল্গিই সমস্ত সামুদ্রিক সম্পদের শ্রেষ্ঠ ও জটিলতম অংশগুলি লইয়া পৃথিবীর বুকে নূতন সৃষ্টির আয়োজন করিয়া তুলিল। যুগ যুগ ব্যাপিয়া সাগরবক্ষে যে বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার কিছুই বিনষ্ট হইল না, কেবল নূতন পরিবেষ্টনের উপযোগী করিয়া লইতে হইল মাত্র। এই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের প্রজনন-অঙ্গগুলির যে কোন প্রকার বিপুল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল তাহা নহে, কেবল সলিল-আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থলের বায়বীয় আবেষ্টনে আসিয়া শিকড় ভিন্ন জলীয় খাদ্যসংগ্রহের আর কোনও সুবিধা না থাকায় জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য দৈহিক গঠনের অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডাঃ চার্চ্চ বলেন পৃথিবীর ক্রমশঃ শীতলতাপ্রাপ্তির পর বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বিশ্বসৃষ্টির তিন বার যুগান্তর ঘটিয়াছে। ইহার এক যুগে জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া পৃথিবীব্যাপী সাগরের সৃষ্টি করে। ডাঃ চার্চ্চের মতে এই সাগরজল বহু সংখ্যক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। এই যুগের নাম প্লাঙ্কটন (Plankton) যুগ।

দ্বিতীয় যুগে ভূত্বকের উপর স্তরসংবেশনের ফলে সমুদ্রগর্ভের বহু অংশ উন্নত হইয়া আলোকোদ্ভাসিত পৃথিবীর বুকে ভাসিয়া উঠে এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ সেখানে আসিয়া

স্থায়ী উপনিবেশ গঠন করিয়া সবৃন্তপত্র (frond) প্রভৃতি নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি আরম্ভ করে। কিন্তু এই অধঃস্তরে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য এই সকল উদ্ভিদ্কে নানা অভিনব উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং বংশ-বিস্তারের জন্য পুনরায় প্লাঙ্কটন রীতির আশ্রয়গ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্পঞ্জ যেমন তাহাদের ইতস্ততঃ সন্তরণশীল অঙ্কুরগুলিকে জলে মুক্ত করিয়া দেয়, এই সকল উদ্ভিদের বংশবিস্তারও কতকটা তদনুরূপভাবে ঘটিয়া থাকে। ডাঃ চার্চ্চ বলেন যে সকল উদ্ভিদ্-বংশের প্রত্যেক উদ্ভিদ্টি ব্যক্তিগতভাবে নিয়ত বংশবৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট থাকিয়া যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে তাহারাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। অতএব দেখা যায় প্লাঙ্কটনের আত্মরক্ষা নীতির সহিত বেন্থসের (Benthos) বংশসংরক্ষণ নীতি সম্মিলিত হইয়াই উদ্ভিদের প্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কতকগুলি সুপ্রাচীন উদ্ভিদ্বংশের যে এখনও বিলোপ ঘটে নাই তাহাতে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে সমবেত ও ব্যক্তিগতভাবে ঐ উদ্ভিদ্গুলি আপ্রাণ পরিশ্রমে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ইহাই বেন্থস যুগ।

তৃতীয় অবস্থায় শুষ্ক স্থলভাগের ক্রমবিকাশ এবং তৎসহ জলজ উদ্ভিদের ক্রমশঃ স্থলের উদ্ভিদে রূপান্তর পরিগ্রহণ। এই সকল উদ্ভিদ্ জীবনধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল হইতে বিভিন্ন গ্যাস এবং অধঃস্তর হইতে দ্রবীভূত লবণ গ্রহণের সামর্থ্য অর্জ্জন করে। বেন্থস যুগে বিবর্ত্তনশীল উদ্ভিদ্জীবনে অধঃস্তরের প্রভাব সূচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থলের আবির্ভাব ব্যতীত বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শলাভ সম্ভবপর হয় নাই। এই সংস্পর্শই জেরোফাইট (Xerophyte) যুগের বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপে এই যুগত্রয়ের বর্ণনা দিতে গেলে পর পর তিনটি দৃশ্য আমাদের মানসনয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—(১ম) ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্সমন্বিত উন্মুক্ত আদিম সাগর, (২য়) আলোকোজ্জ্বল অগভীর সাগরগর্ভ, সবৃন্তপত্রক উদ্ভিদ্ যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনার দেহগঠনে ও বংশবিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং (৩য়) উর্দ্ধগামী সাগরতট যাহা স্থলজ উদ্ভিদে ক্রমবিবর্ত্তনশীল অত্যুন্নত সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ লইয়া একটু একটু করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

ভাঁটার সময় সাগরের প্রস্তরবৎ কঠিন সৈকতভূমির উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে জল-নিমজ্জিত ল্যামিনারিয় প্রভৃতি যে সকল সামুদ্রিক উদ্ভিদ্গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাদের জীবনীশক্তি, বৃদ্ধির বৈচিত্র্য, দেহগঠনের অশেষবিধ জটিলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। ইহারা যে কত স্মরণাতীত প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ্ এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে পাহাড়পর্ব্বত শৈলরাজি অপেক্ষাও প্রাচীনতর তাহা উপলব্ধি করিয়াও মনে কম কৌতুহল জাগ্রত হয় না। প্রচলিত ধারণা এই যে সামুদ্রিক

উদ্ভিদ্‌গুলি উদ্ভিদ্‌জগতের এক বিচ্ছিন্ন সম্পদ, যাহার সহিত সেই জগতের অপরাপর অংশের কোন যোগাযোগ নাই। কিন্তু ডাঃ চার্চ্চ বলেন যে ধীরে ধীরে সাগর-সৈকতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক উদ্ভিদের ন্যায় অত্যুন্নত জীবের মধ্য হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে স্থলজ বৃক্ষলতাগুল্মের উদ্ভব একান্তই অসম্ভব নহে। এই বিবর্ত্তন কিন্তু সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, একটু একটু করিয়া বহু সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বহু দিনে ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃত মূল বলিতে যাহা বুঝায় সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌-সমূহের তাহা ছিল না, কেবল স্থানবিশেষে দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া থাকিবার নিমিত্ত আঁকড়া বা আকর্ষণীর মত একপ্রকার গঠনযন্ত্র বিদ্যমান ছিল মাত্র; স্থলজ উদ্ভিদে পরিণতিলাভের পূর্ব্বে মৃত্তিকা হইতে জল এবং দ্রবীভূত লবণাদি শোষণ করিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল এবং মূলকেশ সংগঠন করিয়া লইতে হইল। যে সবৃন্ত পত্রপৃষ্ঠ কেবলমাত্র জলীয় খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল তাহাকে বায়ুমণ্ডল হইতে শুষ্ক গ্যাস আহরণের উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হইল এবং গৃহীত ও পরিপক্ব খাদ্যরস দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালনের জন্য উদ্ভিদ্‌গুলি এক অতি জটিল রসবাহী কোষতন্তুর (vascular system) সৃষ্টি করিয়া লইল।

এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অতি নমনীয় এবং সহজেই পরিবর্ত্তনশীল। কঠিনদেহ বৃক্ষও অপ্রতুল নয়, যাহা অভিনব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই রূপান্তরগ্রহণের স্বাভাবিক শক্তি বা প্রেরণা যে পর্য্যন্ত না বীজের মধ্য দিয়া স্থায়ী দৈহিক গঠনের উপযোগিতা লাভ করিয়াছে তত দিন প্রকৃত বংশানুক্রমিক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। অনুমান হয় তত দিন পর্য্যন্ত ইহা ঊর্দ্ধগামী বেলাভূমিস্থিত সামুদ্রিক উদ্ভিদসমূহের পরম্পরাগত বিভিন্ন পুরুষের ব্যষ্টিগত পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোনপ্রকারে সঞ্জীবিত ছিল।

স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব সম্পর্কে আমরা যে স্থানান্তরগমন মতবাদ প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নিতান্ত সহজসিদ্ধ নহে। সাগরজল হইতে মিঠা পানীতে প্রব্রজন করিতে হইলে জননকোষসমূহ উপবাসক্লিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ফলে তাহারা অবশ্যম্ভাবী জাতিক্ষয় ও বংশলোপের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই যুক্তিতে হয়তো খানিকটা একদেশদর্শিতা দোষ আছে। কিন্তু দেহযন্ত্রের যে সকল জটিল পরিবর্ত্তন ইতঃপূর্ব্বেই বহু সামুদ্রিক উদ্ভিদে প্রকট হইয়াছিল, হ্রদজলাভূমি হইতে নবাগত সরলগঠন উদ্ভিদ্‌গুলির দেহে অকস্মাৎ তাহাদের নূতন করিয়া সূত্রপাত হইয়াছে—এই যুক্তিও কি দোষলেশহীন? ডাঃ চার্চ্চ বলেন, সাগরবক্ষে নিরাপদ জীবনযাপন ও বংশসংরক্ষণের উপযোগী যে সকল পরিবর্ত্তন সামুদ্রিক উদ্ভিদের দেহে বিকাশলাভ করিয়াছিল, স্থলজ উদ্ভিদের পরিণত কোষসমূহ এবং সাধারণ দৈহিক গঠন তাহাদেরই অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতির নিদর্শন মাত্র। এই

উন্নতিতে অঙ্গবিশেষের যতই পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন ঘটুক না কেন, দেহের কাঠামো ও অঙ্গবিন্যাস রীতি সেই আদিম এবং মূলতঃ সামুদ্রিকই রহিয়া গিয়াছে।

প্রাণীর ক্রমবিকাশ আলোচনায় বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আপাতদৃষ্টিতে প্রাণীর দেহগঠনে যাহা অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা অতি প্রাচীন গঠনযন্ত্রের বিকশিত রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ যে রক্তস্রোত আমাদের দেহে জীবনের স্পন্দন সূচিত করে তাহার রাসায়নিক সংগঠনে এখনও আমরা সাগরপ্রবাহের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ডাঃ চার্চ্চের মতবাদের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন বিরোধ নাই।

বিবিধ

বিজ্ঞান ও সমাজ

বিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেও যে মুহূর্ত্তে সে একদিকে প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণের সহায়ক হইয়া মানবেতিহাসে সে এক নূতন সমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে কেবলমাত্র সভ্যতার নিরাপত্তার সমস্যাই প্রধান হইয়া উঠে নাই, পরন্তু বিজ্ঞানলব্ধ ফল যেভাবে রাজনীতিকগণের হস্তে পড়িয়া মানবের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে নিয়োজিত হইতেছে তাহাতে নানাবিধ সমস্যাই ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। আজ সমগ্র জগতে বেকারের আর্ত্তনাদ, খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভিযোগ, পীড়িতের ক্রন্দন, অস্ত্রের ঝনঝনানি শ্রুত হইতেছে। অথচ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার একেবারে উজাড় হইয়া যায় নাই, কিংবা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্পদ ও কাজ আদায় করিতে বিজ্ঞান এখনও অসমর্থ হয় নাই; বরং আধুনিক যুগে বিজ্ঞান নব নব উদ্ভাবনী শক্তির বলে মানুষের হাতে যে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতা আনিয়া দিতেছে, মানব-উন্নতির ইতিহাসে তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। তবে চারিদিকের পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ আজ এত অসহায় কেন? প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে, অথচ আজ মানুষ পেট পুরিয়া আহার পাইতেছে না কেন? কলকারখানার জঠরে হাজার হাজার টন পরিমাণ শস্য হয় তো আহুতি দেওয়া হইতেছে, অথচ মানুষ মরিতেছে অনাহারে!

সম্প্রতি ব্ল্যাকপুলে ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিভাষণে সমাজের বর্ত্তমানের এই দৈন্য দশার কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলসমূহের হিংসাত্মক মারণাস্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণে যেভাবে অপপ্রয়োগ হইতেছে তাহার কথা ভাবিয়া সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের হিতার্থে বিজ্ঞানের দায়িত্ব আজ তাই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে দোষ দেওয়া যায় না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার এই নিত্যনূতন আবিষ্কারের সহিত সমাজ-মন সম্পূর্ণরূপে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারে নাই বলিয়াই আজ এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং মানুষের মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। যাহাতে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সভ্যতার ধ্বংস না হইয়া উত্তরোত্তর উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সকলের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। মানুষ এতকাল শুধু ব্যক্তিগতভাবে আপনার স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের স্বার্থ দেখিবার মত প্রবৃত্তি তেমনভাবে তাহার বিকশিত হয় নাই। ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের ব্ল্যাকপুল অধিবেশনের সভাপতিরূপে সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিৎ স্যার যোশিয়া ষ্টাম্প তাই বলিয়াছেন "the whole body of ethics needs to be worked in the light of modern corporate relations"। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিজ্ঞানচর্চ্চার এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইলে বিজ্ঞানলব্ধ শক্তি আমাদের অপকার ব্যতীত কখনই মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। সুখের বিষয়, ব্ল্যাকপুল অধিবেশনে যে আশঙ্কার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানসভায় তাহারই প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। ওয়াশিংটন বিশ্বশক্তি সম্মিলনে, ব্যাঙ্গালোরের রাসায়নিক সম্মিলনে, কেম্ব্রিজ, কেপটাউন প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণানিরত কর্ম্মী-সম্মিলনে বিজ্ঞানচর্চ্চার এই আদর্শের প্রতি বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

সমাজসেবার এই গুরু দায়িত্ব প্রতিপালনে বিজ্ঞানের সাধনা জয়যুক্ত হউক।

নিউট্রনের তরঙ্গরূপ

অনেক দিন যাবৎ প্রশ্ন উঠিয়াছে—আলোক কি তরঙ্গ হইতে উদ্ভূত, অথবা উহা বস্তুকণার সমষ্টি? বৈজ্ঞানিক নিউটন আলোকরশ্মি সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন; তিনি উহাকে বস্তুকণাসমষ্টি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে আবার হাইগেন্স প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হয় যে 'ইথরসমুদ্রে তরঙ্গ

সঞ্চালন হইতে আলোকের উৎপত্তি'। এখন প্রশ্ন কোন্ মতবাদটিকে আমরা মানিয়া লইব। আধুনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন উভয়ই ঠিক। আলোক তরঙ্গও বটে, বস্তুকণাসমষ্টিও বটে।

একমাত্র আলোকেরই এই উভয় রূপ দৃষ্ট হয় না। বস্তুকণার এবং তড়িতের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইলেক্ট্রনকেও এইরূপ উভয় রূপবিশিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯২২-২৩ সালে বৈজ্ঞানিক ডি-ব্রগলি 'গণিতের প্যাঁচ' আখ্যায় এই মতবাদ প্রচার করেন। বেল টেলিফোন লেবরেটরীতে যে পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও দেখা যায় কোন স্ফটিকের প্রতি 'ইলেক্ট্রনকে' প্রচণ্ড গতিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা একদিকেই ধাবিত হয় না, পরন্তু তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ 'তরঙ্গবিচ্ছুরণকে' 'ব্রাগ্ রিফ্লেক্সন' (Bragg reflection) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, কারণ ব্রিটীশ পদার্থতত্ত্ববিৎ স্যার উইলিয়ম ব্রাগই সর্ব্বপ্রথম 'এক্সরের' তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করিবার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করেন।

'নিউট্রন' পদার্থকণার সূক্ষ্মতম অংশ, উহারা কোন তড়িৎযুক্ত নহে,—১৯৩২ সালে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ ইহা মানিয়া লইয়াছেন। যাবতীয় পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এবং উহার ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। একমাত্র ওজন ব্যতীত আর কোন বৈশিষ্ট্য এই নিউট্রনের নাই। সুতরাং বস্তুকণা হিসাবেই 'নিউট্রন', বিজ্ঞানসমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুপিন পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে (Pupin Physics Laboratories) এই নিউট্রন লইয়া বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। 'এক্সরে' এবং 'ইলেক্ট্রন' লইয়া পূর্ব্বে যেরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে নিউট্রনকে অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা হইতেও 'ব্রাগ্ রিফ্লেক্সন' বাহির হয়। সুতরাং ইহাতে নিউট্রনেরও যে দুই রূপ তাহাই সূচিত করে। সাধারণ তরঙ্গের যেরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় 'নিউট্রনের' এই তরঙ্গেও তেমনি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং তাহাদের চলার গতিবেগ হইতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্ণয় করা যাইতে পারে। পরীক্ষার ফলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, আলোক এবং পদার্থ উভয়েরই দুই রূপ রহিয়াছে—একটি তরঙ্গরূপ এবং অপরটি কণারূপ। প্রকৃত পক্ষে পদার্থ বা আলোকরশ্মি বা অপর রশ্মিশক্তির মধ্যে (radiant energy) কোন পার্থক্য নাই। আইনষ্টাইন তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত মতবাদে ইহাই বলিয়াছিলেন যে পদার্থ ও শক্তি (energy) একই জিনিষের বিভিন্ন রূপ মাত্র এবং একটি অপরটিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। নিউট্রন সম্পর্কিত এই গবেষণার ফলে আইনষ্টাইনের উল্লিখিত মতবাদ আরও বিশেষভাবে সমর্থিত হইতেছে মাত্র।

কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যপ্রাণ 'ক' প্রস্তুতের চেষ্টা

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের ডাঃ রেনল্ড, সি, ফিউসন (Reynold C. Fuson) এবং ডাঃ রবার্ট এফ, ক্রাইষ্ট (Robert F. Christ) সম্প্রতি এই ঘোষণা করিয়াছেন যে বহু গবেষণার পর তাঁহারা এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম খাদ্যপ্রাণ 'ক' না হইলেও উক্ত খাদ্যপ্রাণের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বাভাবিক খাদ্যপ্রাণ 'ক' গাজর (carrot), পালং (spinach), বিলাতিবেগুন প্রভৃতি স্বভাবজাত শাকসব্জীতে এবং কড্ ও হ্যালিবট মৎস্যের লিভার হইতে প্রাপ্ত তৈলাদিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ের দিক হইতে এরূপ গবেষণার প্রয়োজন না থাকিলেও যদি উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের আবিষ্কৃত রাসায়নিক দ্রব্যটি প্রকৃতই "ক" খাদ্যপ্রাণের কৃত্রিম রূপ হইয়া থাকে, তবে বিজ্ঞানজগতে তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা জানি বিলাতিবেগুন, পালং বা কড্‌লিভার তেল খাইয়া আমরা অনেক ব্যাধির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, অন্ততঃ উহা দ্বারা আমাদের বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব পূর্ণ হয়। সেই রাসায়নিক দ্রব্যটি যে কি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে এরূপ কোন খাদ্যপ্রাণ প্রস্তুত হইলে তাহার ব্যবহারিক মূল্য থাকুক বা না থাকুক, বিজ্ঞান অন্ততঃ খাঁটি জিনিষটির সন্ধানলাভ করিতে পারিবে। অধ্যাপক ফিউসন এবং ক্রাইষ্ট যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা লেমন তৈলের অনুরূপ বিটাসাইক্লোসাইট্রল (Betacyclocitral) নামক একটি রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। অতঃপর উহা হইতে 'ডাইমিথিল-এক্রোলীন' (Dimethylacrolin) নামক এক জটিল পদার্থ প্রস্তুত করেন। উহাতে 'ক' খাদ্যপ্রাণের প্রায় সর্ব্ববিধ গুণ পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবজাত পদার্থসমূহে 'ক' খাদ্যপ্রাণের সন্ধান না করিয়া হয় তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই এই প্রয়োজনীয় ভিটামিনের কৃত্রিম রূপ দেখিতে পাইব। আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট প্রকৃতি এই ভাবেই পরাজিতা হইতেছেন।

কাগজপত্রাদি রাখিবার জন্য অভিনব কাচ নির্ম্মাণ

অনেক মূল্যবান্ দলিলপত্রাদি সূর্য্যালোকে নষ্ট হইয়া যায়। কাগজপত্রাদির লেখাও এই কারণে অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া উঠে। আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগিয়াই দলিলপত্র বা লেখাসমূহের এই অবস্থা ঘটে। যাহাতে এরূপভাবে মূল্যবান কাগজপত্র নষ্ট হইতে না পারে তজ্জন্য অধুনা একপ্রকার কাচ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কাচকে এক কথায় 'দলিলপত্রের কাচ' (document glass) বলিয়া উল্লেখ

করা চলে। এই কাচের মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলট্রাভায়োলেট রশ্মির শতকরা মাত্র তিন ভাগ পরিমাণ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বর্ণচ্ছত্রের অন্যান্য রশ্মিগুলি অনায়াসেই উহার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হয়। কাচকে এই গুণবিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাতে উহা ঈষৎ গোলাপী বর্ণাভা (pink) ধারণ করে মাত্র। উহাতে কাচের মধ্য দিয়া লেখা পড়িতে কোন অসুবিধা হয় না, পরন্তু উহাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হয়। এই কাচ ব্যবহারে অতিশয় ফিকা রঙের কালীর বর্ণও ঠিক থাকে এবং সকল প্রকার কাগজপত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্ত্তমানে নিউইয়র্ক হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক এই নূতন কাচ বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইতেছে। এই কাচ দ্বারা একটি আধার প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সুপ্রাচীন দলিল রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল দলিলপত্রের মধ্যে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাগ্রহণ সম্পর্কিত একটি দলিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধূলি ও ব্যাধি

খনি খনন, কাচ কাটা, টানেল খোদাই, লৌহ ঢালাই, মাটীর কাজ, পাষাণ কর্ত্তন প্রভৃতি কাজে নানারূপ ধূলি উত্থিত হইয়া থাকে। ধূলি বহু প্রকার ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। ধূলিমধ্যস্থ 'সিলিকা'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা 'সিলিকসিস্' নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্যাধির জন্মদাতা। এই প্রস্তরকণা নিঃশ্বাসের সহিত উদ্গিরিত বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মিগণের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তন্তুসদৃশ একপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি করে। ফলে ফুসফুসের অনেকটা অংশ বন্ধ হইয়া গিয়া পরিণামে যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি ঘটায়। অর্দ্ধ আউন্স পরিমিত সিলিকা কণা ফুসফুসে ঢুকিলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে। 'সিলিকসিস্' সম্পর্কে বর্ত্তমানে তাই নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে এবং উপরোক্ত বিভিন্ন কার্য্যনিরত ব্যক্তিগণকে এই রোগের হাত হইতে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণেরও চেষ্টা হইতেছে। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে 'সিলিকার' ধূলিকণা বাদ দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই ব্যাধি প্রশমিত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তন্মধ্যে এরূপ ধূলিকণার উৎপত্তি হওয়ামাত্রই যাহাতে তাহা দ্রুত অপসারিত হয়, তজ্জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বড় বড় কলকারখানায় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের গুরু ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব না হইলেও গৃহশিল্পের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পাগারে ব্যয়বহুল ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভবপর নহে। সম্প্রতি বোষ্টন নগরে মিঃ বাউডিচ (Bowditch) নামক এক ব্যক্তি অল্পব্যয়ে ধূলি-অপসারণের উপায় সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। গত আগষ্ট

মাসে হারভার্ড স্কুল অব পাব্লিক হেল্‌থে 'সিলিকসিস্' সম্পর্কে আলোচনার নিমিত্ত যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে জানা যায় যে এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই পাঁচ লক্ষেরও অধিক কর্ম্মীকে প্রচুর ধূলাবালি উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ শিল্পের আতঙ্কজনক আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিতে হয়। ধূলি-অপসারণের তেমন সুব্যবস্থা না হইলে তাহাদের 'সিলিকসিস্' রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। নৌবিভাগে এবং যাহারা বালুকাপ্রক্ষেপণ কার্য্যে যোগদান করে তাহাদের শতকরা প্রায় ৭৫ জন ব্যক্তিকে 'সিলিকসিস্' রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। যাহাতে 'সিলিকসিস্' রোগ হইতে নৌবিভাগের কর্ম্মিগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকার নৌবিভাগের সেক্‌টি ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়ম পি, ব্রিগস্ ধূলিনিরোধক একপ্রকার শিরস্ত্রাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শিরস্ত্রাণের মুখের অংশটির (face piece) সহিত একটি রবার টিউব এরূপভাবে সংযোজিত আছে যে শিরস্ত্রাণ পরিধান করিলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হয় না, অথচ ধূলিকণা মুখে প্রবেশ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে 'সিলিকসিস্' রোগ যেরূপ দেখা দিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রকোপ হ্রাসের জন্য অবস্থা-বিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই।

গৃহাদির কম্পন পরীক্ষা

রাস্তা দিয়া ট্রামগাড়ী, লরী, বাস্, মোটর, রেলগাড়ী প্রভৃতি যখন জোরে চলিয়া যায়, তখন নিকটবর্ত্তী অনেক বাড়ী কাঁপিয়া উঠে। খুব জোরে ঝড় প্রবাহিত হইলেও অনেক বাড়ীতে মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্প হইলে তো কথাই নাই! তখন সকল ঘরদরজাই কাঁপিতে আরম্ভ করে এবং কম্পনের বেগ প্রবল হইলে অনেক বাড়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূপতিত হয়। জেকব জে, ক্রেস্‌কফ (Jacob. J. Creskoff) নামে একজন আমেরিকান পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ ঘরবাড়ীর কম্পন সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি নানারূপ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের নাড়ির স্পন্দনের মতই গৃহের একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্পন্দনরীতি (pulse rate) রহিয়াছে। বাড়ীর ভিত্তিভূমি, উচ্চতা, তলের সংখ্যা, আয়তন এবং সর্ব্বোপরি যে সকল মালমশলা দ্বারা বাড়ীটি নির্ম্মিত তাহাদের পৃথক্ ও সমষ্টিগত শক্তির উপর এই কম্পনের হার বিশেষভাবে নির্ভর করে। গৃহের সকল প্রকার কম্পন অবশ্য আমরা টের পাই না। যখন কম্পনের ফলে কোন গৃহের সঞ্চালন বা আন্দোলনের পরিমাণ (range of motion) ·০১ ইঞ্চির অধিক হয় এবং কম্পনসংখ্যা প্রতিমিনিটে ৭০০ হয়, কিংবা আন্দোলনের পরিমাণ যখন ·০০৭ ইঞ্চির অধিক এবং কম্পনসংখ্যা প্রতিমিনিটে ১০০০ হয়, কিংবা যখন আন্দোলনের পরিমাণ হয় ·০০৩ ইঞ্চির অধিক এবং কম্পনসংখ্যা হয় প্রতিমিনিটে ৫০০০ হাজার তখনই শুধু আমরা গৃহের কম্পন অনুভব করিতে পারি।

প্রত্যেক গৃহের নিজস্ব বিশেষ কম্পনধারা আছে। যে কারণে গৃহ কম্পিত হইয়া থাকে, ক্রেস্‌কফ তাহার কম্পনের সহিত গৃহের কম্পনসংখ্যা মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উভয়ের কম্পনসংখ্যার মিলন হইলেই উহা বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং কম্পনের প্রথম অবস্থাতেই উভয়ের কম্পনসংখ্যা এক হইতে দেখা যায়। এরূপ সংঘটনসাম্য (synchronism) হইতেই বিপদের উদ্ভব হইয়া থাকে।

গৃহের কম্পন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া উহা প্রশমিত করা সম্পর্কেও ক্রেস্‌কফ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কম্পন একেবারে নিরোধ করা সম্ভবপর না হইলেও তাঁহার অভিমত এই যে, উহা এরূপভাবে হ্রাস করা যাইতে পারে যাহাতে মানুষের স্নায়ু বা নার্ভ কিছুই টের পাইবে না। মনে করুন যদি বাতাস বহিলেই গৃহ কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে গৃহের গঠন সুদৃঢ় করিয়া এরূপ কম্পন নিবারণ করা যাইতে পারে। রাস্তায় গাড়ী বা ট্রাম চলিলে যে সকল গৃহ কম্পিত হইবার সম্ভবনা মাটি হইতে সেইরূপ গৃহ কম্পনরোধক পদার্থ দ্বারা পৃথক (insulate) করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে কম্পনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কম্পন উপস্থিত হইলে ঘরের উত্তরদক্ষিণে, বা পূর্ব্বপশ্চিমে, কিংবা উপরে নীচে কোন্ দিকে কম্পনের তরঙ্গ প্রবাহিত হয় ক্রেস্‌কফ তাহা পরীক্ষা করিবার প্রণালীও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এইপ্রকার বিবিধ গবেষণা হইতে গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভূকম্পসহ গৃহনির্ম্মাণে ক্রেস্‌কফের গবেষণা বিশেষভাবে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

কৃত্রিম উপায়ে মাতৃদুগ্ধ রক্ষার ব্যবস্থা

মাতৃস্তন সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ যে সকল শিশু পূর্ণগর্ভাবস্থা ভোগ না করিয়া সময়ের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করে, মাতৃস্তন ব্যতীত তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা প্রায় অসম্ভব। অনেক মায়ের স্তনে তেমন দুধ হয় না এবং স্তনদুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিতে পারে এরূপ ধাত্রীও সকল সময়ে পাওয়া যায় না। আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে এরূপ সদ্যোজাত শিশুসন্তানের জন্য মাতৃদুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। 'মাতৃভাণ্ডারে' নানা উপায়ে মাতৃদুগ্ধ রক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য অনেক সময় ভাড়া করিয়া ধাত্রী আমদানি করিয়া প্রয়োজন অনুসারে শিশুসন্তানদিগকে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় এরূপ দুগ্ধবতী ধাত্রী পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং মাতৃদুগ্ধ যাহাতে সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে তজ্জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। মাতৃদুগ্ধ শুষ্ক এবং পরে গুঁড়া করিয়া দেখা গিয়াছে উহাতে সুফল পাওয়া যায় না। উহা কৌটায় ভরিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি

নিউইয়র্ক সহরে মাতৃদুগ্ধ জমাট করিয়া রাখিবার এক অভিনব ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে এই উপায়ে দুগ্ধের মৌলিক গুণও বিশেষভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধারণতঃ জল যেরূপ চতুষ্কোণ আকারের ছাঁচে বরফ কল বা রেফ্রিজারেটরের সাহায্যে জমান হয়, মাতৃদুগ্ধও তেমনি প্রথমতঃ জীবাণু শোধিত করিয়া এলুমিনিয়ম নির্ম্মিত ছাঁচের মধ্যে করিয়া বরফ অথবা কঠিনীভূত কার্ব্বন ডায়ক্সাইডের সাহায্যে জমান হইয়া থাকে। জীবাণুশোধিত দুগ্ধ ঐরূপ ছাঁচে ঢালিয়া ছাঁচের মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপর বরফখণ্ড চাপাইয়া দেওয়া হয়। এরূপভাবে পর পর ছাঁচ ও বরফখণ্ড চাপাইয়া দিলে প্রায় দুই মিনিটের মধ্যেই ছাঁচমধ্যস্থ দুগ্ধ জমাট বাঁধিয়া যায়। জমাটবাঁধা দুধ পরে চামচের সাহায্যে তুলিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ ব্যবহারের নিমিত্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত এই জমাটবাঁধা দুধ উষ্ণ করিয়া শিশুদের খাওয়ান চলে। দুধ একপ্রকার মিশ্রিত পদর্থ মাত্র (emulsion)। গোদুগ্ধের তুলনায় মাতৃদুগ্ধ তত স্থিতিশীল (stable) নহে। সুতরাং জমাটবাঁধা দুগ্ধ উষ্ণ করিয়া পান করাইলে তাহা শিশুদের হজম শক্তির পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ অনেক চিকিৎসক সন্দীহান ছিলেন। বোষ্টনের ডাঃ পল, ডব্লিউ, ইমারসন সম্প্রতি চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত পরীক্ষা (clinical test) করিয়া দেখিয়াছেন এইভাবে জমান দুধ মাতৃস্তন হইতে নির্গত দুধের সমগুণবিশিষ্ট। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারস্ কলেজের ডাঃ ওয়ালটার, এইচ, এডিও (Eddy) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দুধ জমাইলে তাহাতে তন্মধ্যস্থিত ভিটামিন-পরিমাণের কোন তারতম্য ঘটে না। এমন কি দুগ্ধমধ্যস্থ প্রোটিন, স্নেহ বা শর্করা-জাতীয় পদার্থেরও কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং কোন মাতা দুগ্ধ দান করিতে অসমর্থ হইলে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত মাতৃদুগ্ধ শিশুদের অনায়াসে পান করাইয়া উহাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞানের সাদৃশ্য

আলোক ও শব্দবিজ্ঞানের মধ্যে একটা সাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রঙীন অলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণ করিয়া এরূপ সামঞ্জস্য আরও বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। নিউটন রচিত সুবিখ্যাত 'অপটিকস্' (Optics) গ্রন্থে তিনিও এইরূপ সামঞ্জস্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কোন শব্দযন্ত্র হইতে উত্থিত বিশেষ কোন শব্দ যেরূপ তরঙ্গাকারে বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের কর্ণে আসিয়া আঘাত করে ও শব্দের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে, তেমনি কোন বস্তু হইতে বিশেষ রকমের কোন আলোক-রশ্মি তরঙ্গাকারে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের ঐ বস্তুর রং সম্পর্কে অনুভূতি আনিয়া দেয়। আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় বর্ত্তমানে এইরূপ সামঞ্জস্য বিশেষভাবে

ধরা পড়িতেছে। শব্দ ও আলোকের অনুভূতি যেভাবে আমরা লাভ করিয়া থাকি, তাহা বিচার করিয়া কেহ কেহ আমাদের কর্ণ ও চক্ষুর আভ্যন্তরীণ গঠনে ও কার্য্যাবলিতে পর্য্যন্ত এক সামঞ্জস্য বিদ্যমান বলিয়া মনে করিতেছেন। আলোকবিজ্ঞানে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের একটা ক্রম (colour-scale) রহিয়াছে, শব্দবিজ্ঞানেও তেমনি একটা ক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা জানি আলোকরশ্মির মধ্যে 'আলট্রাভায়োলেট' প্রভৃতি বিশেষ গুণবিশিষ্ট তরঙ্গরাশ্ম বিদ্যমান। শব্দবিজ্ঞানেও সেরূপ আলট্রা-সাউণ্ড বা শব্দতরঙ্গের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। ডাঃ আলফ্রেড লুমিস্ এবং অধ্যাপক আর, ডব্লিউ, উড্ নামে রাশিয়ার দুই জন বৈজ্ঞানিক এরূপ শব্দতরঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছেন। এই সকল শব্দতরঙ্গ হইতে উত্থিত শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না বটে, কিন্তু অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট আলোকরশ্মির মতই উহাদের নানাপ্রকার গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই শব্দতরঙ্গ নানারূপ বীজাণু ধ্বংস করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত তরল পদার্থ বিশ্লেষণ করিতে ও দুগ্ধ প্রভৃতি বীজাণুমুক্ত করিতে উহাদের অসাধারণ শক্তি দেখা যায়। ভবিষ্যতে এরূপ শব্দতরঙ্গ মানুষের বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। বর্ণচ্ছত্রের প্রধান সাতটি বর্ণের সহিত শব্দযন্ত্রের সপ্তস্বরের বিচিত্র সামঞ্জস্যই বৈজ্ঞানিকগণকে এরূপ গবেষণায় প্রলুব্ধ করে। বৈদ্যুতিক শব্দযন্ত্র প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ গবেষণার ক্ষেত্র আরও বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে উভয় বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

উদ্ভিদাদির ফলনে ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদাদির সাধারণ ফলনে ম্যাঙ্গানিজ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকে এই বৈজ্ঞানিক সত্য ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। উদ্ভিদ্ প্রভৃতির প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য সাধারণতঃ প্রায় সকল জমিতেই উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী ম্যাঙ্গানিজ প্রচুর পরিমাণে থাকে। যেসমস্ত জলাভূমি পুনরুদ্ধার করা (reclaimed) হইয়াছে, বা যে সকল জমিতে ক্যালসিয়ম-কার্ব্বোনেট্ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, সাধারণতঃ সেই জমিগুলিতে ম্যাঙ্গানিজ বিশেষ পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফলে এই সকল জমিতে কোন কোন শস্যের ফলন মোটেই সন্তবপর হয় না। জমিতে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী ম্যাঙ্গানিজের অভাব থাকিলে শস্যে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। ওটস্-এর 'গ্রে-স্পেক' নামক (grey speck) রোগ, লংদ্বীপের পালংশাকের (spinach) ক্লোরোসিস্ (chlorosis), ফ্লোরিডার অন্তর্গত এভারগ্লেডের জমিতে বিলাত্তিবেগুন প্রভৃতির ব্যাধি, জমিমধ্যস্থ মাটিতে এরূপ ম্যাঙ্গানিজের অভাবের দরুণই হইয়া থাকে। জমিতে শস্যের গ্রহণোপযোগী ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ অনেকটা আবহাওয়ার উপরে

নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত কৃষিপ্রণালীর উপরও উহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে শুষ্ক আবহাওয়ায় ঐ সকল ব্যাধির উদ্ভব হয়। জমিতে সাররূপে চুণ ব্যবহারের ফলে মাটি অধিকতর ক্ষারযুক্ত (alkaline) হইলেও এরূপ ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে। জমিতে কি পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ আছে, তাহা বুঝিয়া সেই অনুসারে উপযুক্ত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বালুকাময় ভূমিতে চুণ ছড়াইবার পূর্ব্বে সকল সময়েই জমিস্থ ম্যাঙ্গানিজপরিমাণ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যে সকল উদ্ভিদ্ উপযুক্ত পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ পায় না, তাহাদের শিকড়ে একপ্রকার কীটাণু বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল কীটাণুর বিষের জন্যও অনেক সময় জমিতে ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটে।

ভারতীয় কাষ্ঠ সম্পর্কে গবেষণা

দেরাদুনের বন-গবেষণা পরিষদে বর্ত্তমানে বনজাত নানাবিধ কাষ্ঠসম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি উক্ত পরিষদ হইতে 'বন-গবেষণা ও ভারতীয় শিল্প' নামক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ গবেষণার ফলে ভারতের অনেক শিল্প কিভাবে উপকৃত হইয়াছে এবং রেলওয়ে প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান কিভাবে তাহাদের কাষ্ঠের ব্যয়বাহুল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বাতাস সংস্পর্শে এবং চুল্লীর (kiln) সাহায্যে কাষ্ঠকে আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্ত্তন সহনশীল করিবার নানারূপ প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়াতে সাধারণ কাঠও সিজ্‌ন্ করিয়া ভাল কাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছে। রেলগাড়ী প্রস্তুত করিতে বার বৎসর পূর্ব্বেও বহু মূল্যবান্ কাঠ ব্যবহার করা হইত। কাষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের (wood technologist) গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের কাঠও সিজ্‌ন্ করিলে ঐরূপ মূল্যবান্ কাঠের ন্যায় স্থায়ী হইয়া থাকে। দেরাদুন গবেষণাগারে কাঠ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিয়া যে আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যে সমস্ত কাঠ সহজে নষ্ট হইয়া যায়, 'এস্‌কু' (Ascu) নামক একপ্রকার এন্টিসেপ্টিক বা বীজাণুশোধক ঔষধের সাহায্যে তাহাও সেগুণ ও শাল কাঠের ন্যায় শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এই নবাবিষ্কৃত কাষ্ঠসংরক্ষকের গুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি উহার গুণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন, এবং রেলওয়ের 'স্লিপার'সমূহ এই সংরক্ষক পদার্থ দ্বারা শোধন করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করেন। বর্ত্তমানে এই সংরক্ষক দ্রব্য অনেক প্রদেশের টেলিফোন লাইনের খুঁটি ও হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক বিভাগের কাষ্ঠ প্রভৃতি সংরক্ষণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 'এস্‌কু' আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে দালানের কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে পর্য্যন্ত ভারতীয় কাষ্ঠ ইস্পাত, লোহ ও কংক্রিটের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং কাষ্ঠের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইতেছে। বনবিভাগের কাঠ সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণার ফলে

লাল পিপীলিকা বা অন্যান্য কীটাণু প্রভৃতি যেভাবে কাঠ নষ্ট করে তাহাও রোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন কাঠের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় কাষ্ঠ অনেক বিদেশী কাষ্ঠ অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহে। খেলার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে, যন্ত্রাদির হাতল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বর্ত্তমানে অনেক বিদেশী কাঠ এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। দেরাদুন বনবিভাগের গবেষণাগারে পরিচালিত পরীক্ষাকার্য্যের ফলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাষ্ঠসংরক্ষণ ও শোধন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতীয় কাঠের দ্বারা অনায়াসে ঐসকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। ভারতীয় কাষ্ঠ সম্পর্কে এরূপ গবেষণা দেশের শিল্পবাণিজ্যের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় শস্যের উন্নতিবিধান

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কৃষিগবেষণা পরিষদের কর্ম্মিগণ অধ্যাপক বি, এল, সিংহের পরিচালনাধীনে ভারতীয় শস্যের প্রাণতত্ত্ব (Physiology) সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণায় শস্য সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আলো, তাপ এবং কার্ব্বনডায়অক্সাইড্ সরবরাহের ব্যবস্থার তারতম্যের ফলে শস্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত হয়, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত আলোকসংশ্লেষণ বা 'ফোটোসিন্থেসিস্' পরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শস্যাদি সম্পর্কে এরূপ পরীক্ষা ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার হইলেও ট্রপিকাল বা গ্রীষ্মমণ্ডলে এরূপ ধরণের পরীক্ষা পূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলেও এই পরীক্ষা অনেক মূল্যবান্ রহস্যোদ্‌ঘাটনে সহায়তা করিতেছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে যে সকল শস্য জন্মায় তাহাদেরই গ্রীষ্মমণ্ডলে অধিক আলোর প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল শস্য যত অধিক কাল স্থায়ী হয়, তদনুসারে তাহাদের শ্বাসক্রিয়ার হার (respiration rate) অধিক হইতে দেখা যায়। যে সকল উদ্ভিদ্ অধিক কাল স্থায়ী হয় না, সাধারণতঃ তাহাদের শ্বাসের হার কম এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই হার বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদ্ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাদের শ্বাসের হারও যেরূপ অধিক, তেমনি সেই হার বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকে। শস্যবীজের গঠন ও রাসায়নিক অবস্থাবিশেষে আবার বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন পরিমাণ জলের প্রয়োজন। কৃষির উন্নতিবিধানে এরূপ গবেষণা বিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়াই মনে হয়।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

রসায়ন:—বার্লিনস্থ কাইজার উইল্‌হেল্‌ম ইন্‌ষ্টিটিউটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক পল ডেবেয়া (Prof. Paul Debye) এই বৎসর রসায়নশাস্ত্রে নোবেল

পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ডেবেয়া জাতিতে ওলন্দাজ হইলেও বহু দিন হইতে জার্ম্মানীতেই বসবাস করিতেছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ত্তবিত্তাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত মিউনিকে আসেন। এই সময় বৈজ্ঞানিক সোমারফেল্ডের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রভাবে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অধ্যাপক ডেবেয়া ইতঃপূর্ব্বে গটিংগেন, জুরিখ, লাইপজিক প্রভৃতি স্থানেও অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়াছেন। রসায়নশাস্ত্রে পুরস্কারলাভ করিলেও, ডেবেয়া পদার্থবিজ্ঞানেই অধিকতর গবেষণা পরিচালনা করিয়াছেন। পদার্থের গঠন সম্পর্কে এবং পদার্থ ও শক্তির সংঘাত (interaction) সম্পর্কে অনেক দুরূহ তথ্য তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু পুঁথিগতভাবে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াই ডেবেয়া নিরস্ত হন নাই, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অনেক নূতন নূতন পন্থাও তিনি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক ল্যাঞ্জেভিন (Prof. Langevin) তাই তাঁহাকে একবার 'Physicien Complet' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডেবেয়া কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির মধ্যে পদার্থের বিশিষ্ট তাপ (specific heat) সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ কঠিন পদার্থ শীতলতালাভ করিতে করিতে যখন চরম তাপাঙ্কে (absolute zero) আসিয়া পৌছায়, দেখা গিয়াছে তখন তাহাদের বিশিষ্ট তাপে বৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৯১৩ সালে ডেবেয়া এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, কঠিন পদার্থে তাপশক্তি একপ্রকার শব্দতরঙ্গের (acoustic waves) আকারে বিরাজ করে। তাঁহার মতবাদ এত বৎসরেও কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং স্বচ্ছ কঠিন পদার্থে আলোকবিচ্ছুরণ (scattering) প্রভৃতি অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে উহা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ডেবেয়া কতকগুলি পদার্থের di-electric constant-এর তাপবৈষম্যের বিষয়েও অনেক তথ্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তরল অবস্থায় পদার্থসমূহের অণু কি ভাবে বিরাজ করে সে সম্পর্কেও অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। ডেবেয়ার আরেকটি গবেষণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অণু ও পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ডেবেয়া আলোক ও 'এক্সরে'র সাহায্যে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অনেক স্ফটিকগঠন চূর্ণ পদার্থ দ্বারা এক্সরে বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। ডেবেয়া এ সম্পর্কে সবিশেষ পরীক্ষা করেন এবং স্ফটিকের গঠন নির্দ্ধারণ বিষয়ে সেরারের (Scherrer) সহযোগিতায় এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানে উহা 'সেরার-ডেবেয়া' প্রণালী বলিয়া পরিচিত। হাল্কা পরমাণু দ্বারা বিকীর্ণ এক্সরে কি কারণে নিস্তেজ (softening) হয়, ডেবেয়া ও সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কম্পটন প্রায় একই সময়ে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। কম্পটন ঐ বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সেই হিসাবে বিচার করিলেও ডেবেয়া পুরস্কার লাভের যোগ্যতা পূর্ব্বেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের উপরোক্ত নানারূপ মৌলিক গবেষণা ব্যতীত অধ্যাপক

পল ডেবেয়া রসায়নশাস্ত্রের কোন কোন তথ্যনির্ণয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হন এবং স্বীয় প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ এই বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তড়িৎপ্রবাহবহনক্ষম কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইলে তাহার বিভিন্ন তড়িৎযুক্ত অণুসমষ্টি অর্থাৎ 'আয়ন'গুলি কি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়, এ সম্পর্কে ডেবেয়া অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইতঃপূর্ব্বে এ সম্পর্কে কিছু কিছু পরীক্ষা কার্য্য করিয়াছিলেন। অধিকতর দ্রবীভূত অবস্থায় কোন্ তড়িৎবাহী পদার্থ কিরূপ গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা পরিমাপ করিবার জন্য পল ডেবেয়া এক মতবাদ প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত বস্তুর গঠন সম্পর্কেও তিনি নানাবিধ গবেষণা করেন। আমরা সকলেই জানি যে প্রত্যেক পরমাণুকে কেন্দ্র করিয়া একটি নিউক্লিয়স্ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিউক্লিয়সের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ইলেকট্রনসমূহ বিরাজ করিতেছে। যখন কোন পদার্থের উপর চাপ দিয়া তাহার আয়তন হ্রাস করিতে চেষ্টা করা হয়, তখনই অণুমধ্যস্থ এই নিউক্লিয়স ও ইলেকট্রনের বিকর্ষণের ফলে তাহাতে বাধা জন্মে। অতিরিক্ত চাপ প্রদান করিলে ইলেকট্রনের এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং অবশেষে সমস্ত পদার্থটি 'নিউক্লিয়সে' সমষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়া ক্ষুদ্র আয়তন ধারণ করে। শুধু তাহাই নহে, 'নিউক্লিয়স'ও ভাঙ্গিয়া গিয়া আরও আশ্চর্য্যজনক ঘটনার সৃষ্টি করে। এইভাবে যে বস্তুকণার সৃষ্টি হয় তাহার নাম 'নিউট্রন'। ১৯৩২ সালে চ্যাড্উইক কর্ত্তৃক নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। 'নিউট্রন' অতি ক্ষুদ্রাকার। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন সকল নিউক্লিয়সের গঠনের মূলে 'নিউট্রন' রহিয়াছে। নিউট্রনও আবার বস্তুকণার শেষ অবস্থা নহে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন যে, নিউট্রন আপনা হইতেই একটিমাত্র ইলেকট্রন বিসর্জ্জন দিয়া 'প্রোটনে' পরিণত হয়। 'নিউট্রন' এবং 'প্রোটনের' মধ্যে আবার এক বিশেষ আকর্ষণ বিদ্যমান। আকাশে একপ্রকার নীহারিকাগুচ্ছ দেখা যায় যাহা 'শ্বেত বামন' (white dwarf) নামে পরিচিত। যে বস্তুকণা দ্বারা উহারা গঠিত তাহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার পদার্থ প্লাটিনাম হইতেও অনেক হাজার গুণ ভারী। পরীক্ষায় মনে হয় উহার অধিকাংশই নিউট্রন ও প্রোটনের সংমিশ্রণ মাত্র। ডেবেয়া এক অভিনব পরীক্ষার দ্বারা যন্ত্রসাহায্যে নিউট্রন ও প্রোটনের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া শ্বেত বামনের মত বস্তুবিশেষের উৎপত্তি করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই বিজ্ঞানবিৎ নানারূপ গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্যের দ্বারা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। অধ্যাপক ডেবেয়া ইউরোপীয় অনেক ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া নোবেল কমিটি একজন যথার্থ যোগ্যব্যক্তির প্রতিভার সম্মান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

পদার্থবিজ্ঞান:—পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার এইবার দুই জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে প্রদান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন অষ্ট্রিয়ার ডাঃ ভিক্টর হেস এবং

অপরঞ্জন প্যাসেডিনার 'নরম্যান ব্রিজ লেবরেটরী'র কর্মী এবং সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিলিকানের একজন তরুণ শিষ্য ডাঃ কার্ল এণ্ডারসন। ডাঃ হেস্ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতির যে রহস্যের সন্ধান দিয়াছিলেন এবং যাহা আধুনিক যুগে বিশ্বরশ্মি বা 'কস্‌মিক্ রে' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ তিনি এত দিনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিলেন। ডাঃ এণ্ডারসন 'পজিট্রনের' আবিষ্কর্ত্তারূপে এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

বিশ্বরশ্মির আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯০৩ সাল হইতে কয়েক জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎযুক্ত কণা অল্পাধিক পরিমাণ দেখিতে পান (ionised)। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর এই তড়িৎবাহী গুণের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। রাদারফোর্ড, কুক, মেকলেনান প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ অল্পপরিমাণ বায়ু কোন পাত্রে আবদ্ধ করিয়া এবং যাহাদের প্রভাবে বায়ুতে এরূপ তড়িৎকণা বা 'আয়নের' উদ্ভব হইতে পারে সেই সকল শক্তি প্রতিরোধ করিয়াও দেখিতে পান যে, পাত্রমধ্যস্থ বায়ু তড়িৎবাহী হইয়া উঠে। কেহ কেহ মনে করেন পাত্রমধ্যস্থ বাতাসে কোন রেডিওএকটিভ্ বা স্বতঃকিরণবিসারী দ্রব্য থাকিয়া গিয়া বায়ুকে এরূপ তড়িৎবাহী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু স্বতঃকিরণবিসারী কোন দ্রব্য যাহাতে কোনওরূপে বায়ুমধ্যে না থাকিতে পারে, তজ্জন্য অবিমিশ্র বায়ু লইয়া পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে, এক অদৃশ্য প্রভাবে বায়ু তড়িৎকণাযুক্ত হইয়া উঠে। বায়ুমণ্ডল বা ভূমি হইতে বিকীর্ণ অতি শক্তিশালী কোন রশ্মি আসিয়া পাত্রমধ্যস্থ বায়ুর এইরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে পারে কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিলেও, ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে বায়ুর উচ্চস্তরে সমতাপমণ্ডলে ঐ বায়ুপূর্ণ পাত্র লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সর্ব্বত্রই বায়ু ঐরূপ তড়িৎকণাযুক্ত হয়। পাত্রটিকে যতই উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়া যায়, পাত্রমধ্যস্থ বায়ুতে ততই অধিক পরিমাণ তড়িৎকণা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ভূমি বা বায়ুমণ্ডল হইতে কোনও স্বতঃকিরণবিসারী দ্রব্য যে এ অবস্থা ঘটায় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইলে বাতাসের এরূপ তড়িৎকণাযুক্ত হওয়ার কারণ কি হইতে পারে? ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে বৈজ্ঞানিক হেস বেলুনের সাহায্যে নানাবিধ গবেষণা পরিচালনা করেন এবং সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, কাচপাত্রে আবদ্ধ বায়ুর তড়িৎকণা বা 'আয়নে' পরিণত হওয়ার মূলে আছে অতি দূরদিগন্ত হইতে (space) সমাগত এক অজ্ঞাত ও রহস্যজনক 'রশ্মির' প্রভাব। হেস ইহাকে Ultara Strahelm অথবা 'আলট্রা' রশ্মি বলিয়া প্রথমতঃ উল্লেখ করেন। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বায়ুস্তরে, ষ্ট্রাটোস্ফিয়র বা সমতাপমণ্ডলে এই সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে মিলিকান এই অজ্ঞাত রহস্যজনক রশ্মির নাম দেন 'কস্‌মিক্ রে'

বা বিশ্ব রশ্মি (নিখিল বিশ্বের অজ্ঞাত লোক হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া আমরা ইহার নাম দিলাম 'বিশ্ব রশ্মি'), কারণ দূরদূরান্তের কস্‌মস্ হইতেই এরূপ রশ্মি নিসৃত হইয়া থাকে। মিলিকান কর্ত্তৃক এই নামকরণ হওয়াতে অনেকে মিলিকানকেই এই রশ্মির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হেস এইবার এবিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করায় বহু দিনকার ভুল ধারণা সাধারণ লোকের মন হইতে বিদূরিত হইবে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক হেস এই অপূর্ব্ব রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বেলুনে ব্যোমপর্য্যটন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে, বিশ্বের দরবারে তাঁহার অনুষ্ঠিত গবেষণা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

'পজিট্রনের' আবিষ্কর্ত্তা কার্ল এণ্ডারসন অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক। ১৯০১ সালে কোন চুম্বকক্ষেত্র মধ্যস্থিত বিশ্ব রশ্মির ফটো গ্রহণ করিতে যাইয়া তিনি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের সন্ধান লাভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে প্যারিতে নোবেল-লরিয়েট আইরিন ক্যুরি ও তাঁহার স্বামী জোলিও এবং কেম্ব্রিজে ব্ল্যাকেট নামক একজন বৈজ্ঞানিক এতৎসম্পর্কে গবেষণা করিতে করিতে এরূপ ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইলেকট্রনসমূহ ঋণাত্মক। ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন থাকিতে পারে কিনা এই সন্দেহে তাঁহারা তখন তাঁহাদের গবেষণার ফল জনসমাজে প্রচার করেন নাই। তবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিরাক তাঁহার "গহ্বর মতবাদে" (Hole theory) এরূপ ধনাত্মক ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কার্ল এণ্ডারসন তাঁহার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ডিরাকের এই অভিমত দ্বারাও বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া একান্ত নিঃসন্দেহ হইয়াই ডাঃ কার্ল এণ্ডারসন তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থ হইতেও অধুনা কৃত্রিম উপায়ে 'পজিট্রন' লাভ করা গিয়াছে। গামা রশ্মির বস্তুপরিমাণের (quantum) ভগ্নাবস্থা হইতেও ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত পজিট্রন পাওয়া যায়। গত বৎসরের নোবেল-লরিয়েট জোলিও-দম্পতি যাহা আবিষ্কার করিয়াও সন্দেহের বশে প্রকাশ করেন নাই, তাহাই কার্ল এণ্ডারসনের আত্মবিশ্বাসে অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা ডাঃ ভিক্টর হেস ও ডাঃ কার্ল এণ্ডারসনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ঃ—চিকিৎসাবিজ্ঞানে কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত এইবার স্যার হেনরী ডেইল এবং অধ্যাপক অটো লোয়িকে (Prof; Otto Loewi) নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। যুব কম ব্যক্তিই আধুনিক যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্যার হেনরী ডেইলের ন্যায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ওয়েলকাম ফিজিয়োলজিক্যাল রিসার্চ্চ লেবরেটরী বা প্রাণতত্ত্ব গবেষণাগারে তাঁহার

কর্তৃত্বাধীনে অনেক গবেষণা পরিচালিত হয় এবং অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার পরিচালনাধীনে শুধু গ্রেট ব্রিটেনেই নহে, পরন্তু পৃথিবীর মধ্যে এতদ্বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের গবেষণার স্যার হেনরী ডেইলের কার্য্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রয়েল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এবং জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের ও অন্যান্য কমিটির সদস্যরূপে তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ছোটখাট বহু গবেষণাও বহু ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিস্তৃতিসাধন করিয়াছে।

অধ্যাপক অটো লোয়ির গবেষণা অল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাঁহার আবিষ্কৃত আপাত-অসমঞ্জস অনেক তথ্যই পরে গভীর সত্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গবেষণার ফলে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

যে গবেষণার নিমিত্ত উপরোক্ত বিজ্ঞানবিদ্দ্বয় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। নার্ভের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কিভাবে তাহা সঞ্চালিত হয় এ সম্পর্কে উভয়েই মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন। সহানুভৌতিক নার্ভসমূহ উত্তেজিত করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, এড্রিনেলিন ব্যবহারেও সেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে; মাস্কেরিন (muscarine) এবং অপরাপর ঔষধ ব্যবহারেও তেমনি 'ভেগাস্' নামক নার্ভ উত্তেজিত করার মতই ফল পাওয়া যায়। সুতরাং সহানুভৌতিক নার্ভসমূহের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এড্রিনেলিনের উৎপত্তি হওয়া যেমন সম্ভবপর, 'ভেগাস্' নার্ভের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা হইতে মাস্কেরিন প্রভৃতি দ্রব্যেরও উদ্ভব তেমনি সম্ভবপর। ডেইল এ সম্পর্কে সবিশেষ গবেষণা করিয়া দেখিতে পান, 'আরগট' (Ergot) নামক একপ্রকার গোধূম বীজ হইতে মাস্কেরিনের ন্যায় একপ্রকার অস্থায়ী পদার্থের উৎপত্তি ঘটে। শরীরের উপর ভেগাস্ নার্ভের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পান, উহাতে শুধু মাস্কেরিনের প্রতিক্রিয়াই হয় না, পরন্তু নিকোটিনের প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়। ১৯২১ সালে অধ্যাপক লোয়ির গবেষণায় প্রকাশ পায় যে নার্ভের চাঞ্চল্য হইতে শক্তিশালী পদার্থের উৎপত্তি ঘটে। কোন কোন অবস্থায় বেঙের 'ভেগাস্' ও অন্যান্য নার্ভের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দুইটি পদার্থ সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। এই দুইটি পদার্থ এসিটিলকলিন এবং এড্রিনেলিন বলিয়াই ধারণা হয়। আধুনিক গবেষণায় ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষিতও হইয়াছে। যদিও এ সম্পর্কে অনেকেই নানারূপ পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তথাপি স্যার হেনরী ডেইল এবং অধ্যাপক অটো লোয়ির অনুষ্ঠিত পরীক্ষাকার্য্যের ফলেই ইহা প্রথমতঃ প্রকাশ পায় যে স্নায়ুপায়ী প্রাণিগণের নার্ভের চাঞ্চল্যকর প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ

স্থলেই এসিটিলকলিন এবং এড্রিনেলিনের উৎপত্তির ফলে হইয়া থাকে। নোবেল কমিটি তাই ইহাদের দুই জনকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণের পুনঃ প্রচেষ্টা

তিব্বত সরকার অনুমতি দিলে ১৯১৮ সালে আবার একবার এক দল ইংরাজ অভিযাত্রী হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করিতে আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সহযোগিতায় আল্পাইন ক্লাব এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত ইতোমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অভিযান হইতে বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা গিয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই ভবিষ্যতের এই অভিযাত্রী দল কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন। দলে অধিক সংখ্যক লোক থাকিলে দেখা গিয়াছে পর্ব্বতারোহণে স্থানপরিবর্ত্তনের কালে অনেক সময় নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই প্রস্তাব করা হইতেছে যে আগামী অভিযাত্রীদলে ছয় জনের অধিক সদস্য লওয়া হইবে না। গত বারের অভিযাত্রী দল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন আরও মাসখানেক পূর্ব্বে কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা সফলকাম হইতে পারিতেন। তজ্জন্য এভারেষ্ট কমিটি মনে করেন গত বারের অপেক্ষা আরও পূর্ব্বে এইবার আরোহণ কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন হইবে। এভারেষ্ট আরোহণের সঙ্কল্প অভিযাত্রী দলকে একপ্রভাবে অভিভূত করিয়াছে যে, অনেকের বিশ্বাস এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণে পশ্চাৎপদ হওয়া বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির নিকট পরাজয় স্বীকারের নামান্তর মাত্র। বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান আধুনিক যুগের মানুষ এরূপ পরাজয় মানিয়া লইতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক। তাই বার বার ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও সে তাহার উদ্দেশ্যসাধনে বিচলিত হইতেছে না। এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,০০০ ফুট। এপর্য্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে যত দূর উচ্চে পৌঁছানো সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২১ সালের সর্ব্বাগ্রগামী দল	...	২৩,০০০ ফুট
১৯২২ সাল	...	২৭,৩০০ ফুট
১৯২৪ ,,	...	২৮,০০০ ,,
১৯৩৩ ,,	...	২৮,০০০ ,,
১৯৩৬ ,,	...	২৩,০০০ ,,

এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে মানবের এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মতিথি

গত ৩০ শে নভেম্বর তারিখে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে। আমরা এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বর্ষীয়ান্ বৈজ্ঞানিকের অষ্টসপ্ততি জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। তিনি জড়বিজ্ঞানে ও বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্বশাস্ত্রে যে অনন্যসাধারণ তথ্যাবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদর অর্জ্জন করিয়াছে। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তিনি অনেক সম্মানলাভ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের যশঃ সম্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা, বহু অভিনব আবিষ্কার, উন্নত হৃদয় এবং দৃঢ় চরিত্র তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে উহা চিরকাল পীঠস্থানরূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রথিতযশঃ বৈজ্ঞানিক আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করুন আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

সংবাদ চয়ন

নূতন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ

মহামান্য অষ্টম এডোয়ার্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করাতে তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর ডিউক অব ইয়র্ক 'ষষ্ঠ জর্জ্জ' উপাধি ধারণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের যে সঙ্কট মুহূর্ত্তে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমরা আমাদের নূতন সম্রাটকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী রাণী এলিজাবেথসহ তিনি দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ভগবান্ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দীর্ঘজীবী করুন!

এসিয়াটিক সোসাইটির নূতন নামকরণ

মহামান্য ভারত সম্রাট 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্ব্বে 'রয়াল' শব্দটি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে এই সোসাইটি 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইবে।

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান

ভারত গবর্ণমেণ্টের সার্ভে বিভাগের গ্র্যাভিটি অফিসার (Gravity Officer) ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি

অনুমান করেন যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আবার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইলে তাহার উৎপত্তিস্থল গারো পর্ব্বতেই হইবে। ফলে গারো পর্ব্বত অঞ্চলের তুরা ও তৎসন্নিহিত স্থান সেই ভূমিকম্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। তৎপরবর্ত্তী ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান পেশোয়ারে হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়াও উক্ত কর্ম্মচারী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী তদন্তের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে শিক্ষার ধারা প্রচলিত আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার উদ্ভব হইতে দেখিয়া এই শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন-সাধন করা কর্ত্তব্য তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে দুই জন বিশেষজ্ঞ এদেশে আনয়ন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লণ্ডন বোর্ড অব এডুকেশনের শিল্পবিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক মিঃ এ, এবট এবং লণ্ডনের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অব ইনটেলিজেন্স মিঃ এস, এইচ, উড শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া পরামর্শ দিবার জন্য বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতে আসিয়াছেন।

অধ্যাপক ভাটনাগরের মহানুভবতা

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এস, এস, ভাটনাগর পেট্রোলিয়ম সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান গবেষণা করেন। তাঁহার গবেষণায় সন্তুষ্ট হইয়া ষ্টীল ব্রাদার্স কোম্পানী ও আটক অয়েল মিল পেট্রোলিয়ম সম্পর্কে আরও গবেষণাকার্য্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক অর্থ দান করেন। অধ্যাপক ভাটনাগর ঐ টাকা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়ম গবেষণা বিভাগে কয়েকটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ চারি লক্ষ টাকা হইবে। দেশের শিল্পোন্নতি সাধনের নিমিত্ত অধ্যাপক ভাটনাগরের এই দৃষ্টান্ত যেরূপ অনুকরণযোগ্য, শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য গবেষণাকার্য্যে ষ্টীল ব্রাদার্স কোম্পানীর এরূপ দান এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থাও তেমনই প্রশংসনীয়। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনোদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব শিল্পের উন্নতির জন্য গবেষণায় এরূপ অর্থব্যয় করিতে সম্মত হইলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার জুবিলি উৎসবের ব্যবস্থা

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম-পূর্ণ হওয়ার দরুণ আগামী ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বিজ্ঞান মহাসভার যে রজত জুবিলি উৎসব

অনুষ্ঠিত হইবে তাহার উদ্যোগ আয়োজনের নিমিত্ত কলিকাতায় একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বি, এম, সেন যুগ্মসম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড নাফিল্ডের দান

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিমিত্ত পাশ্চাত্য দেশের ধনবান্ ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায়ই প্রচুর দান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে এইরূপ একজন মহাহুভব ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার জন্য বিশ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এই দানশীল ব্যক্তির নাম লর্ড নাফিল্ড। প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে তাঁহার নামে পরিচালিত নাফিল্ড ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চে যে গবেষণা পরিচালিত হইবে, তদ্দ্বারা বিজ্ঞানানুশীলনের পথ বিশেষ-ভাবে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। দুর্গত জনগণের সাহায্যেও লর্ড নাফিল্ড বিশ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দেশের সেবায় এইরূপ দানে অর্থের চরম সার্থকতা ঘোষণা করে।

খনিদুর্ঘটনার তদন্ত

ভারতীয় কয়লা খনিতে উপর্য্যুপরি যে কয়েকটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহাতে দেশবাসী ভারতীয় কয়লাশিল্প সম্পর্কে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিভাবে এরূপ দুর্ঘটনা নিবারণ করা যাইতে পারে এবং কয়লার অপচয় নিবারণ করিয়া ভারতের এই সম্পদরক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে তদন্ত করিয়া পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার কয়েক জন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এল, বি, বারোজের সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। বাংলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়লাখনিসমূহ পরিদর্শন করিয়া এই কমিটি তাঁহাদের মন্তব্য সহ আগামী বৎসর রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি আবার পইদী কয়লাখনিতে ভীষণ এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহাতে প্রায় ২০৮ জন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে কয়লাখনিসমূহে দুর্ঘটনানিবারক ব্যবস্থাগুলি বিশেষ কঠোরতার সহিত অবলম্বিত হয়, সত্বর তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির তথা ভারত সরকারের দৃষ্টি আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে আচার্য্য রায়ের প্রস্তাব

আচার্য্য স্যার পি, সি, রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি তিনি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উক্ত কোম্পানী হইতে বার্ষিক ১৫০০০৲ টাকা বিবিধ গবেষণা কার্য্যের নিমিত্ত—বিশেষতঃ ঔষধপত্রাদি সম্পর্কে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতার অন্যান্য চিকিৎপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইবে। গবেষণাকার্য্যের সৌকর্য্যবিধানার্থ পাশ্চাত্য দেশে অনেক ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান এরূপ অর্থদান করিয়া গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমাদের দেশেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞানের সেবায় এরূপ অর্থদান করিলে ভবিষ্যতে ঐসব গবেষণার ফলে তাহারাও অধিকতর লাভবান হইতে পারে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে আদর্শ লইয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইলে অতিশয় সুখের হইবে।

টাটা কোম্পানীর ইস্পাত গবেষণাগার

লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার নিমিত্ত টাটা কোম্পানীর জামসেদপুরস্থ লৌহ কারখানার সংলগ্ন ভূমিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি গবেষণাগার প্রস্তুত হইতেছে। যেভাবে এই গবেষণাগার প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতে উহা পৃথিবীর মধ্যে এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার বলিয়া গণ্য হইবে। অন্যান্য দেশে বিবিধ শিল্পসম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারেই নানারূপ গবেষণা হইয়া থাকে। এদেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকেই এতৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। লৌহ শিল্পের বিরাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে টাটা কোম্পানী ইতোমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া টাটা কোম্পানী শিল্পজগতে এক নূতন পথপ্রদর্শন করিতেছে সন্দেহ নাই। এরূপ গবেষণার ফলে এদেশে লৌহশিল্প বিশেষ উপকৃত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

কৃষিগবেষণা কলেজের দিল্লীতে স্থানান্তর

মহামতি হেনরী ফিপ্‌সের (Henry Phipps) বদান্যতায় পুসাতে যে কৃষিগবেষণা কলেজ স্থাপিত হয়, সম্প্রতি তাহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কৃষিগবেষণাগারে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহার ফল যাহাতে দেশের জনসাধারণ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য কৃষিকমিশন পুসার কৃষিগবেষণাগার দেশের কোন কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের ফলে পুসা কৃষি কলেজের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইলে ঐস্থানেই উহার সংস্কার কার্য্য না করিয়া গবেষণাগারটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব

গৃহীত হয়। তদনুসারে পুসার কৃষিগবেষণাগার দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এরূপ স্থানান্তরের ফলে কৃষিগবেষণার কার্য্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইলে আমরা সুখী হইব।

ভেজাল ঔষধ নিয়ন্ত্রণ

নানাবিধ ভেজাল ঔষধে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাই অনেক সময় দেখা যায় ঔষধের যেরূপ গুণ থাকা উচিত তাহা রক্ষিত হয় না। এ সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের পরামর্শক্রমে ভারত সরকার লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল চোপরার অধিনায়কত্বে ঐরূপ ভেজাল ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল হইয়াছে। ভেজাল ও যথার্থ দ্রব্যগুণবিহীন নিকৃষ্ট ঔষধের প্রচলন যাহাতে বন্ধ হয়, তজ্জন্য ভারত সরকার ইতোমধ্যেই একটি 'বায়োকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডারডাইজেসন লেবরেটরী' স্থাপন করিতেছেন। এই লেবরেটরী 'অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাব্লিক হেল্‌থ'ভবনে অবস্থিত থাকিবে এবং কর্ণেল চোপরার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইবে। বিভিন্ন ঔষধ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া যে মাপকাঠি বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ভেজাল ঔষধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পরলোকে কৃষ্ণকুমার মিত্র

বিগত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন কৃতী সুসন্তানের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। আধুনিক বাংলার সংগঠনে নির্ভীক, তেজস্বী, আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ কৃষ্ণকুমারের দান তাঁহার দেশবাসী অনেক দিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ রাখিবে সন্দেহ নাই। আমরা এই পরলোকগত কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছি।

পুস্তক সমালোচনা

আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ ঃ— কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি মহাশয় সঙ্কলিত আয়ুর্ব্বেদের সার তথ্য সম্বলিত অতীব কালোপযোগী গ্রন্থ। ইহাতে খুব সংক্ষেপে ও সহজবোধ্যভাবে চরক, সুশ্রুত, বাগভ্‌ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের মূল স্বাস্থ্যরক্ষার (নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার নহে, স্বাস্থ্যকে স্বীয় যত্ন দ্বারা নষ্ট হইতে না দেওয়ার) নীতিসমূহ অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদানুরাগী মাত্রেই প্রাচীন যুগের যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-পদ্ধতির আভাস পাইয়া আনন্দ ও গৌরব বোধ করিবেন। জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে বিদ্বজ্জন সম্মিলন আহ্বান করিয়া বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা পরস্পরের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান রূপ বিধিব্যবস্থা একমাত্র আধুনিক পদ্ধতি বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু চরকের সূত্রস্থানের (৫।৬।৭)—"বিঘ্ন ভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাং…………পুরস্কৃত্য মহর্ষয়। সমেতা পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে। অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কশ্যপো ভৃগুঃ। আত্রেয়ো গৌতম…………তত্র সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাং॥ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং…………কঃ স্যাত্তেষাং সমোপায়" প্রভৃতি শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে তখকার দিনেও প্রাচীন ঋষিগণ কিভাবে সম্মিলন আহ্বান করিতেন। কেবল সাধারণ পাঠক কেন, অতি অভিনিবেশ সহকারে দীর্ঘকাল আলোচনায় অসমর্থ চিকিৎসকগণও গ্রন্থমধ্যে ধাতুপ্রকৃতি ও তাহার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা বা তাহার প্রতিকারোপায়, ঋতুচর্য্যা, আবহাওয়া অনুসারে বস্ত্রাদির ব্যবহার, পথ্যাদির বিচার ও সেবন প্রভৃতি দৈনন্দিন পালনীয় বিষয়সমূহের আলোচনা, দন্তধাবনে দাঁতনরূপে কি কি ব্যবহার সমর্থিত, কি কি এবং কাহার পক্ষে কোন্ দাঁতন নিষিদ্ধ, দন্ত দৃঢ় রাখিবার সহজসাধ্য উপায়, দুর্ব্বল দন্তের প্রতিকার, তৈল গণ্ডূষ ধারণ এবং কেন ও কখন কি ভাবে ধারণ করিলে অসুবিধায় না পড়িয়াও তাহা সুসম্পন্ন করা যায়, চোখ ভাল রাখিবার উপায়, কি কি চোখের দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে, কি কি জিনিষের অতিসান্নিধ্য ও অতিমাত্রায় সেবন দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত করে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাসম্পাদক আচারব্যবহার প্রভৃতি, মলমূত্রাদির বেগধারণ জন্য অনিয়মিত কোষ্ঠ এবং তাহার ফলে শিরঃপীড়া, উদরাময়, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ, রজঃরোধ জন্য স্ত্রীলোকের রজঃকৃচ্ছ্রতা, শিরঃপীড়া, চক্ষুর জ্যোতির্হীনতা, শারীরিক সৌষ্ঠবহানি ও মুখশ্রীর অকালবার্দ্ধক্য, উৎসাহহীনতা ও অমনোযোগিতা প্রভৃতি নানা ব্যাধির আক্রমণ ইত্যাদি বহু বিষয়ের অতি প্রাসঙ্গিক

সমাবেশ দেখিয়া বহুলাংশে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার যেভাবে অল্প কথায় ও সরল ভাষায় অতি জটিল বিষয়গুলি সাধারণের বোধগম্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। আশা করি গ্রন্থের উপযোগিতা হিসাবে মূল্য কম করিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা পাঠের সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই গ্রন্থকর্ত্তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

যাঁহারা বিজ্ঞান বলিতেই পাশ্চাত্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাদিগকে একবার গ্রন্থখানি পড়িতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

—শ্রীপ্রিয়বন্ধু কাব্যতীর্থ

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

অয়নচলন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল (সৌরভ, ভাদ্র ১৩৪৩)

কোক্ ও মেচনিকফ্—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ, বি-এল (স্বর্ণবণিক্ সমাচার, ভাদ্র ১৩৪৩)

জীবাণুর আলো—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৪৩)

ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন (বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)

ব্লাড্‌প্রেশার—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি (ধন্বন্তরি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)

শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যতত্ত্ব—ডাঃ শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-বি (স্বাস্থ্য, কার্ত্তিক ১৩৪৩)

হীরকখণ্ডের পরিচয়—শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম-এস-সি (বঙ্গলক্ষ্মী, কার্ত্তিক ১৩৪৩)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১৩শ বর্ষ শীত ৫ম সংখ্যা

আকাশের কথা

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান আলোচনার সূচনা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে। আর এই শাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, অন্যান্য বিজ্ঞানচর্চ্চার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কাজেই বিশ্বের প্রকৃতি-পরিচয় সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হয়। অবশ্য বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রথম স্থান অধিকার করিবার আরও স্বতন্ত্র কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ কোন দেশের একটা বিশেষ নগর সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিতে হইলে যেমন সেই দেশের মানচিত্রে তাহার অবস্থান জানিয়া লইতে হয়, সেইরূপ এই বিরাট বিশ্বের যে ক্ষুদ্রতম অংশ অধিকার করিয়া আমাদের পৃথিবী বিদ্যমান, তাহার প্রকৃত চিত্র আমরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার সাহায্যেই জানিতে পারি। আর পৃথিবীর কথাই তো মানুষের সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন, কারণ বিপুল বিশ্বের এই ছোট্ট অংশই তাহার নীড়। দ্বিতীয়তঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনাতেই মানুষ এমন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে, যে সত্যের অনুসন্ধানে মানুষের মন সর্ব্বদাই মহান্ ভাব ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ থাকিত; কোনরূপ নীচতা বা দুর্ব্বুদ্ধি তাহার মনের মধ্যে কখনও স্থান পাইত না। তৃতীয় কারণ এই যে, যদিও জ্যোতির্ব্বিদ্যার কয়েকটি নিয়ম সহজবোধ্য নয়, তথাপি এই নিয়মসমূহ এত সুনিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র বিজ্ঞান-আলোচনার অন্য আর কোন স্তরেই তাহা সুসম্পন্ন করা মানুষের পক্ষে খুব কমই সম্ভবপর হইয়াছে—এই হিসাবে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আদর্শ বিজ্ঞান, সন্দেহ নাই।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে গিয়া গোড়াতে আমাদিগকে এই পৃথিবীর কথা লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। কারণ সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীই আমাদের পক্ষে একান্ত সুগম স্থান এবং আকাশরাজ্যের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সন্ধানও আমাদিগকে এই পৃথিবীর বক্ষে বসিয়াই করিতে হয়।

পৃথিবী ঃ—প্রাচীন কালে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী একটা বিরাট সমতল ক্ষেত্র, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। পৃথিবী যে গোল, এ বিষয়ে এখন আর কাহারও মনে কোন সংশয় নাই। পৃথিবীপৃষ্ঠের বৃত্তাংশের পরিমাণ ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর আকার ও গঠনপ্রণালী অনেকটা নির্ভুলভাবেই নির্ণীত হইয়াছে। মোটামুটি হিসাবে পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, আর নৈরক্ষিক (equitorial) ব্যাস মেরুভেদক (polar) ব্যাস অপেক্ষা ২৭ মাইল বেশী।

পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ একটা পাতলা স্তরকে আমরা সোজাসুজি পরীক্ষা করিতে পারি। পৃথিবীকে যদি ৮" ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটা গোলক বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম খনিও এক ইঞ্চির সহস্রাংশের একাংশেও পৌছিবে না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে এক ইঞ্চির তিন শতভাগের একভাগ অপেক্ষা কম নিম্ন প্রদেশ হইতেই খুব সম্ভবতঃ আগ্নেয়গিরির গৈরিক স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় পৃথিবীর অন্তরের কথা বোধ হয় মানুষের অজ্ঞাতই থাকিবে, বিজ্ঞান যদিও বহু অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

ওজন ও পরিধি ইত্যাদি জানা একটা বল বা শক্তি এবং পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন দূরত্বে আকর্ষণের পরিমাণ তুলনা করিয়া (কার্য্যতঃ যদিও সে পরীক্ষাটি খুবই কঠিন) প্রমাণ করা গিয়াছে যে, পৃথিবীর গড় ঘনত্ব জলের প্রায় ৫·৫ গুণ। তাহার অর্থ এই যে, পৃথিবীর পরিমাণ ৬×১০^২১ টন অর্থাৎ প্রায় ১৬৪×১০^২১ মণ। এই রকম ভাবে পৃথিবীর পরিমাণই শুধু নিরূপিত হয় নাই, উহার অভ্যন্তর প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও জানা গিয়াছে। যতই পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করা যায়, ততই প্রতি ১৩৫ ফুটে তাহার উত্তাপ ১° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়, সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যে অত্যন্ত উত্তপ্ত তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়; খুব সম্ভবতঃ তাহা হাজার ডিগ্রি হইবে। কাজেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশকে তরল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে মাইকেলসন্ ও গেল্ যে বিস্ময়কর 'প্রবাহ-পরীক্ষা' (Tide-experiments) আরম্ভ করেন, তাহাতে চন্দ্রের প্রবাহ-বিকৃতিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিরোধকারী শক্তির পরিমাণ করা হয় এবং সেই পরীক্ষালব্ধ ফল হইতেই পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ যে আগাগোড়া ইস্পাতের ন্যায় কঠিন, গণিতজ্ঞগণ তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকন্তু পৃথিবী ইস্পাতের ন্যায়ই স্থিতিস্থাপক, কঠিন পিচের মত আঠালো নয়। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত ও গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ আমরা গত ১৩৪২ সনের শরৎ সংখ্যা "প্রকৃতি" পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি।

চন্দ্র ঃ—আকাশমার্গে চন্দ্রই পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী, আর সে পৃথিবীরই একটা উপগ্রহ মাত্র। পৃথিবীর আকার নির্ণীত হইবার পরে পৃথিবীপৃষ্ঠের দুইটি বিন্দু হইতে চন্দ্রের আপাত-প্রতীয়মান দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার দূরত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ত্রিকোণমিতির গণনার সাহায্যে কয়েকটি কোণ পরিমাণ করিয়া উক্ত দূরত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। মোটামুটি হিসাবে পৃথিবীকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের কেন্দ্রের দূরত্ব ২৪০,০০০ মাইল। এই পরিমাণনির্ণয়ে ভুল শতকরা একভাগের শতাংশের বেশী হইবে না।

চন্দ্রের ব্যাস ২,১৬৩ মাইল, আর চন্দ্রের ঘনত্ব পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ এবং তাহার বস্তুপরিমাণ (mass) পৃথিবীর $\frac{১}{৮১}$ মাত্র।

চন্দ্রের বস্তুপরিমাণ এত অল্প হওয়ার একটি ফল এই যে চন্দ্রের কেন্দ্রাভিমুখী গতির-প্রবণতা (Gravity) পৃথিবীর ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। উহার অর্থ এই যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ওজন হইবে ছয় সের, তাহাই স্থিতিস্থাপক তুলাদণ্ডে (spring balance) চন্দ্রের পৃষ্ঠে মাত্র এক সের হইবে। পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে একটা ঢিল যদি কোন নির্দ্দিষ্ট গতিবেগে উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত করা যায়, তবে সেই ঢিল যত উচ্চে উঠিবে, চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে উহা সেই গতিবেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে উহার ছয় গুণ উর্দ্ধে উঠিবে। অবশ্য চন্দ্রের বুকে দাঁড়াইয়া ঢিল নিক্ষেপ করিবার লোকের একান্ত অভাব। কিন্তু বায়ুমণ্ডল যে অসংখ্য ক্ষুদ্র পদার্থে প্রস্তুত, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথাই খাটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বায়ুমণ্ডলটির কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও আরও কয়েকটি মৌলিক উপাদান এবং যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে আমাদের বায়ুমণ্ডল গঠিত। যদিও বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের $\frac{১}{৮০০}$ ভাগ মাত্র, তথাপি উপরোক্ত পদার্থগুলি এত দ্রুত গতিতে সঞ্চরণ করে যে, সমুদ্রের সমতলে তাহারা প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৭½ সের ওজনের চাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। আমাদের বায়ুমণ্ডলের অণুগুলি বাহ্য ঘনত্বে (surface-density) ও গ্রীষ্মকালীন্ উত্তাপে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০০ ফুট গতিতে চলে। তাহাদের গতি সর্ব্বতোমুখী, কাজেই তাহারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার ধাক্কা খাইয়া থাকে।

চন্দ্রের বুকে জলও নাই, বায়ুমণ্ডলও নাই। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে এই গুরুতর প্রভেদের কারণ সম্ভবতঃ এই যে চন্দ্রবক্ষের কেন্দ্রাভিমুখী গতির প্রবণতা (Gravity) এত কম যে, দ্রুত-সঞ্চালিত বায়ুকণাসমূহ আপন জোড়ে ধরিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। পরিদৃষ্ট ঘটনা দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। যে সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রাভিমুখী-গতিপ্রবণতা কম বলিয়া আমরা জানি, তাহাদের কাহারও বায়ুমণ্ডল নাই; অথচ পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর সমস্ত বস্তুই বায়ুমণ্ডলে আচ্ছাদিত।

চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে জল বা বায়ু না থাকাতে তাহা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই; কাজেই তাহার পর্ব্বতমালা এখনও অবিনষ্ট আছে, স্রোতের জল তাহার বক্ষে কোনও খাত বা আবর্ত্তের সৃষ্টি করে নাই এবং শৈলরাজি ধ্বসিয়া পচিয়া ধূলিস্যাৎ হইয়া মাটিতে মিশায় নাই। চন্দ্রের আকাশে মেঘের গর্জ্জনও নাই, বৃষ্টির ধারাও তাহার তপ্ত বক্ষকে শীতল করে না, ঝড়ঝাপ্টার কোনও ভয়ভাবনাও তাহার নাই। ফলে

চন্দ্রের বুকে একটা শাশ্বত জনহীনতা ও নিস্তব্ধতা এবং উহা একটা অহর্নর প্রাণহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়া আছে।

স্বীয় কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে চন্দ্রের যতখানি সময় প্রয়োজন হয়, ঠিক ততখানি সময়েই সে তাহার নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসে, কাজেই পৃথিবীর উপর হইতে আমরা শুদ্ধমাত্র তাহার একটা দিকই দেখিতে পাই। পৃথিবীবক্ষ হইতে চন্দ্রের যে দিকটা দৃষ্টিগোচর হয় (মনে হয় অপর দিকটাও প্রায় একই রকম) তাহা মোটের উপর বড়ই কর্কশ এবং অধিকাংশ স্থলেই গোলাকার গর্ত্তে পরিপূর্ণ। ঐগুলির নাম আগ্নেয়গিরিমুখ (craters) এবং উহাদিগকে আবার নানা আকারের দেখা যায়। কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে চোখে পড়ে মাত্র। কোন কোনটির ব্যাস প্রায় ১০০ মাইলেরও উর্দ্ধে হইবে। আবার বেশ প্রশস্ত সমতলভূমির বুকেও 'ক্রেটার' দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সমতলভূমির উপরে কয়েকটি সোজা পর্ব্বতমালা এবং স্বতন্ত্র অবস্থিত অনেক গিরিশৃঙ্গও বিরাজ করিতেছে। তাহাদের কোন কোনটি গোড়া হইতেই খাড়া হইয়া প্রায় ২০,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রের পার্থক্য অনেক। তাহারা উভয়ে একত্রে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে বটে এবং ফলে সূর্য্যের নিকট হইতে একই পরিমিত স্থানে সমপরিমাণ আলোক ও উত্তাপ পায়, এইটুকু মাত্র উভয়ের সাদৃশ্য। কিন্তু চন্দ্রের দিনমান পৃথিবীর দিনমান অপেক্ষা ত্রিশ গুণ বড়। আমাদের পৃথিবীর একদিনের প্রায় পনর গুণ সময় ব্যাপিয়া চন্দ্রের বুক সূর্য্যের প্রতাপে দগ্ধ হয়, একগুণ মেঘ বা এইটুকু বাতাসের দ্বারাও সেই তাপ কিছুমাত্র অপনোদিত হয় না। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ একদিনে) চন্দ্রের বর্ষোদেশের পাহাড়গুলির তাপ প্রায় জলের স্ফোটনাঙ্কে (১০০° সেন্টিগ্রেড্) গিয়া পৌছায়। তারপরে যেমনই সূর্য্য অস্ত যায় উত্তাপ দ্রুত কমিতে আরম্ভ করে, কারণ সেই উত্তাপ ধরিয়া রাখার মত বায়ুর আস্তরণ তাহার নাই। দুই ঘণ্টার মধ্যে সেই তাপ বরফ জমিবার তাপমাত্রায় গিয়া পৌছায়। অতঃপর সুদীর্ঘ রজনী ব্যাপিয়া (পৃথিবীর প্রায় ১৫ দিন) সেই তাপ কমিতে কমিতে খুব সম্ভবতঃ শূন্য ডিগ্রির নীচেও ১০০।১৫০°তে গিয়া উপস্থিত হয়। পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ শীতে জমিয়া এবং রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া চন্দ্র কত যুগ যুগ ধরিয়া না পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছে।

চন্দ্রের বুকে প্রতিনিয়ত কি ঘটিতেছে, তাহা জানা শেষ হইলেই চন্দ্রের কথা শেষ হয় না। চন্দ্রের গতির কথা জানাও একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতির যে বিধানে সে চলাফিরা করিতেছে, যে নিয়ম সে মানিয়া চলিতেছে, আকাশপথের গ্রহস্বপ্নতের সমস্তাও সেগুলি দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে। পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাভাস, কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর নৈরক্ষিক স্ফীতির নিমিত্ত তাহাতে অনেক ছোট ছোট অনিয়মও বিদ্যমান আছে।

গ্রহজগৎ ঃ—পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব যেভাবে নির্ণীত হইয়াছে সূর্য্য এবং গ্রহগণের দূরত্বও সেই উপায়েই স্থির করা যাইতে পারে। আমাদের সৌর জগতের প্রধান গ্রহ আটটি। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। সূর্য্যের নিকটতম গ্রহগুলি অপেক্ষা দূরবর্ত্তী গ্রহগুলির কক্ষপথ যথেষ্ট বৃহত্তর। নিম্নের তালিকাটিতে সূর্য্যের নিকট হইতে গ্রহগণের দূরত্ব, আবর্ত্তন কাল ইত্যাদি দেওয়া হইল—

গ্রহ	সূর্য্য হইতে দূরত্ব (মাইল)	আবর্ত্তন কাল	ব্যাস (গড়ে) (মাইল)	ঘনত্ব (জল=১)	পরিমাণ (পৃথিবী=১)
বুধ—	৩৬,০০০,০০০	২৯ মাস	৩,০৯৯	৪·৫ (?)	০·০৫ (?)
শুক্র—	৬৭,০০০,০০০	৭·৪ মাস	৭,৭০১	৪·৯ (?)	০·৮১ (?)
পৃথিবী—	৯২,৯০০,০০০	১২·০ মাস	৭,৯১৮	৫·৫৩	১·০০
মঙ্গল—	১৪১,৫০০,০০০	২২·৬ মাস	৪,৩৩৯	৩·৫৮	০·১১
বৃহস্পতি—	৪৮৩,৩০০,০০০	১১·৯ বৎসর	৮৮,৩৯২	১·২৫	৩১৪·৫
শনি—	৮৮৬,০০০,০০০	২৯·৫ বৎসর	৭৪,১৬৩	০·৬৩	৯৪·১
*ইউরেনাস্—	১,৭৮১,৯০০,০০০	৮৪·০ বৎসর	৩০,১৯৩	১·৪৪	১৪·৪
*নেপচুন—	২,৭৯১,৬০০,০০০	১৬৩·৮ বৎসর	৩৪,৮২৩	১·০৯	১৬·৭

প্রথম চারিটি গ্রহকে 'পার্থিব গ্রহ' (terrestrial planets) বলা হয়, তাহারা মোটামুটিরূপে পৃথিবীর মত। বুধ এত ক্ষুদ্র যে তাহার বায়ুমণ্ডল নাই, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলও পাতলা। অথচ শুক্রের বায়ুমণ্ডল এত বিস্তৃত ও মেঘাচ্ছন্ন যে পৃথিবী হইতে উহার পৃষ্ঠদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী ব্যতীত শুক্র ও মঙ্গলেই মাত্র জীবনধারণোপযোগী অবস্থা বিদ্যমান। সূর্য্য হইতে অতিদূরত্ব বশতঃ যদিও মঙ্গল গ্রহ প্রতি ক্ষেত্রমানে মাত্র পৃথিবীর মেরুমণ্ডলের ন্যায় উত্তাপ ভোগ করিতে পারে, তথাপি তথায় ঋতুর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার সুদীর্ঘকালস্থায়ী গ্রীষ্ম ঋতুতে উহার মেরুস্থিত বরফের স্তূপ প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মঙ্গল গ্রহে বাসোপযোগিতা এবং তাহার অধিবাসীদের (যদি কেহ থাকে) সম্পর্কে অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। মঙ্গল গ্রহে জীবনধারণ করা যাইতে পারে, এ কথা হয়তো অসম্ভব নহে, কিন্তু এই মতবাদ প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার পক্ষে সুসঙ্গত তথ্য কিছুই নাই। মঙ্গল ও পৃথিবী যখন পরস্পরের কাছে আসে, তখনও তাহাদের দূরত্ব থাকে প্রায় ৪০,০০০,০০০ মাইল—এত দূরে শব্দ পৌছাইতে ছয় বৎসরেরও বেশী সময় প্রয়োজন

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বাচস্পতি মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে ইউরেনাসের নাম 'প্রজাপতি' ও নেপচুনের নাম 'বরুণ' রূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছিলাম। সেই নাম দুইটি বাংলায় গ্রহণ করিলে মন্দ কি ? —লেখক

হয়, আর অত দূরে মঙ্গলপৃষ্ঠের ক্ষুদ্রাকৃতিবিশিষ্ট কোন কিছু লক্ষ্য করাও সম্ভবপর হয় না। মঙ্গল গ্রহে যদি কোন জীব থাকিয়াই থাকে, তবে তাহার শ্রেষ্ঠ জীব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন, কারণ সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথিবী অপেক্ষা পৃথক ধরণের।

সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্থিত চারিটি গ্রহের নাম—মহাগ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস বা প্রজাপতি, নেপচুন বা বরুণ। পৃথিবীর তুলনায় উহারা সকলেই খুব বৃহৎ।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বৃহস্পতি, আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা সহস্র গুণে বড়। এই গ্রহগুলি সকলেই সম্পূর্ণরূপে বাষ্পাকারে থাকার দরুণই খুব সম্ভবতঃ অত্যন্ত পাতলা, কাজেই জীবনধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পৃথিবীর মত কঠিন হইলেও সেখানে জীবন নির্ব্বাহ অসম্ভব হইত, কারণ এমন কি বৃহস্পতিও প্রতি ক্ষেত্রমানে পৃথিবীর মেরুদেশের দশভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম আলোক সূর্য্যের নিকট হইতে পাইয়া থাকে।

সৌর পরিবারের মধ্যে শনিই সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ। এই বিশাল বপুটির ব্যাস ৭৫,০০০ মাইল, এবং স্বীয় নিরক্ষ-বৃত্তের সমতলে উহা বিরাট বলয়সমষ্টি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আড়াআড়িভাবে উক্ত বলয়ের দূরত্ব প্রায় ১৭৫,০০০ মাইল। বিশাল বিস্তৃতি সত্ত্বেও উহারা অত্যন্ত পাতলা, বোধ হয় পুরুত্বে ৫০ মাইলের অধিক হইবে না। শনির বলয়সমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তুতে পরিপূর্ণ, সেই বস্তুরাজি স্ব স্ব পথে গ্রহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহারা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশী বলিয়াই বলয়সমূহ দেখিতে কঠিন বলিয়া মনে হয়।

মহাগ্রহগুলির অনেক উপগ্রহ আছে, বৃহস্পতির নয়টি, শনিরও নয়টি। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, দুইটি ব্যতীত বৃহস্পতির সমস্ত উপগ্রহ এবং একটি ব্যতীত শনির সমস্ত কয়টি তাহাদের স্ব স্ব গ্রহের চতুর্দ্দিকে গ্রহগতির দিক অনুযায়ী চলিয়া থাকে, কিন্তু অবশিষ্ট কয়টি উপগ্রহ বিপরীত দিকে ঘোরে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায় ১০০০ ক্ষুদ্র গ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আকার বৃহৎ দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রায় ২৫ মাইল ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২০০ হইতে ৫০০ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রহের প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, কিন্তু অধিকাংশগুলির আলোকচিত্র মাত্র গত ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। খুবই সম্ভবপর যে এতদপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ হয়তো আছে যাহাদের সন্ধান আমরা এখনও পাই নাই। উক্ত গ্রহগুলির কয়েকটি বৃহস্পতির নিকটে এবং একটি মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কারণ খালি চোখেই উহাদিগকে দেখা যায়। বিশেষতঃ শুক্র, মঙ্গল ও

বৃহস্পতি তো খুবই সুপ্রকাশ। প্রতি উনিশ মাস অন্তর শুক্র ৩।৪ মাসের নিমিত্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারারূপে আকাশে বিরাজ করে। বাকী সময় তেমনই উজ্জ্বল প্রভাতী তারা। কিঞ্চিৎ কম উজ্জ্বল বৃহস্পতি ও রক্তিমাভ মঙ্গল গ্রহকেও কখন কখনও সন্ধ্যা বা প্রভাতী তারা বলা হইয়া থাকে। অবশ্য উহাদিগকে তারা বলা ভুল, কারণ উহারা আলোকিত হয় সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক দ্বারা, কিন্তু তারাগুলি সকলেই স্বতর্জ্যোতি এবং সূর্য্য অপেক্ষা অনেক গুণ বৃহত্তর।

ইউরেনাস বা প্রজাপতি গ্রহ খালি চোখের দৃষ্টির বাহিরে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্সেল উহাকে আবিষ্কার করেন। একটি গ্রহের আপাত-প্রতীয়মান অবস্থান কয়েকবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই উহার কক্ষপথ ও ভবিষ্যৎ অবস্থানের কথা গণনা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। হার্সেল 'প্রজাপতি'র কক্ষপথ গণিয়া স্থির করিয়া দেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার গণনানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পথেই প্রজাপতিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারের ৪০ বৎসর পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রজাপতিকে আর কথিত স্থানে পাওয়া গেল না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ব্যবধান আরও বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা এত বাড়িয়া গেল যে জ্যোতির্ব্বিদগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অবশ্য এই ব্যবধান এমন কিছু নয় যে প্রজাপতিকে আকাশের যে স্থানে নির্দ্দেশ করা হইল পর্য্যবেক্ষণকালে তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখা গেল। প্রকৃত পক্ষে গণনাকৃত ও পরিদৃষ্ট অবস্থানের দূরত্ব এত কম ছিল যে খালি চোখে তাহাদিগকে এক স্থানে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হইল।

স্বভাবতঃই এখন প্রশ্ন উঠে, এতটুকু পার্থক্যের এমন কি বিশেষত্ব? এইটুকু লইয়া অস্থির হইবার কি প্রয়োজন? বিশেষত্ব বা অস্থিরতার কারণ এই, যে গতিবিজ্ঞান ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সাহায্যে উক্ত গণনা করা হইয়াছিল, এরূপ পার্থক্য সেই প্রাথমিক নিয়মগুলি সম্পর্কে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়, আর মানুষের যুক্তিকেও অগ্রাহ্য করিয়া বসে। কাজেই যখনই কোন পরিদৃষ্ট ঘটনা আমাদের যুক্তি ও প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্তি জন্মায়, তখন সেই ঘটনা যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, তাহার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

প্রজাপতির পূর্ব্ববর্ণিত গতির এই অসামঞ্জস্য বিজ্ঞানজগতে একটা মস্তবড় আবিষ্কারের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছে। অপর একটি অজ্ঞাত ও দূরবর্ত্তী গ্রহের আকর্ষণেই এইরূপ অনিয়ম ঘটে। এই প্রস্তাব অনেকেই করেন বটে, কিন্তু সেই অজ্ঞাত গ্রহটির অবস্থিতি নিরূপণ করাই ছিল প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাটি এতই দুরূহ যে তদানীন্তন গণিতজ্ঞগণের কেহই সে সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। পরিশেষে দুই জন যুবক সেই অসাধ্যসাধন করেন। এডাম্‌স্ নামধেয় কেম্‌ব্রিজের একজন ইংরাজ ছাত্র ও লেভেরিয়া নামক একজন ফরাসী যুবক, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও পৃথক্ উপায়ে যুক্তিদ্বারা প্রায় ৩,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরের সেই অজ্ঞাত গ্রহের অবস্থিতি নির্ণয় করেন।

গ্যালে নামক একজন জার্মান জ্যোতির্বিৎ লেভেরিয়ার উপদেশ অনুযায়ী দূরবীক্ষণ নির্দেশ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্ত গ্রহটির সন্ধান পান। উহার নাম নেপচুন বা বরুণ। বরুণের ন্যায় সুদূরে অবস্থিত গ্রহের আবিষ্কারই মানুষের যুক্তি ও প্রকৃতির নিয়মাবিষ্কারের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের আস্থা জন্মাইয়া দেয়।

সূর্য্য ঃ—সাধারণ লোকের ধারণা সূর্য্য আর চন্দ্র বুঝি সমান। আকাশের দিকে তাকাইলে পূর্ণিমার চন্দ্র আর সূর্য্য সমান আয়তনবিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্ব হিসাব করিলে দেখা যায় যে সূর্য্যের আয়তন চন্দ্রের অপেক্ষা ৬০,০০০,০০০ গুণেরও অধিক। এমন কি সূর্য্যের নিকট হইতে পৃথিবী যে পরিমাণ আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ণচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোক অপেক্ষা ৬০০,০০০গুণ অধিক। কাজেই সূর্য্যের সঙ্গে চন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না।

সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৪,০০০ মাইল। আয়তনেও সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১,০০০,০০০গুণ বড়। কিন্তু উহার ঘনত্ব জলের ঘনত্ব অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ বেশী। কাজেই উহার পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় ৩০০,০০০ গুণ। যদি পৃথিবীকে সূর্য্যের কেন্দ্রে স্থাপন করা যায়, আর চন্দ্র যদি তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তবে চন্দ্রের কক্ষপথ সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশের অর্দ্ধেক মাত্র অধিকার করিবে। সমস্ত গ্রহ একত্র করিলেও সূর্য্যের পরিমাণের মাত্র শতকরা একভাগেরও ½ মাত্র অর্থাৎ সাত শত ভাগের একভাগ হয়।

পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে যে বিচ্ছুরিত আলোক ও তাপ পাইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ খুবই বেশী। এক বর্গ গজ ক্ষেত্রের উপর সোজাসুজিভাবে যে সূর্য্যের কিরণ আপতিত হয়, সেই বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ প্রায় দেড় অশ্বশক্তি (H.P.)। আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর বুকে যে সৌরশক্তি বিচ্ছুরিত হয় তাহার গড় পরিমাণ প্রতি বর্গ গজে এক অশ্বশক্তির ½ অংশ। ইহার অর্থ এই যে ৫০'×১৫০' ফুট গৃহের মধ্যে ৩০০ অশ্বশক্তি পরিমাণ সৌরতেজ বিকীর্ণ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে মানুষ শক্তির যে সমস্ত খেলা দেখিতে পায় তাহার মূলে প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই রশ্মিবিকাশী তেজ বিদ্যমান। ঝড় বহে, কারণ সূর্য্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ অসমানভাবে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। বৃষ্টি হয়, কারণ সূর্য্যই তাপের দ্বারা জল শোষণ করিয়া মেঘাকারে বায়ুমণ্ডলের স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখে। কয়লা আর তৈল পুড়িয়া যে শক্তি সরবরাহ করে তাহাও সূর্য্যের নিকট হইতে পাওয়া, কারণ সুদূর ভূতাত্ত্বিক যুগে যে সকল গাছপালা সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক ও তাপ পাইয়া সঞ্জীবিত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহারাই ভূগর্ভে নিহিত হইয়া কয়লা ও তৈলে পরিণত হইয়াছে। মানুষ যে তাহার দেহের বল ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত ক্ষমতাই তাহার সূর্য্যের নিকট হইতে ধার করা, কারণ যে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুজাত পদার্থ ভোজন করিয়া মানুষ জীবনধারণ করে, তাহারা সকলে সূর্য্যের আলোক পাইয়াই জীবিত ছিল। বর্ত্তমানেও

সূর্য্যের নিকট হইতে পৃথিবীর এক একজন অধিবাসী ১৬০,০০০ অশ্বশক্তি হিসাবে তেজ পাইতেছে। যদিও সুদূর ভবিষ্যতের ভূতাত্ত্বিক যুগে হয়তো এমন দিন আসিবে যখন এই সঞ্চিত সৌরশক্তি সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

পৃথিবী হইতে মঙ্গলকে যেমন দেখা যায়, সূর্য্যের নিকট হইতে পৃথিবীও তেমনই অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি উজ্জ্বল বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কাজেই পৃথিবী সূর্য্যের বিকীর্ণ তেজের অত্যন্ত সামান্য একটা অংশই মাত্র পাইতেছে—দুই লক্ষ কোটিভাগের একভাগ মাত্র (one two-billionths)। যদি একমাত্র পৃথিবীকে আলোক ও তাপ দিবার জন্যই সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে কত শক্তিরই না বৃথা অপচয় হইতেছে! সূর্য্যের বিকীর্ণ শক্তি প্রচণ্ড। প্রতি বর্গ গজে ৭০,০০০ অশ্বশক্তি পরিমিত তেজ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্য নিজে অত্যন্ত উত্তপ্ত। উহার রশ্মিবিকাশী ক্ষেত্রের তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০° সেন্টিগ্রেড, উহার গভীরতম অভ্যন্তর প্রদেশে তাপমাত্রা আরও অনেক বেশী। কাজেই সূর্য্য কঠিন বা তরল পদার্থ হইতে পারে না। উহা অসীম তেজের আধার একটি বিশাল বাষ্পপিণ্ড। আর সেই পিণ্ডটি ভয়ঙ্কর ঝড়ে প্রায়ই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহদায়তনবিশিষ্ট দীপ্তিমান্ বাষ্পের রাশি প্রায়ই মিনিটে কয়েক শত মাইল গতিতে সমুদ্রের ফেনার ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কখনও কখনও বা সূর্য্যবক্ষ হইতে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের প্রায় দ্বিগুণ স্থান ব্যাপিয়া উপরোক্ত বাষ্পের রাশি ঊর্দ্ধ দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ভীষণ বলের দ্বারা পৃথিবী কখনও উপজ্রুত হয় নাই, হইলে উহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলিস্তূপে হইয়া গ্রহজগতের সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত।

পৃথিবীস্থ তাপ, আলোক ও জীবন সূর্য্যের উপর নির্ভর করে বলিয়া অনেকের মনে স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসা জাগে যে আর কতকাল সূর্য্য তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে? যদিও এই সমস্যার কোন সমাধানই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তথাপি কতকগুলি প্রমাণের দ্বারা অনুমান করা যায় যে আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর সূর্য্য এভাবেই তাপ ও আলোক প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

সূর্য্যের দূরত্ব, আকার ও পরিমাণই যে মাত্র জানা গিয়াছে এমন নহে, তাহার রাসায়নিক গঠন প্রভৃতিও নির্ণীত হইয়াছে। যে উপায়ে উহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি এইরূপ :—রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই বাষ্পাকারে থাকিবার কালে নিজ নিজ বিশিষ্ট আলোক বিকীর্ণ করিয়া থাকে। বর্ণচ্ছত্র যন্ত্রের সাহায্যে আলোককে তাহার উপাদানীভূত অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলা যায়, কাজেই উক্ত যন্ত্রের সহায়তায় কোনও বিশেষ বস্তুর আলোক আসিতেছে কি না তাহা নির্ণয় করা চলে। এই উপায়ে আলোককে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং কোন্ উপাদান হইতে কোন্ আলোক আসিতেছে তাহা অবগত হইয়া সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ

মৌলিক উপাদানসমূহ নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে। এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সূর্য্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন, হিলিয়ম্, কার্ব্বন, অক্সিজেন, সোডিয়ম্, ক্যালসিয়ম, লৌহ, নিকেল, তাম্র ও দস্তা—অর্থাৎ পৃথিবীতে দৃষ্ট ধাতুগণের মধ্যে ভারী কয়েকটি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ধাতুই সূর্য্যদেহে বিরাজ করিতেছে। সূর্য্য অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রগুলির উপাদানও এইভাবেই জানা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত নক্ষত্রগুলির অনেকেই যে সূর্য্যের মত উপাদানবিশিষ্ট তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশের ভেষজ উদ্ভিদ্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Alstonia scholaris R. Br. ছাতিম	বৃহৎ তরু	ত্বক	পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ	সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক, পরিবর্ত্তক, জ্বরঘ্ন ; পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়ে উপকারী
Holarrhena antidysenterica Wall. কুরচী, ইন্দ্রজব	ক্ষুদ্র তরু	ত্বক, বীজ	পশ্চিমবঙ্গ	ত্বক অতিসারের প্রসিদ্ধ ঔষধ ; জ্বর, উদর পীড়া, অর্শ ইত্যাদিতে বীজ ব্যবহৃত
Nerium odorum Soland. করবী	গুল্ম	মূল		চর্ম্মরোগে, লিঙ্গের উপর গুটিকাদিতে বাহ্য প্রয়োগ
Ichnocarpus frutescens R. Br. শ্যামালতা	বৃহৎ লতা	ঐ	সর্ব্বত্র	বলকারক, পরিবর্ত্তক, সার্সার ন্যায় ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Asclepiadaceae আকন্দ বর্গ				
Hemidesmus indicus R. Br. অনন্ত মূল	লতানিয়া গুল্ম	মূল	পশ্চিমবঙ্গ	স্বাদু, স্নিগ্ধকর, পরিবর্ত্তক, মূত্র, ঘর্ম্ম ও বলকারক ; সার্সার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত
Calotropis gigantea R. Br. C. procera R. Br. আকন্দ	গুল্ম	ত্বক, মূল, পত্র	সর্ব্বত্র	ঘর্ম্ম ও বমনকারক, পরিবর্ত্তক, রেচক ; আমাশয়, উদরী, চর্ম্মরোগ ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত
Daemia extensa R. Br. ছাগলবাঁটি	দুর্গন্ধযুক্ত গুল্ম	পত্র, মূল	সর্ব্বত্র	ব্রণ, বাতজনিত স্ফীতিতে পত্রের বাহ্য প্রয়োগ ; বমনকারক, রেচক
Tylophora asthmatica W. & A. অন্তমূল	বহু বর্ষজীবী ওষধি	পত্র, মূল	উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ	আমাশয়ে ইপিক্যাকের ন্যায় ব্যবহৃত
Loganiaceae নিম্বলীবর্গ				
Strychnos nux-vomica L. কুচিলা	বৃহৎ তরু	বীজ	পশ্চিমবঙ্গ	বীর্য্য ষ্ট্রিকনাইন বিবিধ রোগে ব্যবহৃত
S. potatorum L. নির্ম্মলী	মধ্যমাকার তরু	ঐ	ঐ	চক্ষুরোগে বাহ্য প্রয়োগ, পুরাতন উদরাময়ে প্রযোজ্য
Gentianaceae চিরেতা বর্গ				
Exacum tetragonum Roxb. কুচুরী	বর্ষজীবী	গাছ	উত্তরবঙ্গ	তিক্ত বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Erythroea Roxburghii Don. গৌরমী	বর্ষজীবী	গাছ	পশ্চিমবঙ্গ	অতিতিক্ত বলকারক, চিরেতার স্থলে ব্যবহৃত
Canscora decussata Roem. ধানকুনি	ঐ	ঐ	সর্ব্বত্র	মৃগী, উন্মাদ ও স্নায়বিক পীড়ায় ব্যবহৃত
Swertia chirata Ham. চিরেতা	বহুবর্ষজীবী	ঐ	উত্তরবঙ্গ	বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, মৃদুবিরেচক
Boragineae হস্তিশুণ্ডবর্গ				
Cordia myxa L. বোক্ল	মধ্যমাকার তরু	ত্বক, ফল	সর্ব্বত্র	পাথরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বরে ব্যবহৃত
Heliotropium indicum L. হাতিশুঁড়	রোমযুক্ত বর্ষজীবী	পত্র	ঐ	ঘা, ফোঁড়া, ফুলায় বাহ্যপ্রয়োগ ; গলক্ষত ও আলজিব প্রদাহে ফলপ্রদ
Convolvulaceae কলমীবর্গ				
Argyreia speciosa Sw. বিচতড়কা	লতানিয়া গুল্ম	পত্র, মূল	ঐ	পত্র ফোঁড়া পাকাইবার কিংবা বসাইবার জন্য ব্যবহৃত ; মূল, বাত ও স্নায়বিক ব্যাধি-প্রশমক
Ipomoea hederacea Jacq. কালাদানা	ঐ	বীজ	ঐ	অতিবিরেচক
I. digitata L. ভূঁইকুমড়া	ঐ	মূল	ঐ	পরিবর্ত্তক, স্নিগ্ধকারক, দুগ্ধনিঃসারক, কামোদ্দীপক, পুষ্টিকারক
I. sepiaria Koen. বনকলমী	ঐ	পত্ররস	ঐ	অম্ল ; সেঁকোবিষ-প্রতিষেধক
I. aquatica Forsk. কলমী	বর্ষজীবী	ঐ	ঐ	শুষ্ক রস স্কামোনির ন্যায় রেচক

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
I. turpethum Br. তেউড়ী	বৃহৎ, লতানিয়া ওষধি	মূল	সর্ব্বত্র	বিরেচক
Evolvus alsinoides L. বিষ্ণুগন্ধী	প্রশাখ ওষধি	পত্র, মূল	ঐ	উদর পীড়ায় ব্যবহৃত
Cuscuta reflexa Roxb. আলকুশী লতা	পরজীবী লতা	বীজ	ঐ	রেচক, রক্তশোধক, পিত্তজ্বরঘ্ন
Solanaceae বার্ত্তাকুবর্গ				
Solanum nigrum L. কাকমাছি	বর্ষজীবী	গাছের রস	ঐ	যকৃৎবৃদ্ধি, পুরাতন চর্ম্মরোগে ও উদরীতে ব্যবহৃত
S. indicum L. বৃহতী	ক্ষুদ্র গুল্ম	মূল	ঐ	কফনিঃসারক ; জ্বর ও উদরশূলে প্রযোজ্য
S. xanthocarpum S. & W. কণ্টিকারী	কণ্টকময় ওষধি	গাছ	ঐ	জ্বর, কাশি, পাকাশয়-প্রদাহ ও বক্ষোবেদনায় ব্যবহৃত
Withania somnifera Dunal. অশ্বগন্ধা	গুল্ম	ঐ	কর্ষিত	বলকারক, পরিবর্ত্তক, কামোদ্দীপক, অবসাদক, দৌর্ব্বল্যে, অকালবৃদ্ধতায় ও স্নায়ুরোগে ব্যবহৃত
Datura fastuosa L. Var. alba ধুতুরা	বর্ষজীবী	বীজপত্র	সর্ব্বত্র	মাদক, বেদনানাশক ও আক্ষেপনিবারক ; ফুলায় বাহ্যপ্রয়োগ
Scrophulariaceae ব্রাহ্মীবর্গ				
Celsia coromandelina Vahl. কুক্সিমা	বর্ষজীবী	পত্র	সর্ব্বত্র	আমাশয় ও উপদংশ উদ্গমে ব্যবহৃত
Herpestis monniera H. B & K. ব্রাহ্মীশাক	ঐ	গাছ	আর্দ্র স্থান	উন্মাদ, মৃগী ও স্বরভঙ্গে ও স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Limnophila gratioloides Br. জলকর্পূর	বর্ষজীবী	গাছ	আর্দ্র স্থান	রস জীবাণুনাশক; সংক্রামক জ্বর ও অতিসারে প্রযোজ্য
Bignoniaceae পারুলবর্গ				
Oroxylum indicum Vent. সোনা	তরু	মূলত্বক	উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম	উদরাময়, অতিসার ও তরুণ বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত
Stereospermum suaveolens Dc. ঘণ্টা পারুল	বৃহৎ তরু	ঐ	ঐ	বল ও মূত্রকারক, শীতল; ফুল কামোদ্দীপক
Acanthaceae বাকসবর্গ				
Hygrophila spinosa T. And কুলেখাড়া	বর্ষজীবী	পত্র	আর্দ্র স্থান	বাত, কামলা, উদরী ও মূত্র রোগে ব্যবহৃত; বীজ প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণে ফলপ্রদ
Acanthus illicifolius L. হরকচ্ কাঁটা	গুল্ম		লোনা নদী, খালের পার্শ্বে	বাত ও স্নায়ুশূলে বাহ্য প্রয়োগ; অজীর্ণে উপকারী
Barleria prionitis L. কাঁটাঝাঁটি	ঐ	পত্র, কাণ্ড	সর্ব্বত্র	সর্দ্দিজ্বর, শিশু-উদরাময় ও উদরীতে ব্যবহৃত; গ্রন্থিস্ফীতি ও ক্ষতে বাহ্যপ্রয়োগ
Andrographis paniculata Nees. কালমেঘ	বর্ষজীবী	গাছ	ঐ	শিশুগণের যকৃৎরোগে, জ্বর, উদরপীড়া ও দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত
Justicia gendarussa L. জগ্‌মদন	ক্ষুদ্রগুল্ম	পত্র	ঐ	পুরাতন বাত ও জ্বরে প্রযোজ্য; কর্ণশূল ও কণ্ডুরোগে বাহ্যপ্রয়োগ
Adhatoda vasica Nees. বাকস	গুল্ম	পত্র, মূলত্বক	ঐ	কফনিঃসারক; কফজনিত সর্ব্বরোগে ফলপ্রদ

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Rhinacanthus communis Nees. যুঁইপানা	গুল্ম	পত্র, মূলত্বক	রোপিত	দদ্রু ও অন্যবিধ চর্ম্ম রোগে উপকারী
Verbenaceae নিসিন্দাবর্গ				
Lippia nodiflora Rich. ভুঁইওকড়া	বর্ষজীবী	পত্র	আর্দ্র স্থান	শিশুগণের অজীর্ণে ও প্রমেহে ব্যবহৃত
Verbina officinalis L. জঙ্গলী পুদিনা	বহুবর্ষজীবী ওষধি	পত্র	পতিত জমি	জ্বরঘ্ন, বলকারক, বাতজনিত শ্লীতি ও ক্ষতে পুল্‌টিসরূপে প্রযোজ্য
Gmelina arborea L. গাম্ভার	তরু	পত্রমূল	পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ	বলকারক, তিক্ত, রেচক; জ্বর, কফ ও বাতরোগে ব্যবহৃত
Premna integrifolia L. গণিয়ারী	ক্ষুদ্রতরু	মূল	উপকূলভাগ	তিক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক; বাত ও স্নায়ুরোগে উপকারী
Vitex trifolia L. V. negundo L. নিশিন্দা	গুল্ম	পত্র	সর্ব্বত্র	পত্রের সেক বাত, বেদনা, শিরঃপীড়া, গ্রন্থিস্ফীতিতে উপকারী; জ্বর ও প্লীহা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত
Clerodendron inerme Gaertn. বনযুঁই	গুল্ম	পত্র	উপকূলভাগ	জ্বর ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত; বাগী বসানোর জন্য পুল্‌টিস; বাতে মর্দ্দন; তিক্ত
C. infortunatum Gaertn. ঘেঁটু	ঐ	ঐ	সর্ব্বত্র	জ্বরঘ্ন, বলকারক, ক্রিমিনাশক, রেচক
C. siphonanthus Gaertn. বামুনহাটি	ঐ	পত্র,মূল	ঐ	কফ, হাঁপানি, উপদংশজনিত বাত ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Labiateae তুলসীবর্গ				
Ocimum basilicum L. বাবুই তুলসী	ওষধি	বীজ, পত্র	রোপিত	প্রমেহ, উদরাময়, পুরাতন অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্যবহৃত ; ফোড়ায় পুল্‌টিস ; পত্ররস দদ্রু ও কর্ণক্ষতে প্রযোজ্য
O. sanctum L. তুলসী	ঐ	পত্র, মূল	সর্ব্বত্র	কফনিঃসারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূল স্বেদজনক ; চর্ম্ম ও কর্ণরোগ বাহ্যপ্রয়োগ
Coleus aromaticus Benth. পাথরচুর	বহুবর্ষজীবী ওষধি	পত্র	রোপিত	মূত্ররোগ, যোনিস্রাব, উদর শূল ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত
Salvia plebeia Br. ভূঁই তুলসী	বর্ষজীবী	বীজ	সর্ব্বত্র	প্রমেহ ও অতিরজে ব্যবহৃত ; কামোদ্দীপক
Leucas linifolia Spreng. হলকসা	ওষধি	পত্র	ঐ	জ্বরঘ্ন
L. aspera Spreng. ছোট হলকসা	ঐ	ঐ	ঐ	বাত ও পুরাতন চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত
Nyctagineae পুনর্ণবা বর্গ				
Bœrhaavia diffusa L. পুনর্ণবা	ঐ	গাছ	ঐ	কামলা, উদরী, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও আভ্যন্তরীণ প্রদাহে ব্যবহৃত
Amarantaceae অপামার্গ বর্গ				
Amaranthus spinosus L. কাঁটা নটে	ঐ	ঐ	ঐ	প্রমেহ, অতিরজ ও কণ্ডু রোগে ব্যবহৃত
Achyranthes aspera L. আপাং	ওষধি	গাছ	সর্ব্বত্র	মূত্রকারক, রেচক ; ক্ষত, গুটিকা ও কর্ণরোগে ভস্মের বাহ্য প্রয়োগ
Chenopodiaceae বাস্তুক বর্গ				
Chenopodium album Miq. বাথুয়া শাক	ওষধি	গাছ	সর্ব্বত্র	মৃদু রেচক, অর্শরোগে প্রযোজ্য
Spinacea oleracea L. পালং শাক	বর্ষজীবী	ঐ	কর্ষিত	যকৃৎপ্রদাহ, কামলা ও পাথরী রোগে ফলপ্রদ
Basella alba L. পুঁই শাক	ওষধি	ঐ	ঐ	মূত্র ও স্নিগ্ধকারক ; ফোড়া পাকাইবার পুল্‌টিস
Polygonaceae রেউচিনি বর্গ				
Rumex maritimus L. জঙ্গলী পালং	বর্ষজীবী	ঐ	আর্দ্র স্থান	পত্র পোড়ায় প্রলেপ ; বীজ কামোদ্দীপক
R. vesicarius L. চুকা পালং	ঐ	ঐ	কর্ষিত	রেচক, মূত্রকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ; বিষধর কীট দংশনে প্রলেপ
Aristolochiaceae ইশ্বরী বর্গ				
Aristolochia indica L. ইশের মূল	লতানিয়া গুল্ম	মূল	ঐ	উত্তেজক, বলকারক, রজনিঃসারক, জ্বরঘ্ন ; উদর পীড়াতেও ব্যবহৃত
Piperaceae পিপ্পলী বর্গ				
Piper longum L. পিপুল	গুল্ম	ফল, মূল	উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গ	উত্তেজক, বায়ুনাশক, কটু, বলকারক ; কটী স্নায়ু বাত, পক্ষাঘাত, নিশ্চুন্ধতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Piper betle L. পান	লতানিয়া গুল্ম	পত্র	কর্ষিত	বায়ুনাশক, উত্তেজক ; সঙ্কোচক, কামোদ্দীপক ; ফোঁড়া, ফুলা, শিশুগণের সর্দ্দিকাশিতে এবং জননীর অত্যধিক স্তন্যক্ষরণে বাহ্য প্রয়োগ
Piper nigrum L. গোল মরিচ	ঐ	ফল	কর্ষিত	উত্তেজক, বায়ুনাশক, আগ্নেয় ; বাহ্য প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতা সাধক
Lauraceae দারুচিনি বর্গ				
Cinnamomum Tamala Nees. দারুচিনি	মধ্যমাকার তরু	ত্বক	ত্রিপুরা	পুরাতন উদরাময়, রক্তঃআধিক্য ও দন্তক্ষতে ব্যবহৃত
Litsaea sebifera Pers. কুকুর চিতা	ঐ	ঐ	উত্তরবঙ্গ	স্নিগ্ধকারক, সঙ্কোচক, কামোদ্দীপক
Euphorbiaceae এরণ্ড বর্গ				
Euphorbia pilulifera L. ফিরুই	ওষধি	গাছ	সর্ব্বত্র	হাঁপানি, পুরাতন কাশি, অতিসার ও উদরশূলে ব্যবহৃত
E. thymifolia Burm. ছোট ফিরুই	ঐ	ঐ	ঐ	রক্তযুক্ত প্রমেহ, শিরদর্দ্দ ও রজোলোপে ফলপ্রদ
Euphorbia tirucalli L. লঙ্কাসীজ	বৃহৎ গুল্ম	দুগ্ধবৎ আঠা	প্রবর্ত্তিত	উগ্রতাসাধক, পরিবর্ত্তক, উপদংশ রোগে প্রযোজ্য ; কড়া ও বাতে ব্যবহৃত
E. antiquorum L. নেড়াসীজ	ক্ষুদ্রতরু	মূলত্বক, আঠা	সর্ব্বত্র	রেচক, পাচক ; কড়া ও ফুলায় বাহ্য প্রয়োগ

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Phyllanthus emblica L. আমলকী	মধ্যমাকার তরু	ফল	পশ্চিমবঙ্গ	রস, শৈত্য ও মূত্রকারক, রেচক ; শুষ্ক ফল সঙ্কোচক ; উদর পীড়ায় ব্যবহৃত
P. niruri L. ভুঁই আমলা	বর্ষজীবী	শাখাগ্র	সর্ব্বত্র	অতিসার, উদরী, প্রমেহ ও সবিরাম জ্বরে প্রযোজ্য
Jatropha gossypifolia L. লাল ভেরেণ্ডা	গুল্ম	বীজ, বীজ-তৈল	অনাবাদী জমি	রেচক ; ঘা, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত ও দক্রতে ব্যবহৃত
J. curcas L. বাগ ভেরেণ্ডা	ঐ	বীজতৈল	সর্ব্বত্র	রেচক, বমনকারক ; পুরাতন বাত ও চর্ম্মরোগে প্রযোজ্য
Acalypha indica L. মুক্তাঝুরি	বর্ষজীবী	গাছ	ঐ	কফনিঃসারক, মূত্রকারক ; সেনেগর স্থলে প্রয়োগ করা যায়
Ricinus communis L. রেড়ী	ক্ষুদ্রতরু	বীজতৈল	কর্ষিত	জোলাপের সুপরিচিত তৈল
Baliospermum axillare Bl. দন্তী	গুল্ম	ঐ	চট্টগ্রাম	অতিবিরেচক, উত্তেজক, দাহক ; বাতে বাহ্য প্রয়োগ
Urticaceae ডুমুরবর্গ				
Cannabis sativa L. সিদ্ধি, গাঁজা	ওষধি	পত্র, স্ত্রীপুষ্প-মঞ্জরী	কর্ষিত	সুপরিচিত মাদক
Ficus glomerata Roxb. যজ্ঞডুমুর	বৃহৎ তরু	ত্বক, পত্র, ফল	সর্ব্বত্র	সঙ্কোচক, আগ্নেয় ; পত্র ও মূলের ক্বাথ জীবাণুনাশক ; গ্রন্থি-বিবৃদ্ধনে ও বাতগ্রস্ত সন্ধিতে রসের প্রলেপ

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Orchideae রাস্নাবর্গ				
Eulophia campestris Wall. সালেপ মিছরি	কন্দজ	কন্দ	উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম	পুষ্টি ও বলকারক, কামোদ্দীপক
Vanda Roxburghii Br. রাস্না	ঐ	ঐ	সর্ব্বত্র	বাত, স্নায়ুব্যাধি ও উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত
Saccolabium papillosum Lindl. নাকুলী	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্বোক্তের ন্যায়; সার্সার স্থলে ব্যবহার করা হয়
Scitamineae কদলীবর্গ				
Curcuma angustifolia Roxb. তিক্কুর	ওষধি	কন্দ	পশ্চিমবঙ্গ	পালো পুষ্টিকর খাদ্য
C. Zedoaria Rosc. কাচুরা, শঠি	ঐ	ঐ	চট্টগ্রাম	উত্তেজক, বায়ুনাশক, আগ্নেয়; রোগীর উৎকৃষ্ট পথ্য
C. longa L. হলুদ	ঐ	ঐ	কর্ষিত	উত্তেজক, ক্রিমিনাশক, রক্তশোধক; উদরাময়, সবিরাম জ্বর ইত্যাদিতে প্রযোজ্য; ফুলা, মচকান, কব্জাংটিভা প্রদাহ ও নাসারোগে বাহ্য প্রয়োগ
Kaempferia rotunda L. ভুঁইচাঁপা	ঐ	ঐ	চট্টগ্রাম	ঘা, ফুলা, ফোঁড়া ও ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগ
Amomum aromaticum Roxb. মোরং বা বড় এলাচ	ঐ	ফল, বীজ-তৈল	উত্তর বঙ্গ	বায়ুনাশক, পিত্ত-নিঃসারক, মূত্রকারক; স্নায়ুশূল ও যকৃৎ প্রদাহে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Zinziber officinale Rosc. আদা	ওষধি	কন্দ		উত্তেজক, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক
Alpinia Galanga Sw. কুলঞ্জন	ঐ	ঐ	কর্ষিত	কটু, তীব্র; জ্বর, কফ ও বাতরোগে ব্যবহৃত; মুখের দুর্গন্ধনাশক
Canna indica L. সর্ব্বজয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঘর্ম, মূত্র ও স্নিগ্ধকারক; জ্বর ও উদরীতে প্রযোজ্য
Musa sapientun L. কদলী	তরুসদৃশ	সকল অংশ	উত্তর বঙ্গ ও কর্ষিত	পক্ক ফল পুষ্টিকর খাদ্য; তেঁতুল সহযোগে অতি সারে প্রযোজ্য; কলার-আঠা মধুমেহে উপকারী; মূলরস জননেন্দ্রিয়ের রক্তস্রাব, মৃগী ও হিষ্টিরিয়ায় ব্যবহৃত
Amaryllidaceae সুথদর্শনবর্গ				
Curculigo orchioides Gaertn. তালমূলী	কন্দজ	কন্দজ	পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ	হাঁপানি, অর্শ, কামলা, উদরাময়, উদরশূল, মেহ ও দৌর্ব্বল্যে ব্যবহৃত
Crinum asiaticum L. সুথদর্শন	ঐ	ঐ	সর্ব্বত্র	কুইলের ন্যায় বমন ও ঘর্মকারক
Liliaceae পলাণ্ডুবর্গ				
Smilax macrophylla Roxb. কুমারিকা	বৃহৎ লতা	মূল	পশ্চিম বঙ্গ	রতিজ ব্যাধিচিকিৎসায় সার্সার ন্যায় ব্যবহৃত
Asparagus racemosus Willd. শতমূলী	ক্ষুদ্র গুল্ম	স্থূল মূল	সর্ব্বত্র	স্নিগ্ধকারক, পরিবর্ত্তক, আক্ষেপনিবারক; মোরুমারুপে ধ্বজভঙ্গে ব্যবহৃত

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
Allium sativum L. রসুন	ওষধি	কন্দ		কাস, জ্বর, অর্শ, স্নায়ু, বাত ও ক্ষয়রোগে ব্যবহৃত ; কর্ণ, স্নায়ু ও আক্ষেপযুক্ত রোগে ও অর্ব্বুদ পাকাইবার জন্য প্রলেপ
Scilla indica Baker. জঙ্গলী পিঁয়াজ	ঐ	ঐ		বমনকারক, কফনিঃসারক ; বিলাতী স্কুইলের সমতুল্য
Palmeae তালবর্গ				
Areca catechu L. সুপারি	তরু	ফল	রোপিত	সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক ; অজীর্ণ, উদরাময় ও ফিতা ক্রিমিরোগে ব্যবহৃত ; দগ্ধ সুপারি-চূর্ণ উত্তম দন্তমঞ্জন
Aroideae কচুবর্গ				
Amorphophallus campanulatus Bl. ওল	ওষধি	কন্দ	সর্ব্বত্র	অর্শরোগে ফলদায়ক, পুরাতন বাতে বাহ্য প্রয়োগ
Alocasia indica Schott. মানকচু	ঐ	ঐ	কর্ষিত	মৃদু বিরেচক, মূত্রকারক ; অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও শোথরোগে ব্যবহৃত ; মানমণ্ড উৎকৃষ্ট রোগীপথ্য
Scindaspus officinalis Schott. গজপিপ্পলী	লতানিয়া গুল্ম	ফল	চট্টগ্রাম	উত্তেজক, স্বেদজনক, ক্রিমিনাশক ; বাতে বাহ্য প্রয়োগ
Cyperaceae মুথাবর্গ				
Cyperus rotundus. L. মুথা	ওষধি	মূল	সর্ব্বত্র	উদর পীড়া ও জ্বরে ব্যবহৃত ; স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রলেপ

বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম	উদ্ভিদের প্রকৃতি	ঔষধে ব্যবহৃত অংশ	বাসস্থান	গুণ
C. scariosus R. Br. পাগর মুথা	ওষধি	মূল	সর্ব্বত্র	মৃগী, উদরাময়, রক্তিজ ব্যাধি ও জ্বরে প্রযোজ্য ; কেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধক
Gramineae তৃণবর্গ				
Andropogon squarrosus L. খস্‌খস্	ঐ	ঐ	ঐ	জ্বর, পিপাসা, পাকাশয়-প্রদাহ, পিত্তাধিক্য-রোগে ব্যবহৃত ; প্রলেপ শীতলকারক
A. Iwarancusa Jones করছুশ	বহুবর্ষজীবী	পত্র	বালুকাময় অনুর্ব্বর জমি	বাত, জ্বর, বিসূচিকা, কাস ও রক্তদুষ্টিতে প্রযোজ্য
A. Nardus L. গন্ধবেনা	ঐ	ঐ	রোপিত	উদর পীড়া, বিসূচিকা ও আন্ত্রিক জ্বরে ব্যবহৃত ; বাতে বাহ্য প্রয়োগ
Cynodon dactylon Pers. দূর্ব্বা	ওষধি	গাছ	সর্ব্বত্র	জ্বর, অতিসার, শোথ, উদরী, মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও প্রমেহ রোগে ব্যবহৃত ; পত্রের প্রলেপ রক্তরোধক
Bambusa arundinacea Willd. বাঁশ	বহুবর্ষজীবী	পত্র	ঐ	পত্র, মুকুল ক্ষত-পরিষ্কারক, রজঃনিঃসারক ; বংশলোচন উদরাধ্মান ও প্রস্কাঘাতে ব্যবহৃত

বারিমণ্ডল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

পণ্ডিতগণ ভূমণ্ডলকে প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার প্রস্তরময় কঠিন অংশের নাম দিয়াছেন শিলামণ্ডল (lithosphere), এই শিলামণ্ডলের অনেক অংশ জল দ্বারা আবৃত। তাঁহারা এই জলময় অংশের নাম রাখিয়াছেন বারিমণ্ডল (hydrosphere)। আর এই দুই মণ্ডলকে যে বায়বীয় আবরণ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার নাম বায়ুমণ্ডল (atmosphere)।

পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে গোলাকার হইত, তাহা হইলে শিলামণ্ডল কয়েক সহস্র ফুট গভীর জলরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত, কিন্তু স্থলভাগ অসমান বলিয়া এরূপ হইতে পারে নাই। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঐ প্রভূত জলরাশি নিম্নস্থানে একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ১৪৫,০০০,০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমুদায় ভূপৃষ্ঠের প্রায় বার আনা অংশই মহাসমুদ্র দ্বারা আবৃত। বলা বাহুল্য মহাদেশসমূহের অদূরস্থ সমুদ্র অগভীর হইলেও দূরবর্ত্তী সমুদ্র সাধারণতঃ অতীব গভীর। স্থলভাগের উচ্চতম অংশ (এভারেষ্ট শৃঙ্গ) ২৯০০২ ফুট, এবং মহাসমুদ্রের গভীরতম অংশ ৩২৬৪৪ ফুট। এই নিম্নতম অংশ জাপান দ্বীপপুঞ্জের ৫০ মাইল পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরমধ্যে অবস্থিত এবং টাস্‌কারোরা খাত (Tuscarora Deep) নামে অভিহিত।

বারিমণ্ডল অসংখ্য মৎস্য ও বহু জলচর হিংস্র ও নির্ব্বিরোধী জীবের আবাস স্থল। বর্ত্তমান যুগে বৃহৎ বৃহৎ জলযানসমূহ নির্ম্মিত হওয়াও জলপথ এরূপ নিরাপদ হইয়াছে; ৫।৭ দিনের মধ্যে লোকে নির্ব্বিঘ্নে প্রকাণ্ড আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পারাপার করিতেছে; প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিতেও কেহ আর এখন ভয় পায় না। ফলতঃ বহির্ব্বাণিজ্য ও সভ্যতাবিস্তারের পক্ষে সমুদ্রপথ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে।

যে জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি, উহা সৌরতাপের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সমুদ্রই বৃষ্টির অন্যতম মূলীভূত কারণ। মহাসমুদ্রের প্রভূত জলরাশি সূর্য্যতাপে সহসা যেরূপ উত্তপ্ত হয় না, সেইরূপ সহজে শীতলও হইতে পারে না। ফলে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ এবং উপকূলের নিকটস্থ দেশসমূহের জলবায়ু বার মাসই মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু যে সমঅক্ষাংশস্থিত পূর্ব্ব রুষিয়া অপেক্ষা বার মাসই সুখশীতল সমুদ্রের সান্নিধ্যই তাহার অন্যতম কারণ।

সমুদ্রবর্ণন— মহাসমুদ্রগুলির জল, তাহাদের তলদেশ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং

জীবাদির পর্য্যালোচনাকে সমুদ্র-বর্ণন বলে। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্ট এইরূপ বর্ণনার উপযোগী তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সলিল-অভিযানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত চ্যালেঞ্জার (Challenger) নামক জাহাজখানি চারি বৎসর কাল ধরিয়া আট্‌লাণ্টিক, প্রশান্ত, ভারত এবং দক্ষিণ মহাসাগরসমূহের বহু স্থানে ভ্রমণ করতঃ নানাপ্রকার পরীক্ষা করে। প্রথমতঃ অবশ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশে যাহাতে সহজে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়, তজ্জন্য মহাসমুদ্রের তলদেশে তার (cable) ফেলার চেষ্টা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সহজে এই ক্ষুদ্র কার্য্য সাধিত না হওয়ায় মহাসাগরসমূহের গভীরতা ও তলদেশের প্রকৃতিনির্ণয় বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে সমুদ্রের মধ্যে সুদীর্ঘ ওলন-দড়ি ফেলিয়া উহার গভীরতা নির্ণয় করা হইত। পরে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের (automatic machine) সাহায্যে ওলন-দড়ি ফেলার ও তোলার কার্য্য চলিত, কিন্তু ঐ উপায়ে ১৫,০০০ ফুট গভীর মহাসমুদ্রের মধ্যে এক ঘণ্টায় মাত্র একবার ওলন-দড়ি ফেলা ও উঠানো সম্ভবপর হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই কার্য্য একপ্রকার বিশিষ্ট যন্ত্রসাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে সম্পাদিত হইতেছে। যন্ত্রটির নাম জল-টেলিফোন। দ্রুতবেগে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে যে চাকা থাকে তাহা প্রবল বেগে ঘুরে বলিয়া মহাসাগরের জলের মধ্যে চাকার আঘাতে একটা আলোড়ন ঘটে। উহার ফলে শব্দতরঙ্গ (sound waves) উৎপন্ন হয়। ঐ তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮৪০ ফুট হিসাবে চলে। উহা অবশ্য জলের মধ্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব—সকল দিকেই চলিয়া থাকে। জাহাজের অগ্রভাগে জলের মধ্যে হাইড্রোফোন (hydrophone) বা জল-টেলিফোন নামক যন্ত্র আবদ্ধ থাকে। উপরোক্ত শব্দতরঙ্গ জাহাজের চক্র হইতে প্রথমে সমুদ্রের তলদেশে যায় এবং পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐ যন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। যন্ত্রটি বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে এবং আপনা হইতেই শব্দতরঙ্গের সমুদ্রতলে যাতায়াতের সময় নির্ভুলভাবে যন্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং এই সময় দৃষ্টে মহাসাগরের স্থানীয় গভীরতা সহজেই নির্ণীত হইয়া থাকে।

জল-টেলিফোনের সাহায্যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে মহাসমুদ্রের অংশবিশেষের গভীরতা মাত্র নির্ণয় করা চলে। ওলন-দড়ি দ্বারা কিন্তু একবারেই মহাসাগরের গভীরতা, উহার তলদেশের ও জলের উত্তাপ উপলব্ধি করা যায়। ওলন-দড়ির সহিত আবদ্ধ একটি চর্ব্বি-মাখানো পাত্র সাগরের তলদেশের মৃত্তিকা উপরে তুলিয়া আনে। তাহাতে তলদেশের মৃত্তিকা ও তত্রত্য উদ্ভিদের নমুনা পাওয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় সাগরজলের উত্তাপ কত তাহা দেখিবার জন্য ওলন-দড়ির স্থানে স্থানে তাপমান যন্ত্র আটকাইয়া দিলে বিভিন্ন গভীরতায় সলিলস্তরের তাপও জানা যায়।

জেলেরা যেমন টানাজালের সাহায্যে নদীর তলদেশ হইতে মৎস্য ধরে, অনেক সময় ঐরূপ বৃহৎ বৃহৎ জালের দ্বারাও সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিদের নমুনা উত্তোলিত হইয়া

থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অতীব দুঃসাধ্য। সেইজন্য ওলন-দড়ির স্থানে স্থানে রেশমী বস্ত্রের জাল বাঁধা হয়। সেণ্ট্রিফিউজ (Centrifuge) নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে, উহা জলের মধ্যে অতি দ্রুতবেগে ঘুরে। ফলে এক পাইণ্ট জলের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যত জীবাণু থাকিতে পারে, তাহা একবিন্দু জলের মধ্যে একত্রিত হয়। তখন ঐ জলবিন্দু লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে পরীক্ষা করা চলে।

মহাসমুদ্রের তলদেশ—মহাদেশের উপকূল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত মহাসাগরের তলদেশ সাধারণতঃ সমতলক্ষেত্র বিশেষ। ভূপৃষ্ঠের ১/৩ অংশ স্থান ব্যাপিয়া এইরূপ সমতল অবস্থা দেখা যায়। অবশ্য ইহার স্থানে স্থানে গভীর খাত এবং উচ্চ আগ্নেয়গিরিশিখর না আছে এমন নহে। আটলাণ্টিক মহাসাগরস্থ পোর্টোরিকো দ্বীপের অদূরে অবস্থিত ‘নেয়ার খাত’ (Nares Deep) ২৭,৯৭২ ফুট গভীর। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান দ্বীপপুঞ্জের ৫০ মাইল পূর্ব্বে ৩২,৬৪৪ ফুট গভীর টাস্‌কারেরা খাত এখন পর্য্যন্ত গভীরতম খাত বলিয়া পরিচিত। আটলাণ্টিক মহাসাগরের দ্বীপাবলীর মধ্যে বার্ম্মুডাজ, আজোর্স, ক্যানারী ও কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ প্রধান। আর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত অনুরূপ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে লাড্রোন এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ প্রধান।

মহাদেশসমূহের উপকূলস্থ সমুদ্রের তলদেশ শিলাচূর্ণে পূর্ণ দেখা যায়। এই চূর্ণ ঝড়, বৃষ্টি, নদীস্রোত এবং সামুদ্রিক তরঙ্গাঘাতে ভূপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রে নীত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উপকূলস্থ সমুদ্রের খাতগুলি পূর্ণ হইয়া অবশেষে সমতল ক্ষেত্রে রূপান্তর লাভ করে। গভীর জলের ভীষণ চাপে এই শিলাচূর্ণ স্তরীভূত প্রস্তরে (sedimentary rock) পরিণত হয়।

মহাদেশ হইতে দূরতম মহাসাগরের তলদেশ একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্ ও জীবকঙ্কালে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে শিলাচূর্ণও যে না থাকে এমন নহে। এতদ্ভিন্ন দূরবর্ত্তী আগ্নেয়গিরিসমূহ হইতে যে প্রভূত ভস্মরাশি ঊর্দ্ধাকাশে মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের ফলে আকাশপথে ইতস্ততঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, উহার কিয়দংশও মহাসমুদ্রের উপরে পতিত হইয়া পরিশেষে তলদেশে জমিয়া থাকে।

জীবিত অবস্থায় সমুদ্রমধ্যে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শম্বুক জাতীয় জীব ঘুরিয়া বেড়ায়, মৃত্যুর পর তাহাদের খোলগুলা সমুদ্রের তলদেশে জমিয়া জৈব স্তরের উৎপত্তি ঘটায়। পণ্ডিতগণ এইরূপ স্তরকে globigerina ooze বলেন। সুগভীর মহাসমুদ্রের তলদেশে জলরাশির অতীব প্রচণ্ড চাপের ফলে পূর্ব্বোক্ত জীবাণুসমূহের গলিত খোলা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া শিলাস্তরে পরিণত হয়। আমাদের স্কুল কলেজে নিত্য ব্যবহার্য্য খড়িমাটি জীবাণুকঙ্কাল দ্বারা প্রস্তুত শিলা ভিন্ন আর কিছু নহে।

দক্ষিণ মহাসাগরের তলদেশে একপ্রকার উদ্ভিদাণুর দেহাবশেষ মৃত্তিকায় রূপান্তরিত

অবস্থায় দৃষ্ট হয়। উহার নাম diatom ooze। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নিম্নভাগে অবস্থিত radiobaria ooze অন্য প্রকার জৈব স্তরবিশেষ।

সমগ্র বারিমণ্ডলের ১/৩ অংশ একপ্রকার লোহিতবর্ণের মৃত্তিকায় আবৃত বলিয়া মনে হয়। এই মৃত্তিকাস্তর আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত লোহিত ভস্ম এবং সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ হইতে উৎপন্ন।

সারার্থ—ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা মহাসমুদ্রের তলদেশ অধিক পরিমাণে সমতল। ইহার কারণ :—

(১) মহাসমুদ্রের তলদেশে পর্ব্বত ও আগ্নেয়গিরির সংখ্যা খুব কম।

(২) রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, নদী, তুষার নদী (glacier) প্রভৃতি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের স্থানবিশেষ ক্ষয়িত হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া পড়ে। আর ঐ সকল ক্ষয়িত পদার্থ কোন কোন স্থানে একত্রীভূত হইয়া ভূপৃষ্ঠ উচ্চতর করে। সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া যখন ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে থাকে, তখন উহার সহিত এত বালুকাকণা উড়ে যে আকাশ একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে স্থানে স্থানে সহসা বালুকা-শৈল (sand-dunes) উৎপন্ন হয়, এবং কোথাও বা বালুকারাশি অন্য স্থানে নীত হওয়ায় শৈলময় অঞ্চল দেখিতে দেখিতে সমতলে পরিণত হইয়া যায়। মহাসাগরের তলদেশে এই সকল উপসর্গের অভাব বশতঃ উহা অনেকটা সমান থাকে।

(৩) উপকূলের অদূরস্থ সমুদ্রতল বৃষ্টি ও নদীস্রোতের দ্বারা বাহিত বালুকাকণা চূর্ণে কিন্তু দূরস্থ মহাসমুদ্র জীব ও উদ্ভিদ্‌বিশেষের দেহাবশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই সকল কারণে মহাসমুদ্রের তলদেশের সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল, ভূপৃষ্ঠের ন্যায় উঁচুনীচু নহে।

সমুদ্রজল—উত্তাল তরঙ্গমালা ও জোয়ারভাঁটার ফলে সমুদ্রের উপরিভাগ সর্ব্বদা সংক্ষুব্ধ থাকে। উপরোক্ত দুইটি কারণের অভাব ঘটিলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে স্থিরীভূত হইয়া জল গোলকের সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ কাল্পনিক অবস্থার সমুদ্রপৃষ্ঠকেই সমুদ্র-তল (sea level) বলে এবং এই তল হইতেই দেশ ও পর্ব্বতাদির উচ্চতা স্থির করা হয়। উপকূলস্থ সমুদ্র জোয়ারভাঁটা ও তরঙ্গে সর্ব্বদা সংক্ষুব্ধ থাকে বলিয়া কোনও স্থানের সর্ব্বোচ্চ জোয়ার ও সর্ব্বনিম্ন ভাঁটার গড় উচ্চতাকে সচরাচর সমুদ্র-তল ধরা হয়।

পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিক জল-গোলার্দ্ধের বক্র পৃষ্ঠের সহিত সমুদ্র-তলের সর্ব্বাংশের সকল সময় মিল হয় না, কারণ উপকূলস্থ স্থলভাগের আকর্ষণে সমুদ্রবারি অনেকটা উন্নীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ঝড় ও ঘূর্ণী বাতাস স্থানবিশেষের জলরাশিকে অল্প কালের জন্য আন্দোলিত করে।

সমুদ্র-তল যে চিরকালই এক অবস্থায় থাকে, তাহা নহে। কালক্রমে ইহারও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন তিনটি কারণে সংঘটিত হয়, যথা :—

(১) নদীস্রোত ও সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা স্থলভাগ নিয়ত ক্ষয় পাইতেছে। এই ক্ষয়িত

স্থলভাগ কালক্রমে বালুকা ও কর্দ্দমে রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় লাভ করিতেছে এবং সমুদ্রের তলদেশ অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। সুতরাং ইহার উপরিস্থ জলরাশির পৃষ্ঠদেশও অনেকটা উন্নত হইতে বাধ্য। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কোন কোন সমুদ্রে জৈব স্তরের উপর প্রায় ২।৩ ফুট উচ্চ লাল শৈল-মৃত্তিকা স্তর জমিয়াছে। অতএব তথায় তলদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অবশ্যই ২।৩ ফুট উচ্চ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমুদ্র-তলও যে কিঞ্চিৎ উন্নত হয় নাই এমন নহে।

(২) সৌরতাপ প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে জলরাশি নিয়ত বাষ্পে রূপান্তরিত হইয়া উর্দ্ধাকাশে নীত হইতেছে। তৎপরে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া পর্ব্বতশিখরে জমিয়া বরফে পরিণত হইতেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে অতি প্রাচীন কালে তুষার যুগে ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই সুগভীর তুষারস্তূপে আবৃত ছিল। সুতরাং তখন সমুদ্রজলের ঐ পরিমাণ অভাব বশতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ অবশ্যই বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কয়েক ফুট নিম্ন ছিল বুঝিতে হইবে।

(৩) ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রভাবে এবং ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের ন্যায় সমুদ্রের তলদেশও কখন অনেকাংশ উন্নত, আবার কখনও বা অবনমিত হইয়া থাকে। ইহাতেও সমুদ্র-তলের সাময়িক পরিবর্ত্তন না ঘটে এমন নহে।

সমুদ্রজলের উপাদান—পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে সাগরজলের শতকরা ৩½অংশ দ্রবীভূত ধাতব পদার্থে পূর্ণ। আবার ইহার ⅞ভাগই সাধারণ লবণের সমষ্টিমাত্র। যদি বারিমণ্ডলকে লবণশূন্য করিয়া ঐ লবণরাশিকে ভূপৃষ্ঠের উপর ছড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইত, তবে লবণস্তরের পরিমাণ ৫৫০ ফুটেরও অধিক উচ্চ হইত। রৌদ্রপ্রভাবে সমুদ্রের জল শুকাইয়া অনেক দেশেই লবণ সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব্বকালে 'নুনিয়া' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক বঙ্গোপসাগরের জল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করিত। সেই লবণ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য সোডিয়ম-ক্লোরাইড লবণ ব্যতীতও সমুদ্রের জলে ম্যাগনেসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম-ক্লোরাইড, ক্যালসিয়ম, পোটাসিয়ম-সালফেট রহিয়াছে। এমন কি স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থও কিয়ৎপরিমাণে উহাতে না পাওয়া যায় এমন নহে। শামুক, গুগ্‌লি ও শঙ্খ প্রভৃতির খোলা পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করা হয়। এই চুণ লোকে পানের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাগরজলে চুণ (carbonate of lime) যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রবাল কীট ও শম্বুকাদি সামুদ্রিক জীব উহা খাইয়া নিজ নিজ দেহের আবরণের (shell) সৃষ্টি করে। ঐ আবরণ বা খোলা মৃত জীবের দেহের সহিত সমুদ্রের তলদেশে স্তূপীকৃত হয় ও কালে চুণা পাথরের উৎপত্তি ঘটায়। এই চুণা পাথর বা

* "If all the salt of the oceans could be removed, it would make a layer about 400 feet thick over the earth."—*The New Physical Geography* (1933) by Ralph S. Tarr and O. D. von Engeln, p. 332.

ঘুটিং পোড়াইলে চুণ প্রস্তুত হয়। সিমেণ্ট প্রস্তুত ও লৌহ গলাইবার জন্য ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাসাগরের জলের সহিত সামান্য পরিমাণ অম্লজান (oxygen) মিশ্রিত থাকে। উর্দ্ধাঃ স্রোতের প্রভাবে ঐ অম্লজান গ্যাস মহাসাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। তাহাতেই নানাবিধ জীব সমুদ্রনিম্নে থাকিয়াও শ্বাসগ্রহণে অসুবিধা ভোগ করে না।

পৃথিবীর বয়স—কতকাল পূর্ব্বে যে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই আমাদের মনে কৌতূহল জন্মে। এই কৌতূহলপরিতৃপ্তির জন্য পণ্ডিতগণ বিবিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া থাকেন, যথা :—

(১) ভৌগোলিকগণ সমুদ্রজলের লবণের পরিমাণ নির্ণয় দ্বারা একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীর কঠিন শিলামণ্ডল (lithosphere) অর্থাৎ ভূভাগ নানা জাতীয় লবণে পরিপূর্ণ। এই লবণের কিয়দংশ নদীপথে প্রতিনিয়ত সমুদ্রে নীত হইতেছে বলিয়াই মহাসমুদ্রের প্রভূত জলরাশি লবণাক্ত। এক্ষণে যদি স্বীকার করা যায় যে যুগযুগান্তর ধরিয়া বাহিত নদীজলের এই লবণই সাগরজলের লবণের একমাত্র কারণ, তবে আমরা অনায়াসে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসাব করিতে পারি। আমরা জানি সমগ্র বারিমণ্ডলের ক্ষেত্রফল হইতেছে ১৪৫,০০০,০০০ বর্গমাইল। ইহার গড় গভীরতা ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৪ মাইল ধরা যাইতে পারে। গণিতের সাহায্যে বারিমণ্ডলের মোট লবণের পরিমাণ ১৪,১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন বলিয়া ধরা হইয়াছে, আর প্রতি বৎসর নদীপথে আনীত লবণের পরিমাণ ১৫৮,৩৫৭,০০০ টন। সুতরাং মোট লবণকে বাৎসরিক আনীত লবণ দ্বারা ভাগ করিলে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৮৯,২২২,০০০ বৎসর হয়। বারিমণ্ডলের উপরোক্ত মোট লবণের পরিমাণ কিছু নিভুল নহে, এবং প্রতি বৎসর নদীসমূহ দ্বারা বাহিত লবণের মাত্রাও অভ্রান্ত নয়। তথাপি পৃথিবীর বয়স মোটামুটি ৭ কোটি হইতে ১০ কোটি বৎসর ধরা চলে।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডাব্‌লিন সহরে অবস্থিত ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক জে, জলি উপরোক্ত উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করেন।

(২) ভূপঞ্জরের ক্ষয়ের পরিমাণ সাহায্যেও পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যায়। দিবাভাগে রৌদ্রপ্রভাবে পর্ব্বতগাত্র উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বাড়ে *। আবার রাত্রিকালে তাপক্ষয়ের ফলে উত্তপ্ত পর্ব্বতগাত্র শীতল হইয়া আয়তনে হ্রাস পায়। দীর্ঘ কাল ধরিয়া

* উত্তাপ পাইলে দ্রব্য যে আয়তনে বৃদ্ধি পায় ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। গাড়ীর চাকার উপরে লোহার হাল বসাইবার সময় কামারেরা লোহার বেড়টাকে প্রথমে খুব গরম করে। তাহাতে উহার আকার অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ঐ অবস্থায় কাষ্ঠের চাকার উপরে উহাকে রক্ষা করিয়া জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করে। শৈত্যের ফলে আয়তন হ্রাস পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে হালখানা চাকার উপরে কামড়াইয়া বসে।

পর্ব্বতগাত্রের এইরূপ দিবাভাগে বৃদ্ধি ও রাত্রিকালে হ্রাস ঘটায় উহার উপরিভাগ অনেকটা আল্‌গা হইয়া পড়ে। তখন ঝড় ও বৃষ্টির আঘাতে উহা অন্যত্র নীত হয়। ফলে নূতন নূতন স্তরের আবির্ভাব ঘটে। উহাও কালক্রমে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া নিম্নদেশে সঞ্চিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ভূপঞ্জরের অধিকাংশ স্থানেরই এইরূপ পরিবর্ত্তন অল্পাধিক পরিমাণে নিয়ত ঘটিতেছে। তবে এই পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

নদীর স্রোত দ্বারাও পর্ব্বতগাত্রের ক্ষয় হইয়া থাকে। এক বৎসরে ইহার পরিমাণ অবশ্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু যুগযুগান্তরের হিসাব লইলে ইহার মাত্রা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে কলোরেডো নামে একটি নদী আছে। উহা তত্রত্য পর্ব্বতগাত্রের উপর দিয়া বহিবার সময় অল্প অল্প করিয়া গভীর খাতের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানে স্থানে এই খাতের গভীরতা ১ মাইলেরও অধিক দেখা যায়। কঠিন পর্ব্বতগাত্রে এইরূপ সুগভীর খাত উৎপন্ন হইতে যে কত যুগযুগান্তর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা অনেকটা অনুমান করা চলে।

নিউইয়র্ক ও ফিলাডেল্‌ফিয়া সহর দুইটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে অংশে অবস্থিত, সেই অঞ্চলে এককালে নাকি অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কালক্রমে ক্ষয় হইতে হইতে উহা এখন সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের আরাবল্লী পর্ব্বত এককালে ঊর্দ্ধাকাশে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। তখন অভ্রভেদী বর্ত্তমান হিমালয়ের জন্মও হয় নাই। ভূমধ্য মহাসাগরের বিশাল জলরাশি তখন সাহারা মরুর উপর দিয়া আসাম পর্য্যন্ত নাকি বিরাজ করিত। আরব, পারস্য ও আর্য্যাবর্ত্তের তখন অস্তিত্বও ছিল না। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! আরাবল্লীর উন্নত শির রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতের সংঘর্ষের ফলে নিয়ত ক্ষয় পাইতে পাইতে এখন অনুচ্চ পাহাড়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। এককালে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের (পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের) জ্বালামুখ (crater) হইতে প্রভূত লাভা ও ভস্মরাশি উদ্গীরিত হইত। বোম্বাই প্রদেশের কৃষ্ণ মৃত্তিকা ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এখন সহ্যাদ্রিকে কেহ আগ্নেয়গিরি বলিয়া চিনিতে পারেন কি? হিমালয়ের গাত্র হইতে বালুকা ও কর্দ্দমাদি আনিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বাঙ্গালা দেশের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণনগরাদি অনেক নগর ও গ্রামে ইন্দারা খুঁড়িতে খুঁড়িতে এখনও নৌকার কাঠ পাওয়া যায়। সুতরাং নিম্ন বাঙ্গালা যে এক দিন জলমগ্ন ছিল ইহা অনুমান হয়। এই সকল বহুবিধ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভূতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে পৃথিবীর বয়স* কোটি কোটি বৎসরের কম নহে।

* (১) পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্য উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, যথা—

(ক) লর্ড কেল্‌ভিন মিঃ কোরিয়ারের তাপগতির তথ্য হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগ জমাট হইতে যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা ২ কোটি বৎসরের কম বা ১০ কোটি বৎসরের অধিক নহে।

সমুদ্রজলের ঘনত্ব ও চাপ—নদীর বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা সমুদ্রের লবণাক্ত জল বেশী ভারী। নদীজলের ঘনত্ব ১ ধরিলে সাগরজলের গড় ঘনত্ব ১·০২৬ হয় তবে বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মমণ্ডলের (doldrums) সমুদ্রজল অনেকটা কম ঘন। আবার যে সকল সমুদ্রের জল সৌরতাপের প্রভাবে অধিকতর বাষ্পীভূত (evaporation) হয় তাহার ঘনত্ব অন্যান্য সমুদ্রের জল অপেক্ষা কিছু বেশী। ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের জল বঙ্গোপসাগরের জল অপেক্ষা অনেক ঘন।

গভীর মহাসমুদ্রের তলদেশে জলের চাপ খুব বেশী। এক মাইল নীচে জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১ টনেরও অধিক (১ টন = প্রায় ২৭৷০ মণ)। তলদেশে এই চাপ প্রায় ৬ টন দেখা যায়। ইহাতে মনে হইতে পারে যে এই প্রচণ্ড চাপের ফলে তলদেশের জীবজন্তু পিষিয়া মারা যাইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় না। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর প্রায় ৭৷০ সের। তথাপি আমরা বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে অনায়াসে বিচরণ করিতেছি, বায়ুর প্রচণ্ড চাপ আদৌ অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমাদের শরীরের বহির্ভাগে যেরূপ চাপ পড়িতেছে, শরীরের অভ্যন্তর হইতেও সেই অনুপাতে উল্টা চাপ দিতেছে বলিয়াই আমরা বায়ুচাপে ক্লিষ্ট হই না। সামুদ্রিক জীবগণও শরীরের অন্তর ও বাহিরের সমান চাপের জন্য তলদেশে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। উত্তর

(খ) জোয়ারভাঁটার ফলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিতে চাহেন যে পৃথিবী যদি ১০ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে জমাট হইত, তবে দ্রুত আহ্নিক গতির ফলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মেরুপ্রদেশকে চওড়া করিতে চেষ্টা করিত ; কিন্তু তাহা হয় নাই।

(গ) সূর্য্য হইতে প্রতিনিয়ত আকাশমার্গে তাপ বিকিরিত হইতেছে। এই তাপের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে। সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে বিকীর্ণ সুতরাং সমভাবে ক্ষয় পাইতেছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ অনুমান করিয়াছেন যে ৫৬ কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্য্য তাপহীন হইয়া যাইবে। সূর্য্যের উত্তাপ সমানভাবে কমিতেছে অনুমান করিয়া অধ্যাপক টেট্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্য পৃথিবীকে দেড় কোটি হইতে দুই কোটি বৎসরের অধিক কাল উত্তাপ দেয় নাই।

(ঘ) সীসা নাকি ইউরেনিয়ম নামক ধাতুবিশেষের শেষ পরিণাম। বল্টউড কতকগুলি ইউরেনিয়মসংশ্লিষ্ট ধাতুর বয়স নির্ণয় করিয়াছেন। উহার পরিমাণ ২৪ কোটি হইতে ১৩২ কোটি বৎসর। নরওয়ে এবং সিংহল দ্বীপের আদিম পর্ব্বত হইতে যে সব ধাতু পাওয়া গিয়াছে, উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স ১৩২ কোটি বৎসরের বেশী ভিন্ন কম হইতে পারে না।

(২) জীবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা অধ্যাপক ডারুইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবীর বয়স ৯ হইতে ১০ কোটি বৎসরের কম নহে।

দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর বয়স ২ কোটি হইতে ১৩২ কোটি বৎসরেরও অধিক। কালে কালে আরও কত বাড়িবে কে জানে। আমাদের পঞ্জিকাকারগণের মতে শ্বেত বরাহ কল্পাব্দের পরিমাণ ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসর। হয়ত কালে ইহা আর নিছক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না।

মহাসাগরে আইস্‌ল্যাণ্ড নামে একটি দ্বীপ আছে। উহার নিকটে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক কড্ মাছ ধরা পড়ে। যখন ঐ সকল মাছকে হঠাৎ জাহাজের উপরে তোলা হয়, তখন উহাদের গা ফাটিয়া যায় ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে। বাহিরের চাপ সহসা কমিয়া যাওয়ায় ভিতরের চাপের ফলে মুখ দিয়া নাড়ী বাহির হয় এবং চক্ষুর গোলক যেন বাহির হইয়া আসে। চ্যালেঞ্জার নামক জাহাজ হইতে ওলন-দড়ির সঙ্গে হাল্কা কাঠ ও কর্ক গভীর মহাসাগরের তলদেশে নামাইয়া দিয়া যখন উহা পুনরায় উপরে তোলা হয়, তখন ঐ কাঠ ও কর্ক জলের অত্যধিক চাপের ফলে পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া পড়ে। জলে ফেলিলে তখন আর ঐগুলি পূর্ব্বের ন্যায় ভাসে না। ইহা হইতেই গভীর মহাসমুদ্রের তলদেশে জলের চাপের মাত্রা অনেকটা অনুমান করা যায়। অত্যধিক চাপের ফলে কাঠ ও কর্কের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইলেও তলদেশের জলের ঘনত্ব কিন্তু বেশী নয়। বাতাসের মত জল চাপে বিশেষ ঘন হয় না বলিয়াই এরূপ ঘটে।

সমুদ্রজলের নানাবিধ বর্ণ—মহাসমুদ্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণ একরূপ নহে। কোথাও ইহাকে লাল (যথা লোহিত সাগর), কোথাও হল্‌দে (যথা পীত সাগর), কোথাও সবুজ (যথা উপকূলের অদূরে ও উচ্চ অক্ষাংশে), কোথাও বা কাল (জাপানের অদূরস্থ কুরুসিয়ো বা কৃষ্ণস্রোতে) দেখায়। সূর্য্যরশ্মির বিভিন্ন রূপ প্রতিফলনের জন্যই এইরূপ ঘটে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু জলের বর্ণ ঐরূপ নয়।

সূর্য্যকিরণ সমুদ্রের জলকে অবশ্য আলোকিত করে, অগভীর অংশের তলদেশ পর্য্যন্ত উহা না যাইতে পারে এমনও নহে, কিন্তু গভীর মহাসাগরের তলদেশে পৌঁছায় না। ঐ অংশ অমানিশার অন্ধকার অপেক্ষাও গাঢ়তর তমসাচ্ছন্ন। জোনাকি পোকা ও অন্যান্য অনেক কীটপতঙ্গের দেহ হইতে যেরূপ আলোক নির্গত হইয়া থাকে, সমুদ্রতলচারী অনেক মৎস্যের উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণের দেহ হইতেও তেমনি একপ্রকার আলোক বহির্গত হয়। অনেক মৎস্যের শুঁয়ার (feelers) অগ্রভাগ হইতে আলোক বাহির হয় বলিয়া উহাকে বিদেশীয়গণ সমুদ্র-লণ্ঠন (deep-sea lantern) বলে। সমুদ্রের উপরিভাগেও এমন অনেকপ্রকার জীব থাকে যাহাদের দেহ হইতেও একপ্রকার আলোক বাহির হয়। একখানা নৌকা বা জাহাজ চলিয়া গেলে সমুদ্র জলের উপরে যে একটা দাগ পড়ে, উহা অসংখ্য জলজ কীটাণুর দেহনিঃসৃত আলোকের ফল মাত্র।

আপাতবর্ণহীন অর্থাৎ শুভ্র সূর্য্যরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের আলোকতরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। এক-খানি ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়া উহা পরিচালিত হইলে ঐ সকল আলোকতরঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে বাহির হয় এবং তজ্জন্য বিচিত্র বর্ণের আলোকবৃত্তের (spectrum) উৎপত্তি ঘটে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সকাল ও সন্ধ্যাকালে অনেক সময় রামধনু দেখা যায়। আকাশে ভাসমান জলকণা-সমূহের মধ্য দিয়া চলিবার সময় সূর্য্যরশ্মির আলোকতরঙ্গসকল বিভিন্ন কোণে বাঁকিয়া

চলে বলিয়াই লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের আবির্ভাব ঘটে। ঊর্দ্ধাকাশে ভাসমান দানাদার তুষারকণার মধ্য দিয়া চলিবার সময় সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যসভা এবং চন্দ্ররশ্মি চন্দ্রসভার (halos) সৃষ্টি করে। ফুল ও পত্রের বিচিত্র বর্ণের কারণও সূর্য্যালোকের প্রতিফলন। সূর্য্যকিরণ কাগজ ও অন্য কোন শুভ্র পদার্থের উপর পড়িলে সমুদায় আলোকতরঙ্গগুলি প্রতিফলিত বা সমানভাবে বক্র হইয়া থাকে। তজ্জন্যই কাগজাদি শাদা দেখায়। কিন্তু কাল চুল বা কাপড় প্রায় সমগ্র আলোকতরঙ্গগুলিকে গ্রাস করে (absorb) বলিয়া অতি সামান্য আলোকই প্রতিফলিত অথবা বাহির হইতে পারে। ফলে চুলকে কাল দেখায়। লাল ফুল লাল আলোকতরঙ্গগুলিকে এবং সবুজ পত্র সবুজ তরঙ্গগুলিকে মাত্র প্রতিফলিত করে। তাহারই ফলে ফুলটিকে লাল, কিন্তু পত্রটিকে সবুজ বলিয়া মনে হয়। আকাশকে কখন দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র, কখন গাঢ় নীল, আবার কখন বা লাল-নীল-পীতাদি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মিই উহার কারণ। নিম্নস্তরের বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ ধূলিকণা এবং গ্যাস-কণিকা বিদ্যমান থাকে। মোটা ধূলিকণা আলোকতরঙ্গগুলিকে সমানভাবে প্রতিফলিত করে বলিয়া আকাশকে কখন কখন শাদা মনে হয়। আবার যখন গ্যাসকণিকা এবং অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাসমূহ কেবলমাত্র নীল আলোকতরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করে তখন আকাশ নীল দেখায়। বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ অধিক হইলে দীর্ঘতর লাল ও হল্‌দে আলোকতরঙ্গসকল বিচ্ছুরিত (scattered) হইতে পারে। তখন আকাশ লাল বা হল্‌দে বলিয়া মনে হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি ঘটে,—ধূলিকণাপূর্ণ নিম্নাকাশের মধ্য দিয়া চলিবার সময় সূর্য্যালোককে অধিকতর ধূলিকণাপূর্ণ বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে। ফলতঃ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে আকাশের বিভিন্ন বর্ণ আলোকতরঙ্গের প্রতিফলন ও বিভিন্ন কোণে বক্র হইয়া গমনের ফল মাত্র।

নীলাকাশের বর্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হওয়ায় মহাসাগরকে গাঢ় নীল দেখায় বটে, কিন্তু ইহার অপর কারণ আলোকতরঙ্গসমূহের বিভিন্ন কোণে বক্র হওয়া। জলের মধ্য দিয়া চলিবার সময় যখন নীল (indigo) ও ব্লু (blue) তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়, তখন মহাসমুদ্রকে গাঢ় নীল বলিয়া মনে হয়। উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রজলের সহিত প্রচুর ধূলিকণা মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল ধূলিকণা মাত্র সবুজ আলোকতরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করে, ফলে উপকূলের অদূরস্থ সমুদ্রের জল সবুজ বর্ণ ধারণ করে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত সমুদ্রের উপরিভাগে যথেষ্ট জীবাণু সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। উহারা অনেকটা ধূলিকণার ন্যায় কার্য্য করে ও তজ্জন্য তত্রত্য মহা-সাগরের জল সবুজ বলিয়া মনে হয়। চীনের হোয়াং-হো (পীত-নদী) প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের পলিমাটি আনিয়া মোহনায় ফেলে। তাহার ফলে পীত সাগরের জলকে হল্‌দে দেখায়। ভাসমান অসংখ্য লোহিত জীবাণুর জন্য আরবের পশ্চিমস্থ সাগরটির

নাম হইয়াছে লোহিত সাগর। কিন্তু ঘটি বা অন্য কোন পাত্রে উঠাইলে ঐ জল লাল বলিয়া মনে হয় না। ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের নিকটস্থ আট্‌লান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের জল গাঢ় নীল। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের জলও অনেক স্থানে গাঢ় নীলবর্ণবিশিষ্ট। ঐ সকল স্থানের জলে ধূলিমৃত্তিকার অভাবও অন্যতম কারণ। প্রবাল দ্বীপের নিকটস্থ সাগরজলও গাঢ় নীল বলিয়া মনে হয়। তত্রত্য সাগরজলে চূণের (calcium carbonate) আধিক্যই ইহার কারণ বুঝিতে হইবে।

সারার্থ—সূর্য্যকিরণকে শুভ্র বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উহা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কতকগুলি আলোকতরঙ্গের সংমিশ্রণের ফল মাত্র। বারিমণ্ডলের এক এক অংশের বর্ণ এক এক রূপ। আলোকতরঙ্গের বিভিন্নরূপ প্রতিফলনই এই বর্ণপার্থক্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইবে। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে আকাশকে যে সকল কারণে কখন শুভ্র, কখন পীত, কখন লোহিত, আবার কখন বা ব্লু দেখায়, সে সকল কারণেই সমুদ্রকেও লাল, নীল, সবুজ ও হলদে বলিয়া মনে হয়। পীত ও লোহিত আলোকতরঙ্গগুলি অধিকতর দীর্ঘ। যে সকল স্থানে সমুদ্রের জলে পলিমৃত্তিকা বা জীবাণুর পরিমাণ অনেক বেশী সেই জল হইতে সবুজ এবং ব্লু তরঙ্গ অপেক্ষা লাল ও হলদে তরঙ্গগুলিই বেশী পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। তজ্জন্য ঐ সব স্থানের সমুদ্র লাল এবং হলদে বলিয়া মনে হয়। গভীর সমুদ্রের তলদেশে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেই কারণে ঐ স্থান নিবিড় অন্ধকারময়। তবে ঐ স্থানে যে সকল মৎস্য ও অন্যান্য জীব বসবাস করে, উহাদের গাত্র হইতে একপ্রকার আলোক নির্গত হওয়ায় ঐ অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়া থাকে।

মহাসাগর ও উত্তাপ—সূর্য্যই গ্রহ উপগ্রহ সকলকে তাপ বিতরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র সমানভাবে উত্তাপ বিকীরণ করে না। গ্রীষ্মমণ্ডলের উপর অনেকটা খাড়াভাবে কিরণ পতিত হয় বলিয়া ঐ অঞ্চলের সাগরপৃষ্ঠ ৮০° হইতে ৮৫° ফারেন্‌হাইট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে যতই মেরুমণ্ডলের দিকে যাওয়া যায়, সূর্য্যরশ্মি ততই তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়। ফলে মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ ততই কম তাপ পাইয়া থাকে। সেই জন্যই মেরুদ্বয়ের নিকটস্থ সমুদ্রজলের তাপ ২৮° হইতে ২৯° ফারেন্‌হাইট। আবার যে সকল সমুদ্রে স্থশীতল স্রোত প্রবেশ করিতে পারে না তাহাদের জল অনেকটা উত্তপ্ত হয়। স্থলবেষ্টিত লোহিত সাগরের মধ্যে কোন শীতল স্রোত প্রবেশের আদৌ সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য উহার পৃষ্ঠদেশ ৯০° হইতে ৯৫° ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ঐ সমুদ্রের অধিকাংশ স্থানই গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সামুদ্রিক স্রোতের প্রকৃতির উপরও সমুদ্রবিশেষের উত্তাপ অনেকটা নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যকিরণ মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না,

রৌদ্রপ্রভাবে মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ মাত্র কিঞ্চিৎপরিমাণে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু যতই নীচের দিকে নামা যায়, প্রথম প্রথম ততই তাপ দ্রুতবেগে কমিতে থাকে; পরিশেষে গভীর স্তরে ঐ পরিমাণে কমে না, অতি সামান্যই তাপহ্রাস দৃষ্ট হয়। জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিমস্থ আট্‌লান্টিক মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশের তাপ ৬৮° ফাঃ, কিন্তু ২০০ বাম (fathom) নিম্নে ৫৪°, ৫০০ বাম নীচে ৫২°, ১০০০ বাম নিম্নে ৩৮°, ১৫০০ বাম নীচে ৩৭° এবং ২০০০ বাম নিম্নে ৩৫° ফাঃ তাপ দেখা যায়। বারিমণ্ডলের সর্ব্বত্র, এমন কি বিষুবরৈখিক সমুদ্রেরও তলদেশে জলের উত্তাপ খুব কম। ফলতঃ সমগ্র বারিরাশির ৯ অংশের উত্তাপ ৪০°রও কম।

গরম জল অপেক্ষা শীতল জল বেশী ঘন এবং সেই জন্য বেশী ভারী। কাজে কাজেই কোন সমুদ্রের উপরিভাগ শৈত্যপ্রভাবে যতই ঘন হইতে থাকে, ততই উহা ভারী হয় ও তলদেশে ডুবিতে বাধ্য হয়। শীতপ্রধান দেশের নদীর বিশুদ্ধ জল ৩৮° ফাঃ পর্য্যন্ত নিম্নে নামে, কিন্তু ৩৯° তাপ হইলেই উহা জমিয়া বরফে পরিণত হয়। বরফ জল অপেক্ষা হাল্‌কা। সেই জন্য উহা সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে ভাসিয়া থাকে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল কিন্তু অত অল্প তাপে জমে না। এই জন্য মহাসাগরের তলদেশস্থ জলরাশি বিশুদ্ধ জলযুক্ত হ্রদের তলদেশস্থিত জল অপেক্ষা অনেক বেশী শীতল। মহাসমুদ্রের তলদেশের জল ২৯° ফাঃ পর্য্যন্ত তাপবিশিষ্ট দেখা যায়।

বিষুবরৈখিক মণ্ডলে সৌরতাপ অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই জন্য বিষুবরৈখিক মহাসমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ অধিকতর উত্তপ্ত এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ। এই কারণে বিষুব প্রদেশ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে আট্‌লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ হইতে জলস্রোত বহিয়া থাকে। কিন্তু ঐ উত্তপ্ত জলরাশি যতই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়, অধিকতর শৈত্য প্রভাবে উহা ততই শীতল হইতে শীতলতর হইয়া যায় এবং তলদেশে ডুবিতে থাকে। এই কারণে কি মেরুমণ্ডলস্থ সাগরের, কি শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের সাগরের তলদেশ হইতে একটা শীতল স্রোত তলায় তলায় বিষুবরৈখিক বৃত্তের দিকে বহিয়া থাকে ও উপরে উঠে। অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরুদ্বয়ের দিকে মহাসাগরের উপরিভাগ দিয়া একটি উষ্ণ স্রোত চলে এবং মেরুদ্বয়ের দিক হইতে একটা স্থশীতল স্রোত মহাসাগরের তলদেশ দিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে আসে। তলায় তলায় শীতল জল চলে বলিয়া সুগভীর মহাসাগরের তলদেশের জল সর্ব্বত্রই একরূপ শীতল। ফলতঃ বিষুববৃত্তের নিকট হইতে যে উষ্ণ জলস্রোত উপরি পৃষ্ঠ দিয়া মেরুদ্বয়ের দিকে তাপ বহন করিয়া থাকে, উহাই ক্রমাগত শীতল হইতে স্থশীতল হওয়ায় তলদেশে ক্রমশঃ ডুবিতে বাধ্য হয়। এই বিচিত্র উপায়ে তলদেশচারী মৎস্যাদি জীবগণ উপরি পৃষ্ঠের জলের সঙ্গে মিশ্রিত অম্লজান গ্যাস লইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করে। জীবরক্ষার কি অপূর্ব্ব কৌশল!

এই সুদীর্ঘ উদ্ধাধঃ স্রোত যে সত্য সত্যই চলিতেছে, ভূমধ্যসাগর এবং মেক্সিকো উপসাগরের জলের উত্তাপ পরীক্ষা দ্বারা আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে নিমজ্জিত উচ্চনীচ শত শত পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে। উহাদের উন্নত শীর্ষদেশ হাউয়ান ও লাড্রোন প্রভৃতি দ্বীপশ্রেণীতে পরিণত। আট্‌লান্টিক ও অন্যান্য মহাসাগরের মধ্যেও যে একরূপ পর্ব্বতপ্রাচীর নাই এমন নহে। এই সকল নিমজ্জিত পর্ব্বতপ্রাচীরের বাধার জন্য মেরুর দিক হইতে বিষুব প্রদেশের দিকে তলদেশের স্রোত সর্ব্বত্র বহিতে পারে না। জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আট্‌লান্টিক মহাসাগরের সংযোগ সাধন করিতেছে। এই প্রণালীটি ২০০ বাম বা মাত্র ৮০০ হস্ত গভীর। ভূমধ্যসাগর গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সেইজন্য ইহার জলবায়ু অনেকটা গরম। তাহার উপর ইহার দক্ষিণে বিখ্যাত সাহারা মরু। এই অঞ্চল হইতে বিপরীত বাণিজ্যবাতাস দক্ষিণ ইউরোপের দিকে বহিয়া থাকে এবং ভূমধ্যসাগরের বায়ুকে আরও বেশী গরম করিয়া তোলে। এই সকল কারণে ভূমধ্যসাগর হইতে এত বাষ্প উত্থিত হয় যে ঐ সাগরের পৃষ্ঠদেশ অনেকটা যেন নীচু হইয়া পড়ে। নদীবাহিত জলে এই অপচয় পূর্ণ হয় না। কাজে কাজেই আট্‌লান্টিক মহাসাগর হইতে একটা শীতল জলস্রোত জিব্রাল্টার প্রণালী পথে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে নিয়ত প্রবেশ করে এবং উভয় সাগরের পৃষ্ঠদেশকে সমোচ্চ রাখে। সুতরাং আট্‌লান্টিক মহাসাগরের যে স্তরের জলের যেরূপ উত্তাপ, ভূমধ্যসাগরের জলেরও তদনুরূপ তাপ থাকা উচিত। কিন্তু একপ দেখা যায় না। নিমজ্জিত পর্ব্বতপ্রাচীরের বাধাই এই অসামঞ্জস্যের কারণ।

জলের গভীরতা (বাম হিসাবে)		আট্‌লান্টিক মহাসাগর	জিব্রাল্টার প্রণালী	ভূমধ্যসাগর
০	...	৬৮°	...	৭৫°
২০০	...	৫৩°	...	৫৫°
৫০০	...	৫২°	...	৫৫°
১০০০	...	৩৮°	...	৫৫°
১৫০০	...	৩৭°	...	৫৫°
২০০০	...	৩৫°	...	৫৫°

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জিব্রাল্টার প্রণালীতে নিমজ্জিত পর্ব্বতপ্রাচীরের উপর পর্য্যন্ত জলের তাপ কি আট্‌লান্টিক, কি ভূমধ্যসাগর উভয়ত্রই অনেকটা সমান (৫৫°)। তন্মিম্নে ২০০০ বাম পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের জলের উত্তাপ একইরূপ থাকে, যদিচ আট্‌লান্টিকের জলের তাপ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে ২০০০ বাম গভীরতায় মাত্র ৩৫° হইয়া পড়ে। আট্‌লান্টিক ও মেক্সিকো উপসাগরেও

এইরূপ তাপবৈষম্য লক্ষিত হয়। আট্‌লান্টিকে ১০০০ বাম গভীরতায় তাপ ৩৯·৫°; মেক্সিকো উপসাগরেও ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আট্‌লান্টিকে ২০০০ বাম তলে তাপের মাত্রা ৩৫° হইলেও ১০০০ বাম গভীর ইউকেটান প্রণালীর নিম্নস্থ পর্ব্বত-প্রাচীরের বাধার জন্য মেক্সিকো উপসাগরের ২০০০ বাম তলস্থ জলের উত্তাপও ৩৯·৫° দৃষ্ট হয় অর্থাৎ নিমজ্জিত বাধার জন্য আট্‌লান্টিকের শীতল জল তলায় তলায় মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাসাগরের গভীর তলদেশের শৈত্য গভীরতার উপরে যে নির্ভর করে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীর বয়স যে কোটি কোটি বৎসর ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেই সময় হইতেই ভূগর্ভ তাপ বিকীরণ করিতেছে। সুতরাং মহাসাগরের তলদেশের জল উত্তপ্ত হইবারই কথা। নিম্নদেশের জল উষ্ণ হইলে উহা হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠে। সুতরাং মহাসাগর-সকলের গভীর তলদেশের জল বরং বেশী গরম হওয়াই উচিত। তবে যে গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত মহাসাগরের গভীর তলদেশে তাপ কম দেখা যায় উর্দ্ধাধঃ স্রোতই তাহার কারণ। উষ্ণ অঞ্চলাংশস্থিত মহাসাগরসমূহের পৃষ্ঠের জলরাশি শৈত্য-প্রভাবে যতই শীতল হইতে থাকে বরফে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ক্রমাগত নীচের দিকে ডুবিতে বাধ্য হয়। ঐ শীতল জল বিষুবরৈখিক মহাসমুদ্রের দিকে চলিতে থাকে। এই কারণেই উক্ত সাগরের তলদেশের জলও মেরুস্থ সাগরজলের ন্যায় সুশীতল।

সারার্থ—মহাসাগরের পৃষ্ঠস্থ জলের উত্তাপ অঞ্চাংশের উপরে নির্ভর করে। অর্থাৎ নিম্ন অঞ্চাংশ অপেক্ষা উষ্ণ অঞ্চাংশে অবস্থিত মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশের তাপ ক্রমশঃই কম হইয়া থাকে। তাপহ্রাসের ফলে পৃষ্ঠস্থ জল ক্রমাগত বেশী ভারী হওয়ায় তলদেশে ডুবিতে বাধ্য হয়। আর ঐ অঞ্চলে জলের চাপ অধিক হয় বলিয়া তলায় তলায় গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে একটা স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে বারিমণ্ডলের তলদেশ সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক একই প্রকার শীতল হইয়া পড়ে।

আট্‌লান্টিকাদি মহাসাগরের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক পর্ব্বতপ্রাচীর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদের মস্তকের উপর দিয়া শীতল জলস্রোত অবশ্য বহিতে পারে, কিন্তু পার্শ্বদেশের বাধার জন্য গভীরতর অঞ্চলে যাইতে পারে না। এই হেতু কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর প্রভৃতির ন্যায় আবদ্ধ সাগরের গভীর তলদেশের জল আট্‌লান্টিক কিংবা ভারতাদি মহাসাগরের সমান গভীর স্তরের জলের ন্যায় শীতল হইতে পারে নাই।

ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নহে

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা উপরের লাইনটী পড়ে প্রথমে মনে হয় বটে যে কাব্যচর্চার আগে কবি যদি একটু শব্দিক পড়ে নিতেন তবে বোধ হয় ভাল হ'ত। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে কবির কথাটী ত' সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়,—যে ছোট তাকে ত' নিতান্ত ছোট বলা চলে না। প্রবাল কীট ছোট বটে, কিন্তু প্রবাল দ্বীপ ত' ছোট নয়।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে একটা প্রকাণ্ড জগৎ চল্‌ছে। এ জগতের বাসিন্দারা এত ছোট যে আমাদের ধারণার অতীত। কিন্তু এদের ক্ষমতা অসীম, আর এদের পৃথিবীটাও তুচ্ছ নয়। এই রহস্যময় জগৎকে আমরা জীবাণুজগৎ বলতে পারি। এই অদ্ভুত রাজ্যটীর সন্ধান এনে দেয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)। এই যন্ত্র আবিষ্কারের আগে এদের কথা কেউ জানত না, জানবার কোন উপায়ও ছিল না। সময় সময় এদের দেহের ব্যাস (cell-diameter) এক মিলিমিটারের দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র হয়, অর্থাৎ এদের বপুর আয়তন হচ্ছে '০০০২ ইঞ্চি।

এই জীবাণুজগতের আবিষ্কারের মূলে একটা ইতিহাস আছে। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লিউয়েনহোক্ (Leeuwenhoek) নামে এক দিনেমার তাঁর একটা লেন্সের ভিতর দিয়ে এক ফোঁটা পচা জলে অসংখ্য গতিশীল 'কি সব' দেখ্‌তে পান। সেকালের বৈজ্ঞানিক মহলে এই আবিষ্কার নিয়ে তুমুল গবেষণা চলতে থাকে। ঐ 'কি সব'-এর গতি দেখে তাঁরা এদের প্রাণী (animal) বলে ঠিক করেন এবং নাম দেন *animalculae* অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রাণী—জীবাণু।

প্রথমে লোকে এই আবিষ্কারকে হেসে উড়িয়ে দেয়। এক ফোঁটা জলে অসংখ্য প্রাণী, এ কি সম্ভব? তারা হয়ত' সেই দিনেমারের জন্য মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা করেছিল। বেশী দিনের কথা নয়—১০।৭৫ বছর আগেও বিলাতে কোন কোন মেলায় লোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রওয়ালাদের দু'চারটে পয়সা দিয়ে এই জলের তামাসা দেখত। তারা ব্যাপারটী ভাল বুঝত না, অন্ত অন্ত জিনিসের সঙ্গে এটাকেও তারা ভাঙ্গমতির খেলার এলাকাদীন করেছিল। সে যুগের বৈজ্ঞানিকরাও এই বিষয়ে গবেষণা করে সুবিধে করে উঠ্‌তে পারেন নি। এর একমাত্র কারণ তখন ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া যেত না।

আজকাল আমরা যে জীবাণুতত্ত্বের নাম শুনি, এ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন লুই পাস্তুর ও রবার্ট কক্। এঁরা দেখান যে এই জীবাণুগুলিকে ঠিক্ প্রাণী বলা চলে না। অনেক

পরীক্ষার পর তাঁরা এদের খুব নীচু স্তরের গাছ (lower plants) বলে ঠিক করেছেন। উঁচু স্তরের গাছদের 'ক্লোরোফিল' বলে যে জিনিষটী থাকে, যা দিয়ে সাধারণতঃ দিনের আলোয় তারা হাওয়া থেকে নিজেদের খাবার তৈরি করে নেয় এই জীবাণুদের সেই 'ক্লোরোফিল' নেই। কাজে কাজেই এদের অন্যের খাবার হতে কিংবা পচা জিনিষ থেকে খাবার যোগাড় করতে হয়।

এই জীবাণুরা সব জায়গায় আছে। জলে, বাতাসে, মাটীতে, মানুষের শরীরের ভিতরে সর্বত্র এদের দেখা যায়। সাহারা, হিমালয়, প্রশান্ত মহাসাগর—মরুভূমি হ'তে মহাজলধি পর্য্যন্ত এরা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যেখানে লোকজন বেশী, সেইখানেই এরা বেশী থাকে। কলিকাতার মত সহরে একটা ধূলিকণার সঙ্গে ১৫।১৬ রকমের জীবাণু থাকতে পারে।

জীবাণু নানা রকমের দেখা যায়। এদের দেখতে কখনও ছোট একটী লাইনের মত, কখনও বা ছোট্ট একটী ফুট্‌কির মত, আবার কখনও বা স্প্রিংএর মত হয়। কলেরা রোগের জীবাণুগুলিকে ঠিক 'কমা'র (,) মত দেখতে। অনেক জীবাণুর আবার লেজের মত একটা অঙ্গ থাকে, এটাকে *flagella* বলা হয়। এই লেজটী অনবরত নড়ে। লেজ নাড়া দেখেই সে যুগের পণ্ডিতরা এদের ছোট জানোয়ার বলে ভুল করেছিলেন।

এই জীবাণুদের একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা হচ্ছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়া। একটা জীবাণু থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার জীবাণু হতে পারে। কিন্তু খাবার জিনিস ফুরিয়ে এলে এরা আর সংখ্যা বৃদ্ধি করে না। তখন এদের দেহের উপর একটা শক্ত আবরণ পড়ে যায়। এই অবস্থায় এদের 'অপবীজ' (spore) বলা হয়। অপবীজ অবস্থায় এরা সহজে মরতে চায় না, এমন কি ফুটন্ত জলেও সময়ে সময়ে এদের কিছুই হয় না। অত্যন্ত ঠাণ্ডাতেও এরা বেঁচে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে টাইফয়েড রোগের জীবাণুগুলি —৩০০° সেন্টিগ্রেড্ (তরলীকৃত হাইড্রোজেন বাষ্পের) শৈত্যেও মারা যায় না। —৩০০° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে কম তাপ বৈজ্ঞানিকদের এখনও জানা নেই। গরম ও ঠাণ্ডায় কিছু না হলেও আলো এদের পরম শত্রু। যে কোন রকম জোরালো আলো—যেমন সূর্য্যের আলো, বিজলী বাতি, রেডিয়ম রশ্মি, এক্স-রে (রণ্ট্‌গেন রশ্মি) ইত্যাদি অতি অল্প সময় মধ্যেই লক্ষ লক্ষ জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এই কারণেই ডাক্তার বাবুরা অনেক সময়ে আশাভরসাহীন মরণ পথের যাত্রী রোগীদের ঔষধপত্র বন্ধ করে রৌদ্রে ফেলে রাখতে বলেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই রোগের জীবাণু ধ্বংস করা। অনেক সময়ে এতে উপকারও হয় যথেষ্ট।

এক এক রকমের জীবাণু এক এক রকম খাবারের ভক্ত। কোন শ্রেণীর জীবাণু আলুতে, কোন শ্রেণী জিলাটিনে (gelatine), কোন শ্রেণী বা পচা গোমাংসের ঝোলে তাড়াতাড়ি বাড়ে। জীবাণুদের সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার সময়ে বৈজ্ঞানিকরা যে শ্রেণীর

জীবাণু দরকার, সেই শ্রেণীর জীবাণুর খাবারে (medium) তাদের বানিয়ে নিয়ে গবেষণা করেন। এই রকম করাকে জীবাণুর চাষ (culture) বলা হয়।

জীবাণুগুলি যে কি সে কথা আগে বলেছি। এইবার এদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে দু'চারটী কথা বলব। এরা যে আমাদের কত কাজ করে দেয় তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এরা মদ, দই, সির্কা (ভিনিগার) তৈরি করে। জিনিস যে পচে ওঠে, সেই পচনও ঘটায় এই জীবাণুগুলি। বেশীর ভাগ রোগ—যেমন, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদির মূল কারণ এই জীবাণু। এক রকম জীবাণুরই (*Bacillus coli*) সাহায্যে আমরা সহজে খাবার হজম করি। কোথাও গুরুতর জখম হলে ডাক্তারবাবু anti-tetanus injection করেন এই টিটেনাস্ জীবাণুর হাত থেকে জখমকে বাঁচাবার জন্য। টিটেনাস্ জীবাণু দুষ্টক্ষার রোগ জন্মায়। কোথাও কেটে গেলে আমরা সেখানে প্রতিষেধক (antiseptic) দিয়ে ঢেকে ফেলি, এর কারণ হচ্ছে হাওয়ার জীবাণুগুলিকে সেই কাটায় পড়তে বাধা দেওয়া।

লোকে আগে বাঘ, ভাল্লুকের নামে ভয় পেত, কিন্তু আজকাল তাদের চেয়ে জীবাণুগুলিকেই আমাদের বেশী ভয়। আজকাল নিশ্বাস নেবার সময়ে আমাদের ভয় হয়, যক্ষ্মার গোটাকতক জীবাণু হয়ত' ভেতরে চলে গেল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার আগে আমরা ছিলাম ভাল, কিন্তু এখন এক গ্লাস জল পেতে গেলেই চোখের সামনে অসংখ্য জীবাণু দেখতে পাই; ভয় হয় হয়ত' কয়েক হাজার কমা-ব্যাসিলাস্ পেটে ঢুকে গেল।

কিন্তু দু'একটী জীবাণু শরীরে গেলেই যদি লোকে কলেরা, টাইফয়েডে মারা যেত, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে মনুষ্যসংখ্যার অতি দ্রুত হ্রাস ঘটত, কিন্তু সাধারণতঃ তা হয় না। বাইরের কোন জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকে পড়লে আমাদের শরীরের ভিতরকার জীবাণুগুলি তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে না। বাইরের জীবাণু আর আমাদের শরীরের জীবাণু—এই দুই দলে তখন একটা রীতিমত দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। তবে প্রথম দলটী যদি বেশ বড় হয়, তবে আমাদের শরীরের জীবাণুগুলি তাদের সঙ্গে পেরে উঠে না, তারা হেরে যায় এবং তখনই আমরা রোগে পড়ি। তখন বলা হয় আমাদের resistive force অর্থাৎ রোগকে বাধা দেবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

কাজ হিসাবে জীবাণুগুলিকে প্রধানতঃ এই কয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—

(১) রোগোৎপাদনকারী ও শরীর জীবাণু (Pathogenic bacteria)। প্রথম রকমের জীবাণু কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে। শরীর জীবাণু আমাদের পরম বন্ধু। এরা আমাদের শরীরে থেকে হজমের সাহায্য করে, অন্য রোগকে দেহে আসতে বাধা দেয় এবং আরও অনেক উপকার করে।

(২) মৃতজীবী জীবাণু (Saprophytic bacteria)। এরা মরা জন্তু, মরা গাছ-

পালা, মল, মূত্র, কফ ইত্যাদি জৈব (organic) জিনিসে বাসা বাঁধে। এরা না থাকলে কোন জিনিস পচে উঠ্‌ত না, মাতালরা এক ফোঁটা মদ পেত না, আর আমরাও দই খেতে পেতাম না। এই জীবাণুগুলি আশ্চর্য্য রকমের। এরা মরা শরীরে বাসা বেঁধে সেই শরীরের মৌলিক উপাদানগুলিকে (elements) আলাদা করে দেয়। সেগুলি থেকে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালায় আবার নতুন সৃষ্টির সূত্রপাত হয়,—আমাদের দৃষ্টির বাইরে যা পুরাণো তাই আবার নতুন হয়ে ফিরে আসে। আমাদের চোখে যে জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বলতে হয়,—'আমি হে আমি তাও হয় নি হারা।'

(৩) নাইট্রোজেন-জীবাণু (Nitrogen bacteria)। এরা সরাসরি হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন বাষ্প গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ গাছদের কিন্তু এ ক্ষমতা নেই। তারা নাইট্রোজেন পায় মাটী থেকে। মাটীতে নাইট্রোজেনঘটিত অনেক জিনিস আছে (যেমন সোরা ইত্যাদি)। এই নাইট্রোজেন গাছের একটা প্রধান খাদ্য। ছোলা, মটর, সিম, অপরাজিতা ইত্যাদি যে বর্গের গাছ, বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেই বর্গের (order) নাম *Leguminosae*। এই বর্গভুক্ত সব গাছেরই শিকড়ে ছোট ছোট জিমের মত টিপি (tubercles) দেখা যায়। মাটিতে এই গাছ হলে মাটীর নাইট্রোজেন-জীবাণুরা ঐ টিপিগুলিতে বাসা বাঁধে, আর হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন ধরে ঐ গাছদের খাবার তৈরি করে দেয়। গাছগুলিও অকৃতজ্ঞ নয়। তারা নিজেদের খাবার থেকে ঐ জীবাণুদের কিছু খেতে দেয়। এই রকমের বন্ধুত্বকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অক্সোজীবিত্ব (Symbiosis) বলা হয়। যে জমিতে মটর জাতীয় গাছ হয়, সেই জমি ঐ নাইট্রোজেন-জীবাণু থাকার জন্য খুব উর্ব্বর হয়ে ওঠে এবং সেখানকার গাছগুলি তৈরি নাইট্রোজেন পেয়ে বেশ মোটা-সোটা হয়। এই জন্যেই আমাদের দেশের চাষারা যে জমিতে ভাল ফসল হয় না, সেই জমিতে দুই তিন বছর ডালকলাই ফলিয়ে নেয়। এতে করে সে জমি আবার ভাল হয়ে ওঠে।

(৪) নাইট্রোজেনপ্রদায়ী জীবাণু (Nitrifying bacteria)। এদের ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকমের। আমরা জানি গাছরা ক্লোরোফিলের (সবুজ কণা) সাহায্যে দিনের বেলা হাওয়া থেকে খাবার তৈরি করে নেয়। কিন্তু এই জাতীয় জীবাণুরা আলো বা ক্লোরোফিল দু'এরই অবর্ত্তমানে এই কাজটী করতে পারে। এরা আবার বাতাস থেকে আমোনিয়া গ্যাস (ammonia) গ্রহণ করে এবং সেই আমোনিয়া থেকে গাছদের জন্য নাইট্রোজেনঘটিত খাবার তৈরি করে দেয়।

এই চার রকম জীবাণু ছাড়া আরও অনেক রকম জীবাণু আছে, তারা নানাভাবে প্রকৃতির সেবা করে চলেছে। চিরদিনই

বড় বহে দাপিয়ে আকাশ
ছোট যে নুক ব্যাপিয়ে চলে

যুগ যুগ ধরে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলি নিঃশব্দে যবনিকার অন্তরালে থেকে আমাদের জীবনমরণের কাঠি নেড়ে চলেছে। এদের কাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, দাম্ভিকতা নেই। এদের শক্তি একের শক্তি নয়, এ শক্তি সঙ্ঘশক্তি,—আমাদের মধ্যে যার একান্ত অভাব।

'ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নহে' কথাটী তা' হলে একেবারেই মিথ্যা নয়।

বেহারে ও বঙ্গে প্রচলিত কয়েকটা পূজা ও উৎসব

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

আহিরদিগের 'গাইডার' পূজা এবং তৎসহ সাঁওতালদের 'সোহ্‌রাই' উৎসবের সাদৃশ্য

দক্ষিণ বেহারনিবাসী আহির বা গোয়ালাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কৌতুকপ্রদ পূজাটী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার নাম 'গাইডার' পূজা। ফসলী কার্ত্তিক মাসের ১৬ তারিখে অর্থাৎ "দীপালী" উৎসবের পর দিবসে আহিরগণ এই পূজার অনুষ্ঠান করে। 'দীপালী'র রাত্রিতে যত দুগ্ধ থাকে তাহার সহিত চাউল সিদ্ধ করিয়া 'ক্ষীর' অর্থাৎ পায়স প্রস্তুত করা হয়। এই ক্ষীর 'বসাওন' নামক দেবতাকে এই মানস করিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয় যে, পূজার অনুষ্ঠাতৃগণের গোমহিষাদি যেন সম্বৎসর রোগ হইতে মুক্ত থাকে। পূর্ব্ব রাত্রি হইতেই গোমহিষগণকে অভুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে উহাদের পশুগুলি সিন্দুরের দ্বারা রঞ্জিত এবং সমগ্র দেহের উপর সিন্দুরের 'টীপ্' অঙ্কিত করিয়া উহাদিগকে একটী ক্ষেত্রের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। একটী ছোট শূকরের চারিটী পা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া এই ক্ষেত্রের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং গোমহিষগণ যাহাতে পদ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া অথবা শৃঙ্গের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলে সেই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে শূকরটীর উপর দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে বেহারনিবাসী আহিরদিগের মধ্যে প্রচলিত 'গাইডার' পূজার সদৃশ কোন প্রথা বা অনুষ্ঠান উত্তর ভারতনিবাসী দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে উত্তর ভারতবর্ষনিবাসী দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে উক্ত "গাইডার' পূজার অনুরূপ একটী অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। সাঁওতাল

পরগণার অধিবাসী সাঁওতাল জাতির মধ্যেও 'গাইডার' সদৃশ একটী অদ্ভুত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার নাম 'সোহ্‌রাই' পর্ব্ব অর্থাৎ 'ধান্য কর্ত্তনের উৎসব'। নিম্নে এই উৎসবের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

'সোহ্‌রাই' পর্ব্ব ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষ্যে প্রত্যেক সাঁওতাল তাহার গোমহিষগুলিকে 'মাঘি থানে' অর্থাৎ 'পবিত্র কুড়ে' লইয়া যায়। সেই কুড়ের মধ্যে একটী খোলা জায়গায় এক স্তর ধান্য গোলাকারভাবে বিস্তৃত করা থাকে এবং ঐ স্তরের মধ্যস্থলে এমন একটী কুক্কুট ভিম রাখিয়া দেওয়া হয় যাহা সেই দিবস প্রাতঃকালেই প্রসূত হইয়াছে। সাঁওতালদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তির গরু অথবা মহিষ অজ্ঞতাবশতঃ ডিম্বটীর উপর পদক্ষেপ করিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সেই ব্যক্তি আগামী বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে সুখসম্পদ ও সৌভাগ্য ভোগ করিবে। উহাদের আরও বিশ্বাস যে আগামী বৎসরে তাহার গোমহিষ এবং গৃহপালিত অপরাপর পশুপক্ষিগণও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইবে এবং সে নিজে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবে।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান দুইটীর তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সাঁওতাল-দিগের মধ্যে যে একটী ডিম্ব ব্যবহৃত হয় বেহারনিবাসী আহিরদিগের মধ্যে উহারই পরিবর্ত্তে শূকরশাবক স্থাপনের রীতি। সাঁওতালী পর্ব্বে গোমহিষগণ ডিম্বটীর উপর পদক্ষেপ করিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, আর আহিরদিগের পূজায় পশুগণ শূকরটীকে শৃঙ্গের দ্বারা আহত করিয়া অথবা উহার উপরে পদক্ষেপ করিয়া উহার প্রাণনাশ করে।

ভারতবর্ষের দ্রাবিড় এবং অপরাপর নিম্ন জাতিদিগের মধ্যে জাতীয় দেবতার নিকট শূকর বলি দেওয়া খুব প্রশস্ত। কোন হিন্দু কিন্তু দেবতার নিকট শূকর বলি দেয় না। খুব সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে হিন্দুদের বিষ্ণু তাঁহার এক অবতারে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

বেহারনিবাসী আহিরগণ খুব সম্ভবতঃ কোন অনার্য্য জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেহেতু শূকর বলি দেওয়া একটী অনার্য্য বা অহিন্দু প্রথা সেই জন্যই আহিরগণ তাহাদের জাতীয় দেবতা 'বসাওনের' সমক্ষে শূকর বলি দিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি অনুষ্ঠানটীর মূলে এই বিশ্বাস নিহিত আছে যে শূকর বলি দিলে আগামী বৎসরে তাহারা নিজেরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্য ভোগ করিবে এবং গোমহিষাদি পশুগণও রোগমুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ করিবে। গোমহিষের দ্বারা পদদলিত করিয়া অথবা তাহাদের শৃঙ্গের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া শূকরকে মারিয়া ফেলা প্রকারান্তরে শূকর বলি দেওয়ার সমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—উত্তর ভারতবাসী অথবা বেহারনিবাসী আহিরগণ কোন অনার্য্য জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, উত্তর ভারতবর্ষ-নিবাসী বিভিন্ন জাতিগণের নৃতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিত বলিয়া

থাকেন যে আহিরগণ অনার্য্য জাতি হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের অনেকগুলি আচারব্যবহার দ্রাবিড় জাতির আচারব্যবহারের মত। এ সম্বন্ধে পরলোকগত ডাক্তার ব্রুক, ব্রুকের (W. Brooke) নিম্নলিখিত মন্তব্যটী* উল্লেখযোগ্য মনে করি :—

"In the Mirzapur jungles, the Ahirs, who, though possibly of different origin, have closely assimilated their customs to those of the Dravidian races who surround them, erect wooden fetishes to represent Birnath one of their deified ghost who protect their animals from tigers and their families from fever."

অর্থাৎ আহিরগণ বিভিন্ন জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও মির্জাপুরের জঙ্গলনিবাসী আহিরগণ তাহাদের প্রতিবেশী দ্রাবিড় জাতির অনেকগুলি আচারব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছে। উক্ত আহিরগণ বীরনাথ নামক প্রেতাত্মাকে দেবতার আসনে বসাইয়া উহার কাষ্ঠময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে উহার পূজা করে যে তিনি যেন তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে জ্বরের প্রকোপ হইতে রক্ষা করেন।

উত্তর বেহারের রোগোৎপাদক ভূতদূরীকরণ প্রথা

মন্ত্রবলে পীড়া-উৎপাদক ভূতদূরীকরণের প্রথা যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত আছে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটী ঘটনা তথায় সংঘটিত হইয়াছিল। ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া এলাহাবাদের মুন্সেফী আদালতে একটী দেওয়ানি মোকদ্দমাও রুজু হয়। এই মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাদী স্বাভাবিক কারণজনিত কোন পীড়ায় ভুগিতেছিল। কিন্তু যুক্তপ্রদেশনিবাসী নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের যেমন বিশ্বাস যে একপ্রকার ভূত মানুষকে পীড়াগ্রস্ত করে, বাদীরও মনে হইয়াছিল ঐ প্রকার একটা ভূত তাহাকে রোগগ্রস্ত করিয়াছে। মোকদ্দমার প্রতিবাদী পীড়া-উৎপাদক ভূত ছাড়াইবার একজন 'ওঝা'। সে বাদীর নিকটে আসিয়া বলে—"তুমি যদি পারিশ্রমিক স্বরূপ কয়েকটী টাকা আগে আমাকে দাও তাহা হইলে মন্ত্রবলে আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিব।" এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাদী প্রতিবাদীকে কয়েকটা টাকা দেয় এবং প্রতিবাদীও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন্ত্রচিকিৎসা আরম্ভ করে। কিন্তু 'ওঝা'র মন্ত্রচিকিৎসা সফল হইয়াছে কি না জানিবার পূর্ব্বেই বাদী ডাক্তারী চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

* W. Brooke প্রণীত *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* নামক ইংরাজী গ্রন্থের (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) ৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরোগ্য লাভ করিয়া বাদী প্রতিবাদীকে টাকা ফিরাইয়া দিতে বলে। কিন্তু প্রতিবাদী টাকা ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হওয়ায় বাদী টাকা ফিরিয়া পাইবার দাবী করিয়া এলাহাবাদের মুন্সেফী আদালতে উক্ত মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। কিন্তু মুন্সেফ এই বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন যে প্রতিবাদী টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য নহে, যেহেতু যুক্তপ্রদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস মন্ত্রবলে ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা 'ওঝা'দের আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত শ্রেণীর রোগীরা সচরাচর 'ওঝার' শরণাপন্ন হয়, সুতরাং প্রতিবাদীর টাকা লওয়া অপরাধ হয় নাই।

ঐরূপ বিশ্বাস উত্তর বেহারেও প্রচলিত আছে। উত্তর বেহারের অন্তর্গত সারন জেলার সেওয়ান্ মহকুমায় উপরোক্ত ঘটনাসদৃশ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ঐরূপ একটী মোকদ্দমাও ফৌজদারী আদালতে রুজু হইয়াছিল। দ্বিতীয় মোকদ্দমাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

কারি নামক জনৈক ডোমের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে একটা দুষ্ট এবং অনিষ্টকারী প্রেত তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। সেই জন্য সে একজন 'ওঝার' নিকটে গিয়া তাহাকে নিজের কষ্টের কথা সব বলিল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 'ওঝা' কারিকে বলিল—"তোমার প্রতিবেশী গোকুল ডোমের একটা পালিত প্রেত বা ভূত আছে, সেই তোমাকে কষ্ট দিতেছে।" ইহা শুনিয়া কারি গোকুলের কাছে যাইয়া বলিল :—"গোকুল, তুমি তোমার পালিত প্রেতটীকে ডাকিয়া লও এবং যাহাতে সে আমাকে আর কষ্ট না দেয় তাহার ব্যবস্থা কর। তুমি ইহা করিতে অস্বীকৃত হইলে তোমাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমায় ২৫৲ টাকা দিতে হইবে।" গোকুল ডোম এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সাক্ষীর স্বাক্ষরসহ চুক্তিটী একখানি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কিন্তু চুক্তি সত্ত্বেও প্রেতটী কারি ডোমকে পুনরায় কষ্ট দিতে লাগিল। ফলে কারি ডোম গোকুল ডোমের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে এই অভিযোগে নালিশ করিয়া দিল যে গোকুল তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য প্রতিবাদীকে শাস্তি দেওয়া হউক।*

উপরোক্ত বিবরণ হইতে অনায়াসে অনুমান চলে যে ডোম জাতীয় লোকেরা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। অপরাপর জাতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ লইয়া গবেষণা করিলে উক্ত তথ্যটী বিশেষরূপে সমর্থিত হয়।

কয়েকজন পণ্ডিতের এই মত যে, ইউরোপের নট্‌জাতি (Gypsies) ভারতবর্ষীয় ডোম জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ইউরোপীয় নট্‌গণ যে ভাষা (Romany) ব্যবহার

* L. S. S. O'Malley প্রণীত *The Gazetteer of Saran* (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) গ্রন্থের ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করে, ভারতবর্ষীয় ডোমদের ভাষার সহিত উহার অনেক সাদৃশ্য আছে। এ সম্বন্ধে * বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিৎ স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন্ বলেন :—

"The Bhojpuri-speaking Doms are a famous race and they have many points of resemblance with the Gipsies of Europe. Thus, they are darker in complexion than the surrounding Biharis, are great thieves, live by hunting, dancing and telling fortunes; their women have reputation for making love-philtres and medicines to procure abortion. They are also great musicians and horsemen."

গ্রিয়ার্সন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে বেহার-নিবাসিনী ডোম স্ত্রীগণ অদৃষ্টগণনায় (fortune-telling) এবং টোটকা ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় কিছু পরিমাণ জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক। ইন্দ্রজালবিদ্যায় জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে ভূত এবং প্রেতগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা দরকার। ইন্দ্রজালবিদ্যায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইলে উক্ত ভূতপ্রেতগণ উহাদের বশকারীগণের ভৃত্য ও আজ্ঞাপালক হইয়া যায়। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে উক্ত বেহারনিবাসী পুরুষ ডোমগণের ইন্দ্রজালবিদ্যায় অভিজ্ঞতা আছে। এ কারণেই সারন জেলার অন্তর্গত সেওয়ান্ মহকুমার লোকদের মনে বিশ্বাস ছিল যে গোকুল ডোমের একটা পালিত প্রেত ছিল এবং কারি ডোমকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য সে এই প্রেতটীকেই নিযুক্ত করিত। গোকুল ডোমের সহিত কারি ডোমের চুক্তির মূলে যে ঐ সংস্কার নিহিত আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাটনা সহরের একটী উপাস্য বৃক্ষ

সাধু পুরুষ এবং সন্ন্যাসীরা ঐশী শক্তি বা প্রভাবসম্পন্ন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইহারা যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতেও কিয়ৎপরিমাণে ঐশী প্রভাব আরোপিত হয়। *The Journal of the Anthropological Society of Bombay* নামক পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের ৩০৮ হইতে ৩১০ পৃষ্ঠায় *"Notes on a Sacred Tree at Puri in Orissa"* শীর্ষক আমার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি তিনটী উপাস্য বৃক্ষের কথা বলিয়াছি। জনসাধারণের বিশ্বাস এই তিনটী বৃক্ষ তিন জন সাধুপুরুষের 'দাঁতনকাঠ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাষ্ঠগুলি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের কোমল শাখা হইতে প্রস্তুত ছিল। সাধুপুরুষগণ ঐগুলি

* *The Indian Antiquary* নামক পত্রিকার ১৭শ খণ্ড (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

'দাঁতনকাঠ'রূপে ব্যবহার করাতে তাঁহাদের ঐশী প্রভাব উহাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে আরোপিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটী বৃক্ষের নাম 'মকদুম্ বৃক্ষ'। কথিত হয় যে মকদুম পীর নামক জনৈক মুসলমান সাধুপুরুষ যে 'দাঁতনকাঠ' ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতেই এই বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'মকদুম' বৃক্ষ। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীধামে দ্বিতীয় বৃক্ষটী আছে। জনপ্রবাদ এই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্যদেব একটী 'দাঁতনকাঠ' ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইতেই বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম 'সিদ্ধ বকুল'। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডানগরে তৃতীয় বৃক্ষটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, অন্ততঃ কিয়দ্দিন পূর্ব্বেও ছিল। এই বৃক্ষের দেশীয় নাম 'চিল্‌বিল্ গাছ'। আমি ইহার বৈজ্ঞানিক নাম জানি না।

এক্ষণে আমি অপর একটী উপাস্য বৃক্ষের কথা বলিব। ইহা দক্ষিণ বেহারের অন্তর্গত পাটনা সহরে আছে। কথিত হয় যে শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরুগোবিন্দ সিংহের ব্যবহৃত দন্ত খুঁটিবার খড়িকা কাঠি হইতে এই বৃক্ষটী উৎপন্ন। ইহার সম্বন্ধে ও'মালী (O'Malley)* নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—"পাটনা সহরে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরুগোবিন্দ সিংহ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে 'চকে'র নিকটস্থ একটী বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানে আজকাল একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটীর নাম 'হরমন্দির'। মন্দিরে গুরুগোবিন্দ সিংহের দোলনা, পাদুকা এবং 'গ্রন্থ-সাহেব' নামক শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। তীরের ফলার দ্বারা গুরুগোবিন্দের স্বহস্তে লিখিত নাম এই পুস্তকে আছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন আরও দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির অথবা 'সঙ্গৎ' আছে। 'সঙ্গৎ' দুইটীর মধ্যে একটী নানকসাহী সম্প্রদায়ের দখলে। তন্মধ্যে একটী উপাস্য বৃক্ষ আছে। লৌকিক বিশ্বাস এই যে বৃক্ষটী গুরুগোবিন্দ সিংহের ব্যবহৃত দাঁত খুঁটিবার খড়িকা হইতে দৈববলে উৎপন্ন। (It contains a sacred tree believed to have sprung up miraculously from a tooth-pick placed in the ground by Govinda Singh.)

গুরুগোবিন্দ সিংহের ন্যায় সাধুপুরুষ উক্ত খড়িকা ব্যবহার করাতে তাঁহার ঐশী প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে উহাতে আরোপিত হইয়াছিল। বৃক্ষটী তাই দৈববলে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তজ্জন্যই পবিত্র ও উপাস্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

হিন্দু ও শিখদের উপরোক্ত বিশ্বাসের সহিত মুসলমানদিগের একটী বিশ্বাসের সাদৃশ্য আছে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ যদি স্বীয় পরিচ্ছদ হইতে বস্ত্রখণ্ড

* L. S. S. O'Malley প্রণীত *The Gazetteer of Patna* শীর্ষক ইংরাজী গ্রন্থের (১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত সংস্করণ) ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছিন্ন করিয়া পুরুষ অথবা স্ত্রী-পীরের দরগায় প্রদান করে, তাহা হইলে পীরেরা উক্ত বস্ত্রখণ্ড তাহাদের ঐশী প্রভাব অথবা আরোগ্যদায়িনী শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই মুসলমান বিশ্বাসটীর মূলে নিম্নবিবৃত তথ্যটী নিহিত আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলি যদিও স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ হইতে ছিন্ন করা হয়, তথাপি সেগুলির সহিত স্ত্রীলোকগণের একরূপ কাল্পনিক সংযোগ থাকিয়া যায় এবং সেই কাল্পনিক সংযোগের ফলেই পীরদিগের আরোগ্য-দায়িনী শক্তি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণের উপর আরোপিত হয়। তাহাতে উক্ত স্ত্রীলোকগণ বন্ধ্যাদোষমুক্ত হন। গয়া জেলার অন্তর্গত মিরনপুর নাদিরা নামক গ্রামে জনৈক মুসলমান পীরের দরগা আছে। সন্তানকামী বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ রাত্রিকালে সেই দরগাতে আসিয়া স্ব স্ব পরিচ্ছদ হইতে বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করিয়া তথায় অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে।*

উক্ত জেলায় 'কমালোবিবি' নাম্নী জনৈকা স্ত্রী-পীরের সমাধি আছে। বন্ধ্যা হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকগণ সন্তানকামনায় উক্ত সমাধি মন্দিরে গিয়া স্ব স্ব পরিচ্ছদ হইতে বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করিয়া সমাধির দ্বারদেশে সংলগ্ন করিয়া দেয়।†

বেহারে এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত 'জোলোভূত' সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস

দক্ষিণ বেহার অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীস্থ ও অজ্ঞ হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অনিষ্টকারী ভূত এবং প্রেতসকল তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষকে সর্ব্বপ্রকার দুর্ভোগে, পীড়ায়, দুঃখে এবং কষ্টে ফেলাই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। উক্ত হিন্দুদিগের কল্পনায় এই ভূতপ্রেতগুলি আকৃতিতে ভয়াবহ, ইহাদের রং ঘোর কৃষ্ণ এবং ইহারা তালগাছপ্রমাণ উচ্চ, ইহাদের দন্তশ্রেণী লম্বা এবং মুখের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত, ইহাদের কেশ আলুলায়িত, রুক্ষ এবং কর্কশ। ইহারা নির্জ্জন স্থানে, বিশেষতঃ অরণ্যময় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। বৃক্ষ-সমূহই ইহাদের আবাসস্থল। যে সকল পথিক গভীর রাত্রিতে এই বৃক্ষগুলির নিকট দিয়া গমনাগমন করে, উক্ত ভূতগণ তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রাণসংহার করে। এই সকল অনিষ্টকারী ভূত ও প্রেতগণের তালিকা এবং বিবরণ আমি প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

এই ভূতপ্রেতগণের মধ্যে 'পানডুব্বা' নামক ভূতই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। যে সকল পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক পুষ্করিণী অথবা নদীতে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদেরই

* L. S. S. O'Malley প্রণীত *The Gazetteer of Gaya* নামক ইংরাজী গ্রন্থের (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

†-উক্ত গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠা।

প্রেতাত্মা এই ভয়াবহ 'পানডুব্বা' ভূতে পরিণত হইয়া পুষ্করিণীতে এবং নদীসকলে বাস করে। যে ব্যক্তি অসাবধানতা বশতঃ দ্বিপ্রহরে এবং গভীর রাত্রিতে স্নান করিবার অথবা জল লইবার জন্য এই সকল পুষ্করিণী কিংবা নদীতে অবতীর্ণ হয় 'পানডুব্বা' তাহাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে এবং জলের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণসংহার করে।

উত্তর বেহারের অন্তর্গত সারন এবং চম্পারন জেলানিবাসী হিন্দুগণের মধ্যেও উপরোক্ত 'পানডুব্বা' সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটী প্রচলিত আছে। *Man in India* নামক পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডের ১৯৬ হইতে ২০১ পৃষ্ঠায় আমি *Water Spirits* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছি। সারন জেলার প্রধান সহর ছাপরার এবং চম্পারন জেলার প্রধান সহর মতিহারীর যে বড় বড় পুষ্করিণীগুলিতে 'পানডুব্বা' নামক 'জোলোভূত' বাস করে, তাহাদের বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

মৃত ব্যক্তিদের মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে 'জোলোভূতরা' মানুষের প্রাণসংহার করে না। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে নিহত ব্যক্তিগণের প্রেতাত্মাসকল সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গী হইয়া বসবাস করিবে।

এই ধরণের একটা বিশ্বাস পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা দেশেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় 'জোলোভূতের' আকৃতি অত্যন্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ন্যায়। এই ভূতটাও বড় বড় পুষ্করিণী এবং দীঘিতে বাস করে এবং যে সকল ব্যক্তি অসাবধানতা বশতঃ দীঘির জলে নামে তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া থাকে। ইহার নাম 'জটে বুড়ী'। আমরা এখনও পর্য্যন্ত এই 'জটে বুড়ী'র উল্লেখ ছেলেদের একটী খেলায় পাইয়া থাকি। একজন বালক বা বালিকা 'জটে বুড়ী' হয় এবং অপর কয়েকজন বালকবালিকা হয় স্নানার্থী। "জটে বুড়ী' এক স্থানে দাঁড়ায় ও তাহার কিয়দ্দূরে আর একটী স্থান স্নানার্থীরা অধিকার করে। তৎপরে তাহাদের মধ্যে একজন 'জটে বুড়ী'র জলে অবতরণ করিবার ভান করিয়া এই বলিয়া চিৎকার করে—"ও জটে বুড়ী, আমি তোর জলে নেবেছি।" একথা শুনিয়া স্নানার্থীকে ধরিবার অভিপ্রায়ে 'জটে বুড়ী' দৌড়াইয়া আসে এবং তাহাকে ধরিতে পারিলে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিবার ভান করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল স্নানার্থী নিহত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খেলাটা চলে।

জাপানীদের মধ্যেও ঐরূপ একটী বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কোন কোন জাপানী বলিয়া থাকেন যে সমুদ্রে একপ্রকার জীব বাস করে যাহার আকৃতির একার্দ্ধ মনুষ্যসদৃশ এবং অপরার্দ্ধ কচ্ছপসদৃশ। ইহার নাম 'কাপ্পা'। আবার কোন কোন জাপানী বলেন যে 'কাপ্পা' সামুদ্রিক ভূত নহে। নদীগুলি যেখানে সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়, সেই সকল মোহানায় 'কাপ্পারা' বাস করে। অতএব 'কাপ্পা' একপ্রকার নদীবাসী ভূত। যে সকল সন্তরণকারী অসাবধানতা বশতঃ ঐ সকল মোহানায় সন্তরণ করে 'কাপ্পা'

তাহাদিগকে জলের ভিতরে টানিয়া লইয়া হত্যা করিয়া তাহাদের নাড়ীভুঁড়িগুলি খাইয়া ফেলে। 'কাল্পা' যে সকল মৃতদেহ খায়, অনেক দিন পরে সেগুলি সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃতদেহ সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা উপকূলস্থ প্রস্তরের উপরে বারংবার নিক্ষিপ্ত না হইলে, অথবা সামুদ্রিক মৎস্যসকল উহার মাংস অল্প অল্প করিয়া না খাইলে, মৃতদেহটী বহুকাল যাবৎ শুষ্ক লাউএর ন্যায় হাল্‌কা এবং ফাঁপা থাকে।

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার চতুর্বিংশ অধিবেশন

বিগত ২রা জানুয়ারী দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার চতুর্বিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩০০ শত বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রিন্স অব বেরার কর্ত্তৃক অধিবেশনের উদ্বোধন হইবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত থাকিতে না পারায় হায়দরাবাদ রাজ্যের অর্থসচিব স্যার আকবর হায়দরী অধিবেশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। মাননীয় নিজাম বাহাদুর অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন স্যার আকবর কর্ত্তৃক তাহা সভার প্রারম্ভে পঠিত হয়। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে হায়দরাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার এই অধিবেশনে আনন্দপ্রকাশ করিয়া নিজাম বাহাদুর তাঁহার বাণীতে ভারতে বিজ্ঞান প্রচারকল্পে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভা যে প্রেরণা জোগাইতেছে সে কথার উল্লেখ করিয়া মহাসভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদেশে বিজ্ঞানের রেনেশাঁস বা নবযুগ আনয়ন করিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার রাজ্যস্থিত ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও সহযোগিতা করুক নিজাম বাহাদুর তাঁহার বাণীতে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

স্যার আকবর হায়দরী অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রথমতঃ জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে তাহার বিষয় উল্লেখ করেন এবং আধুনিক যুগে নিজাম বাহাদুরের উদারতা ও দূরদৃষ্টির ফলে হায়দরাবাদে যে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তৎপ্রতি সমবেত সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, আসিফিয়া বংশধরগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে দ্রাবিড়, আর্য্য, হিন্দু এবং মুস্লিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব্ব সমাবেশ সম্ভবপর হইয়াছে এবং নিজাম বাহাদুর তাঁহার বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পাশ্চাত্যের যাহা ভাল প্রাচ্যের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে তাহাও গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। যে ওস্‌মানিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার অধিবেশন হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া স্যার আকবর হায়দরী বলেন যে এখানে শিক্ষার্থিগণ নিজ দেশের ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ পাইয়া থাকে। 'হিন্দুস্থানী' ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা এখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বভারতীয় সংযোগ সাধনে এবং জাতীয় একত্ববোধের উদ্বোধনে বিশেষ সাহায্য করিবে। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তা বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়া থাকে। একথা আমরা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়া থাকি যে কোন জাতি বা ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চ্চা বাদ দিয়া যথার্থ উন্নতি করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপরে দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। যদিও ভারতবর্ষ অনেক পরে আধুনিক বিজ্ঞানের নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তথাপি ইতোমধ্যেই এ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত গবেষণাগারসমূহে যে ধরণের মৌলিক ও উচ্চাঙ্গের গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি। বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভারতীয়গণ ক্রমেই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে উপলব্ধি করিতেছে তাহাতে বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুকূল অবস্থা অনতিবিলম্বে এদেশেও গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আশা হয়। বিজ্ঞানের দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে, শুধু এই কারণেই আমি বিজ্ঞানের উচ্চ মূল্য নির্দ্দেশ করিতেছি না। বাস্তব জীবনে মানবের সুখশান্তিবিধান কার্য্যে বিজ্ঞানের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সমালোচকগণ যে দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে বিজ্ঞান মানুষকে অন্ধ কুসংস্কার ও ক্ষুদ্র গণ্ডির বাঁধন হইতে মুক্তিদান করিয়াছে এবং সত্যিকারের দৃষ্টি দিয়া প্রত্যেক জিনিষের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণের শক্তি অর্জ্জনে সমর্থ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিজস্ব মূল্যও কম নহে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে অসীম ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানাবিধ তথ্য, ঘটনা ও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে হয় এবং ঐগুলি ঠিক হইল কিনা বুঝিয়া লইতে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, শাসনতন্ত্র পরিচালনে তাহার মূল্য বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। উপসংহারে স্যার আকবর বলেন, হায়দরাবাদ সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি; এখানকার শাসকগণ চির দিন জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পের সমাদর করেন ও উৎসাহ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ যে সমবেত হইয়াছেন ইহা একান্ত শোভন ও সঙ্গত হইয়াছে। স্যার আকবর হায়দরীর উদ্বোধনী বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নবাব মাহ্‌দিয়ার জানস্ (Mahdiyar Juns) সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ভারতীয় বিজ্ঞান

মহাসভার সাধারণ সভাপতি কোয়েম্বাটুরের সুবিখ্যাত ইক্ষুতত্ত্ববিশারদ রাও বাহাদুর টি, এস, ভেঙ্কটারামন্ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ

সাধারণ সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে 'ভারতীয় পল্লীর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ' চিত্র প্রদান করেন। ভারতে আর্য্য বসতির প্রথম অবস্থা ও তৎকালীন পল্লীজীবন ও পল্লীশাসনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন, প্রাচীন ভারতে পল্লীসমূহ এক একটি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন স্বয়ংপ্রধান কেন্দ্র ছিল। বহির্জ্জগতের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল অতি কম। গ্রামের লোকদিগের প্রয়োজনীয় শস্যসামগ্রী গ্রামেই উৎপন্ন হইত এবং নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইয়াও যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাই তাহাদের দুর্দ্দিনের সম্বল হইত। পল্লীর সমুদায় ব্যক্তি একটি সুবৃহৎ পরিবার-গোষ্ঠীর বিভিন্ন লোকের ন্যায় জীবনযাপন করিত এবং সকল কাযে গ্রামের বৃদ্ধ পঞ্চায়েৎগণের উপদেশ লইত। তখন জমি প্রচুর পাওয়া যাইত, গ্রামবাসীর অভাব অনটনও বেশী ছিল না, একপ্রকার সুখেই তাহাদের দিন অতিবাহিত হইত। সেই প্রাচীন কালে গ্রামবাসীদের দৃষ্টিও যেরূপ দূরপ্রসারী ছিল না, তাহাদের জ্ঞানও তেমনি স্বল্পপরিসর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। এই রকম ভাবে প্রায় দুই হাজার হইতে তিন হাজার বৎসর কাটিয়াছে। ভারতে যখন এই অবস্থা, পাশ্চাত্য দেশের পল্লীজীবন সেই সময় আরও অধিকতর আদিম অবস্থার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে গড়িয়া উঠিতেছিল। নানাপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে পারিপার্শ্বিকের উপর মানুষ অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ক্রমে সময় ও দূরত্বের বাধা এমনভাবে অপসারিত হইতে লাগিল যে কাহারও পক্ষে আর বহির্জ্জগৎ হইতে দূরে সরিয়া থাকা সম্ভবপর রহিল না। জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, খাদ্যসম্ভারও যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকেও সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘর্ষের ফলে যেমনই আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য সুরু হইল, অমনি এদেশের পল্লীজীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পল্লীগ্রামে যে সকল শস্য উৎপন্ন হইত, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ফলে তাহার একান্ত নিজস্ব অল্পপরিসর গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পল্লীবাসীকে বৃহত্তর জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে আসিয়া পড়িতে হইল। তখন সে আর শুধু নিজ গ্রামের প্রয়োজনের উপযুক্ত শস্য জন্মাইয়া সুখী হইতে পারিল না, নিউইয়র্ক, লণ্ডন প্রভৃতি দূরান্তের বাজারে যেরূপ শস্যের কাটতি হইবে, সেইরূপ শস্য জন্মাইয়া লাভবান হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করিল। অধিকতর বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল পল্লীবাসী নিকটবর্ত্তী সহর বা

নগরের জীবনে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তথায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল এবং অবশেষে অনেক সময় তথাকার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হইয়া গেল। এ সমস্ত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

আধুনিক কালের ভারতীয় পল্লীর কথা বলিতে গিয়া সভাপতি মহাশয় প্রথমেই কৃষির অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আজও ভারতীয় কৃষির ¾ ভাগ মৌসুমী বায়ুর উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বাহিরের যে বাজারে পল্লীবাসীদের শ্রমলব্ধ জিনিষপত্রের বেচাকেনা হয়, সেই বাজার সম্পর্কে তাহারা এত অজ্ঞ যে মধ্যবর্ত্তী একদল লোক আজও অবলীলাক্রমে তাহাদের লভ্যাংশের বেশীর ভাগ গ্রহণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ জনসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুপাতে শস্যাদি জন্মাইবার মত কর্ষণযোগ্য ভূমি পাওয়া সুকঠিন। বর্ত্তমানে জমিতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা কিছু কিছু হইলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে তাহা কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত উত্তরাধিকারস্বত্ব প্রভৃতি নানারূপ কারণে ভাগবাঁটোয়ারা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমি বিভক্ত হওয়ায় ব্যবসায় হিসাবে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

আর্য্যগণ গোজাতির সেবা বিশেষভাবেই করিতেন। প্রতি গ্রামে গোচারণভূমি ভারতীয় পল্লীজীবনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। গো-দুগ্ধ চিরদিনই এই দেশে সর্ব্বোত্তম খাদ্যদ্রব্য বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। সেই কারণে, এমন কি প্রাচীন উপাসনাদিতে পর্য্যন্ত গোজাতির মঙ্গল প্রার্থনাসূচক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাই জমিজমার পরে গোধনই ছিল গ্রামিকের প্রধান সম্পত্তি। তাহার সমাদরও ছিল খুব বেশী। কিন্তু এখন এই মনোভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন কালে গোজাতি সম্পদ্ হিসাবে সমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল আধুনিক পল্লীবাসীর জীবনে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শক্ত ও সবল ঘোড়া বৃদ্ধ ও অক্ষম হইলে তাহার প্রতি অশ্বারোহীর যেরূপ মনোভাব হয়, অথবা অভিজাত কোন মহিলার পোষা কুকুরের প্রতি যেরূপ দরদ থাকে, এখনকার মনোবৃত্তি যেন অনেকটা তাই। গাভীর প্রতি গ্রামিকের এইপ্রকার 'টান' এত গভীর যে শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর নহে। আধুনিক যুগে মোটর, অয়েল ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি অনেক কাজে বলীবর্দ্দের স্থান দখল করিয়াছে। তবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থের চাহিদা এখনও কমে নাই, ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং যাহাতে দুগ্ধবতী সুস্থ গাভীর সংখ্যা কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বিজ্ঞান কি চেষ্টা করিবে না?

গ্রামের শ্রমশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অতঃপর সভাপতি মহাশয় গ্রামিকের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, বাহিরের ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটার ফলে ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে,

তৎসঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে আধুনিক পল্লীবাসী বহুই আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছে। চা, কফি প্রভৃতি নূতন পানীয়ের অভাববোধের দরুণ এবং পোষাকপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনে পারিবারিক ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার যে মনোভাব পূর্ব্বে ছিল, তাহা যেমন এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, মধ্যযুগীয় একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার ন্যায় সামাজিক কাঠামো এখনও বলবৎ থাকায় গ্রামিকের জীবনে সামঞ্জস্যের (balance) অভাব ঘটিতেছে। ভারতীয় পল্লীবাসীর অতিরিক্ত ঋণভারের কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। পল্লীর যাহারা খোঁজ রাখেন তাঁহারাই জানেন ভারতীয় গ্রামবাসিগণ ঋণভারে কিরূপ জর্জ্জরিত। কি কি কারণে গ্রামবাসিগণ ঋণ করিতে বাধ্য হয়, অর্থনীতির দিক্ দিয়া কি ভাবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে প্রায়শঃ দেখা যায় বৎসরের অনেকটা সময় গ্রামিককে বাধ্য হইয়া কার্য্যাভাবে ঘরে বসিয়া কাটাইতে হয়। গ্রামে চাষ-আবাদই একমাত্র কাজ, কিন্তু তাহা বার মাস চাষীকে নিযুক্ত রাখিতে পারে না। এইরূপে বাধ্য হইয়া ক্রমাগত দিনের পর দিন অলসভাবে কাটায় বলিয়া একদিকে যেমন তাহার জীবনাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, অপর দিকে চরিত্রেরও নানারূপ অপকর্ষ ঘটে। অবিশ্রান্ত কাজের ন্যায় স্বাস্থ্যপ্রদ আর কিছুই নাই।

আধুনিক কালে আর এক অশুভ পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে পল্লীতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ক্রমেই অধিক সংখ্যক গ্রামবাসী পল্লী ছাড়িয়া সহরে যাইতেছে। আর্থিক দৈন্যই এরূপভাবে পল্লীত্যাগের প্রধান কারণ। কৃষি হইতে আর তেমন আয় হয় না, অথচ গ্রামে থাকিয়া আয় বৃদ্ধি করিবার অন্য পথও আবিষ্কার করা কঠিন। এতদ্ব্যতীত গ্রাম ছাড়িয়া সহরই কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। লেখাপড়া শিক্ষার সকল প্রকার সুবিধাও লোককে সহরের প্রতি কম আকৃষ্ট করিতেছে না। যে পরিমাণ লোক সহরের দিকে চলিয়া আসে তাহাদের সংখ্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া, গুণের দিক্ বিচার করিলেও ইহাতে পল্লীর ক্ষতি উপলব্ধি হয়। দেখা যাইবে কোন এক পরিবারের চারিটি ছেলে শিক্ষার জন্য সহরে আসিলে যে কয়টি ছেলে প্রতিভাশালী তাহারা সহরেই নানা কাজে থাকিয়া যায়; যাহার কোনপ্রকার প্রতিভা নাই, সহরে কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, সেই শুধু পল্লীতে ফিরিয়া বসবাস করে। পল্লীর সম্পদ্‌বৃদ্ধিতে তাহারা যতটুকু না সাহায্য করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিকতর দাবী তাহারা জমির উপর করিয়া বসে। ধনবান ও বিত্তশালী জমিদারদের সম্বন্ধেও একথাই বলা যায়। যাঁহারা গ্রামে থাকিলে গ্রামের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারিতেন তাঁহারা সহরেই তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি সীমাবদ্ধ রাখেন। সংস্কৃতি তাই এখন সহরেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে, গ্রামে প্রতিভাস্ফুরণের ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে।

অতীত ও বর্ত্তমান পল্লী-ভারতের অবস্থা বিশদভাবে আলোচনার পর কিপ্রকারে ভবিষ্যতে পল্লীজীবন সংগঠন করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে সভাপতি মহাশয় সবিশেষ

আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের পল্লীজীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতিসাধন এবং সমগ্র দেশের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত দুইটি কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমতঃ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার অন্নসংস্থান এবং (২) দ্বিতীয়তঃ সুস্থ গো ও মনুষ্যজাতি প্রতিপালন ও তাহাদের উপযুক্তরূপ রক্ষণাবেক্ষণ।

আমাদের দেশের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে হইলে পল্লী ও নাগরিক জীবন উভয়ই সংগঠন করা প্রয়োজন। পল্লী ও সহর উভয়তই কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে। উদ্ভিজ্জীবনে সঙ্করোৎপাদন করিয়া যেমন কোন একটি শ্রেণীর ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দেওয়া যায়, সভাপতি মহাশয় বলেন সহর ও পল্লীসংগঠনে তেমনই কিছু করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ উপলব্ধি হইতেছে এবং এভাবে কার্য্যও অগ্রসর হইতেছে। সহরের উপকণ্ঠে বর্ত্তমানে যে সকল উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে পল্লী ও নাগরিক জীবনের উভয়বিধ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা চলিতেছে।

আধুনিক যুগে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনার্থ ১৯৩০ সালে নিযুক্ত কৃষি কমিশনের অভিমত অনুসারে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ার লক্ষণও দেখা দিয়াছে। উক্ত রয়াল কমিশনের অভিমত অনুসারে গঠিত রাজকীয় কৃষি গবেষণা সমিতি কৃষিশিল্প সম্পর্কে বিবিধ সমস্যার সমাধানে ইতোমধ্যেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া, কুটীরশিল্পের প্রচলন দ্বারা গ্রামিকের আয়বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া, সমবায় সমিতি গঠন এবং পরস্পরের সাহায্যের সুব্যবস্থা করিয়া কিভাবে পল্লীসংগঠন করা যাইতে পারে সভাপতি মহাশয় বিশদভাবে তাহার আলোচনা করেন। পল্লীজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ গ্রামবাসীর কার্য্যদক্ষতা, ব্যবসায়বুদ্ধি, জীবনাদর্শ, চরিত্র প্রভৃতি নাগরিকের তুলনায় কিরূপ, এবং কিভাবে তাহার বিবিধ বৃত্তির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন করিতে পারা যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণের পরিসমাপ্তি করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতে পল্লীর যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। যে সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা পূর্ব্বে গ্রামে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ক্রমেই নগরের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং সমগ্র দেশের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নগর ও পল্লীর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে একটা সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। নগরকে তাহার অধিকতর জ্ঞান, ক্ষিপ্র চালচলন এবং আধুনিক যুগের নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা পল্লীকে বিতরণ করিতে হইবে। পল্লীও তেমনি তাহার খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া সহর ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করিবে। প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে থাকিয়া গ্রামবাসীর মধ্যে মানবোচিত চরিত্র গুণ যাহা বিকশিত হইয়াছে, নগরের 'ব্যবসায়গতপ্রাণ' সভ্যতাকে তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ

কর্ত্তব্য খুব স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট :—প্রথমতঃ ভারতের প্রাণস্বরূপ পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন, এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও শিল্পপ্রসারের দ্বারা নব্য যুগের সংস্কৃতির প্রভাবে পল্লীজীবনকে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা।

বিভিন্ন শাখা সভাপতিগণের অভিভাষণের সারাংশ

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান শাখা :—এই শাখার সভাপতিরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এস্. দত্ত 'অণু ও পরমাণু কর্ত্তৃক আলোকের শোষণ' সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। বৈজ্ঞানিক বর (Bohr) প্রবর্ত্তিত মতবাদের সাহায্যে কিভাবে স্বাভাবিক পরমাণু দ্বারা শোষণের মূল তথ্যগুলির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ দত্ত বলেন যে শুধু স্বাভাবিক পরমাণুর কথা ছাড়িয়া দিলেও আন্তর্কাক্ষিক (interorbital) পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত নির্ব্বাচন নীতির সংশোধিত নিয়মের সহায়তায় এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরমাণুসমূহের ঘনত্ব (concentration) সম্পর্কে বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যান যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহার আনুকূল্যে বরের মতবাদ দ্বারা তাপ, বিদ্যুৎ বা আলোক শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত পরমাণুসমূহের শোষণকার্য্য সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যও বর্ত্তমানে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হইয়াছে। শক্তিপরিমাণ বা 'কোয়াণ্টাম্' মতবাদের দ্বারা আলোকশোষণ রেখার উজ্জ্বলতা (intensity) প্রভৃতি গুণের কারণনির্ণয় করিতে না পারা গেলেও তরঙ্গ মতবাদের সাহায্যে, বিশেষতঃ অধুনা ডিরাক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত রশ্মিবিকিরণ (radiation) মতের সাহায্যে তাহাও অধিকতর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারা যাইতেছে।

শক্তিসমূহ শোষিত হইয়া কোথায় যায় এবং কিভাবে উহা বিক্ষিপ্ত বা পরিব্যাপ্ত (dissipated) হয় পরীক্ষা দ্বারা এপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করেন। শোষণ করিবার ফলে যে সকল রেখার উৎপত্তি ঘটে তাহা কতটা চওড়া (width) এবং সেই প্রস্থের কতটুকুই বা স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে অথবা চাপের ফলেই বা উহার পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে তৎসম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে, ডাঃ দত্ত অভিভাষণে তাহাদেরও নির্দ্দেশ করেন। সংরক্ষণ নীতি (Laws of Conservation) অনুসারে ফোটন (photon) শক্তির বিভাগ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ফোটন ও বস্তুকণার মধ্যে আদানপ্রদান সম্পর্কিত নীতি প্রয়োগ করিলে দেখা যায় শোষণকার্য্য এলোমেলোভাবে না হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে হইয়া থাকে। শেষোক্ত ঘটনা হইতে ফোটন শক্তি অবিভাজ্য বলিয়াই ধারণা হয়। সুতরাং ফোটন বিভক্ত হয় বলিয়া সংরক্ষণ নীতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। শক্তিপরিমাণকে (quanta)

অবিভক্ত বিবেচনা করিয়াও যাহাতে 'কম্পটন ফলের' কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি এক উপায়ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অণুসমূহের দ্বারা শোষণ বিষয়ে ডাঃ দত্ত বিভিন্ন অণু কর্ত্তৃক শোষণের প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়া বলেন, যে সমস্ত শোষণে বর্ণচ্ছত্রে কোনরূপ ব্যাণ্ড (band) বা রেখা দেখিতে পাওয়া যায় না পরন্তু শুধু একটানা শোষণের ফলই (continuous absorption) পরিলক্ষিত হয়, সেই সমস্ত অণু সাধারণতঃ একপ্রকার 'আয়ন' বা তড়িৎবাহী একটিমাত্র পরমাণুকণা (singly ionised atoms) লইয়া গঠিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর যে শোষণের সহিত বর্ণচ্ছত্ররেখা যুক্ত থাকে, তাহা সাধারণ পরমাণুবিশিষ্ট অণুসমূহ কর্ত্তৃক আলোকশোষণের ফলে হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। সাধারণ পরমাণুবিশিষ্ট অণু দ্বারাও বর্ণচ্ছত্ররেখাবিহীন শোষণের ফল কিভাবে লাভ করা যাইতে পারে অথবা একপ্রকার আয়নের পরিবর্ত্তে দ্বিবিধ আয়নযুক্ত অণুসমূহের দ্বারা কিভাবে বর্ণচ্ছত্রশোষণ সম্ভবপর, ডাঃ দত্ত তাঁহার অভিভাষণে ইহাও আলোচনা করেন। যে সকল অণু দ্বারা বর্ণচ্ছত্র-রেখাযুক্ত শোষণের ফল লাভ হয়, তাহাদের বিভিন্ন প্রগতির (progressions) প্রকারভেদের দরুণ ঐ সকল অণুর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে যে তাপের প্রয়োজন (heat of dissociation), তাহা কিভাবে পরিমাপ করা যায় সভাপতি মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহার আলোচনা করেন। যে সমস্ত অণু দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন শোষণই শুধু সঙ্ঘটিত হয় তাহাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শেষ সীমা হইতে তাহাদের এরূপ তাপের পরিমাণও নির্ণয় করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শেষসীমা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত 'মাইক্রো ফটোগ্রাফ' ব্যবহার করিবার অভিমত প্রকাশ করেন এবং মাইক্রো ফটোগ্রাফ সংক্রান্ত বিশ্লেষণের জন্য স্পেক্ট্রোগ্রাম বা বর্ণচ্ছত্রপরিমাপক যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা করেন। উপসংহারে ডাঃ দত্ত বলেন, একটানা শোষণের ফল বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড, হাইড্রোব্রোমিক এসিড এবং নাইট্রিক অক্সাইড (NO) প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য সম্পর্কে ডাঃ দত্ত নিজে পরীক্ষা দ্বারা যে সকল তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন বস্তুতঃ শোষণ সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষা পদার্থবিজ্ঞানের তথা শিল্প ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সমাধান করিয়াছে।

রসায়ন শাখা :—এই শাখার সভাপতিত্ব করেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জে, এন, রায়। তাঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল 'ম্যালেরিয়ানিবারক পদার্থ' সম্পর্কিত তত্ত্ব। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা আধুনিক যুগে এই রোগনিবারণ ও প্রতিকার কল্পে যে সকল নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, অধ্যাপক রায় বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন রং

ও রাসায়নিক গঠনের মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা যেমন নূতন নূতন রঞ্জক দ্রব্যাদি আবিষ্কারে বিশেষ কার্য্যকরী হয়, তেমনি দ্রব্যাদির গঠন ও প্রাণিদেহের উপর উহাদের প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহার গবেষণা ঔষধ-পত্রাদি আবিষ্কারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণিদেহের উপর রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা খুব সহজসাধ্য নহে। কারণ যে কোন রাসায়নিক পদার্থেই বহুতর গুণ পরিলক্ষিত হয় এবং জীবন্ত প্রাণিকোষের উপর উহার ক্রিয়া বহুতর ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই সমস্ত অসুবিধার দরুণই ভৈষজ্য রসায়ন (Chemotherapy) এত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগে এসম্পর্কে যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে, ম্যালেরিয়ানিবারক নানাবিধ ঔষধ ও অন্যান্য বহু ভেষজ দ্রব্যের প্রস্তুত কার্য্য হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রাণিদেহের উপর কুইনাইনের যে বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় এই গুণ কুইনোলিন রিং, কুইনোক্লাইডিন রিং এবং ভিনিল অণুসমবায় (vinyl group) বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকার দরুণ পরিস্ফুট হয়। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ কার্য্যে সিঙ্কোনিন্ কুইনাইন অপেক্ষা কম কার্য্যকরী; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, উহাদের একটির মধ্যে 'মেথোক্সি' অণুসমবায় (methoxy group) বিদ্যমান থাকায় 'ইরিথ্রো-সাইটস্' (erythrocytes) নামক রাসায়নিক পদার্থে উহা কম দ্রবীভূত হয়। 'ইথার' সমবায় বৃদ্ধি করিলে অনেক সময় ইথোক্সি সিঙ্কোনিনের প্রতিষেধক গুণ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। 'ভিনিল সমবায়'কে হাইড্রোজেনযুক্ত (hydrogenation) করিলে পদার্থটির ম্যালেরিয়ানিবারক গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু মূল যৌগিক পদার্থে ম্যালেরিয়ানিবারণী গুণ বিদ্যমান না থাকিলে শুধু হাইড্রোজেন যুক্ত করায় সেই গুণ আসে না। ইহাতে মনে হয় 'ভিনিল সমবায়ের' সঙ্গে কুইনাইনের ম্যালেরিয়াপ্রতিষেধক গুণের তেমন কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও 'ভিনিল সমবায়' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অথবা কোন 'কার্বক্সিল সমবায়' কর্ত্তৃক উহার স্থান অধিকৃত হইলে কুইনাইনের ম্যালেরিয়াপ্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আবার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের (secondary) এলকোহলিক সমবায়ের চারিপাশে stereo-isomerism ঘটায় ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের গুণ নষ্ট না হইলেও দেখা যায় যে, 'হাইড্রক্সিল সমবায়ে'র স্থান ক্লোরিন্, ব্রোমিন্ প্রভৃতি হেলোজেন্ দ্বারা অধিকৃত হইলে কুইনাইনের গুণ হ্রাস পায়। উপরোক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় কুইনাইনের ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধের আসল গুণ কুইনোলিন নিউক্লিয়সে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এলকোহলিক সমবায় বিদ্যমান থাকিলে উহার উক্ত গুণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি কুইনোলিন্ হইতে কৃত্রিম উপায়ে যে সকল বিভিন্ন পদার্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'প্লাস্‌মোকুইন্' ও রাশিয়ায় প্রস্তুত 'প্লাস্‌মোসাইডের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফোর্ণো, রবিনসন্ প্রভৃতির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে 'প্লাস্‌মোকুইনের' ন্যায় পদার্থ-সমূহে 'এল্‌কিল-এমিনো সমবায়ের' 'এলকিল' যখন শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত না থাকিয়া সোজা-ভাবে যুক্ত থাকে তখন তাহাতে ম্যালেরিয়ানিবারক গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ কল্পে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কুইনাইন-প্লাস্‌মোকুইন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ হয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

মিয়েটস্ (Mietsch) এবং মস্ (Mauss) যে 'এলকিল-এমিনো-এক্রিডিন' হইতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'এটেব্রিন' বিশেষ কার্য্যকরী। ইহা প্লাস্‌মো-কুইন হইতে কম 'বিষাক্ত' (toxic) গুণসম্পন্ন মনে হয়। প্লাস্‌মোকুইনের সঙ্গে একত্রে ইহাকে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। একমাত্র 'এটেব্রিন' ব্যবহারেও ম্যালেরিয়া বীজাণুর অচিহ্নিত (asexual) রূপ ধ্বংস হয়। তবে সত্যিকারের রোগনিবারক ঔষধের মধ্যে স্পোরোজাইটস্-এর উপর বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে এরূপ গুণ থাকা প্রয়োজন। সে হিসাবে বিচার করিলে 'প্লাস্‌মোকুইন' বা 'এটেব্রিন্' কাহারও মধ্যে এই গুণ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ম্যালেরিয়া রোগনিবারক খাঁটি ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আধুনিক যুগে মিসেস্ রবিন্‌সন্, রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ হইতে ম্যালেরিয়ানিবারণের আদর্শ ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা যায় 'হারমেলিন্' নামক একটি পদার্থে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধকের গুণ বিদ্যমান আছে। রায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ 'হারমেলিনের' ন্যায় গঠনবিশিষ্ট একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া গবেষণা করিতেছেন। যদিও তাঁহাদের গবেষণায় এখনও তেমন কোন সুনির্দ্দিষ্ট ফল লাভ হয় নাই, তথাপি এমন কতকগুলি বিশেষ তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে যাহাতে পূর্ব্বের অনেক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইয়াছে। রবিন্‌সন্, চাটার্জ্জি, শেশাদ্রি, কারমাক, ব্রহ্মচারী এবং দাশগুপ্তের বিবিধ গবেষণা এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। 'আফ্রি'এর ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক গুণ আছে বলিয়া মনে করা হইত। এই কারণে 'নারকোটিন্' ও 'কোটারনিন্' (cotarnine) হইতে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থে ম্যালেরিয়া-নিবারক ঔষধের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া গবেষণা করা হয়। বর্ত্তমানে কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উহাদের মধ্যে এরূপ গুণবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়ার কোন আশা নাই। ম্যালেরিয়া-নিবারণে আধুনিক যুগে সাল্‌ভারসন, ষ্টোভারসল প্রভৃতির ব্যবহার হইতে মনে হয়, জৈব ধাতব (organo-metallic) পদার্থসমূহ পরীক্ষা করিলে সন্তোষজনক ফল লাভ হইতে পারে। ডাঃ রায় তাঁহার অভিভাষণে ম্যালেরিয়ানিবারক পদার্থগুলির রাসায়নিক তথ্য আলোচনা করিয়া এসম্পর্কে ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করেন। জগতের ম্যালেরিয়া-রোগপ্রপীড়িত অগণিত জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পদামের

ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ রায় বলেন যে সকল দিক হইতে সন্তোষজনক কোন ফল এপর্য্যন্ত লাভ করিতে না পারা গেলেও কৃত্রিম উপায়ে যে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এক দিন হয়তো সুফল পাওয়া সম্ভবপর হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণাগারে যাহাতে এবিষয়ের গবেষণা পরিচালিত হইতে পারে, তজ্জন্য সাহায্যের আবেদন জানাইয়া ডাঃ রায় তাঁহার অভিভাষণের উপসংহার করেন।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোলবিজ্ঞান শাখাঃ—ডব্লিউ, ডি, ওয়েষ্ট এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'ভারতে ভূমিকম্প' সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ আলোচনায় তিনি বলেন, ভারতবর্ষে ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার গোড়াপত্তন করেন ডাঃ টি, ওল্ডহাম ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আর, ডি, ওল্ডহাম। আর, ডি, ওল্ডহাম ১৮৯৭ সালের আসামের ভীষণ ভূমিকম্প সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভূকম্পলেগ যন্ত্রে যে তিন প্রকারের কম্পনতরঙ্গ অনুভূত হয় তিনি তাহাও আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠনবিষয়ের গবেষণা বিশেষভাবে আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। ভারতে ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে বলা যায়, টারসিয়ারি ও কোয়ার্টারনারি যুগে ভারতের উত্তরাংশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং যাহার ফলে হিমালয় এবং বেলুচিস্থান ও ব্রহ্মদেশীয় পার্ব্বত্য প্রদেশের উদ্ভব ঘটে, আধুনিক কালের ভূকম্প সেই আন্দোলনেরই ফল। এই কারণেই ভারতবর্ষে যত ভূমিকম্প হইয়া থাকে, তাহা ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে কিংবা ঐ সকল পর্ব্বতের সান্নবর্ত্তী প্রান্তরে সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়।

তুলনায় ভারতের দক্ষিণ উপদ্বীপ ভাগ এইরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব হইতে অনেকটা নিরাপদ। তথায় ভূমিকম্প সম্ভাবিত হইলেও কম্পনের বেগ তত তীব্র অনুভূত হয় না। ভারতের ভূমিকম্পপ্রপীড়িত স্থান বা বলয়ের (বেল্টের) ভূতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করিলে উক্ত বলয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহাদের উৎস সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। কচ্ছ প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ ধ্বসিয়া সমুদ্রাভ্যন্তরে লুপ্ত হওয়ার ফলেই ঐরূপ ভূকম্প আত্মপ্রকাশ করে। বেলুচিস্থানে কোয়েটা এবং সিবি যেভাবে তথাকার পর্ব্বতের সহিত অন্তর্মুখী (re-entrant) কোণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে একটা অতিরিক্ত চাপের সঞ্চার হইতেছে। তাই ঐ স্থান ঘিরিয়া ভূকম্পের অত্যাচার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। হিমালয় পর্ব্বত ক্রমেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার ফলে যে চাপ-রেখার সৃষ্টি হইয়াছে, উত্তর ভারতের ভূকম্প এই রেখামধ্যে উত্থিত হইয়া ঐ পথেই পরিচালিত হয় বলিয়া মনে হয়। উত্তর এবং পূর্ব্ব হইতে উত্থিত এক কেন্দ্রাভিমুখী ভূতরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতীয় উপদ্বীপের

উত্তরপূর্ব্বাংশস্থ আসাম পাহাড় চির খাইয়া যাওয়ায় অনেক ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মদেশে অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান কেন্দ্রীয় টারসিয়ারি বলয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কোন না কোন স্থলে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত বলয় এক গভীর খাদের ন্যায়, উভয় পার্শ্ব ভূগর্ভের ফাটল (faulting) দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে যে কয়টি ভূকম্প ঘটিয়াছে, দেখা যায় বেলুচিস্থান, আসাম ও ব্রহ্মদেশ—এই তিন প্রদেশেই তাহাদের প্রভাব বিশেষভাবে প্রকট। এই আশঙ্কাজনক অঞ্চলমধ্যে (danger zone) কোন কোন ভূমিকম্প কখন কখন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ১৮৯৭ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও আধুনিক যুগে সম্ভবতঃ উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। ১৯০৫ সালের কাংরা উপত্যকার ভূমিকম্পে, ১৯৩৪ সালের উত্তর বিহারের ভূমিকম্পে এবং ১৯৩৫ সালের কোয়েটার ভূমিকম্পে সর্ব্বসাকল্যে কম পক্ষে ৬০,০০০ ষাট হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে।

দেশের এই ভূকম্প অনেকটা পুরাণো ব্যাধির ন্যায়, ইহা নূতন কোন উপসর্গ নহে। জাপান, কালিফোর্ণিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে, তথায় ইহার আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, ভারতে এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। ভারতবর্ষে যেমন ভূমিকম্প হইতেছে, তাহাতে এদেশেও ভূকম্পলেখন বিভাগ স্থাপিত হওয়া এবং জাপানের অনুরূপ গবেষণাকার্য্য পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। ভূকম্পলেখন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এইরূপ গবেষণাকার্য্য পরিচালন করিতে যে ব্যয় পড়িবে, ভারতে এক একবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে যে কোটি কোটি পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয়, তাহার তুলনায় এই ব্যয় কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত যে যে অঞ্চলে ভূকম্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তথায় গৃহাদিনির্ম্মাণে বিশেষ উন্নত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। ভূকম্পসহ গৃহ প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় কিরূপ কার্য্যকরী, বিগত কোয়েটা ভূমিকম্পে তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। কোয়েটায় উন্নত পদ্ধতিতে নির্ম্মিত গৃহের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। গৃহাদি নির্ম্মাণের বিশেষ পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়া নূতন সহরের পত্তনে বা নূতন গৃহ-উত্তোলনে যাহাতে সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহা দেখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং লোকাল বোর্ড অনায়াসেই আইনের দ্বারা ইহার প্রচলন করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থায় ভূকম্পে ক্ষতির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে এবং অত্যধিক প্রাণহানির আশঙ্কাও থাকিবে না।

উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখাঃ—দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের মিঃ এইচ্, জি, চ্যাম্পিয়ন এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষের

Climax vegetation সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের স্থলভাগের একচতুর্থাংশে এখনও বনজ উদ্ভিদই জন্মিয়া থাকে। লোকজনের বসবাস না থাকিলে এবং বনসমূহ ধ্বংসের ব্যবস্থা না হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান জঙ্গল সমাকীর্ণ হইয়া উঠিত, শুধু উত্তরপূর্বের শুষ্ক অঞ্চল এবং আরও কয়েকটি বিশুষ্ক স্থান এরূপ অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। হিমালয়ের অতিশয় উচ্চ স্থানেও অবশ্য উচ্চতার ও শৈত্যের দরুণ এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারিত না।

উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে ভারতের সভ্যতা সুপ্রাচীন; উষ্ণমণ্ডলে এরূপ সর্ববিষয়ে উন্নত দেশ এখনও খুব কম আছে। সুতরাং এরূপ দেশের বনস্পতিসমূহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার যে যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত পাশ্চাত্য দেশসমূহের বৃক্ষাদির প্রাণতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানই এখনও পর্য্যন্ত খুব সামান্য, উষ্ণমণ্ডলস্থ বনসমূহের জীবনেতিহাস ও সমস্যা তো অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। যথার্থ বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ প্রমাণপ্রয়োগ ব্যতিরেকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বৃক্ষাদি সম্পর্কে যাহা প্রযোজ্য তাহাই উষ্ণমণ্ডলজাত বৃক্ষাদি সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে এইরূপ ধরিয়া লওয়ার যে ঝোঁক দেখা যায় তাহা বস্তুতঃ মারাত্মক।

কি ভাবে জল উচ্চতম বৃক্ষেরও শীর্ষদেশে উত্থিত হইয়া থাকে, সে সমস্যা যেমন কৌতূহলজনক, তেমনিই তাহা আধুনিক যুগে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের ছায়ায় (canopy) আলোর গুণ ও পরিমাণ কিরূপ তৎসম্পর্কে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। ভূমিতে উদ্ভিদ্ জন্মিলে তাহার ফলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, বৃক্ষের উপর কিরূপভাবে অন্য বৃক্ষ জন্মায়, তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে, এ সমস্তার সমাধানও এখনও হয় নাই। জমি অনুসারে কোন্ কোন্ বৃক্ষের কি পরিমাণ জলের দরকার, খালের সাহায্যে সিঞ্চনের দ্বারা অভিষিক্ত শুষ্ক জমিতেই বা তাহার পরিমাণ কিরূপ এ সকল সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বৃক্ষাদির প্রজনন তত্ত্ব ও কোথায় কি কি উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে, তদ্বিষয়েও তথ্য-সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

জমি অনুসারে উষ্ণমণ্ডলস্থ বনভূমির প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। উষ্ণমণ্ডলে ভূমি বনাকীর্ণ থাকিলে তাহা যে বিশেষ উপকার সাধন করে তাহাও বর্ত্তমানে স্বীকৃত হইতেছে। জমিতে 'হিউমাস' (humus) যোগ করে বলিয়া বনসমূহের উপকার বিশেষভাবে স্বীকৃত হইলেও এ সম্পর্কে এখনও যথার্থ তথ্য জানা নাই। বনসমূহ ভূমির উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, নদীর ভাঙ্গনে বা অন্য কোন কারণে কোথাও পলি পড়িয়া নূতন জমির সৃষ্টি হইলে পূর্ব্বেকার অনুরূপ বনজ উদ্ভিদই

এই সমস্ত নূতন জমিতে পর পর জন্মিয়া থাকে। বন সম্পর্কে যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা বনজ উদ্ভিদের পর পর এরূপ আত্মপ্রকাশ প্রায়ই লক্ষ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয়ার্থ বিস্তারিত গবেষণা হওয়া আবশ্যক।

স্বাভাবিক বনানী নষ্ট করিলে কিংবা ক্রমে ক্রমে উহা ধ্বংস করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক সময় বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। এরূপভাবে উদ্ভিদের উৎপাদনে বাধা দেওয়ায় ভারতের অনেক স্থানে আর্থিক সমস্যারও উদ্ভব হইতে দেখা গিয়াছে। অতঃপর পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্যার আক্রমণ ও তাহার সহিত বনসমূহের সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, একথা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে যে বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সহিত এবং অনেক শ্যামল প্রান্তরের উর্ব্বরতাহ্রাসের সঙ্গে স্বাভাবিক বনভূমির উচ্ছেদসাধনের এক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

বৃক্ষ ও শস্য প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে হইলে তাহাদের সংগ্রহ কার্য্যে ও তথ্যবিশ্লেষণে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে বৃক্ষ ও শস্যাদি প্রায়ই আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠে, উহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ সময়সাপেক্ষ। উহারা যেরূপ পচনশীল, তেমনি আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এই সমস্ত কারণ অনেক সময় উহাদের বৃদ্ধির পক্ষে বাধা উৎপাদন করে। সুতরাং তখন উহাদিগের রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হয়। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন, উষ্ণমণ্ডলে যে সমস্ত বন উৎপন্ন হয়, তাহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভারতের অবস্থা খুব অনুকূল এবং ভারত এ বিষয়ে অন্যায়াসে অন্যান্য দেশকে পথপ্রদর্শন করিতে পারে। এ বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই, তাহা বৈজ্ঞানিকগণের নিকট যেমন কৌতূহলজনক, আর্থিক অবস্থার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাদের সমাধানের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি অনুভূত হইবে।

প্রাণিবিজ্ঞান শাখাঃ—লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জি, এস, থাপার এই শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে 'ভারতে ক্রিমিতত্ত্ব' (Helminthological) গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষে ক্রিমিতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইদানীং অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কৃষিসম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণের কার্য্যের এই যে 'সমাদর, ইহা, বিশেষ শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ অন্যান্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ক্রিমিতত্ত্ব সম্পর্কিত বহুবিধ মৌলিক তথ্য প্রাণিবিজ্ঞান-বিদ্‌গণের চেষ্টার ফলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ডাঃ থাপার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের

সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহের অনেক পরজীবীরও (parasite) উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহপালিত নানাবিধ জীবজন্তুর দেহে যে ক্রিমি বা পোকা আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বাগ মানাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধানের ফলে কিংবা কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অথবা লোকালয় স্থাপনের দরুণ একই স্থানে অধিক সংখ্যক প্রাণীর সমাবেশ হইলে গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে এরূপ ক্রিমি সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। যানবাহনের নানাবিধ ব্যবস্থা এবং আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থাও অনেক সময় এরূপ সংক্রমণ বৃদ্ধি করে। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে শুধু এই কারণেও ব্যাপকভাবে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণার প্রয়োজন। ক্রিমি সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ডাঃ থাপার বলেন যে সুশ্রুত, চরক এবং মাধব নিদান প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রকার ক্রিমির সন্ধান পাওয়া যায়। 'দ্বিমুখ' এবং 'পরিসর্প' নামে যে ক্রিমি বা কীটের উল্লেখ ঐ সকল গ্রন্থে আছে, আধুনিক নামকরণের নিয়মানুসারে তাহাই তিনি যথাক্রমে *Enterobius vermicularis* এবং *Microfilariae* বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন ভারতে এসম্পর্কে অতি কম আলোচনা হইয়াছে। ডাঃ থাপার বলেন ভারতের অহিংসা আন্দোলনই এজন্য অনেকাংশে দায়ী। আধুনিক যুগে এদেশে ক্রিমি সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সাধারণ চিকিৎসা অথবা পশুচিকিৎসা বিভাগের উৎসাহী কর্ম্মিগণের প্রচেষ্টায়। কার্য্যব্যপদেশে এই সমস্ত কর্ম্মীরা নানাপ্রকার ক্রিমিকীটের সন্ধান লাভ করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতীয় ক্রিমিতত্ত্বের মূল ভিত্তির পত্তন করিয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ক্রিমিতত্ত্ব বিষয়ে এদেশের ছাত্রগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার পক্ষে নানারূপ অসুবিধা বিদ্যমান। এ দেশে প্রাণিবিজ্ঞানের যে সমস্ত পুস্তক প্রচলিত, সংশোধিত বলিয়া তাহাদের প্রণেতৃগণ যতই গর্ব্ব করুন না কেন, অধিকাংশ পুস্তকেই আধুনিক শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের নিয়ম অনুসৃত হয় নাই এবং পুরাতন নাম ও শ্রেণীবিভাগই ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি, কোন কোন পুস্তকে অতি সাধারণ ক্রিমি *Ascaris*এর জীবনেতিহাস সম্পর্কেও অতি পুরাতন ও অচল কথার অবতারণা করা হইয়াছে। ফলে ক্রিমি সম্পর্কিত চিকিৎসায় ও উহাদের নিবারণে বিশেষ অসুবিধা হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্রগণকে ক্রিমিতত্ত্বের শিক্ষা সোজাসুজিভাবে না দিয়া পরজীবিত্বের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যাহাতে তাহারা এ বিষয়ে গবেষণা করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ব্যবচ্ছিন্ন জীবদেহ হইতে এরূপ ক্রিমিকীট সংগ্রহ করাও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য হইবে। এরূপ গবেষণার ক্ষেত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ডাঃ থাপার বলেন যে, কীট প্রভৃতির অঙ্গসংস্থান-বিদ্যা (morphology) সম্পর্কে এদেশে এখনও যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রহিয়াছে। কারণ এদেশে জীবজন্তুদেহে যে ক্রিমিকীট (helminth fauna) আছে তদ্বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন

গবেষণাই হয় নাই। এমন কি যে সকল ক্রিমিকীটের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কেও পুনর্গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, কারণ এ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে এখনও রোগনির্ণয়ে নানাবিধ ভ্রান্তি দেখা যায়। ডাঃ থাপার বিভিন্ন পুস্তক হইতে এরূপ অনেক ভ্রমের উল্লেখ করিয়া বলেন ক্রিমিকীটের অঙ্গসংস্থান বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থে যে সকল ভুলচুক পরিলক্ষিত হয়, তাহার অপনোদন বর্ত্তমানে এক প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ সমস্যার সমাধান এবং আধুনিক প্রথালীতে শ্রেণীবিভাগ দ্বারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর (group) মধ্যে সম্পর্কনির্দ্দেশ করা যেরূপ সম্ভবপর হইবে, তাহাদের ক্রমবিকাশের তথ্যনির্ণয়েও তেমনি সহায়তা করিবে,—এসম্পর্কে ডাঃ থাপার তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের বিষয় সবিশেষ আলোচনা করেন।

ক্রিমিকীটসমূহের জীবনেতিহাস জানিতে পারিলে ঐ সমস্ত পরজীবীদের নিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভবপর হইবে। এবিষয়ে মিশরে *Schistomiasis* সম্পর্কে লিণ্ডারের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্ণৌ সহরে অধুনা যে *Echinococcus cysts* আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহাও ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ক্রিমিকীটের রোগোৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় মানুষের এপেণ্ডিসাইটিস্ রোগের কারণ স্বরূপ *Enterobius vermicularis* নামক ক্রিমিকীটের আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এরূপ আবিষ্কারের ফলে জীবজন্তুদেহেরই নানাবিধ রোগের কারণ সম্বন্ধে এক নূতন কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে গোমহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর একপ্রকার 'নাক ডাকা' রোগ দেখা যায়। *Schistosoma spindalis* ঐ রোগের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রকার বহু গবেষণায় দেখা যায় জীবজন্তুর অনেক রোগের মূলেই ক্রিমিকীট বিদ্যমান। বস্তুতপক্ষে এধরণের গবেষণা ভারতবর্ষে প্রাণিসাধারণের রোগনির্ণয় বিষয়ে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সমস্ত ক্রিমিকীট দূরীকরণের নিমিত্ত নানা ক্রিমিঘ্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণেল চোপরা দেশী গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত নানাবিধ ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এখনও এরূপ বহু ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা বাকী আছে। কুকোন্দার (*Blumea lacera*) রসের ন্যায় একপ্রকার চারাগাছের রস প্রয়োগ করিয়া সাধারণ ক্ষুদ্র ক্রিমিকীট (common pinworm) ধ্বংস করিবার যে প্রণালী অনুসৃত হয়, তাহাতে প্রাণিদেহে এ সকল স্বভাবজাত ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধেও গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইষ্ট ও ভিটামিন ব্যবহারের ফলে যে উপকার হয় তাহাও গবেষণা করিয়া দেখিবার মত। কারণ প্রাণিসমূহের জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার নিমিত্ত এই সমস্ত পরজীবীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার শক্তি কাহার কতটুকু আছে তাহা পূর্ব্বাহ্নে নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুক্তির উদ্ভবের

জন্য যে একপ্রকার ক্রিমিকীট দায়ী তাহার কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে ডাঃ থাপার বলেন ভারতে ক্রিমিতত্ত্ব গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা, অনস্বাস্থ্য, পশুচিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্ম্মিগণের এ সম্পর্কে একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহা হইলেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সন্তোষজনক ফললাভ আশা করা যাইতে পারে।

নৃতত্ত্ব শাখাঃ—দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বিগত চব্বিশ বৎসরে নৃতত্ত্বে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র সুদূর-প্রসারী। শারীরিক গঠন ও সংস্কৃতি উভয় দিক্ হইতেই নৃতত্ত্বের আলোচনা হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও আছে। শারীরিক গঠনের দিক্ হইতে বিচার করিলে প্রাণিবিজ্ঞানকে প্রত্ন-জীববিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এবং প্রাগতত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই অগতের সন্ধান লইতে হয়, যাহা 'সাইকোফিজিক্সের' দ্বারাই শুধু অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে। সংস্কৃতির দিক্ দেখিতে গেলে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্প, শিল্পকলাপ্রতিষ্ঠান সংস্থার এবং সর্ব্বোপরি মানবের ভাষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হয়। ভাষার সাহায্যেই মানুষের অন্তর্জগতের নিগূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করা সম্ভবপর। এই সমস্ত বিষয়ে যে সকল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, নৃতত্ত্বের তাহা এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। ইহার যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় নৃতত্ত্বে সঙ্কীর্ণ Somatology বা শুধু মাত্র দেহবিজ্ঞানের ধারণা থাকা উচিত নহে। মানুষের শরীর ও সংস্কৃতি উভয় দিকের আলোচনাই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সুনির্দ্দিষ্টভাবে করিতে হইবে। মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং উহা একপ্রকারভাবে মানবকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে যে, একটিকে বাদ দিয়া শুধু অপরটির সাহায্যে মানুষের জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন কিছুরই বিচার করা চলে না। ডাঃ অনন্তকৃষ্ণ তাঁহার অভিভাষণে বিশেষভাবে কুর্গ জাতির নৃতত্ত্ব আলোচনা করেন। তিনি বলেন বিভিন্ন লেখক এই জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শিলালিপি হইতে এই জাতির অতি অল্প পরিচয় পাওয়া যায়। কুর্গ অঞ্চল কদমবাস, গঙ্গবংশ, হয়শাল রাজগণ, বিজয়ননগরের অধীনস্থ বেলুরের নায়কগণ, কুর্গের লিঙ্গায়তগণ প্রভৃতি মানবসম্প্রদায়ের সহিত ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল। কুর্গ রাজগণ নিজেরাও বিদেশী। ওয়াইনাদ চেট্টিগণের (Wynad Chetties) নাম হইতেও বুঝা যায় যে তাহারা কুর্গে বসতিস্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং এরূপ অনুমান হয় যে কুর্গগণ একেবারে অন্য জাতির সংমিশ্রণের প্রভাবমুক্ত নহে। সংস্কৃতির দিক্ দিয়াও মালাবার, ক্যানেরি ও তামিল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের এবং টুলুগণের সহিত

কুর্গগণের সংযোগ দৃষ্ট হয়। কুর্গগণের ভাষা প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিগণের ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জীববিজ্ঞানানুসারে জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রয়োজনীয় তথা, তেমনই তাহার সহিত মানসিক ক্ষমতা এবং বৃত্তিগুলিও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়, পার্ব্বত্য আবহাওয়া, অভ্যাস, খাদ্য এবং কর্ম্মপ্রথা কুর্গবাসীকে আজ যেমনটি দেখিতে পাওয়া যায় তেমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উপরোক্ত কারণের জন্যই প্রান্তরের অধিবাসীদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্যের উদ্ভব হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর কুর্গদিগের অর্থনীতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। কুর্গগণ প্রথমতঃ শিকারী ও মৎস্যজীবী ছিল এবং পরে কৃষিজীবী হয়। তাহাদের শিকারের প্রবৃত্তি এখনও তাহাদের বিভিন্ন উৎসবাদিতে পরিস্ফুট দেখা যায়। ছোট-খাট নদীতে এবং বর্ষার সময় ধানক্ষেতে তাহারা এখনও মাছ ধরিয়া থাকে। কুর্গগণের কৃষিকার্য্য প্রণালী ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের ন্যায়ই সুপ্রাচীন প্রথায় পরিচালিত হয়। চাষীরা সেই পুরাতন কার্য্যপদ্ধতিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, নূতন কিছু করিবার তাহারা পক্ষপাতী নহে। এস্থানের দুই উচ্চ ভূমির মধ্যস্থিত উপত্যকা বেশ উর্ব্বর, তবে চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি এখনও মান্ধাতার আমলের। তাহা হইলেও এখানে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় এবং স্থানীয় অভাব মিটাইয়া, মালাবার অঞ্চলে রপ্তানি করা চলে। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও চৈত্রসংক্রান্তির দিন হইতে কৃষি-বৎসর (agricultural year) গণনা করা হয়। এপ্রিল বা মে মাসে প্রথম বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা ক্ষেত্র চাষ করিতে আরম্ভ করে। শুভদিন দেখিয়া কুর্গপরিবারগণের সকলে একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্মিলিত হয় এবং নিজ নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রজ্জ্বলিত শিখার সম্মুখে পূর্ব্বপুরুষগণের ও কাবেরী দেবীর আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া লয়। যুবকগণ গুরুজনদের প্রণাম করিয়া এক জোড়া বলদ লইয়া মাঠে যায় এবং উহাদিগকে পূর্ব্বাস্য করিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। জমির মালিক আসিয়া উদীয়মান সূর্য্যের দিকে হাত তুলিয়া নারিকেল, কলা, চাউল, দুগ্ধ প্রভৃতি অর্ঘ্য দেবতা 'নাদে'র উদ্দেশে সমর্পণ করে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লয়। চাষী তখন বলদদুইটিকে জোয়ালে বাঁধিয়া হল দ্বারা জমিতে তিনটি কর্ষণচিহ্ন অঙ্কিত করিলে পর সেই দিনকার প্রাতঃকালের মত কার্য্যশেষ হয়। কর্ষিত মাটির কয়েকটি ঢেলা চাষী গোলায় লইয়া যায় এবং শিবের নিকট তাহার শতগুণ পাইবার প্রার্থনা করে। ক্ষেতের কার্য্যে তাহাদের উদ্যমশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কুর্গগণ অনেকে কফি, এলাচ, ফলফলাদিও উৎপন্ন করিয়া থাকে। মধুসংগ্রহেও তাহাদের উৎসাহ দেখা যায়। ভাতই কুর্গগণের প্রধান খাদ্য। উহাদের ঘরবাড়ী নায়ারদিগের বাড়ীঘরের ন্যায় ধান জমির নিকটেই অবস্থিত এবং কদলী, সাগু, পান, আম, কাঁটাল ও সুপারি গাছে ঘেরা। অনেকের

বাড়ীতেই আবার ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহাতে মাছের সংখ্যাও কম নয়। কুর্গদিগের গৃহের গড়ন অনেকটা মালাবারের নায়ারদিগের গৃহের অনুরূপ। প্রাচীন কুর্গগৃহ অনেকটা দুর্গের মত সুরক্ষিত। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বে সর্দ্দারে সর্দ্দারে এবং এক বংশের সহিত অপর বংশের অন্তর্বিরোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। অনেক প্রাচীন গৃহের চারিদিকে যে পরিখা এখনও দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত এইরূপ বিরোধবিপত্তির নিদর্শন সূচিত করে। কুর্গদিগের গৃহের আসবাসপত্র উহাদের সরল জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়। উহারা কিরূপ পরিশ্রমী ও দূরদর্শন, মৌসুমী সময়ে উহাদের কৃষিকার্য্য পরিচালনা দেখিয়া সহজেই তাহা অনুমান করা চলে। পোষাকপরিচ্ছদেও উহাদের একপ্রকার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে উহারা পুরাতন আচারপদ্ধতির সহিত হাল ফ্যাসনের অনেক রীতিনীতি আমদানী করিয়া লইয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই উহাদের বিবাহ হয় এবং বিবাহে অনেক হিন্দু আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কুর্গদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা বিশেষ প্রবল। বয়োজ্যেষ্ঠ গৃহকর্ত্তার সম্মতি ব্যতীত কোন কায কেহ করিতে পারে না। বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহিণীও তেমনি পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্রী। সামাজিক রীতিনীতি সমস্তই বয়োবৃদ্ধদের এক সম্মিলিত বৈঠকের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনরূপ সাহায্য না লইয়া ইহারাই অনেক ব্যাপারে নিজেদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। কেহ কোন অপরাধ করিলে হয় তাহার জরিমানা হয়, কখনও বা তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কুর্গগণ মাংসাশী এবং নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের অনুস্মৃত রাক্ষসাদির পূজা করে। মালয়ালি, টুলু, কানারি প্রভৃতির সংস্কার দ্বারা ইহারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সম্প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও লিঙ্গায়ত সংস্কারও ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টুলুগণ ইহাদের অনেক প্রাচীন দেবমূর্ত্তি লইয়া গিয়াছে। কুর্গগণকে তাই অনেক সময় আবার উহাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কুর্গগণ কাবেরী আমেন বা কাবেরী দেবীর পূজা করে। উহাদের প্রধান উৎসব ছট্টরি; উহা মালাবারদিগের ওনাম উৎসবের ন্যায়। সম্প্রতি কুর্গগণ অনেক হিন্দু দেবদেবীর পূজাও আরম্ভ করিয়াছে।

মনোবিজ্ঞান শাখাঃ—এই শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে, সি, মুখোপাধ্যায়। তিনি ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক মন (social mind) সম্পর্কে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সূচিন্তিত অভিভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সামাজিক বন্ধন মূলতঃ মানসিক। প্রত্যেক মানবের মানসিক জীবনেই কোন না কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিজড়িত থাকে। প্রথমে যেমন ইট এবং তার পরে ইটের স্তূপ; মানুষের জীবনে কিন্তু তাহা নহে,—প্রথমে ব্যক্তি এবং পরে সামাজিক ঐক্য, মানবজীবনে এরূপ ঘটে না। কেহ কেহ এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন যে, সমষ্টিবোধই মনোজগতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আদর্শ এবং সমাজই প্রকৃত দেবতা। সমাজ-

মনের এইরূপ উন্নত অবস্থা সাধারণতঃ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। গোষ্ঠীর জীবনে যখন ভাবাবেগ আসে, তখন ব্যষ্টি তাহার নিজের বিষয় ভাবিবার কম অবসর পায়, যুক্তিতর্কের অবসান ঘটাইয়া সে তখন পর মত গ্রহণে উন্মুখ হইয়া উঠে বেশী। আলোচনার ফলে নিজ মত পরিবর্ত্তন করিবার ঝোঁক বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং পরীক্ষায় দেখা যায়, এরূপ আলোচনার ফলে পুরুষদের তুলনায় মহিলাগণই অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়া থাকেন। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায়, হত্যাপরাধের বিচারে বহু জুরী নিযুক্ত করা হয়, অথচ কোন জাহাজের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য লোক থাকে মাত্র এক জন। যে কয় জন ব্যক্তি লইয়া গোষ্ঠী গঠিত হয়, দায়িত্বভার তাহাদের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব সেই পরিমাণে হ্রাস পায়। অবশ্য দায়িত্ববোধ হ্রাস পাইলেই মানুষ অপর একজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে না। গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে অনেক সময় সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গেলেও ব্যক্তিবিশেষের শুরু দায়িত্ব ভার এড়াইবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সামাজিক চেতনার বিকাশ পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে। সমাজের অংশ হিসাবে ব্যক্তির সত্তা যতখানি, তদপেক্ষাও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাহার উপরে বেশী। শিশু যখন সমাজে প্রথম প্রবেশ করে, তখন তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে না; সমাজের সঙ্ঘাতের ফলে আস্তে আস্তে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এই ব্যক্তিত্বের ক্রম ক্রমে পরিপুষ্ট হয় এবং যে সামাজিক সংস্কৃতিরূপ নমুনার বিশেষত্ব লইয়া সে গড়িয়া উঠে প্রতি স্তরে তাহাই পরিস্ফুট হয়। সামাজিক সংস্কৃতির শেষ বিশ্লেষণ সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই লাভ করা যায়। মানুষ শুধু পুরাতন সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে না, পরন্তু তাহাদিগকে নূতন সংস্কৃতিরও সন্ধান আনিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিত্য নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না অর্থাৎ সংস্কৃতির দিক্ দিয়া যে নিষ্ক্রিয়, তাহার জীবন কি শিক্ষা, কি সমাজ উভয়ের দিক্ দিয়াই ব্যর্থ। সুতরাং সংস্কৃতিমূলক কার্য্যাবলীকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্যই রাজনীতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধই শিশুর মনে বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রতি মমতাবোধের বিকাশসাধনে সহায়তা করে। নিজ পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ ও উগ্র জাতীয়তাবোধ স্কটদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ হাইল্যাণ্ডারদিগের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জাপানীদেরও পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি অত্যধিক টান। উচ্চ জাতীয়তাবোধের জন্যও জাপানীরা বিখ্যাত। জার্ম্মানী ও ইতালীর অধিবাসিগণের পক্ষেও ঐ কথা বলা চলে। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণেরও জাতীয়তাবোধ এবং ভাবপ্রবণতার জন্য খ্যাতি আছে, তাহাদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি মমত্ববোধও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি মমতা অত্যধিক দেখা গেলেও তাহাদের

জাতীয়তাবোধ তেমন উগ্র নহে; এই কারণে যদিও উক্ত দুই গুণের মধ্যে বিশেষ কোন যোগাযোগ আছে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তথাপি রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনার্থ পরিবারিক জীবনসংগঠন করা যেরূপ প্রয়োজন, জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ও ভিত্তিস্থাপনে পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধের প্রতি জোর দেওয়াও তেমনি আবশ্যক। ইহা সম্ভবতঃ সত্য যে 'ব্যারাক সিষ্টেমে' শিশুপালনের প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে, তাহা জাতীয় জীবনসংগঠনের পক্ষে মারাত্মক হইবে। পরিবারের মধ্যে থাকিলে বৃহত্তর সমাজের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পক্ষে বাধা জন্মে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। একান্ত আত্মপ্রীতিসম্পন্ন ও স্বার্থপরায়ণ না হইলে পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ কোনরূপ বাধা না জন্মাইয়া বরং বৃহত্তর সমাজের প্রতি চেতনার বিকাশসাধনের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ দুই বংশের প্রধান শাখার সংযোগে বলিষ্ঠ ও তেজোবীর্য্যশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করে এরূপ প্রমাণ বিরল নহে। প্রতিভাশালী সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত এরূপ বিভিন্ন বংশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া হিতকর বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন জাতির মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেরই বিপুল কর্ম্মশক্তি দেখা যায়, জাতি হিসাবেও তাহাদের মধ্যে বিজাতীয় রক্ত অপেক্ষাকৃত কমই প্রবেশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু বিশেষ বাঁধাধরা কোনও বর্ণবিভাগ না থাকাতে তাহাদের সংস্কৃতির গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ জীববিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে শুধু রক্তের পবিত্রতা সংরক্ষণই যে ভাল তাহা নহে। কিন্তু বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন দুই বংশ বা জাতির সংযোগে নিকৃষ্টতর জাতির উৎপত্তি ঘটে বলিয়াই মনে হয়। এই কারণেই ভারতবর্ষের ইউরেশিয়ানগণ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতি। কিন্তু সমস্ত ইউরেশিয়ানদিগের সম্বন্ধে এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত করায় বিপদ আছে, কারণ পিতামাতার বংশের বিশিষ্ট গুণ একেবারে বিনষ্ট হয় না এবং সংমিশ্রণজাত সন্তানের মধ্যেও নানারূপ গুণবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সামনার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাতিবিদ্বেষ বা সমাজবিদ্বেষ শুধু এরূপ পার্থক্যের জ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে। জাতিতে জাতিতে পার্থক্য রহিয়াছে, শুধু এই কারণেই এরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষের উদ্ভব হয় না। স্প্যানিয়ার্ড বা ভারতীয়দিগের মধ্যে কোনরূপ ঘৃণার ভাব বিদ্যমান নাই, যদিও তাহাদের গায়ের রং, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাব ও ভাষাতে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। জাতিবিদ্বেষ তখনই আত্মপ্রকাশ করে যখন রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সংস্কৃতির দিক্ দিয়া অবনত কোনও জাতির আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হয়। যদি অগ্রগত বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উচ্চতর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রকৃত শাস্ত্রভাবে মানিয়া লয়, তাহা হইলে আপেক্ষিক সমতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। কিন্তু যখনই কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় শিক্ষা, দীক্ষা বা শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে বৃহত্তর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা

প্রদর্শন করে, তখনই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানমর্য্যাদাহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ফলে ছোটখাট রকমের বা বড় রকমের জোরজুলুম, অত্যাচার, অবিচার ঘটে। শুধু জাতিগত বা সম্প্রদায়গত পার্থক্যের জন্যই এরূপ সঙ্ঘর্ষ বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। অনেক সময় এই সমস্ত পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কারণ উহা দ্বারাই উল্লিখিত কাল্পনিক বা সত্যিকারের আশঙ্কার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আহ্বান আসে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত সম্বন্ধের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই উভয়ের মধ্যে আমাদের দেশে এই মনকষাকষির উদ্ভব হইয়াছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন মনকষাকষি আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে যে কারণ হইতে ঐরূপ মনকষাকষির উদ্ভব সেই কারণের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে অথবা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধানের আগ্রহ উপস্থিত হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ জোরজবরদস্তি দ্বারা মানুষের মতপরিবর্ত্তনে বাধ্য করা যায় না। মূল উদ্দেশ্য যেখানে স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বতই উপস্থিত হয়,—প্রাগৈতিহাসিক নিম্নস্তরে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যুক্তিতর্ক শুধু কৌশলক্রমে প্রযুক্ত হইলেই সফল লাভের আশা আছে। মুখ্য উদ্দেশ্যকে গৌণ করায় যে আকাঙ্ক্ষা বা প্রেরণা প্রতিহত হওয়ার ফলে সামাজিক ঘৃণা বা বিদ্বেষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দূরীকরণের চেষ্টায় যুক্তিতর্ক কৌশলক্রমে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন; এবং যে অনুপাতে মূল উদ্দেশ্যকে চাপা দিয়া এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়, সেই অনুপাতেই যুক্তি কার্য্যকরী হইয়া থাকে। মূল উদ্দেশ্যকে পশ্চাতে রাখিয়া কার্য করিলে সমাজসংস্কারে যে অধিকতর ফললাভ করা যায় তাহার কারণও এই,—এ যেন অনেকটা 'লেভারের' দীর্ঘতর দণ্ডে ওজন চাপাইবার মত, যাহার ফলে শক্তির অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়। জনসাধারণকে মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্য গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হইবার কারণ এই যে, প্রথম হইতেই পরিষ্কারভাবে কার্য্যের আসল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহার উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতিবিধান এবং উপদেশমূলক সঙ্গীত, নাটক ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে অধিকতর স্থায়ী ফল অবশ্যই পাওয়া যাইত। এই কারণেই আইনের সাহায্যে সামাজিক উন্নতিসাধনের চেষ্টাও প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। বাঁকানো লোহার পাতকে সোজা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিশেষ বিবেচনার সহিত বাঁকানো অংশের বাহিরে আস্তে আস্তে উহার উপর ঘা দিতে হয়, নচেৎ আঘাতের ফলে আবার নূতন রকমের ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। বাঁকা লোহাকে সোজা করা তবু হয়তো সহজ, মানবমনকে গড়িয়া তোলা কিন্তু তত সহজ নহে।

সংবাদ চয়ন

ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার আগামী অধিবেশন

আগামী ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান সভাসভার পঞ্চবিংশ অধিবেশন হইবে। পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে বলিয়া ঐ অধিবেশন মহাসভার রজত জয়ন্তী। এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আগামী অধিবেশন ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের সহযোগে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ডের সভাপতিত্বে কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হইব। জয়ন্তী অধিবেশনে বিভিন্ন শাখার সভাপতি পদে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান—স্যার সি, ভি, রামন
রসায়ন—স্যার পি, সি, রায়
ভূতত্ত্ব ও ভূগোলবিজ্ঞান—মিঃ ডি, এস, ওয়াডিয়া
উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান—অধ্যাপক বীরবল সাহনি
প্রাণিবিজ্ঞান—ডাঃ জর্জ্জ মাথাই
নৃতত্ত্ব—ডাঃ বি, এস, গুহ
প্রাণতত্ত্ব—লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল আর, এন, চোপরা
চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পশুচিকিৎসা—স্যার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী
কৃষিবিজ্ঞান—রাও বাহাদুর টি, এস, ভেঙ্কটারামন্
মনোবিজ্ঞান—ডাঃ জি, বসু

ভারতীয় ছাত্রের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সুবৃহৎ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, প্রদর্শনী সমাপ্ত হইয়া গেলে তাহাতে অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ প্রদর্শনীর কমিশনার বা কর্ম্মকর্ত্তাগণকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কমিশনারগণ ঐ অর্থ হইতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদিগকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতীয় রাজন্যগণ এবং অন্যান্য অধিবাসী উপরোক্ত প্রদর্শনী-তহবিলে প্রচুর অর্থদান করিলেও উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ভারতীয় ছাত্রগণকে এতাবৎকাল কোন বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম এতদিন পরে লণ্ডন প্রদর্শনীর কমিশনারগণ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দুই বৎসরের নিমিত্ত ২৩০ হইতে ৩০০ পাউণ্ড পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৃত্তি দুই বৎসর পাওয়া যাইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ প্রার্থী বাছাই করিবার নিমিত্ত ছোট একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯৩৭ সালের বৃত্তির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্য ছাত্র মনোনয়ন করিয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাহাদের যথার্থ অনুরাগ আছে তাহাদের মধ্যে এবং যাহাতে বিদেশের নিকট ভারতের নাম কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে হায়দরাবাদে সম্পন্ন হইয়াছে। সভায় বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—অধ্যাপক এম, এন, সাহা
সহ সভাপতি—অধ্যাপক ভাটনাগর এবং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল আর এন, চোপরা
বৈদেশিক সম্পাদক—অধ্যাপক বীরবল সাহনি
সম্পাদক—অধ্যাপক এস, পি, আঘরকর এবং ডাঃ এ, এন, হিরণ
কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ সুন্দরলাল হোরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচেন্সেলর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ডাঃ মজুমদারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজ্ঞানে ডি-এস-সি উপাধি লাভ

শ্রীযুত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়ে এইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডি-এস-সি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় ফোটো কেমিক্যাল প্রতিক্রিয়ার সহায়ক (catalysts) স্বরূপ অজৈব colloidsএর ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুত মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে কলেরা ভাইব্রিও (vibrio) এবং তৎসম্পর্কিত অনুরূপ পদার্থের ফিজিকো-কেমিক্যাল গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নূতন ডিরেক্টর

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে, এফ্, র‍্যাকিষ্টনের স্থলে রায় বাহাদুর কে, এন, দীক্ষিত উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন।

দীক্ষিতের নাম সকলেরই সুপরিচিত। ১৯৩০ সালে তিনি ভূতাত্ত্বিক খননকার্য্যের জন্য ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৫ সালে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। মহেঞ্জোদারো, পাহাড়পুর, মহাস্থান, রাঙ্গামাটী প্রভৃতি অনেক স্থানে তিনি বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন। প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বেও দীক্ষিতের বিশেষ অনুরাগ আছে। এই পদপ্রাপ্তি সর্ব্বাংশেই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা দীক্ষিত মহাশয়কে তাঁহার এই সম্মানলাভের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের আগামী বার্ষিক অধিবেশন

ব্রিটীশ এসোসিয়েসনের পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১লা হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্যার এডওয়ার্ড পুলটনের (Poulton) সভাপতিত্বে নটিংহামে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিন্‌সনের দান

ব্রিটীশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি ঐ দেশের ধনীব্যক্তিগণের বিশেষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড নাফিল্ডের দানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মিঃ ফ্রাঙ্ক পাকিন্‌সন নামক একজন ব্যক্তি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে। মিঃ পাকিন্‌সন কিছুকাল পূর্ব্বে একটি বৃত্তিপ্রদানের তহবিল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। পার্কিন্‌সন মেসার্স ক্রমটন এণ্ড পাকিন্‌সন লিমিটেড কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। নিজ শিক্ষায়তন বা 'আলমা মেটারে'র প্রতি শিক্ষার্থীর এইরূপ প্রীতির প্রকাশ বিশেষভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই।

পুস্তক সমালোচনা

খাদ্য-বিজ্ঞান—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম্-এস্-সি প্রণীত; ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

গত ২০।২৫ বৎসর হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে খাদ্য-বিজ্ঞান বা dietetics সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়টী এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে আজ খাদ্য-বিজ্ঞান একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষেও গত কয়েক বৎসর হইতে এ সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। সাধারণেও এখন এ বিষয়ে জানিতে উৎসুক। এমন সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় একজন প্রবীণ ও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাতৃভাষায় খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন দেখিয়া খুবই আনন্দ হয়। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা সাধারণের উপযোগী করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে ছোট ছোট পুস্তক লিখেন। এদেশে সে বালাই নাই। বিজ্ঞান-জগতে যাঁহাদের নাম আছে এমন লোক সাধারণের জন্য মাতৃভাষায় পুস্তক লিখিতে নারাজ। অথচ দেশে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই। এখন অবশ্য কেহ কেহ এদিকে একটু মনঃসংযোগ করিয়াছেন, ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকারদ্বয় আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। শারীর-যন্ত্র, পরিপাক-যন্ত্র ও পরিপাক প্রণালী, এন্‌জাইম, হরমোন্, কার্ব্বোহাইড্রেট, ফ্যাট্, প্রোটীন, ভাইটামিন, লবণ পদার্থ, বয়স ও অবস্থাভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা, রোগীর খাদ্য—ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে। 'বর্ত্তমানে ভাইটামিন সম্বন্ধে সকলেরই জানিবার কৌতূহল দেখা যায়' এজন্য এই বিষয়টী যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে। অনেক নূতন তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকটী সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অতি চমৎকার হইয়াছে। এমন সুন্দর ও সুললিত ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক পুস্তক খুব কমই দেখা যায়। 'বস্তুর লীলা-বৈচিত্র্য' নামক প্রথম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য রসশাস্ত্রের কতকগুলি জটিল বিষয় এমন সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে যে একটু চেষ্টা করিলে সকলেই উহা বুঝিতে পারিবেন। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা বা সংস্কৃত কবিতার ২।১ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বিষয়গুলি সরস করিবার যে চেষ্টা তাহা খুবই উপযুক্ত হইয়াছে। একটী উদাহরণ না দিয়া থাকা গেল না। যথা—(পৃঃ ৮)

"আমরা নাইট্রোজেনের সমুদ্রে ডুবিয়া আছি, অথচ উহার এক কণিকা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা আমাদের নাই—তাই বলিতে ইচ্ছা করে 'সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব, কো দূর করব পিয়াসা?" পুস্তকখানি আগাগোড়া এইরূপ সরস করিয়া লেখা বলিয়া অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিও আগ্রহসহকারে পড়িবার ও বুঝিবার ইচ্ছা হয়।

এইবার পরিভাষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিতে চাই। (১) প্রথম, প্যানক্রিয়াস অর্থে ক্লোম ও নার্ভের স্থলে স্নায়ু শব্দের ব্যবহার। আজকাল পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ লইয়া অনেক বিচার হইতেছে। ক্লোম ও স্নায়ু এই দুইটী শব্দ আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত। স্নায়ুর সুস্পষ্ট অর্থ ligament; ক্লোমের সুস্পষ্ট অর্থ করা যায় না, ইহার অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। ক্লোম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তকে ইহা ব্যবহার না করাই ভাল। গ্রন্থকারদ্বয় পুস্তকে বহু ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; সুতরাং nerve ও pancreasকে নার্ভ এবং প্যান্‌ক্রিয়াস্ বলিলেও কিছু দোষ হইত না। নার্ভের পরিবর্ত্তে স্নায়ু শব্দের বহুল প্রচলন থাকিলেও এক্ষণে উহা ত্যাগ করা হইতেছে।

(২) Gland অর্থে 'গণ্ড' করিয়াছেন। 'গ্লাণ্ড' বলিলে কিরূপ হইত?

(৩) "কোলেসটেরল, লেসিথিন এবং বিলিরুবিন নামে পদার্থও পিত্তরসে দৃষ্ট হয়। পিত্তকোষ হইতে ঝিল্লীনিঃসৃত হওয়ায় এই রস চট্‌চটে লাগে (পৃঃ ৪৩)।" এই ঝিল্লীর অর্থ ঠিক বুঝা গেল না।

Metabolism অর্থে কয়েক স্থলে 'শরীরের ভাঙ্গাগড়া' শব্দের প্রয়োগ আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। Cartilageএর পরিবর্ত্তে 'নমনীয় পেশী'র (পৃঃ ২৪০) ব্যবহার ভাল লাগে নাই। 'পোড়া কাঁঠালের বিচি' না বলিয়া 'কাঁঠাল বিচি পোড়া' বলিলে শুনিতে ভাল হইত।

৫৩ পৃষ্ঠায় গ্লুকোজ প্রসঙ্গে বহুমূত্র রোগের উল্লেখ করিয়া ইঁহারা লিখিয়াছেন,—"সম্ভবতঃ সুশ্রুতের পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই রোগ 'মধুমূত্র' নামে পরিচিত হয়।" শব্দটী 'মধুমেহ' হওয়াই উচিত, কারণ 'মধুমূত্র' শব্দের উল্লেখ সুশ্রুতে পাওয়া যায় না; অবশ্য মেহ ও মূত্র একই পর্য্যায়ভুক্ত। ২১৮ পৃষ্ঠায় বিহঙ্গের 'কে নীরোগ'—এই কথার উত্তরে সুশ্রুতের উক্তি বলিয়া যে শ্লোকটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমরা সুশ্রুতসংহিতায় খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে শ্লোকটীর খুব প্রচলন আছে।

এক স্থানে (৩১ পৃঃ) গ্রন্থকারদ্বয় লিখিয়াছেন,—"আমাদের কবিরাজেরা অনেক সময় মাসাবধি একই প্রকারের পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতে খাদ্যের একঘেয়ে ভাবের দরুণ উক্ত (পাচক) রস ভাল নিঃসৃত হয় না, ফলে রোগী আশানুরূপ উপকার পায় না।" কোন-কোন কবিরাজ—এবং শুধু কবিরাজ কেন, অন্য চিকিৎসকদিগের মধ্যেও কেহ

কেহ—হয়ত' এরূপ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টই নির্দ্দেশ আছে যে রোগীর অরুচি হইলেও কদাপি কুপথ্য ভোজন করা উচিত নহে। যাহা হিতকর, তাহাই নানা প্রকার পাকের কল্পনা দ্বারা মুখপ্রিয় করিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া সমগ্র কবিরাজ সম্প্রদায়ের প্রতি উক্ত শ্লেষোক্তি তাঁহারা না করিলেই শোভন হইত।

পরিশেষে একটী কথা—একটী নিবেদন। গ্রন্থকারদ্বয় প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে পুস্তকটী নব্য খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। সুতরাং প্রাচ্য খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও আলোচনা করেন নাই। কিন্তু চরক-সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও বিচার রহিয়াছে। নব্য বিজ্ঞানের আলোকসম্পাতে আয়ুর্ব্বেদীয় খাদ্য-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। পুস্তকের এক স্থানে (৯৩ পৃঃ) লেখা আছে,—"আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কতকগুলি অদ্ভুত তেজঃসম্পন্ন পদার্থকে 'জীবনীয় বর্গ' বলা হইয়া থাকে। জানি না, ইহাদের সহিত বর্ত্তমান ভাইটামিনের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না।" আয়ুর্ব্বেদের খাদ্য-বিজ্ঞান আলোচনা করিলে বহু স্থলেই এইরূপ 'জানি না' বলিতে হইবে। আচার্য্য রায়মহাশয় হিন্দু রসশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নানা গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আচার্য্যমহাশয় ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের সহযোগিতায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত খাদ্য-বিজ্ঞানের রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন। আমরা আলোচ্য পুস্তকের অন্যতম রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরগোপাল বাবুকে এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি।

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আমাদের খাদ্য—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৩)

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার—শ্রীসুধীরকুমার বসু, বি-এস-সি
(দেশ, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

ডাঃ রায় কানাইলাল দে বাহাদুর—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
(সুবর্ণবণিক্ সমাচার, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)

নোবেল-লরিয়েট এণ্ডারসন ও পজিট্রন—শ্রীশুভেন্দুশেখর বসু, এম-এস-সি-পি-আর-এস
(দেশ, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

নোবেল-লরিয়েট হেস ও ব্যোমরশ্মি—শ্রীশুভেন্দুশেখর বসু, এম-এস-সি, পি-আর-এস
(দেশ, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

প্রাচীন ভারতে অস্ত্রচিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন (ধন্বন্তরি, মাঘ ১৩৪৩)

বায়ুর স্বরূপ—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম-এস-সি (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪৩)

ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ—শ্রীতেজশচন্দ্র সেন (বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৪৩)

ব্যাং-মাছ—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৩)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ

১৩শ বর্ষ | বসন্ত | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানানুশীলন

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

কীটপতঙ্গ, সাপব্যাঙ্, পশুপক্ষী, গরুভেড়া, বানরগরিলা, মানুষ—সকলেই প্রাণী। বুদ্ধির অল্পবিস্তর বিকাশ সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন?

মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, ভালমন্দ বিচার করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে, আর আছে নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তি যাহার প্রভাবে আজ সে আকাশ-বাতাস জয় করিয়াছে, পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছে, সমুদ্রের গভীর তলে নামিয়াছে, আরও কত কি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক কথায় তাহার অসাধ্য কাজ নাই, তাহার অগম্য স্থান নাই। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই কেন এই শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না? নিউটন কেন ঘরে ঘরে জন্মায় না? আইনষ্টাইন একজনই হয় কেন? চোখ কান তো সকলেরই আছে, মস্তিষ্কেরও অভাব নাই, সুযোগ সুবিধাও অনেকেই পান, তবুও দেড়শ' বছরের মধ্যে রামানুজম্, রামন, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহার মত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ভিন্ন পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে আর কাহারও নাম করিতে পারি না কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে অনেকেই অনেক রকম কথা বলিবেন। কিন্তু আমার মনে হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহার জন্য আংশিক ভাবে দায়ী পিতামাতা এবং শিক্ষক। আমাদের দেশে একটা কথা আছে "মাতৃদোষে রাবণ রাক্ষস।" যিনি সর্ব্বপ্রথম এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন করিয়াছিলেন তিনি একজন অতিবড় মনস্তত্ত্ববিৎ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ভবিষ্যৎ সতর্কবাণী সময় মত না পালন করিয়া কত মাতা তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের জন্য শেষ বয়সে চোখের জল ফেলিয়াছেন, কত পিতার ভবিষ্যৎ জীবন যে দুঃখময় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পিতামাতার নিকট শিক্ষা অনেক দিন ধরিয়াই চলে, কিন্তু ইহার মধ্যেই শিশুকে—ভবিষ্যৎ মানুষকে—স্কুলে শিক্ষকের সংসর্গে আসিতে হয়। কোন জিনিসকে

ছাচে ঢালিয়া উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার কোমল নমনীয় অবস্থায়ই তাহা করা সম্ভবপর। মন একবার শক্ত হইয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তনসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। কথায় বলে Habit is the second nature। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ ও শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইবার সহায়ক না হইয়া তাহার প্রতিরোধই করিয়া থাকে। ছেলেরা পড়া মুখস্ত করিয়া যাহাতে পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ করিতে পারে তাহার দিকেই আমরা প্রখর দৃষ্টি দিয়া থাকি, পরীক্ষার ফলের মাপকাঠিতেই ছেলের বুদ্ধির তারিফ করি। কিন্তু এ কথা ভুলিয়া যাই—"Examination is the test of memory rather than of originality"। লর্ড কেলভিন শেষ পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার পরীক্ষার খাতা দেখিয়া একজন পরীক্ষক আর একজনকে বলিয়াছিলেন—"You and I are just about fit to mend his pens"। ছেলেরা যখন শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হয় তখন তাহাদের বেশীর ভাগেরই স্বাধীন চিন্তা ও অনুশীলন করিবার শক্তি পঙ্গু হইয়া পড়ে। আমরা যে চোখ থাকিতে দেখিতে শিখি না, আর মস্তিষ্ক থাকিতে বিবেচনা করিতে শিখি না তাহার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

হাজার চারেক বছর আগের কথা। ব্যাবিলন তখন সভ্যতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। রাজধানীর নিকটে নদীর ধারে বনের মধ্যে একজন যুবক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি একদিন তাঁহার কুটিরের নিকটেই একা একা পায়চারি করিতেছিলেন। এমন সময় রাণীর প্রধান ভৃত্য ও রাজার সহিস ব্যস্তসমস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল রাণীর কুকুর ও রাজার ঘোড়াকে সে দেখিয়াছে কি না? কারণ, জন্তু দুইটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সন্ন্যাসী বলিলেন—কুকুর নহে, কুকুরী, সেটা অল্প কয়েকদিন হইল প্রসব করিয়াছে, তা'র কান দুইটি লম্বা এবং সামনের বাঁ পাখানি একটু খোঁড়া। ঘোড়ার সম্বন্ধে বলিলেন—ঘোড়াটি খুব দৌড়ায়, খুর ছোট ছোট। উঁচুতে প্রায় পাঁচ ফুট, লেজ লম্বায় সাড়ে তিন ফুট, বল্গা ২২ ক্যারেট সোনা দিয়া তৈয়ারী, নাল রূপার। রাণীর ভৃত্য এবং রাজার সহিস প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঠিক, ঠিক" এবং জিজ্ঞাসা করিল সে কুকুরী ও ঘোড়া কোথায়? সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি ইহাদের কাহাকেও দেখি নাই"। তাঁহার এ কথা কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিল না। তাঁহাকেই কুকুরী ও ঘোড়া চোর ঠিক করিয়া বিচারালয়ে ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারের সময় কৈফিয়তে তিনি বলিলেন—"বনের ধারে বালির উপর পায়ের দাগ দেখিয়া বুঝিলাম ছোট কুকুর। পায়ের দাগের মধ্যে লম্বা বাঁটের চিহ্ন দেখিয়া ঠিক পাইলাম কুকুরী সদ্যপ্রসূতা। সম্মুখের পায়ের দাগের পাশে পাশে দাগ দেখিয়া অনুমান করিলাম কান লম্বা, আর চারিখানি পায়ের দাগের মধ্যে একখানি অস্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হইল না কুকুরীটি খোঁড়া। খুরের

চিহ্ন ও ব্যবধান দেখিয়া বুঝিলাম ঘোড়াটি দৌড়াইয়া গিয়াছে। গাছপালার সাড়ে তিন ফুট আন্দাজ ধুলা যেন ঝাড়া হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে করিলাম লেজটি ইহার সাড়ে তিন ফুট লম্বা হইবে নিশ্চিত। দুই পাশ হইতে ডালপালা আসিয়া রাস্তার পাঁচ ফুট উপরে সবুজ চাঁদোয়া বিস্তার করিয়াছে। রাস্তার উপরে উহা হইতে কচি কচি পাতা ছেঁড়া অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অনুমান করিলাম ঘোড়াটির পৃষ্ঠদেশ উহা ঘেঁসিয়া গিয়াছে। সুতরাং ঘোড়াটি পাঁচ ফুট উঁচু হওয়াই সম্ভব। কষ্টি-পাথরে বল্গার চিহ্ন দেখিয়া জানিলাম উহা ২২ ক্যারেট সোনার তৈয়ারী এবং পথের ধূলির উপর রজতাঙ্কিত রেখা দেখিয়া অনুমান করিতে অসুবিধা হইল না নালগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত"।

এতগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ রাস্তায় ছিল এবং তাহা অনেকেই দেখিয়াছে, কিন্তু ইহাদের অবস্থিতির কারণ ও তাহা বিশ্লেষণ করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা এক জাদিগ ভিন্ন আর কেহই করেন নাই। জাদিগের দেখিবার ও বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিল তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষা ও দীক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে যে শিক্ষা পায় তাহার জীবন সার্থক হইয়া উঠে। উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালীর একটি উদাহরণ দিতেছি।

আগাসিজ (Agassiz) ছিলেন প্রাণিবিদ্যার তৎকালীন একজন মস্ত বড় পণ্ডিত। নানা দেশ হইতে তাঁহার গবেষণাগারে শিক্ষার জন্য ছাত্র আসিত। একদিন একটি শিক্ষার্থী আসিল। তিনি তাহাকে একটি গোটা মাছ দিয়া বলিলেন—"এই মাছটি ভাল করিয়া পরীক্ষা কর। আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে ইহার বিষয় কি কি দেখিলে প্রশ্ন করিব"। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়াই ছেলেটি ভাবিল তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় সে দেখিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে আসিয়া আগাসিজ প্রশ্ন করিলে সে যাহা উত্তর করিল তাহা ধীরভাবে শুনিয়া তিনি বলিলেন—"Why, you havn't even seen one of the most conspicuous features of the animal, which is as plainly before your eyes as the fish itself; look again, look again."। এই রকমে তিন দিন ধরিয়া ছেলেটিকে মাছটি পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল, তবে আগাসিজ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইলেই হইবে না, শিক্ষার্থীর নিজেরও সাধনা চাই; শিক্ষক শুধু পথ দেখাইয়া দিবেন, সময় সময় সাহায্য করিবেন। কিন্তু সাধনা না হইলে সিদ্ধি নাই।

ক ইপ্সিতার্থ স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ।
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ॥ কুমারসম্ভব।

অর্থাৎ 'অভিলষিত বস্তুর লাভ বিষয়ে দৃঢ় কামনা ও নিম্নগামী জলকে কে নিরোধ করিতে পারে?'

হার্সেল গবেষণায় এমন তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে তাঁহার ভগ্নি ক্যারোলিন নিজে হাতে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতেন। কোন ঘটনার উল্লেখ করিয়া ক্যারোলিন লিখিয়াছেন—"Since by way of keeping him alive I was constantly obliged to feed him by putting the victuals by bits into his mouth."। হার্সেল তাঁহার দূরবীন দিয়া রাতের পর রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত আকাশে গ্রহনক্ষত্রের খবর লইতেন। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান দিবার সময় আর একজন জ্যোতির্ব্বিদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল—"Twelve years he spent to satisfy himself, six more years to satisfy and still thirteen more to convince mankind. For thirty years never has the sun exhibited his disc above the horizon of Dessau without being confronted by Schwabe's imperturbable telescope, and that appears to have happened on an average 300 days a year"। ইহারই নাম সাধনা। এমন সাধনা না হইলে সিদ্ধি হয়!

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কিছুই বাদ পড়ে না। তাহার নিকট কোন কথাই নিরর্থক নহে। একটা সামান্য ঘটনা, একটা সামান্য ইঙ্গিতই তাহার পক্ষে সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট হইয়া উঠে।

শহর ও শহরতলীতে জাতবসন্তের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের তিনটি ছাত্র বসিয়া বসন্ত সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল; একটি গোয়ালিনী দুধ দিতে আসিয়া তাহাদের সেই আলোচনা শুনিতেছিল। তাহাদের কথার অবসরে গোয়ালিনী বলিল তাহার বসন্ত হইবে না, কারণ তাহার সম্প্রতি গো-বসন্ত হইয়াছিল। কথাটি তিন জনেই শুনিয়াছিল, কিন্তু জেনার গোয়ালিনীর ঐ সামান্য একটি কথার উপর ৩০ বছর ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন; অবশেষে ১৭৯৬ সালের ১৪ই মে গো-বসন্তের বীজ লইয়া একটি ৮ বছরের ছেলের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথম প্রমাণ করিলেন গো-বসন্তের বীজ জাত-বসন্তের প্রতিষেধক। একটি সাধারণ মেয়ের একটা সামান্য কথা হইতে পৃথিবীর কত বড় একটা উপকার সাধিত হইল। ইহার মূলে বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠ সাধনা ও শ্রুতির সদ্ব্যবহার। তাই না কবি গাহিয়াছেন—"সকলেরই কি আছে কান, সকলেই কি শুনতে পান?"

তিনিই বৈজ্ঞানিক যিনি তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করেন। যাহা সর্ব্বদা দেখা যায়, শ্রবণ করা যায় কিংবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, সে বিষয়ে মনে মনে প্রশ্ন করা, ঘটনার বিশ্লেষণ করা, বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করাকেই বিজ্ঞানানুশীলন বলা হয়।

আকাশের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

নক্ষত্রপুঞ্জঃ—নির্ম্মল চন্দ্রহীন রাত্রিতে নীল আকাশের গায়ে উজ্জ্বল মণির মত যে ছোট ছোট দীপ্তিমান্ পদার্থ নয়নগোচর হয়, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য কিন্তু আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা প্রায়ই শত সহস্র গুণ বৃহত্তর। শীত ঋতুতে দক্ষিণ আকাশে কালপুরুষের মধ্যে বেটেল্‌গুজ (Betelgeuze) নামক যে রক্তিমাভ নক্ষত্রটি দেখা যায় মাইকেলসন দেখাইয়াছেন যে উহা আয়তনে আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ২৭,০০০,০০০ গুণ বড়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে রেড্ এণ্টারিস্ নামে যে নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা আরও বৃহত্তর। লাল নক্ষত্রগুলি পাতলা দেহবিশিষ্ট, তাহাদের গড় ঘনত্ব আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা কম। অনেক নক্ষত্রেরই বিকীর্ণ তেজ আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা শত সহস্র গুণ বেশী।

প্রায় ৫,০০০ নক্ষত্রকে আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত আরও লক্ষ লক্ষ নিস্তেজ ও অধিকতর দূরবর্ত্তী নক্ষত্র আছে, যাহাদের সন্ধান আমরা দূরবীনের সাহায্য ব্যতীত পাইতে পারি না। আকাশের যে কোনও অংশের একটি দীর্ঘকালব্যাপী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলে তন্মধ্যে হাজার হাজার নক্ষত্রের ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে, খালি চোখে যাহাদের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। ছায়াপথের আলোকচিত্রে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ছবির সন্ধান মিলে। নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় সেগুলি যেন পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার মোটেই তাহা নহে। তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত—এতদূরে যে আমরা যদি মাইলের হিসাবে তাহাদের দূরত্ব নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে এতবড় সংখ্যা হইবে যে তাহা আমরা কল্পনায়ও নাগাল পাইব না। কাজেই নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত নূতন মানের (unit) প্রয়োজন হইয়াছে। আলোক এক বৎসরে যতদূর যাইতে পারে তাহাকেই একক মান (unit) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে যায় ১৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ একবার প্রাণের স্পন্দন হইতে না হইতেই সে সাত বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে। আর চন্দ্রের নিকট হইতে পৃথিবীর বুকে আসিতে আলোকের মোটে প্রয়োজন হয় ১¼ সেকেণ্ড। কাজেই এক আলোকবৎসর মোটামুটি প্রায় ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। যে নক্ষত্রটিকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে বলিয়া জানি, তাহার নাম আল্‌ফা সেণ্টাউরি (Alpha Centauri)। উহার দূরত্ব ৪ আলোকবৎসর।

কালপুরুষের নিকটবর্ত্তী 'লুব্ধক' (Sirius) নামক নক্ষত্রটির দূরত্ব ৮ আলোকবৎসর। উহাদের নিকট প্রতিবেশী নর্থ ষ্টার (North Star) ৪০ আলোকবৎসর, Big Dipper ৭০ আলোকবৎসর, আর অরুন্ধতীসহ সপ্তর্ষিমণ্ডল (Pleiades) ৩০০ আলোকবৎসর দূরে রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্রটির স্থানে যদি বৃহস্পতির ন্যায় বৃহত্তম ও উজ্জ্বল গ্রহটিকেও বসানো যায়, আর আমাদের বৃহত্তম দূরবীনটিকে যদি সহস্রগুণ শক্তিশালী করা যায়, তথাপি বৃহস্পতি আমাদের কাছে অদৃশ্যই থাকিবে। কাজেই নক্ষত্র নামে পরিচিত সূর্য্যগুলির গ্রহ আছে কিনা জানা আমাদের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। গ্রহের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব হইলেও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, অনেকগুলি নক্ষত্রই—সম্ভবতঃ প্রতি পাঁচটিতে একটি—যুগল সূর্য্য। উহারা পরস্পরের চতুর্দ্দিকে বহু লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই যুগল সূর্য্যের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র গ্রহমণ্ডলী থাকিতে পারে, অথবা দূরবর্ত্তী গ্রহগণ দু'টিকেই প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

নক্ষত্রগুলিকে 'অচল তারকা' বলা হয়, কারণ গ্রহগুলির সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য এই যে মানব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে একই সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। মিশরবাসীদের পিরামিডনির্ম্মাণের সময়ে যে নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাদের মাথার উপর যেভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে, আজও সেগুলিকে সেই ভাবেই চলিতে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলি কিন্তু আদৌ 'অচল' নহে। দূরবীনের সাহায্যে খুব ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগসাধনকারী রেখার আড়াআড়ি ভাবেই তাহারা চলিতেছে এবং বর্ণচ্ছত্রযন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে অন্যরকম পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নক্ষত্রগুলি সৌরজগতের দিকে অথবা সৌরজগৎ হইতে আপেক্ষিক গতিবেগে চলিতেছে। নক্ষত্রগুলির পরস্পরের আপেক্ষিক গতি বৎসরে প্রায় ৬০০,০০০,০০০ মাইল। খালি চোখে দেখিলে তাহাদিগকে যে বহুদিন যাবৎই একস্থানে দেখা যায়, তাহার কারণ এই, সৌরজগৎ হইতে তাহাদের দূরত্ব এতই অধিক যে বৎসরে ৬০০,০০০,০০০ মাইল করিয়া চলিলে হাজার বৎসরেও তাহাদের গতি মোটেই অনুভব করা যায় না। কিন্তু এমন দিন হয়ত আসিবে, যে দিন তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইবে; তখন পৃথিবী হইতে দৃষ্ট আকাশের রূপও পরিবর্ত্তিত হইবে। নক্ষত্রগণ কোনও বৃহৎ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অথবা গ্রহগণের কক্ষপথের ন্যায় কোনও সরল সীমাবদ্ধ বক্রপথে পরিভ্রমণ করে না, ঝাঁকবদ্ধ মৌমাছির ন্যায় কম বেশী অনিয়মিত ভাবেই চলাফেরা করিয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য, যে অল্প সময় ধরিয়া আমরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি, এই সময়ের মধ্যে তাহারা সরলরেখা পথেই চলিয়াছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে গেলে তাহাদের পথ যে কোনও নিয়ম মানিয়া চলিবে না, এই কথা তাহাদের অবস্থান ও তাহাদের উপর ক্রিয়াশীল অপরাপর শক্তির অস্তিত্ব হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নক্ষত্রগুলি প্রধানতঃ চারি জাতীয়। বর্ণচ্ছত্রযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া কে কি রকম আলোক বিকীরণ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বিভিন্ন রকমের নক্ষত্রও পড়িতে পারে, অথবা মূলতঃ একই রকমের নক্ষত্রের বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ীও উহা লক্ষিত হইতে পারে। শ্বেত অথবা নীলাভ-শ্বেতবর্ণের বৃহৎ সূর্য্যগুলিই প্রথম শ্রেণীর। সেগুলি সাধারণতঃ আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা অনেক বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর। উহাদের বর্ণোদ্দেশের তাপমান প্রায় ১৫,০০০° সেন্টিগ্রেড হইতে ২০,০০০° সেন্টিগ্রেড। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম হইতেই উহাদের আলোক বিকীর্ণ হইয়া থাকে। নক্ষত্রপুঞ্জের প্রায় অর্দ্ধেকই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি পীতাভ। আমাদের সূর্য্য তাহার দৃষ্টান্ত। ইহারাও নক্ষত্রপুঞ্জের প্রায় অর্দ্ধেক। কম তাপবিশিষ্ট লাল তারাগুলি বাকী দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অনেক মৌলিক উপাদান ও তাহাদের যৌগিক পদার্থ উক্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে বিরাজ করে। এই দুই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম।

সাধারণতঃ একথা কল্পনা করা হইয়াছে যে শ্বেত নক্ষত্রগুলি তরুণ সূর্য্য (অবশ্য তরুণ কথাটি জ্যোতির্বিদ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে)। পীতাভ সূর্য্যগুলি বিবর্ত্তনের দিক দিয়া আরও অনেক অগ্রসর, আর লাল তারাগুলি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রায় নির্ব্বাপিত। সূর্য্যগুলির আয়ুষ্কাল খুবই দীর্ঘ, হয়ত কোটি কোটি বৎসর। ভূতাত্ত্বিক যুগের মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী মানব বা মানবসভ্যতার পক্ষে সেই সূর্য্যসমূহের বিবর্ত্তনের সমস্যার সমাধান যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি মানুষের অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা তাহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যে প্ররোচিত করে। হয়ত একদিন সে এই সমস্যার নিরাকরণ করিবেই।

গোলক-নক্ষত্রস্তবক (Globular Star clusters) ঃ—নভোমণ্ডল যে শুধু স্বতন্ত্র ও যুগল সূর্য্যেই পরিপূর্ণ এমন নহে, আরও অনেক জগৎ আকাশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নীহারিকাময় বস্তুসমূহ এত বহুল পরিমাণে আকাশের গায়ে বিদ্যমান আছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে শত সহস্র বৎসরেও সেখান হইতে আলোক পৌঁছায় না। কালক্রমে এই নীহারিকাপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়া সূর্য্যে পরিণত হইবে ইহাই জ্যোতির্ব্বিদগণের ধারণা। এই ভাবেই যদি তাহাদের ক্রমবিকাশের গতি হয়, তবে তাহাদের বিবর্ত্তনের জন্য এত লক্ষ কোটি বৎসর প্রয়োজন হইবে যে, তাহার তুলনায় আমাদের ভূতাত্ত্বিক যুগযুগান্ত গণনার মধ্যেই আসে না।

এই সমস্ত নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে গোলক-নক্ষত্রস্তবকই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এই নক্ষত্রস্তবকের মধ্যে অসংখ্য বর্ত্তুলাকার সূর্য্যের সমাবেশ রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা কয়েক সহস্র হইতে সুরু করিয়া প্রায় এক লক্ষ হইবে।

বৃহত্তর সূর্য্যগুলির প্রত্যেকেই আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী আলোক বিকীর্ণ করে। কিন্তু তাহারা এত দূরে অবস্থিত যে সমস্ত নক্ষত্রস্তবকটিকে একটি ম্লান অস্পষ্ট নক্ষত্রের মত দেখায়। অন্যান্য নক্ষত্রস্তবক কেবল দূরবীনের সাহায্যেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নক্ষত্রস্তবকটির আলোকচিত্র দেখিলে এই ধারণা জন্মে যে, অন্ততঃ স্তবকটির কেন্দ্রে নক্ষত্রগুলি বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট। এত ঘন যে প্রায়শঃ তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষও ঘটিতে পারে এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকে গ্রহরাজির প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এত সহজ নহে। স্তবকটি ২০,০০০ অথবা ৩০,০০০ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত আর উহা এতগানি স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে যে, তাহাকে অতিক্রম করিতে আলোকেরও কয়েক শত বৎসর প্রয়োজন হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, উক্ত নক্ষত্রস্তবকটির কেন্দ্রেও যে সমস্ত সূর্য্য পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব গড়ে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের প্রায় ১০০,০০০ গুণ বেশী। কাজেই নক্ষত্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা তো নাই-ই বরং আমাদের সৌরপরিবারের গ্রহরাজি অপেক্ষা বৃহত্তর গ্রহ-পরিবারেরও তাহাদের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিবার মত যথেষ্ট স্থান বিদ্যমান আছে।

গোলকস্তবকের নক্ষত্ররাজি ঝাঁকবদ্ধ মৌমাছির ন্যায় নিজেদের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক একটি নক্ষত্র অবশিষ্ট সমস্তগুলির আকর্ষণে বাধ্য হইয়া চলিতে থাকে ও সমস্ত নক্ষত্র যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই স্থানে অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলি সুসঙ্গতভাবে বিকীর্ণ হওয়ার দরুণই উহার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু চলিতে চলিতে একে অন্যের নিকটে আসিলেই (সেই নিকটে আসাও আমাদের সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের শতগুণ দূরে) তাহাদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটি অণুর অপর একটি অণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার গতি যেমন হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে, গ্যাসের অণুর গতিবিজ্ঞানের সঙ্গে গোলক-নক্ষত্রস্তবকের গতিবিজ্ঞানের তুলনা করা হইয়াছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অণুগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৫০০ ফুট গতিবেগে ধাবিত হইয়া অন্য অণুর সাক্ষাৎ পাইয়া এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ২৫০,০০০ বার প্রতিহত হইয়া থাকে। গোলকস্তবকের অভ্যন্তর হইতে একটি নক্ষত্রের একবার আবর্ত্তনেই লক্ষাধিক বৎসর প্রয়োজন হয়, আর নক্ষত্রগুলির দূরত্ব এত বেশী যে গড়ে একটি নক্ষত্র অপর নক্ষত্রের নিকটে যায় হাজার হাজার আবর্ত্তনে মাত্র একবার।

গোলক-নক্ষত্রস্তবকে সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, তাহাদের অধিকাংশ একক নক্ষত্রগুলিই বহুকাল বিরাজ করিয়াছে, পরস্পরের নিকটে আসায় যে অসঙ্গতা ঘটা প্রয়োজন, তাহা যেন তাহাদের জীবনে কখনও ঘটে নাই।

ছায়াপথ (Galaxy) ঃ—আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে কোটি

কোটি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া নাই, অথবা একইরূপে অনন্তবিস্তৃতও তাহারা নহে। তাহারা যেন আকাশের মধ্যে একটা থালার ন্যায় অথবা ঘড়ির মত আকার ধারণ করিয়া বিদ্যমান। উহার বৃহত্তম ব্যাসের $\frac{১}{৬}$ অথবা $\frac{১}{৮}$ উহার পুরুত্ব। এই সূর্য্যসহতির সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্ব অর্থাৎ এই ঘটিকাকৃতি মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশ হইতে বক্ষোদেশের দূরত্ব সম্ভবতঃ ১০,০০০ অথবা ২০,০০০ আলোকবৎসর; উহার নৈরক্ষিক ব্যাস প্রায় ১০০,০০০ আলোক বৎসরেরও অধিক। এই সংখ্যাগুলি হয়ত নিভুল নয়, কিন্তু এগুলি যে অনেকটা ঠিক তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের ছায়াপথটির নক্ষত্রসংখ্যা ১,০০০,০০০,০০০ এর কম নয়, খুব সম্ভবতঃ ইহার দ্বিগুণ হইবে। এই অনিশ্চয়তার প্রধান কারণ এই যে, অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল ও অন্ধকারময় নক্ষত্রগুলি ১০ হাজার আলোকবৎসর দূরে অবস্থিত হইলেই আর আমাদের আধুনিক যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য একথা গতিবিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী নিশ্চিত যে, অদৃশ্য নক্ষত্রের পূর্ণ পরিমাণ দৃশ্য নক্ষত্রের পরিমাণের অপেক্ষা বেশী নহে।

ছায়াপথটি একজাতীয় নক্ষত্রে পূর্ণ নহে। ইহার কোথাও বা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র আলোকবৎসরব্যাপী সূর্য্যের রাশি, কোথাও বা শত শত আলোকবৎসর ব্যাপিয়া নিবিড় গোলক-নক্ষত্রস্তবক, কোথাও বা অসংখ্য উন্মুক্ত নক্ষত্রস্তবক, বহুবিধ নীহারিকাপুঞ্জ, আর কোথাও বা স্বতন্ত্র ও গুণিতক নক্ষত্রে উহার সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত। আমাদের সূর্য্য এই ছায়াপথের গভীর প্রদেশে অবস্থিত হইয়াও ইহার কেন্দ্র হইতে সহস্র সহস্র আলোকবৎসর দূরে রহিয়াছে। ছায়াপথের সমতলে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যে অসংখ্য নক্ষত্র নয়নগোচর হয়, তাহারই নাম "আকাশগঙ্গা" (milky way)। কিন্তু সেই সমতলের সমকোণে নজর করিলে নক্ষত্রসংখ্যা অনেক কম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ছায়াপথটির মধ্যে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া সূর্য্য বৎসরে প্রায় ৪০০,০০০,০০০ মাইল করিয়া চলিতেছে আর তাহার গতির লক্ষ্য হারকিউলিস নামক নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি বিন্দুর দিকে। যতগুলি নক্ষত্রের গতি নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই গড় গতি বৎসরে প্রায় ৬০০,০০০,০০০ মাইল। নক্ষত্ররাজির গতি সব দিকেই—ইহা দেখা গেলেও সপ্তর্ষিমণ্ডল (Pleiades), বৃষরাশিস্থ নক্ষত্রগুচ্ছ (the Hyades), বিগ্ ডিপার (Big Dipper) প্রভৃতি অনেকগুলি বড় বড় নক্ষত্রের দল আকাশের মধ্য দিয়া সমান্তরাল রেখাতে সমান গতিতে ভাসিয়া চলিতেছে, আর সমস্ত নিকটতর নক্ষত্রগুলিরই দুইটি বিপরীত দিকে চলিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়।

এই ছায়াপথটি মোটামুটিভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে উহা এমন একটা বিশাল জগৎ যাহার গতির বিবর্ত্তন এখনও নিয়মিত হয় নাই। গোলক-

স্তবকে যে স্থায়ী অবস্থা দৃষ্ট হয়, ছায়াপথ যেন সে অবস্থা এখনও প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার বিরাট নক্ষত্রের ঝাঁক এখনও কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া মিশিতে থাকিবে। একটা গ্যাসের মধ্যস্থিত বিভিন্ন রকমের অণুর বিশৃঙ্খল বিস্তারের ন্যায় সূর্য্যসমূহের এই বিশাল সঙ্কলন সমকেন্দ্রিক স্তরে একভাবে অবস্থিত নক্ষত্র-রাজির সঙ্গে ক্রমশঃই মেরুদেশে অবনমিত সৌষ্ঠবময় আয়তন ধারণ করিতে থাকিবে। এই গতিশীল বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতির পথে সূর্য্য ছায়াপথের সাম্রাজ্যে ব্যাপক অভিযান করিবে; কখনও বা ঘন-অধ্যুষিত গভীর অন্তর্দ্দেশের মধ্য দিয়া শত কোটি বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকিবে, আবার কখনওবা সুদূরবর্ত্তী শূন্য রাজ্যের সীমান্তে পৌছিয়া তমসাচ্ছন্ন আকাশের ক্রোড়ে চিরকালের জন্য মিশিতে না মিশিতেই লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের আকর্ষণে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

ছায়াপথের মধ্য দিয়া অভিযানকালে সূর্য্য তথা অন্যান্য নক্ষত্রেরও অনেক রকম কৌতূহলপ্রদ ঘটনার স্রোতে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কোনও সময়ে সূর্য্যটি যখন অন্য আর একটি সূর্য্যের নিকট দিয়া চলিয়া যাইবে, তখন তাহাদের দূরত্ব হয়ত সূর্য্য হইতে পৃথিবীর ব্যবধান বা তদপেক্ষা কয়েক শত গুণ বেশীও থাকিতে পারে। কিন্তু যখনই দুইটি সুবিশাল অথচ অত্যন্ত উত্তপ্ত বস্তু শত সহস্র মাইল ব্যাপিয়া আগুনের শিখা উৎসারিত করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হয়, তখন ইহা খুবই সম্ভব যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ফলে একে অন্যের বুকে আরও ভীষণতর প্রচণ্ডতার সৃষ্টি করিবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের হইলেও তখন সূর্য্যদেহ হইতে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার মত বস্তু সৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ একটি গ্রহপরিবারে পরিণত হইবে। আর অপর নক্ষত্রের সন্নিধানকালে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যদি গ্রহপরিবার বিদ্যমান থাকে, তবে সেগুলি নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তাহাদের বিচূর্ণীকৃত ভগ্নাবশেষ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আবার নূতন গ্রহজগতের সৃষ্টি করিবে। এই নূতন গ্রহমণ্ডলীও ততদিনই বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন না তাহাদের সূর্য্য আবার অপর কোনও নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তী হয়।

আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য যে সমস্ত গ্রহ আমাদের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের সৃষ্টি ও ধ্বংস কেমন করিয়া হইতে পারে, এতক্ষণ সেই আলোচনাই করা হইল। [এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য "প্রকৃতি", ১৩৪২ শরৎ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]। গ্রহগণের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী যুগ, তাহাদের বৃদ্ধি ও বিবর্ত্তনের বয়স ইত্যাদিও মোটামুটিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ছায়াপথের আয়তন, উহার নক্ষত্রসংখ্যা ও তাহাদের গড় গতিবেগ হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, উক্ত যুগের পরিমাণ ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বৎসরের কাছাকাছি হইবে। এই বিপুল সময়ের মধ্যে একটা নক্ষত্র বহুবার ছায়াপথটি পরিভ্রমণ করিবে। এই অভিযান কালে খুব সম্ভবতঃ বিকীরণের দ্বারা উহার বস্তুর

অপচয় ঘটিবে; কখনও বা নীহারিকাময় অথবা উল্কাময় মেঘের মধ্য দিয়া চলিবার সময় উহা লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া স্বীয় দেহে আরও বস্তু সঞ্চয় করিয়া লইবে; কখনও বা উহা ক্ষয় পাইয়া বিলীন হইয়া যাইবে; ফলে হয়ত উহারই একটি গ্রহ সহচর-সূর্য্যে পরিণত হইবে। আজ যে শতকোটি নক্ষত্র পূর্ণ গৌরবে আকাশে দীপ্যমান্ রহিয়াছে, অথচ সেই পরিমাণ অস্পষ্ট নক্ষত্রের অভাব দেখা যায়, ইহাতেই আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে গ্রহরাজির বহু জীবন-চক্র ব্যাপিয়াই সূর্য্যগণ আকাশে বিরাজ করে।

বহির্দ্দেশীয় মহানক্ষত্রমণ্ডলী (Exterior Galaxies) :—পৃথিবী, সৌর-জগৎ ও ছায়াপথের কথা আবিষ্কার করিয়া এবং তাহাদের অবস্থা জানিয়াই জ্যোতির্ব্বিদগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই; আমাদের সৌরপরিবারের সীমানার বাহিরে বহুদূরবর্ত্তী মহানক্ষত্র-মণ্ডলী অধুনা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা-পুঞ্জ বলিয়া অভিহিত কতকগুলি অদ্ভুত বস্তু আপাতদৃষ্টিতে নক্ষত্রসমূহের মধ্যে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেগুলি নক্ষত্রসমূহের নিকটে মনে হইলেও খুব সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। খুব সম্প্রতি (১৯২৪।২৫ খৃষ্টাব্দে) প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, য়্যান্ড্রোমিডা নীহারিকামণ্ডল বলিয়া অভিহিত বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে একটি দূরবর্ত্তী নক্ষত্র-সংহতি (Galaxy)। উহা আমাদের নক্ষত্রমধ্যস্থ বিশাল বাষ্পপুঞ্জ নহে। উহা এতদূরে অবস্থিত যে ১,০০০,০০০ বৎসরে উহার নিকট হইতে আমাদের নিকট আলোক পৌছিতে পারে। উক্ত নক্ষত্রসংহতিটি আমাদের ছায়াপথের ন্যায়ই আকারে ও গঠনে একই রকম এবং তুল্যসংখ্যক সূর্য্য দ্বারাই উহা সৃষ্ট। এই ভাবে আরও কয়েকটি বহির্দ্দেশীয় নক্ষত্রসংহতিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহারা যে এতদূরে অবস্থিত, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে সহজে তাহাদের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

শত সহস্র কুণ্ডলীকৃত নীহারিকাপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ তাহারা সকলেই বহির্দ্দেশীয় নক্ষত্রসংহতি। উহাদের কোন কোনটি আমাদের ছায়াপথ অপেক্ষা বৃহত্তর, কোন কোনটি বা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু এখানেই পর্য্যবেক্ষিত প্রমাণের শেষ, বৃহত্তম দূরবীক্ষণযন্ত্রেও আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; কারণ তাহারা দূরবীনের সীমার বাহিরে। ইহার বাহিরেও আর কিছু আছে কিনা তাহা আমরা কেবল কল্পনাই করিতে পারি।

যে ভাবে তড়িতাণুর সমবায়ে পরমাণু, পরমাণুর সমষ্টিতে অণু ও অণুর সংহতিতে বস্তুর সৃষ্টি হইয়া এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই জগৎপরিবারের সমবায়েই যেমন সৌরপরিবার, নক্ষত্রসংহতি প্রভৃতির সৃষ্টি, ঠিক সেইভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের দৃষ্টির বাহিরেও যে নক্ষত্রসংহতি থাকিবে না তাহার প্রমাণ কোথায়? থাকাই তো অধিকতর সম্ভবপর। আর এভাবে কল্পনা করিয়াই

আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অসীম বলিয়া ধারণা করিতে পারি। শুধু অগণিত সূর্যেই উহা পূর্ণ নয়, অসংখ্য নক্ষত্রসংহতি, অপরিমিত মহানক্ষত্রমণ্ডলীতে (super galaxies) সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

এই কল্পনা অনুযায়ী বিশ্বের কোনও কেন্দ্র নাই। বিশ্ব যদি সসীম হইত, তবে তাহার শক্তিও ক্ষয়িত হইয়া চিরন্তন মৃত্যু ও অন্ধকারের গহ্বরে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিত; কিন্তু অসীম বিশ্বে এরূপ মর্ম্মান্তিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যে শক্তি একবার বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহা যদি একীভূত নাও হয়, তথাপি শক্তি দ্বারা বস্তুর পরিবর্ত্তন অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিতে থাকিবে।

এই বিপুল বিশ্বের যতটুকু খবর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে তাহার বিরাটত্ব, নক্ষত্ররাজির অপরিমেয়তা, নক্ষত্রসংহতিমধ্যস্থ ক্রিয়াশীল বিশাল শক্তি, অথবা জ্যোতিষিক যুগের সুদীর্ঘতা প্রভৃতি কোন ঘটনাই জ্যোতির্ব্বিদের চিত্তকে মুগ্ধ করে না। সে শুধু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ভাবে এই বিশ্বের শৃঙ্খলা কেমন পরিপূর্ণ আর কিরূপ মহাসমারোহেই না বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতেছে। সৌরজগতের ক্ষুদ্র উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া গোলক-নক্ষত্রস্তবক, নক্ষত্রসংহতি ও বহির্দ্দেশীয় মহান্ নক্ষত্র-মণ্ডলী পর্য্যন্ত কোনও রূপ বিশৃঙ্খলা নাই, কোনও রূপ আকস্মিক ঘটনা বা স্বেচ্ছাচারিতা নাই। বিশ্বের এই শৃঙ্খলাই বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ইহার ফলেই আমাদের আশা হয় যে শুধু বহির্জগৎ নয়, আমাদের দেহ ও মনের খবরও আমরা সেই নিয়মের বলেই জানিতে পারিব।*

* এই প্রবন্ধের জন্য লেখক F. R. Moulton-এর একটি প্রবন্ধের নিকট ঋণী।

বারিমণ্ডল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

সমুদ্রতরঙ্গঃ—সাগর কি মহাসাগরের উপরে যখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করে, তখন উহার সহিত জলের সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ঝড়ের মাত্রার উপরে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ভর করে। পাশাপাশি দুইটি তরঙ্গের চূড়া বা শীর্ষদেশের ব্যবধান অনেক সময় ৫০০ ফুট দীর্ঘ হয় অর্থাৎ খোলা মহাসাগরের উপরে প্রবল ঝড় বহিলে এক একটি ঢেউ ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। আর পর পর দুইটি তরঙ্গের মধ্যবর্ত্তী 'গর্ত্ত' (trough) হইতে তরঙ্গদ্বয়ের মস্তকদেশ ৩০ হইতে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। যখন পবনদেব জলাধিপতি বরুণদেবের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ভীষণ প্রভঞ্জন-মূর্ত্তিতে মহাসমুদ্রবক্ষে আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকেন, তখন বরুণদেবও ক্রুদ্ধ বাসুকীর ন্যায় দেবদৈত্যনরত্রাস গর্জ্জন করিতে করিতে তরঙ্গরূপ সহস্র ফণা ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক আস্ফালন সহকারে অগ্রসর হন। মহাসমুদ্রের সে ভীষণ মূর্ত্তি যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনিই কেবল উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। নদীতরঙ্গ দেখিয়া উহার সেই ভীষণতা অনুমান করা, বল্মীকস্তূপ দেখিয়া হিমালয়ের উচ্চতা অনুমাত্রের ন্যায় একেবারেই বৃথা। এই সকল উত্তাল তরঙ্গমালা যখন কোন দ্রুতগামী অর্ণবযানের সহিত প্রতিহত হয়, তখন উহাদের মস্তকদেশ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া থাকে এবং শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তরঙ্গশীর্ষের সহিত অত্যধিক পরিমাণে বায়ু মিশ্রিত হয় বলিয়া উহাকে শুভ্র দেখায়। কখন কখন এই সকল উর্ম্মিমালা একটির পর একটি করিয়া যখন কোন জাহাজের পাটাতনের (deck) উপর দিয়া চলিতে থাকে, তখন জাহাজের উপরস্থ অনেক জিনিষপত্র ভাসিয়া যায়। উপরের যাত্রিগণ এই সময়ে জাহাজের নিম্নদেশে আশ্রয় লয়, নতুবা সমুদ্রসমাধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

বাত্যাতরঙ্গ

মহাসমুদ্রের এক অংশে তরঙ্গ দেখা দিলে বহুদূরবর্ত্তী অংশেও ঐরূপ ঢেউ দেখা যায়। তজ্জন্য খোলা সাগরের বক্ষদেশ কদাচিৎ তরঙ্গবিহীন থাকে। এই সকল অত্যুচ্চ উর্ম্মিমালার ইংরাজি নাম rollers or ground-swell। ইহারা যখন উঠানামা করে, তখন ইহাদের জলকণাসকল সম্মুখদিকে শায়িতভাবে (horizontally) অগ্রসর না হইয়া বৃত্ত বা বৃত্তাভাস পথে (বাদামী) নামিতে থাকে। সাগরবক্ষে মুখবন্ধ বোতল ফেলিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা একই স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিয়া আসে। এইজন্য এই সকল

ঢেউকে নৃত্যশীল তরঙ্গ (oscillatory waves) বলা হয়। ইহারা অনেকটা একই স্থানে থাকিলেও উপরের জল যে সামান্য পরিমাণে সম্মুখদিকে একটু না চলে এমনও নহে। যদি এই সকল উত্তাল তরঙ্গমালাশ্রেণী ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইল বেগে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইত, তবে নৌচলাচল অসম্ভব হইয়া পড়িত।

উপকূলের যতই নিকটে আসা যায়, সমুদ্র ততই অগভীর হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা গভীর সমুদ্র ছাড়িয়া উপকূলের দিকে আসিলে নিমজ্জিত স্থলভাগের উপর আছড়াইয়া পড়ে। ইহাদিগেরই নাম ভগ্ন-তরঙ্গ (surf বা breakers)। যে তরঙ্গ যত উচ্চ তাহার জন্য অবশ্য তত বেশী জলের প্রয়োজন। কিন্তু উপকূলের নিকটে অত জল না থাকায় তরঙ্গের সম্মুখভাগ অনেকটা ফাঁকা হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং শীর্ষদেশ আশ্রয়হীন হওয়ায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গতিবেগ বশতঃ সম্মুখদিকে সজোরে অগ্রসর হইয়া থাকে।

তীরের একেবারে যখন নিকটে আসিয়া পৌঁছে, তখন উচ্চ জলরাশির কি পশ্চাতে কি সম্মুখদিকে পূর্ব্বের ন্যায় 'গর্ত্ত' দেখা দেয় না। ইহাদিগকে গতিশীলতরঙ্গ (wave of translation) বলা হয়। কেননা ইহাদের প্রত্যেকটি জলকণা পূর্ব্বের ন্যায় উপরনীচে উঠানামা না করিয়া সবেগে স্থলের দিকে ধাবিত হয়। কোথাও কোথাও এক মাইলেরও অধিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত চণ্ডীপুরের নিকট বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত অগভীর। এখানে ঐরূপ দেখা গিয়াছে। গঙ্গাসাগর-আনাধিনী অনেক স্ত্রীলোক তীরে বসিয়া এই ঢেউ লইয়া থাকেন। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইতে পারিলে নাকে মুখে অবশ্য জল যাইতে পারে না।

ঐ সকল ঢেউ যখন ফিরিয়া যায়, তখন গভীর জলের দিকে তলায় তলায় একটা টান বা স্রোত (undertow) দেখা দেয়। তীরের বালুকারাশি এই টানের ফলে উপকূলকে ক্রমশঃ অগভীর ও সমতল করিয়া ফেলে।

ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রমধ্যে অনেক সময় একপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাপানের নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে এইরূপ তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। জাপানীরা ইহাকে সুনামী (tsunami) বলে।

* Water particles in the waves of the open sea move up and down in circular or slightly elliptical orbits, but not horizontally forward.....In deep water the wave-form advances, but the water particles come back to their original positions.

In the breaker wave, owing to shallowing, there are not enough particles to fill out the wave-form, but the energy of the wave-motion causes the crest to develop. Left unsupported the wave breaks, forming surf. A mound of water (a wave of translation) then rushes forward. In it the water particles move horizontally forward to new positions.—*New Physical Geography* (1933) by R. S. Tarr and O. D. von Eugelen.

ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রের তলদেশস্থ ভূভাগ কাঁপিলে উপরস্থ জলও অবশ্য কাঁপিতে বাধ্য হয়। খোলা মহাসাগরের মধ্যভাগে হয়ত জলের পৃষ্ঠদেশ সিকি ইঞ্চিও উন্নীত হয় না, কিন্তু

সুনামী-তরঙ্গ

সুগভীর তলদেশের জল পর্য্যন্ত কম্পিত হওয়ায় জলরাশি যখন নিকটস্থ তীর-ভূমির দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, তখন উহা অনেক সময় শতাধিক ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে এবং হয়ত স্থলভাগের উপর দিয়া দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত চলে। তাহার ফলে বন্দর ও নিকটস্থ গ্রামসকল মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়, সহস্র সহস্র মানব অতর্কিতে জলসমাধি লাভ করে। গভীর জলে অবস্থিত বড় বড় জাহাজ হয়ত উপকূল হইতে দুই এক মাইল উপরে গিয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়া পড়ে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর এইরূপে একপ্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়, উহার ফলে ইয়োকোহামা বন্দরের সমূহ ক্ষতি ঘটে।

জাপানে, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, চিলি ও পেরু দেশের উপকূলে ভূমিকম্পজনিত তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই যে উহা দৃষ্ট হয় না, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়। এইরূপ তরঙ্গ বহু দূর পর্য্যন্ত চলে। এশিয়ার উপকূল হইতে সুদূর কালিফোর্ণিয়ার উপকূল অবধি ইহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনেক সময় ইহাকে জোয়ার-তরঙ্গ বলিয়া ভ্রম হইলেও ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।

প্রত্যহ দুইবার করিয়া সমুদ্রে জোয়ার হয়। উপর্য্যুপরি দুইটি জোয়ারের ব্যবধান

জোয়ার-তরঙ্গ

১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের ফলেই জোয়ার উৎপন্ন হয়। মহাসমুদ্রের জল এক-আধ ফুট মাত্র উন্নত হইলেও উহা যতই অগভীর উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, ততই উচ্চ হইয়া থাকে এবং তরঙ্গের আকার ধারণ করে। ইহারই নাম জোয়ার-তরঙ্গ (tidal wave)।

মহাসমুদ্রে এবং বিস্তৃত উপসাগরে (bight) জোয়ারের জলকে বেশী উচ্চ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু আবদ্ধ উপসাগরে এবং নদীর বিস্তৃত মোহনায় উহাকে অনেক উচ্চ হইতে দেখা যায়। নোভাস্কোশিয়ার অন্তর্গত ফাণ্ডি এবং লাব্রাডরের অন্তর্ভুক্ত আন্‌গাভা উপসাগরদ্বয়ের জোয়ারের জল ৩০ হইতে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে।

জোয়ার ভাটা—যাহারা সমুদ্রের তীরে বসবাস করে, তাহারা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকে যে প্রত্যহ সমুদ্রের জল দুইবার উঁচু ও দুইবার নীচু হয়। সমুদ্রজলের উচ্চতাবৃদ্ধিকে জোয়ার বলে। সংস্কৃত ইহারই নাম বেলা। উচ্চতা-হ্রাসকে ভাঁটা বলে। অতি প্রাচীন কালেও হিন্দুগণ সমুদ্রজলের দৈনিক হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিথিবিশেষে সমুদ্রজলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্দ্রের আকর্ষণই যে জোয়ারের প্রধান কারণ; তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ বহু সংস্কৃত গ্রন্থে জোয়ারের

উল্লেখ দেখা যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের একস্থানে পুত্রমুখদর্শনে রঘুরাজার আনন্দোচ্ছাস বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু দর্শনাৎ
গুরু প্রহর্ষ প্রবভূব নাত্মনি॥"

অর্থাৎ চন্দ্রকে দর্শন করিলে সমুদ্রের জল যেরূপ কূল ছাপাইয়া পড়ে, সেইরূপ পুত্রমুখ দর্শনে রাজার অত্যধিক আনন্দ শরীরে ধরিল না, পরন্তু বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

"পূর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।" পঞ্চতন্ত্র
"নিবৃত্তবেল সময়ে প্রসন্নইব সাগর।" রামায়ণ

"স্থূল বিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই।

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণ কার্য্যকরী হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।" (বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, ২২৩ পৃষ্ঠা)।

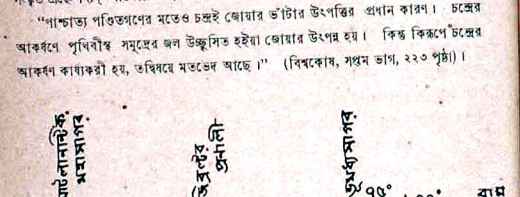

চিত্র—১
সমুদ্রের তলবাহী স্রোতের প্রমাণ

জোয়ারতরঙ্গের আলোচনা কালে আমরা জোয়ার সম্বন্ধে অতি সামান্য দুইচারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিষয়টি বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য। ইহার কারণ (১) সমুদ্রতীরস্থ স্থানে জোয়ারভাঁটার সম্যক্ হিসাব রাখা হয় না এবং (২) যে সকল কারণের সমবায়ে উহা উৎপন্ন হয়, উহাদের প্রত্যেকটির হিসাব রাখাও দুঃসাধ্য।

ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থ ভূকেন্দ্রের দিকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইতেছে। এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ (gravity) বলে। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল দীর্ঘ। আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীস্থ প্রত্যেক পদার্থ বিষুবমণ্ডলে প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও অধিক বেগে আবর্ত্তন করিতেছে। ইহাতে ভূমণ্ডলের স্থল, জল ও বায়ুকণাসকল কেন্দ্রত্যাগী (centrifugal) প্রচণ্ড শক্তিতে ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইবার কথা, কিন্তু এইরূপ যে ঘটিতেছে না, কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই উহার কারণ। উহারই টানে বৃন্তচ্যুত আপেলাদি ফল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে।

মাধ্যাকর্ষণ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড়পদার্থ পরস্পরকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আকর্ষণ করে। ইহারই নাম মহাকর্ষণ (gravitation)। অন্ধকারময় রাত্রিতে আকাশপটে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা প্রত্যেকেই এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য-বিশেষ অথবা তদপেক্ষাও বৃহত্তর জড়পিণ্ড। সূর্য্য পৃথিবী হইতে গড়ে ৯ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল দূরে রহিয়াছে। আলোকরশ্মি এত দ্রুতবেগে চলে যে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে সূর্য্যরশ্মির পক্ষে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। সূর্য্যের পরেই যে নক্ষত্রটি পৃথিবীর নিকটতম, উহার দূরত্ব এত অধিক যে উহা হইতে আলোক আসিয়া পৃথিবীতে পৌছিতে ৪½ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং ঐ নক্ষত্রটির দূরত্ব কত বেশী উহা অনুমানসাপেক্ষ। অন্যান্য নক্ষত্রগণ যে আরও কত দূরে রহিয়াছে, তাহা ধারণারও অতীত। ইহা হইতেই প্রতীতি জন্মিবে যে সূর্য্য ভিন্ন অন্যান্য নক্ষত্রের আকর্ষণ পৃথিবীর উপরে আদৌ কার্য্যকরী হইতে পারে না। শুক্রাদি গ্রহগণ অনেকটা নিকটে থাকিলেও উহাদের আকৃতি অনেক ছোট। সেই কারণে উহাদের প্রভাবও নগণ্য। ফলতঃ সূর্য্যের আকর্ষণ জোয়ারের একটা কারণ বটে। ক্ষুদ্র হইলেও চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল মাত্র দূরে আছে। সেইজন্য উহার আকর্ষণই জোয়ারভাঁটার প্রধান কারণ। সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাব পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, সেইজন্য সূর্য্য ও চন্দ্রের মিলিত আকর্ষণকেই জোয়ার-ভাঁটার কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। ভূকেন্দ্র ও ভূপৃষ্ঠস্থিত পদার্থসমূহের উপর ইহাদের আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণবৈষম্যই জোয়ারভাঁটার প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইবে।

মহাকর্ষণ

প্রধানতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাবে বারিমণ্ডলে যে জোয়ারভাঁটার উৎপত্তি ঘটে, উহাকেই আমরা দেখিতে পাই। নদীর মোহনা দিয়া যখন সমুদ্রের প্রভূত জলরাশি স্থলভাগের মধ্যে চলিতে থাকে, তখন নদীতে উজানস্রোত দেখা যায়। সময় সময় ঐ স্রোতের জল অতি উচ্চ হইয়া থাকে। উহার আঘাতে অনেক নৌকা ডুবিয়া যায়।

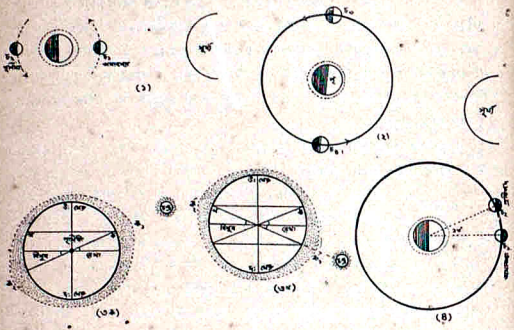

চিত্র—২

(১)— অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কাটাল।

(২)— অষ্টমীর অল্প জোয়ার।

(৩ক)— ক-চিহ্নিত স্থান ও চন্দ্র বিষুবরেখার উত্তরে আছে; সুতরাং ঐ স্থানে উচ্চতর মুখ্য জোয়ার, কিন্তু নিম্নতর গৌণ জোয়ার হইয়াছে।

(৩খ)— ক-চিহ্নিত স্থান বিষুবরেখার উত্তরে, কিন্তু চন্দ্র বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং জোয়ারশীর্ষ ক, নামক স্থানে থাকায় ক-চিহ্নিত স্থানে নিম্নতর মুখ্য জোয়ার এবং খ-চিহ্নিত স্থানে উচ্চতর গৌণ জোয়ার হইয়াছে। অতএব আহ্নিক গতি বশতঃ ১২ ঘণ্টার কিছু বেশী পরে যখন খ-চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের নিম্নে আসিবে, তখন সেখানে মুখ্য জোয়ার হইবে, কিন্তু ক-চিহ্নিত স্থানে উচ্চতর গৌণ জোয়ার দেখা যাইবে।

(৪)— দুই মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের ব্যবধান সময়।

বায়ুমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশেও যে অনুরূপ জোয়ারভাঁটা প্রত্যহ হইতেছে না, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা বায়ুসাগরের তলদেশে বিচরণ করিতেছি। মহাসাগরের সুগভীর তলদেশে সতত সন্তরণশীল মৎস্যাদি জীবগণ যেমন সাগরপৃষ্ঠের জোয়ারভাঁটা অনুভব করিতে পারে না, আমরাও হয়তো সেইরূপ বায়ুসাগরের উপরিপৃষ্ঠের জোয়ারভাঁটার খোঁজ রাখিতে অসমর্থ।

প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি কঠিন পদার্থের কণাসকল পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। এইজন্য একটি শিলা বা মৃত্তিকাকণা চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণবশতঃ নিকটস্থ অপরাপর কণাকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু জলের কণাসকল দৃঢ়ভাবে সংহত নয়। এই নিমিত্ত যে শক্তি সমুদ্রের প্রত্যেক কণাকে অনায়াসে চালিত করিতে পারে, কঠিন পদার্থের কণাসকলকে উহা সেইরূপ স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। সমুদ্রপৃষ্ঠস্থ বিশাল জলরাশির প্রত্যেকটি কণা চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে অবলীলাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু স্থলকণাসকল সেরূপ উঠানামা করে না। ফলতঃ শিলা-মণ্ডলের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন সমগ্র শিলারাশি কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র বিন্দুতে একত্রিত রহিয়াছে এবং ঐ বিন্দুর উপরেই মহাকর্ষণ কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ মহাকর্ষণের প্রভাবে ভূকেন্দ্র যেন সমুদয় জল ও স্থলকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হয়, জলকণাবিশেষের ন্যায় সমগ্র বারিমণ্ডল এবং প্রস্তরমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী চলে না।

মাধ্যাকর্ষণ মহাকর্ষণেরই রূপান্তর মাত্র। মাধ্যাকর্ষণ ভূমণ্ডলস্থ স্থল, জল ও বায়ু সমুদয় পদার্থকে ভূকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর মহাকর্ষণ ভূকেন্দ্র ও বারিমণ্ডলকে সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীও যে সূর্য্যকে অনুরূপ আকর্ষণ না করে, এমন নহে। ফলতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ পরস্পরকে আপনাপন কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাবেই মঙ্গলাদি গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

মহাকর্ষণের প্রভাব

আবার পৃথিবীর আকর্ষণের ফলেই চন্দ্র আপন নির্দ্দিষ্ট পথে এরূপ নিয়মিত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে সহস্র বৎসর পরে উহার অবস্থান অভ্রান্তরূপে জ্যোতির্বিগণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। পঞ্জিকাকারগণ বহু পূর্ব্বেই গ্রহণাদি গণনা করিয়া থাকেন।

দুই শত বৎসরের অধিককাল হইল স্যার আইজাক নিউটন মহাকর্ষণের তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি কেহ বলিতে পারেন নাই যে মহাকর্ষণের প্রকৃত কারণ কি, কিংবা কেনই বা ইহা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া কার্য্য করিতেছে। আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি যে, পরস্পর-আকর্ষণকারী দুইটি জড়পিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ও উহাদের বস্তুপরিমাণের উপর আকর্ষণের মাত্রা নির্ভর করে।

জোয়ারভাঁটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মহাকর্ষণের নিয়ম তিনটির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মহাকর্ষণের নিয়ম

১ম নিয়ম। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড়পিণ্ড পরস্পরকে নিজ নিজ কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

২য় নিয়ম। পরস্পর-আকর্ষণকারী জড়পিণ্ডদ্বয়ের বস্তুপরিমাণ (mass) যত অধিক হয়, আকর্ষণের মাত্রাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ একটি জড়পিণ্ডের বস্তুপরিমাণ অপরটির সমান না থাকিয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইলে আকর্ষণের পরিমাণও দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

৩য় নিয়ম। পরস্পর-আকর্ষণকারী জড়পিণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে ঐ দূরত্বের বর্গের অনুপাতে আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং দূরত্ব হ্রাস পাইলে আকর্ষণ ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে মহাকর্ষণের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এইরূপে দেখা যায় যে, কোনও দুইটী জড়পিণ্ডের আকর্ষণ এবং দূরত্ব উভয়কেই একক ধরিলে এবং দূরত্বকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিলে শেষোক্ত আকর্ষণের মাত্রা পূর্ব্ব আকর্ষণের $\frac{১}{২^২}$ বা $\frac{১}{৪}$ অংশ হইবে; দূরত্ব তিনগুণ বৃদ্ধি পাইলে শেষোক্ত আকর্ষণ পূর্ব্ব আকর্ষণের $\frac{১}{৩^২}$ বা $\frac{১}{৯}$ অংশ মাত্র হইবে ইত্যাদি।

এই নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও অতি নিকটস্থ জড়পিণ্ডের আকর্ষণ বৃহত্তম কিন্তু অতি দূরবর্ত্তী জড়পিণ্ডের আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক প্রবল হইবার কথা। ফলতঃ এইরূপই দেখা যায়। সূর্য্যের সহিত তুলনায় চন্দ্রের আকার অতি তুচ্ছ হইলেও সূর্য্য অপেক্ষা উহা পৃথিবীর খুব নিকটে থাকায় চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা পৃথিবীর উপর অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব (৯,২৭,৫০,০০০মাইল) চন্দ্রের দূরত্বের (২,৪০,০০০ মাইল) প্রায় ৪০০ গুণ বেশী হইলেও সূর্য্যের বস্তুপরিমাণ চন্দ্রের বস্তুপরিমাণ অপেক্ষা প্রায় দুই কোটি চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। গণিত শাস্ত্রানুসারে ভূপৃষ্ঠে সূর্য্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকা শক্তির অনুপাত ৩৫৫ : ৮০০ মাত্র অর্থাৎ সূর্য্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণের প্রায় $\frac{৪}{৯}$ অংশ, সুতরাং বিশেষ কম নহে। সূর্য্যের এই প্রভূত আকর্ষণশক্তি কখন চন্দ্রের অনুকূলে, আবার কখন বা প্রতিকূলে কার্য্য করিয়া থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার তিথিতে উহারা পরস্পর অনুকূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অপর অংশে ভাঁটা উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই কারণে ঐ দুই তিথিতে জোয়ারের উচ্চতা অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। এদেশীয় নাবিকেরা উহাকে কাটাল (spring tides) বলে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন চন্দ্র ও সূর্য্যের

আকর্ষণের যেমন প্রায় যোগফল কার্য্য করে, অষ্টমীর দিন চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর সহিত তুলনায় সমকোণে অবস্থিত থাকায় উহাদের আকর্ষণের বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে জোয়ার উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উভয়ের একত্রীভূত আকর্ষণ-জাত জোয়ার, কেবলমাত্র চন্দ্রের আকর্ষণজাত জোয়ারের $\frac{১৩}{৯}$ গুণ, কিন্তু অষ্টমীর জোয়ার চন্দ্র দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের $\frac{৫}{৯}$ অংশ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণিমার জোয়ার এবং অষ্টমীর জোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ পূর্ণিমার জোয়ার অষ্টমীর জোয়ারের আড়াই গুণেরও অধিক। অষ্টমীর এই অনুচ্চ জোয়ারকে ইংরাজিতে neap tides বলে।*

অষ্টমীর পর ক্রমে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ পূর্ণবৃত্ত নহে, পরন্তু বৃত্তাভাস (elliptical) মাত্র। সেইজন্য পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের দূরত্ব বৎসরের সকল সময় সমান থাকে না; কখন বাড়ে, কখন বা কমিয়া যায়। "চন্দ্র ও সূর্য্যের নীচ অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার উৎপন্ন হয়, উহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ কাটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে যে জোয়ার অল্প উচ্চ হয় এ দেশে উহাকে মরা কাটাল বলে।" (বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, ২২৪ পৃষ্ঠা)।

জলস্থলময় পৃথিবীকে বারিমণ্ডল ও শিলামণ্ডলে ভাগ করা হয়। এই শিলামণ্ডল বা শিলাপিণ্ড অতীব শক্ত ও সংহত। শিলাপিণ্ডের উপরিপৃষ্ঠে আমরা বিচরণ করিতেছি।

জোয়ারভাঁটার উৎপত্তি

বর্ত্তমান জ্যোতিষীবৃন্দ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উপরিপৃষ্ঠ অপেক্ষা আরও শক্ত ও সংবদ্ধ। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ কিন্তু অন্যরূপ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর মধ্যভাগ অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পূর্ণ। সেইজন্য তাঁহারা পৃথিবীকে নারিকেলের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ শিলারাশি সম-আয়তন-বিশিষ্ট জল অপেক্ষা ২।০ গুণ ভারী, আর অভ্যন্তর ভাগ জল অপেক্ষা ৫।৬ গুণ গুরু-ভারযুক্ত অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ গুরুতর ভারবিশিষ্ট কঠিন ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা সুকঠিন ইস্পাত অপেক্ষাও বেশী কঠিন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর কঠিন শিলাপিণ্ড ও তরল বারিরাশি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। পরীক্ষা করিলে দেখিতে

* At new and full moon the sun, being in a line with the moon and the earth, exerts its influence in the same direction and thus causes every fortnight a higher tide than usual. These are called spring tides.

At half-moon the influence of the sun is exerted at right angles to that of the moon, and hence the tides are not so high as usual. These lower tides are called neap tides. *Longmans' Geographical Series*, Book II, p. 9.

পাওয়া যায় যে, একটি ফাঁপা রবার বেলুন এবং একটি কাঠের নিরেট বলকে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বঁড়শির দ্বারা সমান শক্তিতে আকর্ষণ করিলে বেলুনটির একপার্শ্বে ফুলিয়া উঠে, সমগ্র বেলুনটি সরিয়া আসে না, কিন্তু কাঠের বলটি না ফুলিয়া সমগ্রটাই চলিয়া আসে। এইরূপ চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণের শক্তি জল ও স্থল উভয়ের উপরে সমভাবে কার্য্য করিলেও জলরাশি সুসংবদ্ধ স্থলভাগকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীর যে পার্শ্ব যখন চন্দ্রের বা সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকে, তখন সেই পার্শ্বস্থিত সমুদ্রের জল উহাদের পৃথক পৃথক বা সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে ফুলিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। এইরূপ জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার (primary tide) বা নিকটবর্ত্তী পার্শ্বের জোয়ার বলে। ঐ পার্শ্বের স্থলভাগের উপরে যে আকর্ষণ উহা যেন ভূকেন্দ্রে কার্য্য করে। পৃথিবীর কেন্দ্র অবশ্য প্রায় ৪০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, কেন না পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল দীর্ঘ। সুতরাং নিউটনের আবিষ্কৃত মহাকর্ষণের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে ঐ আকর্ষণের পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক কম হইবার কথা। ফলতঃ জল ও স্থলের উপরে চন্দ্রের (বা সূর্য্যের) আকর্ষণের পার্থক্যই মুখ্য জোয়ারের কারণ বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে ৫ ফুট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে।* চন্দ্রের (বা সূর্য্যের) ঠিক নীচের জলই যে ফুলিয়া জোয়ার উৎপাদন করে তাহা নহে। কেন না তাহা হইলে চন্দ্রকে (বা সূর্য্যকে) সোজাসুজি খাড়াভাবে জল টানিয়া তুলিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ কেবলমাত্র এক কোটি অংশ বেশী। ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের অপর অংশে চন্দ্রের আকর্ষণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাড়া এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শায়িত অর্থাৎ তির্য্যকভাবে পড়ে। অতিমাত্রায় সঞ্চরণশীলতার (mobility) জন্য অতি সামান্য আকর্ষণেই জল শায়িত ভাবে চলাচল করিতে পারে। এইরূপে নানাস্থান হইতে জল আসিয়া আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয় এবং স্ফীত হইয়া উঠে। বিষুবরেখার উপরে চন্দ্র (বা সূর্য্য) যখন লম্বভাবে থাকে, তখন মেরুদ্বয়ে এই শায়িত আকর্ষণ দুই পার্শ্বেই সমান থাকায় তথায় ভাঁটা দেখা দেয়, জোয়ার হয় না।

মুখ্য জোয়ার

যে সময়ে পৃথিবীর একপার্শ্বে জোয়ার দেখা দেয়, ঠিক সেই সময়েই উহার অপর পার্শ্বেও অনুরূপ জোয়ার ঘটে। উহাকে গৌণ জোয়ার (secondary tide) বলা হয়। প্রথম প্রথম ইহার কারণ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয় বটে, কেন না চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণের ঠিক বিপরীত দিকে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র যত দূরে, পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্ব অবশ্য তাহা অপেক্ষা আরও ৪০০০

গৌণ জোয়ার

* But the water is not rigid (like solid earth), therefore heaps up in response to the greater (than that which it exerts at the centre of the earth) attractive force of the moon at the earth's near-side surface. *New Physical Geography* (1933) by R. S. Tarr and O. D. Von Eugelen, p. 633.

মাইল বেশী দূরে অবস্থিত, যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল দীর্ঘ। সুতরাং এই বিপরীত পৃষ্ঠের উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ অনেক কম হইবারই কথা (নিউটনের তৃতীয় নিয়ম)। দূরত্ব হিসাবে ভূকেন্দ্রের উপরে যে পরিমাণ আকর্ষণ পড়িবার কথা, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী পড়ে; কেন না ভূমণ্ডলের চন্দ্রাভিমুখী পৃষ্ঠের উপরে যে টান পড়ে, উহা শিলাময় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কার্য্য করিয়া থাকে। এইজন্য বিপরীত পার্শ্বের স্থলভাগ যেন অনেকটা চন্দ্রের দিকে সরিয়া যায়, আর তত্রত্য সমুদ্রতলদেশস্থ স্থলভাগের সঙ্গে সমানে চলিতে না পারায় যেন কিছু দূরে পিছাইয়া পড়ে, অর্থাৎ তত্রত্য সমুদ্রের গভীরতা যেন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় বা জোয়ার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দূরত্বের উপরে যখন আকর্ষণের মাত্রা অনেকটা নির্ভর করে [প্রকৃত পক্ষে জোয়ার-উৎপাদকশক্তি দূরত্বের বর্গের (squares) পরিবর্ত্তে দূরত্বের ঘনের (cubes) বিপরীত অনুপাতে কার্য্যকরী হইয়া থাকে], তখন চন্দ্রাভিমুখী পৃষ্ঠের উপরিস্থ জলরাশি নিম্নস্থ স্থলভাগ অপেক্ষা যত বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট ও সেই কারণে স্থানচ্যুত হয়, পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বের জলরাশিকে পশ্চাতে ফেলিয়া তত্রত্য স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে সেই অনুপাতে গমন করে না। সুতরাং বিপরীত পৃষ্ঠের জোয়ার (গৌণ জোয়ার) সম্মুখপৃষ্ঠের জোয়ার (মুখ্য জোয়ার) অপেক্ষা অনেক কম হইবারই কথা। কিন্তু নানা কারণে এই পার্থক্য একরূপ লোপ পায়। সেইজন্য পৃথিবীর উভয় পার্শ্বেই একই সময়ে অনেকটা অনুরূপ জোয়ার হয় বলিয়া মনে হয়। বিষুবরেখার উপরিস্থিত যে কোন স্থানে ১২ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় অন্তর প্রায় সমানভাবেই জোয়ার হইয়া থাকে।

বিষুবরেখা হইতে উপকূলের দূরত্ব এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দূরত্ব বশতঃও স্থানীয় জোয়ারভাঁটার তারতম্য হয়। মুখ্য ও গৌণ জোয়ারতরঙ্গদ্বয়ের দুইটি শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষান্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব সমান হয় এবং উভয়েই যদি বিষুবরেখার একই পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র যখন ঐ স্থানের মস্তকোপরি আসিবে, তখন ঐ স্থানে মুখ্য জোয়ারতরঙ্গের শীর্ষদেশ থাকিবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইবে। এই জন্য গৌণ জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাবে ক চিহ্নিত স্থানে যখন মুখ্য জোয়ার হইবে, তখন যেন উহার শীর্ষ হইবে ক, আর সেই সময় বিপরীত গোলার্দ্ধে ক, চিহ্নিত সমুদ্রে গৌণ জোয়ারশীর্ষ থাকিবে। কিন্তু ক চিহ্নিত স্থানের সম অক্ষরেখায় অবস্থিত বিপরীত দ্রাঘিমাস্থ খ চিহ্নিত স্থানে জোয়ারের উচ্চতা অনেক কম হইবে। প্রায় ১২।০ ঘণ্টা পরে যখন খ, চিহ্নিত স্থান আহ্নিক গতির প্রভাবে চন্দ্রের ঠিক নিম্নে আসিয়া উপনীত হইবে, তখন ঐস্থানে

অবশ্য মুখ্য জোয়ার দেখা দিবে, কিন্তু তখন ক চিহ্নিত স্থানে যে গৌণ জোয়ার হইবে, উহার উচ্চতা অবশ্যই কিছু কম হইবে (২নং ৩ক ও ৩খ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বলা বাহুল্য সূর্য্যের আকর্ষণ ফলেও ক চিহ্নিত স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চতর মুখ্য জোয়ার, কিন্তু নিম্নতর গৌণ জোয়ার হইবে।

অনুরূপ কারণে চন্দ্র এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিষুবরেখার দুই বিপরীত পার্শ্বে থাকিলে মুখ্য জোয়ার অবশ্য অনুচ্চ, কিন্তু গৌণ জোয়ার অনেক উচ্চতর হইবে, সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবেও একইরূপ জোয়ার দেখা যাইবে।

কোনও স্থানের পরস্পর দুইটি জোয়ারের (অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের) ব্যবধান ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট হইবার কথা। কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির পর কয়েক দিন এই ব্যবধান অনেকটা কম দেখা যায়, অর্থাৎ জোয়ার যেন নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই দেখা দিয়া থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণজাত জোয়ারতরঙ্গের শীর্ষদেশদ্বয় একই স্থানে থাকে। কিন্তু প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া প্রভৃতি কয়েক তিথিতে উহারা অনেকটা নিকটে থাকে মাত্র, কাজে কাজেই জোয়ার জলের উচ্চতম স্থান উহাদের মধ্যে থাকে। সেই জন্য উচ্চ জোয়ারও উহাদের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দুইটি জোয়ারশীর্ষের আংশিক মিলনের ফলে ঐ সকল তিথিতে উচ্চ জোয়ার উৎপন্ন হইবার কথা। এখন যদি সূর্য্য ঐ সময়ে চন্দ্রের অগ্রে অর্থাৎ পশ্চিমে থাকে, তাহা হইলে ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিটের কিছু পূর্ব্বেই উচ্চ জোয়ার দেখা দিবে। ষষ্ঠী, সপ্তমী পর্য্যন্ত এইরূপই দেখা যায়। তাহার পর সূর্য্য যখন চন্দ্রের পশ্চাতে পড়ে অর্থাৎ সৌর-জোয়ারের শীর্ষদেশ চান্দ্র-জোয়ারের মস্তকের পশ্চাতে থাকে, তখন উচ্চ জোয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে দেখা দেয়।

জোয়ারের ভাঁটার ব্যবধান

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যখন সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই বিষুবরেখার উপরে লম্বভাবে থাকে, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের ব্যবধান ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট দেখা যায়। কিন্তু যদি চন্দ্র কোন উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশের উপরে (উর্দ্ধ সংখ্যা ২৮° হইতে পারে) লম্বভাবে অবস্থান করে, তবে দুই উচ্চ জোয়ারের ব্যবধান অসমান হইয়া থাকে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ইহা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর উচ্চতম জোয়ার নির্ভর করে :—

উচ্চতম জোয়ার

(১) সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সমসূত্রে অবস্থান। এইরূপ অবস্থা কেবল অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটে।

(২) যখন সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে (at perihelion) চন্দ্র ও পৃথিবীর ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস বলিয়া এইরূপ হয়।

(৩) যে স্থানে জোয়ার হয়, সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ স্থানের শীর্ষবিন্দুতে অথবা শীর্ষবিন্দুর খুব নিকটে থাকিলে।

(৪) যখন জোয়ারের অনুকূলে প্রবল বাতাস বা ঝড় বহে।

(৫) যখন বায়ুর চাপ খুব কম থাকে। বায়ুরাশির চাপ কমিলে সমুদ্রজলের স্ফীতি বৃদ্ধি পায়, আর চাপ বৃদ্ধি পাইলে জলের উচ্চতার অবনতি ঘটে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যেভাবে জোয়ারভাঁটার আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মনে হইতে পারে যেন চন্দ্র ও সূর্য্য সর্ব্বদাই পৃথিবীর একই পার্শ্বে থাকে এবং পৃথিবীর সহিত একই সরল রেখায় অবস্থিত থাকিয়া জোয়ার উৎপাদন করে এবং উহারা সকলেই যেন গতিশক্তিবিহীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পৃথিবীর দুই প্রকার গতি রহিয়াছে —(১) বার্ষিক ও (২) আহ্নিক। আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এক পাক ঘুরিয়া যায়। চন্দ্রও প্রায় ২৭½ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। একমাত্র সূর্য্যকেই স্থির বলা চলে। কেবলমাত্র পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উহারা তিনটিই সমসূত্রে থাকে। ফলতঃ উহাদের পারস্পরিক অবস্থানের উপরে জোয়ারের মাত্রা নির্ভর করে।

প্রথমতঃ আমরা চন্দ্রকে গতিশক্তিহীন স্থির জড়পিণ্ড বলিয়া অনুমান করিব এবং কেবল পৃথিবীর আহ্নিক গতি ধরিয়া লইব। তাহা হইলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর পর পৃথিবীপৃষ্ঠে, চন্দ্রের ঠিক নিম্নে, জোয়ার দেখা যাইবে। সমগ্র পৃথিবী সমপরিমাণ গভীর সাগরজলে পরিবেষ্টিত থাকিলে অবশ্য এইরূপই ঘটিতে পারিত। স্থানবিশেষে কোন এক সময়ে মুখ্য জোয়ার হইলে উহার ঠিক ১২ ঘণ্টা পরে গৌণ জোয়ার দেখা দিত। আর মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের মধ্যবর্ত্তী সময়ে একবার ভাঁটা হইত।

জোয়ারের গতি

কিন্তু চন্দ্র ত সত্যসত্যই স্থির থাকে না। উহা পৃথিবীরই ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং নিজ কক্ষে প্রত্যহ প্রায় ১৩° তের ডিগ্রীর কিছু বেশী অগ্রসর হয়। সেই জন্য অদ্য মধ্যাহ্নে যে স্থানে মুখ্য জোয়ার দেখা গেল, কল্য মধ্যাহ্নে সেস্থানে মুখ্য জোয়ার হইতে পারে না, যেহেতু চন্দ্র ইত্যবসরে পূর্ব্বাকাশে ১৩° অধিক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীর পক্ষে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ১° আবর্ত্তন করিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা÷৩৬০ অর্থাৎ মোটামুটি ৪ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং ১৩° অধিক পথ ঘুরিতে মোটামুটি প্রায় ৫৭ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। এই কারণে একই স্থানে পর পর দুই বার মুখ্য জোয়ার হইতে ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময়ের দরকার।* আর এক মুখ্য জোয়ারের পর গৌণ জোয়ার হইতে ১২ ঘণ্টা ২৮½ মিনিট

* কেহ কেহ বলেন ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট, যথা—"The interval between the high tide and the corresponding high tide next day is nearly 24 hours 51 minutes."—*Longmans' Geographical Series*, Bk. II, p. 9.

লাগে সুতরাং পরপর দুইটি জোয়ারের মধ্যে ভাঁটা হইতে ৬ ঘণ্টা ১৪½ মিনিট সময়ের আবশ্যক। ফলতঃ অনেকটা এইরূপই দেখা যায়।

পৃথিবীর খুব কম স্থানেই চন্দ্র ঠিক মাথার উপরে আসিলে মুখ্য জোয়ার দেখা দেয়। অধিকাংশ স্থলেই চন্দ্র কোন মাধ্যাহ্নিক রেখা (meridian) অতিক্রম করার অনেকক্ষণ পরে জোয়ারতরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বেশী সময়কে 'বন্দরের সময়' (establishment of the port) বলে। নিউইয়র্ক নগরে এই সময়ের পরিমাণ ৮ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত সাতকানিয়া মহকুমায় থাকিবার সময় দেখিতাম মাঝিরা তিথি অনুসারে নদীতে কখন জোয়ার আসিবে তাহা অনেকটা নির্ভুলভাবেই অনুমান করিত। এক এক ঘণ্টা অন্তর জোয়ারতরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। নাবিকগণ উহার সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরদ্বয়ের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে উচ্চতম জোয়ারের সময় পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এক জোয়ারতরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ দক্ষিণমহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মালাবার এবং করমণ্ডল—উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে। এইরূপ জোয়ারতরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার প্রায় ২০।৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা ও সিন্ধুনদের মোহনায় আসিয়া উপনীত হয়। উত্তরে বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী (লোহিত সাগরের মুখে) হইতে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র উপকূলে প্রায় একটি মাত্র জোয়ারতরঙ্গ এক এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়।

ভারতমহাসাগরে জোয়ারতরঙ্গের গতিপথ

উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ারতরঙ্গ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ারতরঙ্গ উত্তর আটলান্টিক দিয়া ইংলিশ চ্যানেলে (প্রণালীতে) গিয়া উপস্থিত হয়। এখানে ইহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক শাখা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিয়া উত্তরমুখে চলে ও দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অপর শাখা বরাবর ডোভার প্রণালী দিয়া চলে। সুতরাং উত্তর বা জার্ম্মাণ সাগরের মধ্যে একেবারে দুই দিক হইতে দুইটি জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। এইরূপে দেখা যায় যে জোয়ারতরঙ্গ প্রথমে উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০।৬০ ঘণ্টা পরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপনীত হয়।

আটলান্টিক মহাসাগরে জোয়ার-তরঙ্গ

প্রশান্ত মহাসাগরেও যে অনুরূপ জোয়ারতরঙ্গ না চলে, এমন নহে।

এইরূপে জোয়ারতরঙ্গ স্থলভাগে প্রতিহত হওয়ায় নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা দ্রাঘিমায় বিভিন্ন বেগে নানাদিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই হেতু অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে একই বন্দরে দুই বিভিন্ন দিক হইতে দুইটি জোয়ারতরঙ্গ একই সময়ে উপনীত হয়। তাহার ফলে পরস্পরের সঙ্গমাতে ঐস্থানে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে উত্তর বা জার্ম্মাণ সাগরের উপকূলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। আমরা জোয়ারতরঙ্গের সাধারণ আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, ফণ্ডী উপসাগরের জল প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ঐ উপসাগরেরই উপকূলস্থিত আম্‌লাপোলিস্ নামক বন্দরে জোয়ারের জল ১২০ ফুট উচ্চ হয়। সুইল প্রণালীর জল ১৮ ফুট এবং সোয়ান্‌সির (Swansea) জল ৩০ ফুট, চেপষ্টোন বন্দরের জল ৫০ ফুট এবং নোভাস্কোসিয়ার নিকটে জল ৭০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া পড়ে।

জোয়ারের উচ্চতা

সমুদ্রজলের এই অত্যধিক উচ্চতা অবশ্য চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণাধিক্যের ফলে হয় না। জোয়ারতরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূলস্থ স্থলভাগ দ্বারা প্রতিহত হইলে উচ্ছলিত হইয়া ভীষণ বেগে সম্মুখে ধাবিত হয়। ফলতঃ সুবিস্তৃত জোয়ারপ্রবাহ প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতে হইতে যদি অপ্রশস্ত কোন নদীর মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হয়, বা কোন খাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তবে উহা স্থল দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই জলরাশি উচ্চ হইতে বাধ্য হয়। এই কারণে আমাজন নদীর মোহনায় জোয়ার-জল প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। টেম্‌স্, সীন, হুগলী প্রভৃতি নদীর মোহনায়ও জোয়ারজলকে অনেক উচ্চ হইতে দেখা যায়।

অনেক সময় জোয়ারের জল সম্মুখে চলিতে চলিতে প্রশস্তমুখ কোন একটা নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া অগ্রসর হয়। এই প্রভূত জলরাশি প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া তীব্র বেগে স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গসকল যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তরঙ্গসকল উহাদের উপরে গিয়া পড়ে এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ তীরের উপরে আছড়াইতে থাকে। নদীর মধ্যে এইরূপে জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া আসাকে 'বান-ডাকা' বা বান আসা বলে। আমাজন নদীর বান এইরূপে প্রায় ১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইয়া সহসা নদীস্রোতের প্রতিকূলে ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। হুগলী, সীন ও গারোন নদীর বান প্রসিদ্ধ। চীনের সীন-টাং (Tsien tang) নদীর বানের ন্যায় ভীষণ বান আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। কখন কখন ঐ নদীপথে জল ৩০ ফুট উচ্চ হইয়া ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ছুটিয়া থাকে।

বান-ডাকা

কোন কোন সমুদ্রে একই সঙ্গে জোয়ার ও ভাঁটা দেখা দেয়। উহাদের পরস্পর

সংমিশ্রণের ফলে তথায় সমুদ্রের জল সর্ব্বদা যেন সমভাবেই থাকে। সুতরাং ঐ সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা লক্ষিত হয় না। ইন্দোচীনের টংকুইন প্রদেশের মধ্যস্থ বাচ্চাম বন্দরে একই সময়ে ভারত মহাসাগর ও চীন সাগর হইতে একটি জোয়ারতরঙ্গ ও একটি ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ বশতঃ ঐস্থানে সমুদ্রের জল সর্ব্বদা সমভাবে থাকে এবং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

স্থির-সমুদ্র

কাশ্মীরের খরস্রোতা বিতস্তা নদী (Jhelam) শ্রীনগরের নিকটে প্রশস্ত উলার হ্রদে প্রবেশ করায় তথায় স্রোত অনুভূত হয় না। অল্প জল অনেকখানি স্থানে ছড়াইয়া পড়ায় এইরূপ মনে হয়। এইরূপ আটলান্টিক মহাসাগরের জোয়ারতরঙ্গ অপ্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালীপথে যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ খুব স্রোত দেখা যায়, কিন্তু সুপ্রশস্ত ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করার পর আর উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। ফলতঃ ভূমধ্যসাগরে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়েও জল দুই ইঞ্চি মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারই ফলে প্রাচীন কালে স্থানীয় নাবিকগণ তথায় অতি সহজে দাঁড় বাহিয়া ব্যবসায়বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইত। প্রাচীন ফিনিসীয় বণিকগণের নৌবাণিজ্যে সম্যক উন্নতির অন্যতম কারণ ভূমধ্যসাগরে জোয়ার-ভাঁটার একরূপ অভাব। ঐ সাগরের অবশ্য নিজস্ব একটা সামান্য জোয়ার যে না আছে এমন নহে, তবে উহা নগণ্য।

আহ্নিক গতি বশতঃ পৃথিবীর শিলামণ্ডল বা স্থলভাগ যত জোরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া থাকে, অসংবদ্ধ বস্তুমণ্ডল সেই সঙ্গে চলিতে পারে না পিছাইয়া পড়ে অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখে একটা স্রোত দেখা যায়। জোয়ারতরঙ্গও পশ্চিমমুখে চলে। সুতরাং গঙ্গা ও আমাজন প্রভৃতি পূর্ব্ববাহিনী নদীর মোহনায় প্রবল জোয়ার দেখা দেয়। তবে নদী বা খাড়ি প্রভৃতির মুখ পূর্ব্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অন্য কোন দিকে থাকিলেও ঐ সকল স্থানে সমান জোয়ারই উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিম বাহিনী সমুদ্রে পতিতা নদীতেও জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীত দিকে জোয়ার চলিয়া থাকে।

কোন স্থানে জোয়ারপ্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটায় স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া পড়ে। পরক্ষণেই আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতোহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি বুঝিতে হইবে। সমুদ্রতীরস্থ বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীর মোহনায় ইহা প্রযুজ্য নহে, কারণ ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া থাকে।

উপকূল হইতে বহুদূরবর্ত্তী খোলা সমুদ্রে জোয়ার হইলেও উহা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা জোয়ারতরঙ্গের উচ্চতা (tidal range) এক বা দুই ফুটের অধিক হয় না। সমুদ্রের গভীরতা ও উপকূলের আকারের উপর এবং দ্বীপ ও মহাদ্বীপাদির ব্যবধানের জন্যও জোয়ারের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে।

ইংলণ্ডীয় নৌপঞ্জিকায় ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বন্দরের জোয়ারভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত থাকে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান অতীব আবশ্যক। পোতাশ্রয়াদি নির্ম্মাণ কালেও স্থানীয় জোয়ারের চরম উন্নতি এবং চরম অবনতি জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহনায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ ও ষ্টীমার যাতায়াত করিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে তথাকার জোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন নদীর স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। সমুদ্রের তীরস্থ নগর, গ্রাম ও বন্দরের মাঝিরা নদীর মধ্যে গুণ টানিয়া উজানে নৌকা চালায় না, জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করে। কলিকাতা, কি চট্টগ্রাম যে কোনও বন্দরে এইরূপই দৃষ্ট হয়। জোয়ারভাঁটার ফলে অনেক নদীর মোহনা বহুতা (open) থাকে, ভৈরব নদী নদীয়া জেলায় মজিয়া নৌকা চলাচলের অযোগ্য হইলেও বঙ্গোপসাগরের নিকটে বেশ প্রবল রহিয়াছে।

জোয়ারের উপকারিতা

জোয়ারের প্রকৃতির উপরে দেশের জলবায়ু অনেকটা নির্ভর করে। উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলকে বরফশূন্য রাখিয়াছে। নরওয়ের উত্তরস্থ হ্যামার-ফেষ্ট নগরে বারমাসই এই স্রোতের ফলে জাহাজ চলাচল করিতে পারে, কিন্তু অনেক নিম্ন অক্ষাংশস্থিত বাল্টিক সাগর বরফাচ্ছন্ন হওয়ায় শীতকালে নৌচলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আবার লাব্রাডর উপদ্বীপ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সম অক্ষরেখায় অবস্থিত হইলেও নিকটস্থ শীতল লাব্রাডর স্রোতের জন্য উহার উপকূল প্রায় ৯ মাস ধরিয়া বরফাচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে নৌচলাচল অসম্ভব হইয়া পড়ে। উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের কল্যাণে ইংলণ্ডের জলবায়ু অত্যধিক শীতল হইতে পারে নাই। কিন্তু সুশীতল লাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে লাব্রাডরের জলবায়ু শীতকালে একরূপ অসহ্য হইয়া থাকে। অনেক বন্দরের নিকটে জোয়ারের ফলে সমুদ্রে একটা ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয়। বড় বড় সহরের আবর্জ্জনারাশি ও মলমূত্রাদি অনেক সময় সমুদ্রে ফেলা হয়। উপরোক্ত ঘূর্ণীপাকের দ্বারা ঐ সকল দূষিত পদার্থ বহু দূরে নীত হওয়ায় সহরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে। ইউরোপে অনেক বড় বড় শিল্পপ্রধান সহরকে কৃত্রিম খালের সাহায্যে সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। জোয়ারের জল যখন খালে প্রবেশ করে তখন পণ্যবাহী জাহাজ ঐ সকল নগরে যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ডের মাঞ্চেষ্টার জাহাজ খাল এবং জার্ম্মাণির কীয়েল খাল ইহার উদাহরণ।

জোয়ারের অপকারিতা

উপকূলস্থ স্রোতোবিহীন অনেক সমুদ্রের তলদেশে জোয়ারের বেগে বালুকা ও কর্দ্দমাদি ক্রমশঃ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। ঐ সকল মৃত্তিকাস্তর উপরিস্থ গভীর বারিরাশির প্রবল চাপে জমিয়া জলজ শিলাস্তরে (stratified rocks)

রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এইরূপে উপকূলস্থ সমুদ্র কালক্রমে নৌচলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

আবার জোয়ারের উল্টা স্রোতে অনেক নদীর মুখে ও বন্দরের মধ্যে প্রচুর পলিমৃত্তিকা এবং বালুকারাশি প্রেরিত হয়। উহার ফলে ঐ সকল নদীর মোহনা ও বন্দর ক্রমশঃ অগভীর হইয়া পড়ে এবং সময়ে নৌবাণিজ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠে। প্রাচীন সপ্তগ্রামাদি বন্দরের কথা দূরে থাকুক, অনেকটা আধুনিক হুগলী বন্দরও এক্ষণে জাহাজ চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা বন্দরেও আর পূর্ব্বের ন্যায় বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না। সেইজন্য সমুদ্রের অনেকটা নিকটে ডায়মণ্ডহারবার বন্দরের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। জোয়ারের স্রোতে চালিত বালুকারাশি চিল্কা উপসাগরের মুখে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হওয়ায় উহা জাহাজ চলাচলের পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে। কালক্রমে হয়ত মুখটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। এক্ষণে চিল্কা একটি উপহ্রদে (lagoon) পরিণত হইয়াছে।

যখন কোনও নদীর মধ্যে 'বান ডাকে' তখন সামান্য অসাবধান হইলে অনেক সময় বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত চড়ায় ঠেকিয়া নষ্ট হয়। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে এই কারণে হুগলী নদীর মুখে জেম্‌স্ (James) এবং মেরী (Mary) নামক দুইখানি জাহাজ বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য নদীর মোহনাস্থ জলের গভীরতা নিয়ত মাপা হয়। এই স্থানে আসিয়া কাপ্তেন জাহাজখানিকে অভিজ্ঞ পাইলট (pilot) বা পথপ্রদর্শকের হস্তে ছাড়িয়া দেয়, পাইলট উহাকে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে লইয়া যায়। বান ডাকার সময়ে মাঝিরা নৌকা নদীর মধ্যভাগে লইয়া যায়, নতুবা কিনারায় প্রতিহত হইয়া ভাসে বা ডুবিয়া নষ্ট হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা জোয়ার সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়াছি। বিষয়টি বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য। একই সময়ে জোয়ারের জল পৃথিবীর বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। ইহার প্রভাবে সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি ভীষণ ঝটিকা কালেও সমুদ্রের প্রভূত জল প্রচণ্ড উর্ম্মিমালাসঙ্কুল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও মাত্র কয়েক ফুট নিম্নস্থ জল স্থিরই থাকে।

চন্দ্রই যে জোয়ারের প্রধান কারণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জলরাশি সর্ব্বদাই চন্দ্রের নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীত দিকে উচ্চ হইয়া মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের আকৃতি ধারণ করে। সুতরাং পরস্পর বিপরীতভাবে অবস্থিত দুইটি জোয়ারতরঙ্গ সর্ব্বদা চন্দ্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিয়া থাকে। আহ্নিক গতিবশতঃ পৃথিবীর শিলামণ্ডল বা স্থলভাগ ঐ জোঁয়ারতরঙ্গ ভেদ করিয়া বিপরীতমুখে ( ) পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করিতেছে,

অথবা জোয়ারপ্রবাহ পশ্চিমমুখে পৃথিবীকে প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে জল ও স্থলভাগের সহিত নিয়ত ঘর্ষণ চলিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণন শক্তি (আহ্নিক গতি) কিয়ৎপরিমাণে ব্যয়িত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে।

আহ্নিক গতির হ্রাস

তাহার ফলে দিবসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এক চান্দ্র মাস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর আহ্নিক গতি নিয়ত হ্রাস পাইবে।

ইহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে সুদূর ভবিষ্যতে এক সময় পৃথিবীর একটি দিবস এক চান্দ্র মাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটিমাত্র পৃষ্ঠ নিয়ত প্রদর্শন করিয়া (চন্দ্র এখন যেমন করিয়া থাকে) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ দুইটি বল বা পিণ্ডের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। তখন আর এখনকার মত সমুদ্রপৃষ্ঠে জোয়ারভাঁটা হইবে না, সমুদ্রের জল পৃথিবীর দুই স্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে। কিন্তু সে কাল আসিতে লক্ষ লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন হইবে।

চন্দ্রের একটি মাত্র পৃষ্ঠদেশই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরান থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে অনুমান করেন যে চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ উপরিভাগে দ্রব অবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহার পৃষ্ঠদেশে নিঃসন্দেহ প্রচণ্ড জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রচণ্ড জোয়ারের ভীষণ ঘর্ষণের ফলে চন্দ্রের আবর্ত্তনশক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া এখন এক চান্দ্র মাসে মাত্র একবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রের পক্ষে মেরুদণ্ডের উপরে একবার আবর্ত্তন ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণের সময় এই কারণেই সমান হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে জোয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ (theory) রহিয়াছে। একটির নাম 'গতিশীল-তরঙ্গ-মতবাদ' (progressive wave theory)। এই মতবাদ অনুসারে দক্ষিণ মহাসাগরে জোয়ার উৎপন্ন হইলে উহা গতিশীল তরঙ্গশ্রেণীর আকারে আটলান্টিক ও অন্যান্য মহাসাগর দিয়া চলে। পর পর জোয়ারের জন্য ঐ সকল জোয়ারতরঙ্গ নির্দ্ধারিত সময়ে আসিয়া দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ অনুসারে অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না।

গতিশীল তরঙ্গ

অন্য মতবাদকে 'স্থিতিশীল-তরঙ্গ-মতবাদ' (stationary wave theory) বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে সমুদ্রের জলরাশির উত্থান ও পরক্ষণেই উহার পতন বেশ ব্যাখ্যা করা চলে। দাঁড়িপাল্লার এক প্রান্ত উচ্চ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত নিম্ন হইয়া যায়। সেইরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের এক স্থান জোয়ারতরঙ্গের আকারে উন্নত হইলে, নিকটস্থ অপর স্থান সঙ্গে সঙ্গে অবনমিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ তরঙ্গের

স্থিতিশীল তরঙ্গ

পর 'গর্ত্ত' (trough) দেখা যায়। আবার উঁচু পাল্লা নীচু হইলে অপর পাল্লা যেমন সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, সেইরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের এক অংশ অবনত হইলে পার্শ্বস্থ অপর অংশও উচ্চ হইয়া উঠে। এইরূপে তরঙ্গ ও গর্ত্ত পাশাপাশি চলে। ফলতঃ জোয়ারের সময় এইরূপেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে জোয়ারজলের এই ক্রমিক উত্থান ও পতন মহাসমুদ্রে এবং খোলা সমুদ্রের বক্ষে ঘটে। ইহাদের উচ্চতা সেখানে এক বা দুই ফুটের যে অধিক হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জোয়ারজলের এই অল্পাধিক উচ্চতাকে 'জোয়ার মাত্রা' (tidal range) বলে।

সারার্থ—প্রবল ঝড় বহিলে খোলা সমুদ্রের উপরে বড়-বড় ঢেউ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল ঢেউ অনেকটা একই স্থানে থাকিয়া উঠানামা করে মাত্র। উহাদিগকে বাত্যা-তরঙ্গ বলে। উহাদের এক একটির ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। উহারা একই স্থানে উঠানামা করিলেও একটির পর আর একটি ঢেউ উঠিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অগভীর উপকূলের নিকটে উহাদের মস্তকদেশগুলি সজোরে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই প্রবল আঘাতে তীরভূমি ক্ষয় পায় ও বালুকাদি জলের তলায় তলায় চলিয়া উপকূলস্থ সমুদ্রকে আরো অগভীর করিয়া ফেলে।

ভূমিকম্পের ফলে প্রশান্ত ও ভারতাদি মহাসমুদ্রের মধ্যে এক প্রকার তরঙ্গ উত্থিত হয়। জাপানীরা উহাকে সুনামী-তরঙ্গ বলে। মহাসমুদ্রের মধ্যভাগে জলের পৃষ্ঠদেশ সিকি ইঞ্চি উন্নীত না হইলেও বিচলিত প্রভৃত জলরাশি যখন কোন দ্বীপ বা উপকূলের দিকে প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়, তখন উহা সময় সময় শতাধিক ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে উপকূলস্থ গ্রাম, নগর ও বন্দরাদি ভাসিয়া যায় এবং উহাদের বিষম ক্ষতি হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন নগর এই কারণে একরূপ ধ্বংস পায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের ইয়াকোহামা বন্দরসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে মহাসমুদ্রে জোয়ার উৎপন্ন হয়। ঐ জলরাশি চন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পশ্চিমাভিমুখে ছুটে। অগভীর উপকূলের নিকটে পৌঁছিলে উহা উচ্চ হইয়া উঠে ও জোয়ারতরঙ্গের আকার ধারণ করে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বাংশস্থিত ফাণ্ডি এবং আন্‌গাডা উপসাগর দুইটিতে জোয়ারের জল ৩০ হইতে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে।

জোয়ারের এই প্রভূত জলরাশি যখন কোন প্রশস্তমুখ নদীর মোহনা দিয়া নদীর মধ্যে চলে, তখন উচ্চ হইতে বাধ্য হয়। উহাকে বান-ডাকা বলে। উহার প্রচণ্ড আঘাতে অনেক সময় অসাবধান নৌকা, মানুষ, এমন কি ষ্টীমারাদি নষ্ট হইয়া যায়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের নিকটতম মহাসমুদ্রে জোয়ার উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম মুখ্য জোয়ার। আবার যে সময়ে পৃথিবীর এক পার্শ্বে মুখ্য জোয়ার দেখা দেয়, ঠিক সেই সময়েই উহার বিপরীত পার্শ্বেও প্রায় অনুরূপ জোয়ার দেখা যায়।

উহাকে গৌণ জোয়ার বলে। দূরত্বের আধিক্য হেতু পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বে চন্দ্রের (ও সূর্য্যের) আকর্ষণ সম্মুখ পার্শ্ব অপেক্ষা অনেক কম। সেই জন্য সমগ্র শিলামণ্ডল চন্দ্রের (ও সূর্য্যের) দিকে যেরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারে, বিপরীত পার্শ্বস্থ জলরাশি সেরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারে না, যেন কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়ে। তাহাতে ঐ পার্শ্বেও জোয়ার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিষুবরেখার উপরিস্থ সমুদ্রে ১২ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় অন্তর প্রায় সমানভাবেই মুখ্য ও গৌণ জোয়ার দেখা দেয়। বিষুব রেখা হইতে স্থানবিশেষের দূরত্ব (অক্ষাংশ), এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের অবনতি অনুসারে স্থানীয় জোয়ারভাঁটার মাত্রার তারতম্য হইয়া থাকে।

কোনও স্থানে মুখ্য ও পরবর্ত্তী গৌণ জোয়ারের ব্যবধান প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (কোন কোন মতে ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট) হইবার কথা। কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর কয়েক দিন এই ব্যবধান অনেক কম থাকে। অষ্টমীর পর হইতে ব্যবধান বাড়িয়া যায়।

অনেকগুলি কারণের উপরে উচ্চতম জোয়ার নির্ভর করে, যথা—চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রে অবস্থান ইত্যাদি।

জোয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ রহিয়াছে। একটির নাম গতিশীল-তরঙ্গ-মতবাদ। এই মতানুসারে দক্ষিণ মহাসাগরে জোয়ার উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ ভারত, আটলান্টিক ইত্যাদি এবং অন্যান্য সাগর দিয়া চলে। অন্য মতকে স্থিতিশীল-তরঙ্গ-মতবাদ বলে। জোয়ারের সময় যে উচ্চ তরঙ্গ ও উহার পার্শ্বেই নিম্ন গর্ত্ত দেখা যায়, এই মতানুসারে উহা বেশ ব্যাখ্যা করা চলে।

কোন কোন আবদ্ধ সাগর উপসাগরে জোয়ারের জল খুব উচ্চ হইয়া থাকে। নোভাস্কোশিয়ার নিকটে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত জোয়ারজল উচ্চ হইতে দেখা যায়। আবার কোন কোন সমুদ্রে জোয়ারভাঁটা অনুভব করা যায় না; যথা—টংকুইন উপসাগর ও ভূমধ্যসাগর। জোয়ারের দ্বারা যেমন অনেক প্রকার উপকার সাধিত হয়, সেইরূপ অপকারও হইয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বিপরীতমুখী জোয়ারজলের সহিত শিলামণ্ডলের অবিশ্রান্ত সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে অর্থাৎ দিবসের পরিমাণবৃদ্ধি পাইতেছে। এমন দিন হয়ত আসিবে, যে সময় সমুদ্রপৃষ্ঠে আর জোয়ার-ভাঁটা অনুভূত হইবে না, সমুদ্রের জল পৃথিবীর দুই পরস্পর বিপরীত পার্শ্বে উচ্চ অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিবে।

সিকিম হিমালয়ের উদ্ভিদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
ANDROSACE LINN. মূলজ ও দীর্ঘবৃন্তক পত্র								
১। আনড্রোসাসি স্যাক্সিফ্রাগিফোলিয়া Androsace saxifragæfolia Bunge.	পাতা ¾", বর্ষজীবী			ফাল্গুন	তরাই			
২। আঃ জিরানিফোলিয়া A. geraniifolia Watt.	পাতা জিরানিয়মের মত		বৈশাখ	আশ্বিন	ইউয়ামথাং-এর সেঁৎসেতে অরণ্যে ১১০০০′	কুমাও হইতে সিকিম		
৩। আঃ ক্রফটিয়াই A. Croftii Watt.	১½" পাতা গোলাকৃতি		জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	নাথং ১২০০০′ জোঙ্গরির নিকটে ১২০০০′			

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৪। আনড্রোসাসি ষ্ট্রিগিলোসা = সারমেনটসা গ্রাণ্ডিফ্লোরা Androsace strigillosa Franch. = Sarmentosa grandifolia Wall.	১০" মূল, কাণ্ড কাষ্ঠময়			ভাদ্র	লিংমোথাং ১৩০০০′, নদীকূলে ও শুষ্ক শিলার উপরে	সিকিম		
৫। আঃ হুকেরিয়ানা A. Hookeriana Klatt.	ক্ষুদ্র গুল্ম, সপত্রক জননশাখা	ধূমলবর্ণ, হলদে অক্ষি, পাটলবর্ণ	বৈশাখ	শ্রাবণ	ওংলাথাং ১৪০০০′ খোলা জায়গায়	সিকিম		
৬। আঃ চমিজাসমি A. Chamœjasme Host.			জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	ছাঙ্গু ১৪০০০′			
প্রকার—ইউনিফ্লোরা var. uniflora								
প্রকার—কোরোনাটা var. coronata Watt.			শ্রাবণ		লিংমাছু ১৬৫০০′			

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৭। আনড্রোসাসি সিলাগো Androsace Selago Hook.	২"		আষাঢ়	আশ্বিন	থি-লা ১৮০০০' লোনাক উচ্চ চারণভূমিতে	সিকিম-হিমালয়		
৮। আঃ লেহমান্নি A. Lehmanni Wall.	১½"		আষাঢ়	আশ্বিন	গুচেলা ১৫০০০'	সিকিম		
৯। আঃ পোইজোনি A. Poisonii Kenth.	১½"		আষাঢ়	আশ্বিন	নাকুছু ১৬০০০' ইয়ামফোং ১৪০০০'			
১০। আঃ ইরেক্টা A. erecta Maxim.	২", ক্ষীণ কিন্তু খাড়া			ভাদ্র	গিয়াংসি ১১০০০'	তিব্বত		
১১। আনড্রোসাসি জাতি A. sp.	২", অত্যন্ত মজবুত উদ্ভিদ				বামাতোছো, শুষ্ক বালুকাময় ভূমিতে ১৪০০০'			ইরেক্টা অপেক্ষা বৃহৎ ও মজবুত উদ্ভিদ
১২। আঃ ভিল্লোসা A. villosa			আষাঢ়		কাংগ্রা লামা গিরিবর্ত্ম ১৫০০০'			পোইজোনির মত

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
প্রকার—লাতিফলিয়া *var.* latifolia Ledeb.								

BRYOCARPUM HOOK. f & t

১। ব্রাইয়োকারপম হিমালইকাম Bryocarpum himalaicum Hook.	পাতা ৬", তেভর প্রায় দ্বিগুণ	গন্ধকবৎ হলদে একপুষ্পী	বৈশাখ	আশ্বিন	চুয়াভাঞ্জাং ১২০০০' পাইন অথবা রোডোডেণ্ড্রন বনে	সিকিম		

LYSIMACHIA LINN.

লম্বা পুষ্পস্তবক, মঞ্জরীপত্র পুষ্পবৃন্তিকা হইতে দীর্ঘতর ; পুংকেশর পুষ্পমুকুট হইতে হ্রস্ব ; পুষ্প সাদা অথবা ঈষৎ আরক্তবর্ণ
(Flowers in elongate terminal racemes, bracts leafy, longer than the pedicels. Stamens shorter than the corolla. Flower white or pale pink.)

১। লিসিমাচিয়া চিনোপোডিয়ডিস Lysimachia chenopodioides Watt.	১২", সাধারণতঃ বহু শাখাবিশিষ্ট	অবৃন্ত পুষ্প মঞ্জরীতে	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ				
২। লিঃ প্রলিফেরা Lysimachia prolifera Klatt.	৫"	সাদা অথবা মাংসের রং	বৈশাখ	শ্রাবণ	টংলু ৯০০০'	দারওয়াল-সিকিম		

	নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৩।	লিসিমাচিয়া র‍্যামোসা Lysimachia ramosa Wall.	খাড়া ১২" শাখা সপক্ষ	½" হলদে	বৈশাখ	শ্রাবণ	বংবী ৬০০০' তাকভার	পূর্ব্ব হিমালয়		
৪।	লিঃ ইভালভিস L. evalvis Wall.	১০", জটিল কোণযুক্ত; পাতা কতক পরিমাণ দূরবর্ত্তী	হলদে, বড়	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	রিম্‌সিম্‌ম ৮০০০' দার্জ্জিলিং ৬০০০'	মধ্য ও পূর্ব্ব হিমালয়		
৫।	লিঃ আলটারনিফলিয়া L. alternifolia Wall.	১২', শাখা ২"-৮", গোড়া হইতে শাখান্বিত	হলদে	বৈশাখ		দার্জ্জিলিং ৬০০০'	ঘারওয়াল-ভোটান		
	Leaves opposite—অভিমুখপত্র								
৬।	লিঃ জাপোনিকা L. japonica Thunb.	সরু শাখাবিশিষ্ট		জ্যৈষ্ঠ		সুরেল ৫০০০'	কাশ্মীর-ভোটান		
	ANAGALLIS TOURNEF								
১।	আনাগল্লিস আরভেনসিস্ Anagallis arvensis Linn.	৪", গোড়া হইতে শাখান্বিত	নীল	পৌষ	ফাল্গুন	তরাই	ভারতবর্ষ		লাইসিমাইকিয়ার মত দেখিতে

	নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
১।	আরডিসিয়া নেরাইফোলিয়া Ardisia neriifolia Wall.	একটি বৃহৎ খাড়া শাখাযুক্ত গুল্ম, কখনও লতার মত	পাটলবর্ণ ফুল	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	মনসাং ২৫০০' বনে নদীর ধারে	কুমাওঁ-ভোটান	পিয়োংকুং	
২।	আঃ মাক্রোকারপা A. macrocarpa Wall.	১-৪' গুল্ম	সাদা	চৈত্র	বৈশাখ	দার্জ্জিলিংএর বনজঙ্গলে	নেপাল-ভোটান		
৩।	আঃ ইনভলুক্রাটা A. involucrata Kurz.	২০' গুল্ম		মাঘ	চৈত্র, ভাদ্র	তারসিং-এর বনে ৪০০০'			
৪।	আঃ হিউমিলিস্ A. humilis Kurz.	ছোট গাছ		বৈশাখ	আশ্বিন	সিঙ্গলা ২০০০'			
	MYRSINEÆ.								
১।	মাইরসিনি সেমিসেরাটা Myrsine semiserrata Wall.	বৃক্ষ		ফাল্গুন		দার্জ্জিলিং ৬০০০'			
২।	মাঃ ক্যাপিটেল্লাটা M. capitellata Wall.	ছোট বৃক্ষ	ফেকাসে হলদে	অগ্রহায়ণ	বৈশাখ	দামসাং ৪০০০'			

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
SAPOTACEÆ								
১। সার্কস্পারমা আরবোরিয়াম Sarcosperma arboreum Benth.	বৃহৎ ঝোপ	ঘনভাবে গুচ্ছিত পুষ্প	ফাল্গুন		কালিঝোরার বনে	সিকিম-খাসিয়া	দুদ-লাম-পাতি	
১। মিমুসপ্স ইলেঞ্জি Mimusops Elangi Linn.	সুন্দর ছোট গাছ, চিরহরিৎ	ফুল প্রচুর মালাতে ব্যবহার হয়				ভারতবর্ষ	বকুল	চাষ হয়; ফল হলদে, খাওয়া যায়।
STYRACEÆ (C. B. Clarke)								
১। সিমপ্লোকস রেসিমোসা Symplocos racemosa Roxb.	ছোট গাছ	মঞ্জরীর ঘন গুচ্ছে হরিদ্রাভাযুক্ত সাদা ফুল	ফাল্গুন		শুকনার বনে	উত্তর-পূর্ব্ব ভারতবর্ষ	খারানি	ইহার পাতা হইতে মেটে রং তৈয়ারি হয়।
২। সিঃ গ্লোমেরাটা S. glomerata King.	মাঝারি রকম গাছ	ফুল এবং ফল নমনীয়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	সিঞ্চল ৮০০০′	সিকিম-ভোটান	ঐ	
৩। সিঃ রামোসিস্সিমা S. ramossissima Wall.	ঐ		বৈশাখ	কার্ত্তিক	দার্জ্জিলিং ৬০০০′	ঘারওয়াল-ভোটান	ঐ	

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৪। সিমপ্লোকস সামুনটিয়া S. sumuntia Ham.	ছোট গাছ	শীর্ষ ১½″ লোমশ	ফাল্গুন		সুরেইলের বনে ৫৫০০′ দার্জ্জিলিং	নেপাল-ভোটান		
৫। সিঃ স্পিকাটা S. spicata Roxb.	ঐ		অগ্রহায়ণ	ভাদ্র	গ্যাংটক ৫০০০′ লেবং	উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়		
৬। সিঃ থিয়াফলিয়া S. theæfolia Ham.	খাড়া গাছ	মঞ্জরী অত্যন্ত খাট, ঈষৎ রোমশ	ফাল্গুন	বৈশাখ	দার্জ্জিলিং ৬০০০′	নেপাল-ভোটান		
৭। সিঃ ফিল্লোক্যাক্স S. phyllocax C. B. Cl.	বৃক্ষ	মঞ্জরী বৃন্ত অপেক্ষা খাট	ফাল্গুন		টংলু ৯০০০′ বনে			
STYRAX Linn.								
১। ষ্টিরাক্স সেরুলাটম Styrax serrulatum Roxb.	বৃক্ষ	সাদা	চৈত্র	পৌষ	রঙ্গিত ২০০০′	নেপাল-ভোটান		
২। ষ্টিঃ হুকেরি S. Hookeri C. B. Cl.	ছোট বৃক্ষ, বিস্তৃত	সাদা	বৈশাখ	শ্রাবণ	রংবি ৬০০০′	সিকিম-ভোটান		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
OLEACEÆ (C. B. Clarke)								
১। জাসমিনাম য়্যাণ্ডুলাটম Jasminum undulatum Ker.	লতা, ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি রোমশ	উপশিরা প্রায় ছোট পার্শ্বিক শাখার উপরে ; সাদা অল্প সুগন্ধি	ভাদ্র	ফাল্গুন	রিয়াং ২০০০'	সিকিম		
২। জাঃ পুবেসেন্স J. pubescens Willd.	ক্ষুদ্র, প্রশাখা বৃতি ও বৃন্ত রোমশ		আশ্বিন	চৈত্র	লাবদাহ ২০০০'	হিমালয়-টেনাসেরিম		
৩। জাঃ স্কানডেনস্ J. scandens Vahl.	লতা, ক্ষুদ্র উপশাখাগুলি রোমশ	মঞ্জরী খাট কাক্ষিক শাখা হইতে, সাদা—ঈষৎ পাটলবর্ণরঞ্জিত, সুগন্ধি	অগ্রহায়ণ	ফাল্গুন	তরাই	বঙ্গদেশ-পেগু		
৪। জাঃ আনাস-টোমোসানস J. anastomosans Wall.	লতা	১-৫ পুষ্পী, পাপড়ি অত্যন্ত লম্বা	মাঘ		তরাই-মেটেলি	ভোটান-পেগু		
৫। জাঃ সাবট্রিপ্লিনার্ভ J. subtripli-nerve Blume.	ঐ			ফাল্গুন	জলঢাকা	সিকিম-কাছাড়		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
৬। জাসমিনাম গ্লানডুলোসাম J. glandulosum Wall.	৬ ফুট লতা	সাদা মঞ্জরী অল্প ফুলযুক্ত	জ্যৈষ্ঠ		রঙ্গিত ২০০০'	কুমাওঁ-খাসিয়া		
৭। জাঃ কডাটাম J. caudatum Wall.	আরোহী		কার্ত্তিক	জ্যৈষ্ঠ	সিভোক	খাসিয়া-সিকিম		
৮। জাঃ হেটিরোফাইলাম J. heterophyllum Roxb.	লতা	অগ্রস্থ মঞ্জরী হলদে	চৈত্র		তোরসা ৪০০০'	নেপাল		
৯। জাঃ ডিসপারমাম J. dispermum Wall.	লতা	সাদা	ফাল্গুন বৈশাখ	চৈত্র	রংবির বনে ৬০০০' দার্জ্জিলিং	হিমালয়-কাশ্মীর ভোটান		
১০। জাঃ হিউমিলি J. humile Linn.	খাড়া গুল্ম	হলদে সুগন্ধি	চৈত্র	আশ্বিন	ল্যাচেং ৮০০০'	কাশ্মীর হইতে সিকিম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ		
১১। জাঃ অফিসিনেল J. officinale Linn.	ক্ষীণ গুল্ম	হলদে ১-১০ পুষ্পী	জ্যৈষ্ঠ		লাকুক (তিব্বত) ১১০০০'	কাশ্মীর		

নাম	গাছের প্রকৃতি	ফুলের আয়তন	ফুল ফুটার সময়	বীচি পাকিবার সময়	প্রাপ্তিস্থান	স্বাভাবিক বাসস্থান	স্থানীয় নাম	মন্তব্য
NYCTANTHES LINN.								
১। নিক্টানথিস্ আরবোরট্রিস্টিস Nyctanthes arbortristis Linn.	ছোট বৃক্ষ	সাদা সুগন্ধি	কার্ত্তিক	মাঘ	জলপাইগুড়ি	ভারতবর্ষ	শেফালি	
SYRINGA LINN.								
১। সিরিঙ্গা পারসিকা Syringa persica Linn.	মসৃণ গুল্ম	নীলাভ লোহিতবর্ণ			ভারতবর্ষ ও পারস্যে উৎপন্ন হয়			
OSMANTHUS LOUR.								
১। ওসমানথাস ফ্রাগ্রান্স Osmanthus fragrans Lour.	ছোট গাছ ৬'	মঞ্জরী ঘন আগার দিকে	পৌষ		স্নুরেইলএর বনে ৫৫০০'	ঘারওয়াল-সিকিম		
২। ও: স্যুয়াভিস O. suavis King.	৮' ঝোপ		বৈশাখ	গহিরিবাশ কালাপোখরী ১০০০০'				

ভারতবর্ষে শৃগাল পূজা

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

শিবের অনুচর শিবাগণকে অর্থাৎ শৃগালদিগকে পূজা করিবার প্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকগণকে সন্তান-বর দিবার ক্ষমতা দেবাদিদেব শিবের আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মহিলাদের বিশ্বাস ছিল যে শিবের অনুচর শিবাগণকে বলি ভোগ প্রদান করতঃ পূজা করিলে তাঁহারা সন্তানসম্ভবা হইবেন। বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী পাঠ করিলে আমরা এই তথ্যটী জানিতে পারি। এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বিবৃত আছে যে রাজ্ঞী বিলাসবতী সন্তান-সম্ভবা হইবার জন্য উৎসুকা হইয়া রাত্রিকালে শিবমন্দিরে গিয়া উহার প্রাঙ্গণে শিবাগণের জন্য মাংসের বলি ভোগ রাখিয়া আসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে শিবের অনুচর শিবাগণ ঐ বলি ভক্ষণ করিলে তিনি সন্তানসম্ভবা হইবেন।

শৃগালগণকে পূজা করিবার প্রথা আধুনিক ভারতবর্ষেও প্রচলিত আছে। পূর্ব্ব বাংলার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় চৈত্রসংক্রান্তির সময় নীলপূজা উপলক্ষে শৃগালগণকে বলি ভোগ দেওয়া হয়। এই 'শিবা-পূজা' তথাকার মাদারিপুর মহকুমায় প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে যে 'নীলপূজা' বা 'চড়কপূজা' নামক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, 'শিবা-পূজা' উহার অঙ্গীভূত। এই উপলক্ষে যে দেবতার পূজা হয়, তাহার প্রতিমার দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ শিবমূর্ত্তি ও বাম অর্দ্ধাংশ গৌরীমূর্ত্তি। এই হরগৌরী মূর্ত্তির পূজা সমাপ্ত হইলে উহার সম্মুখে একটী ছাগল বলি দেওয়া হয়। তৎপরে কিছু সিদ্ধ চাউল ও মুগের ডাল মিশ্রিত করিয়া পাক করা হয় এবং বলিদেওয়া ছাগলটীর মস্তক এবং কয়েকটা শাল ও শিঙ্গী মৎস্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উক্ত চাউল ও ডালের সহিত একখানি 'কুলার' উপরে রাখিয়া 'কুলা'খানিকে একখানা গামছার দ্বারা আবৃত করা হয়। তদনন্তর দগ্ধ মাংসমৎস্য এবং পক্ক চাউল ও ডালের সহিত 'কুলা'খানিকে একটা নির্জ্জন স্থানে এই উদ্দেশ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শৃগালেরা আসিয়া উহা আহার করিতে পারে। কথিত হয় যে পূর্ব্বকালে বলি ভোগ সহ 'কুলা'খানিকে নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইত না, যেহেতু তখন শৃগালেরা রন্ধনস্থলে আসিয়াই বলি ভোগ খাইয়া যাইত।*

উত্তর বেহারেও শৃগালগণকে বলি ভোগ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথাটী কেবলমাত্র হাথুয়া মহারাজার পরিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উত্তর বেহারের অন্তর্গত সারণ জেলার কুয়াড়ী এবং সিপাহ্ পরগণায় উক্ত মহারাজার অধিকাংশ

* *Man in India* নামক পত্রিকার ৩য় খণ্ডের ২৫২ পৃষ্ঠা।

জমিদারী অবস্থিত এবং হাথুয়া নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী। কিরূপে এই প্রথাটী উক্ত পরিবারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পরগণা সিপাহ্‌র অন্তর্গত বরহরিয়া নামক স্থানের মুসলমান জমিদার রাজা কাবুল মহম্মদের সহিত হাথুয়ার রাজা সাহীর অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উক্ত হিন্দু রাজা অনেকবার পরাভূত হইয়াছিলেন। শেষবার পরাজিত হইয়া যখন রাজা সাহী কতিপয় অনুচরের সহিত জঙ্গলে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন দেবী ভবানী স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দেন এবং রাজার নিকট আত্মদুঃখ জানাইয়া বলেন যে তিনি (দেবী) মুসলমান রাজ্যে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তিনি রাজাকে এই বলিয়া উৎসাহিত করেন যে "তুমি তোমার প্রতিবেশী মুসলমান রাজার সহিত খুব উদ্যমের সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যুদ্ধযাত্রাকালে তুমি একটী শৃগাল ও একটী সর্প দেখিতে পাইবে। শৃগালটীকে প্রণাম করিয়া সর্পটীকে মারিয়া ফেলিবে।" সাহী দেবীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রপুরের যুদ্ধে মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুর পরগণা সিপাহ্‌র অন্তর্গত থাওয়ে গ্রামের এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। থাওয়ের জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের বৃক্ষের মূলদেশে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। হাথুয়ার মহারাজা তথায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত দেবী-মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। মহারাজা এখনও পর্য্যন্ত শৃগালগণকে খুব ভক্তির সহিত আদর করিয়া থাকেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি চৈত্র মাসে রামনবমীর দিন শৃগালগণকে বলি ভোগ খাওয়িয়া প্রকারান্তরে উহাদের পূজা করেন।*

ফরিদপুর জেলায় এবং হাথুয়া রাজ্যে প্রচলিত প্রথা দুইটীর সমাকৃষ্ণ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই সাধারণতঃ যেভাবে দেবদেবীর পূজা হয়, ঠিক সেই ভাবে ঐ দুই স্থানে শৃগালগের পূজা হয় না। উহাদিগকে কেবলমাত্র বলি ভোগ দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে-নিম্নলিখিত চারিটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয় :—

(১) মন্ত্রপাঠ

(২) উপাস্য মূর্ত্তি বা দ্রব্য বা পশুটীকে সিন্দুর এবং চন্দনের দ্বারা চর্চ্চিত করা

(৩) উক্ত মূর্ত্তি বা দ্রব্য বা পশুটীকে পুষ্পমালোর দ্বারা শোভিত করা

(৪) উক্ত মূর্ত্তি বা দ্রব্য বা পশুটীকে খাদ্য এবং পানীয় অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা।

কিন্তু প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতবর্ষে যেভাবে শৃগালগণের অর্চ্চনা করা হয়, তাহাতে ঠিক ঐভাবে উপরোক্ত প্রথম তিনটী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। সুতরাং এই অর্চ্চনাকে ঠিক 'পূজা' বলা চলে না, উহা কেবলমাত্র বলি ভোগ দ্বারা শৃগালগণকে সন্তুষ্ট করা।

* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের *The Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

এ স্থলে বলা উচিত যে অযোধ্যার অন্তর্গত বাহ্‌রাইন জেলায় মলামৎ সাহ্‌ নামক জনৈক মুসলমান পীরের সমাধি মন্দির আছে। তত্রত্য লোকেরা এই পীরকে অতিশয় ভক্তির সহিত সম্মান করিয়া থাকে। এই সমাধি-মন্দিরের সংরক্ষক সন্ধ্যার সময় এক প্রকার অদ্ভুত চীৎকার করিয়া শৃগালগণকে আহ্বান করে। ঐ চীৎকার শুনিয়া শৃগালরা উক্ত সমাধি-মন্দিরে সমবেত হয় এবং তথায় যে 'সিন্নি' অথবা খাদ্য প্রদত্ত হয়, তাহার যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেই অবশিষ্টাংশ উক্ত শৃগালগণ ভক্ষণ করে। কিন্তু যে সকল 'সিন্নি' বা খাদ্যভোগ অকৃত্রিম ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এবং গুপ্তভাবে প্রদত্ত হয় কেবলমাত্র সেই 'সিন্নি'ই শৃগালগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাই ঐ পশুগণের বিশেষত্ব। কথিত হয় যে একটী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাঘ্র প্রতিবৎসর বাহ্‌রাইন হইতে এই সমাধি-মন্দিরে আসিয়া থাকে।*

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

শ্রীসুবোধকুমার মিত্র

খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে বর্ত্তমান এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত মিলেটস্ নামক একটী নগরে থেলস্ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে মিলেটস্ নগরী একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রীক্ উপনিবেশ ছিল। থেলসের পূর্ব্বপুরুষগণ ফনিসিয়ান জাতীয়। হালিস নদীর বাঁধনির্ম্মাণের জন্য থেলস্ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার লবণ এবং তৈলের ব্যবসায়ও ছিল। মিশর দেশ পরিদর্শন করিতে যাইয়া তিনি তত্রত্য পৌরহিত্য বিদ্যার জ্ঞানও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ এবং জ্যামিতির অধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন। তিনি গ্রহণের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। খৃঃ পূঃ ৫৮৫ অব্দে যে গ্রহণ হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং এজন্য তিনি তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম জগতে প্রচার করেন যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয় এবং চন্দ্রসূর্য্য হইতে আলোক আসে। গণিতবিদ্যায় থেলস্ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পাদদেশের কোণ দুইটী সমান হয়, দুইটী সরলরেখা পরস্পরকে কাটিয়া গেলে বিপরীত কোণগুলি সমান হয়, একটী বৃত্ত তাহার ব্যাস দ্বারা সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়, একটী বৃত্তার্দ্ধের মধ্যে ত্রিভুজ আঁকিলে ঐ ত্রিভুজের একটী কোণ সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রাথমিক জ্যামিতির কতকগুলি উপপাদ্য তাঁহার উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত হইয়া

* W Crooke প্রণীত *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) নামক ইংরাজী গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

থাকে। কোন বস্তুর ছায়া দেখিয়া তিনি ঐ বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করিতে পারিতেন। একটী ত্রিভুজের তিনটী কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান—এই উপপাদ্যটী কোন কোন ঐতিহাসিক থেলসের উদ্ভাবিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ছায়ার সাহায্যে বস্তুর উচ্চতা পরিমাপ বিষয়ের তত্ত্ব অবলম্বনে তাঁহার এক ছাত্র আনাক্সিমাণ্ডার (Anaximander) গ্রীসে প্রথমে সূর্য্য ঘড়ির প্রচলন করেন।

থেলসের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য হইলেও গ্রীসের সহিত মিশরের তুলনায় গ্রীক্ জাতিসম্ভূত থেলসের উদ্ভাবিত গণিতের ফলগুলির জ্ঞান আমাদের সাহায্য করে কম না। মিশরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু কার্য্যের উপর, সুতরাং বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্পাদন করিতে যাইয়া কোন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিলেও মিশরবাসীদিগের দৃষ্টি সতত কার্য্য-কারিতার উপর নিবদ্ধ থাকায় উদ্ভাবনগুলি কতকগুলি অসংবদ্ধ ঘটনা ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা লাভ করে নাই। গ্রীক্‌দিগের কিন্তু প্রথম হইতেই ঝোঁক ছিল ঘটনাবলী দেখিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা, তাহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ আবিষ্কার করা এবং উহা হইতে অনুমান সাহায্যে বিশেষ কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা। থেলসকে যে সকল তত্ত্বের উদ্ভাবক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ সকল তত্ত্বসংশ্লিষ্ট ঘটনার অধিকাংশই মিশরবাসীদিগের জানা ছিল, কিন্তু মিশরবাসীদিগের নিকট ছিল উহারা নিতান্তই কতকগুলি ঘটনা আর গ্রীক্‌দিগের নিকট এগুলি জ্যামিতিশাস্ত্রের অপূর্ব্ব শ্রিকাশের সূত্রপাত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

মাইলেসিয়ান দার্শনিকদিগের বিশ্ব সম্বন্ধীয় ধারণা অতীব বিচিত্র। থেলসের মতে পৃথিবী একখানি গোলাকার থালার ন্যায় এবং ইহা বিশ্বব্যাপী জলরাশির উপর ভাসমান রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের আদি ও মূল বস্তু জল। তুষার ও বরফ সহজেই জলে পরিণত হয়, প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহার মধ্যেই অন্তর্হিত হয়, সমুদ্রের ও স্থলদেশের জল সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে নিরেট পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। জল শুষ্ক হইয়া বাষ্প হয়, এবং জলরাশির আলোড়নে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। খৃঃ পূঃ ৬১১ অব্দে মিলেটসে আনাক্সি-মাণ্ডারের জন্ম হয়। তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে জল এবং বায়ুর মধ্যবর্ত্তী কোন এক আদি বস্তু হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। তাঁহার বিশ্বাস পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ইহা পরিধির সকল অংশের সহিত একই সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেইজন্যই পৃথিবীর কখনও কাহারও দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার আসক্তি নাই। যে সকল গ্রীক্ নাবিক মিলেটস্থে আসিত তাহাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি পৃথিবীর একটী মানচিত্র প্রস্তুত করেন।

আর একজন গ্রীক্ পণ্ডিত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেটসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে আকাশের গাত্রে নক্ষত্রসকল গ্রথিত এবং অন্তকালে তাহারা পৃথিবীর পশ্চাতে চলিয়া যায়। তিনি বলেন সৃষ্টির আদি কারণ বায়ু, জল নয়, এবং এই বায়ুর

সঙ্কোচন ও বিরলতা হইতেই অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড গতি হইতেই সূর্য্যের উত্তাপের উদ্ভব। নক্ষত্রসকল পৃথিবী হইতে বহু বহু যোজন দূরে আছে বলিয়া তাহাদের উত্তাপ আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না। ইঁহাদের পরে গ্রীক্‌দিগের ইটালীয় উপনিবেশে আরও উচ্চতর জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়াছিল। পিথাগোরস জ্যামিতিকে প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত করেন এবং উহার উপপাদ্যগুলির তত্ত্ব অধিকতর বুদ্ধির সহিত এবং অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেন। মিশরের পুরোহিতসম্প্রদায় গণিতশাস্ত্রের মূল উপাদান জ্যামিতিঘটিত ব্যাপারগুলি জানিতেন, কিন্তু থেলস্ উহাদিগকে গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্যে প্রয়োগ করিলেন এবং পিথাগোরস উহা হইতে একটী প্রকৃত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ভিত্তি গড়িয়া তুলিলেন। পিথাগোরস হইতেই নামে এবং কার্য্যে প্রকৃত গণিত-শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। পিথাগোরস দক্ষিণ ইটালীতে একটী সম্প্রদায় গঠিত করেন, এই সম্প্রদায় একটী গুপ্ত সমিতির মত ছিল এবং ইহার মধ্যে রাজনীতিও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। রাজনীতির সহিত সংস্রব থাকাতে ইহার সভ্যগণের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং ফলে সম্প্রদায়টী ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার জীবনের এবং কার্য্যাবলীর এই সামান্য দুইএকটী ঘটনা ব্যতীত আমরা পিথাগোরস সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু জানিনা। এমন কি তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধেও নানা সন্দেহ আছে। মিলেটসের নিকটবর্ত্তী সামস নামক একটী দ্বীপে পিথাগোরসের জন্ম হয়। একবার মিশর দেশে ভ্রমণকালে তিনি মিশরীয় ভাবধারা দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি বাবিলনও ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু সে বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। পিথাগোরস-সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে যাবতীয় নূতন আবিষ্কার সম্প্রদায়ের গুরুর উপর আরোপ করা হইত। অবশ্য "পিথাগোরস থিয়রেম" বলিতে যে সম্পাদ্যটী আমরা বুঝি, খুব সম্ভবতঃ তাহা পিথাগোরসের নিজেরই রচিত। সমকোণযুক্ত বহুভুজ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। দেখা যায় পিথাগোরস সঙ্গীতবিদ্যা এবং জ্যামিতির সম্পর্কে সংখ্যার মূলসূত্র (theory of numbers) আলোচনায়ও মনোযোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ওজন এবং পরিমাপ প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন।

পিথাগোরস কর্ত্তৃক পাটীগণিত, সঙ্গীত, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষ—এই চারিটী শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই শ্রেণীবিভাগ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পাটীগণিত এবং জ্যামিতিকে সঙ্গীতবিদ্যা হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইত, উপরন্তু গণনাবিদ্যা হইতেও উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া ধরা হইত। গ্রীক্ পাটীগণিতের উদ্দেশ্য সাধারণ গণনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। বিশুদ্ধ পাটীগণিত বা সংখ্যাবিদ্যায় পিথাগোরস-সম্প্রদায় কতক-গুলি প্রমাণোক্তি (dicta) রচনা করিয়াছিলেন, যেমন—"এক হইতেই সকল সংখ্যার উৎপত্তি বটে, কিন্তু এক নিজে একটী সংখ্যা নহে।" পিথাগোরস-সম্প্রদায় বীজগণিতের অনেকগুলি জটিল সমস্যা নির্ণয় করেন। পূর্ব্বে বীজগণিতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না,

আধুনিক প্রথার ন্যায় মাত্র "অজ্ঞাত" এবং "জ্ঞাত" সংখ্যা ব্যবহৃত হইত। যুগ্ম এবং অযুগ্ম সংখ্যার বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। তদ্ভিন্ন বর্গশ্রেণী এবং সমান্তর শ্রেঢ়ী (arithmetical progression) ও সমগুণ শ্রেঢ়ী (geometrical progression) তাঁহাদের জানা ছিল। তাঁহারা জানিতেন স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির (natural numbers) অযুগ্ম সংখ্যাগুলি যথাক্রমে যোগ করিয়া গেলে বর্গশ্রেণীর (series of square) গঠিত হয়, যেমন $১+৩=৪=২^{২}$, $১+৩+৫=৯=৩^{২}$, $১+৩+৫+৭=১৬=৪^{২}$ ইত্যাদি। সেইরূপ যুগ্ম সংখ্যাগুলি যথাক্রমে যোগ করিলে অথবা স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির পর পর দুইটী যথাক্রমে গুণ করিলে ২,৬,১২,২০,৩০... এই শ্রেণীটী পাওয়া যায়, যথা :—

২+৪=৬, ২+৪+৬=১২, ২+৪+৬+৮=২০ ইত্যাদি, এবং ২×৩=৬, ৩×৪=১২, ৪×৫=২০ ইত্যাদি। যদি একটী কোণ এবং যথাক্রমে ১,২,৩,৪ পরিমাপের বাহু লইয়া চতুষ্কোণ আঁকা যায়, তাহা হইলে একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের সহিত যে পরিমাণ ক্ষেত্র যোগ করিলে ঊর্দ্ধতন চতুষ্কোণ ক্ষেত্র পাওয়া যায় তাহাকে গ্রীকগণ 'নমন' (gnomon) বলিতেন এবং এই ক্ষেত্রগুলি অযুগ্ম সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইত। যথা—

ইহা গ্রীকদিগের জ্যামিতির সহিত সংখ্যাবাদ মিশাইবার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দুইটী সংখ্যার গুণফল দ্বারা যেমন ক্ষেত্রের পরিসর নির্ণীত হইত, সেইরূপ তিনটী সংখ্যার

গুণফলকে ঘনফল বা আয়তন আখ্যা দেওয়া হইত। পরে পিথাগোরস-সম্প্রদায়ের একজন ঘনপদার্থকে (cube) 'জ্যামিতিক সমঞ্জস' (geometrical harmonic) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—এই আখ্যার মধ্যে গণিত সঙ্গীতের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

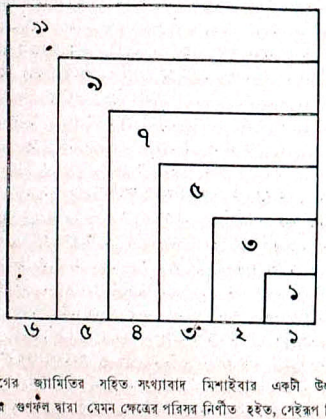

পিথাগোরস-সম্প্রদায় জ্যামিতিতে রেখা, সমতল, কোণ ইত্যাদি মূল প্রাথমিক সংজ্ঞাগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী ক্ষেত্রের উপর আর একটী ক্ষেত্র বসাইয়া জ্যামিতির যে কতকগুলি উপপাদ্য প্রমাণিত হয় সেগুলি পিথাগোরস-সম্প্রদায়ের রচিত বলিয়া কথিত। ঐগুলি হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা ক্ষেত্রের পরিসর মাপিবার প্রণালী অবগত ছিলেন এবং সমান্তরাল সরলরেখার গুণাবলীর সহিত তাঁহাদের সম্যক পরিচয় ছিল।

তাঁহারা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। একটী ত্রিভুজের তিনটী কোণের সমষ্টি যে দুইটী সমকোণের সমষ্টির সমান ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই প্রমাণের পদ্ধতি প্রায় আধুনিক পদ্ধতিরই অনুরূপ। তাঁহাদের ঘন (solid) কোণ সম্বন্ধেও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা জানিতেন যে একটী ঘন (solid) কোণের অন্ততঃ তিনটী ত্রিভুজ ক্ষেত্রের প্রয়োজন। যদি সমভুজ তিনটী ত্রিভুজ একত্র করিয়া এরূপভাবে বসান যায় যে তাহাদের বাহুগুলি একটীর উপর আর একটী পড়িবে, তাহা হইলে যে স্থানে উহাদের তিনটী কোণ একত্রে মিলিত হয় সেই স্থানে ঘন কোণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত তাঁহারা জ্যামিতির বহুভুজবিশিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের সহিতও পরিচিত ছিলেন। মিশরবাসীগণ অবশ্য ঘন (cube) সমভুজী চতুষ্ফলক (regular tetrahedron) এবং সমভুজী অষ্টফলক (octahedron)-এর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু পিথাগোরস-সম্প্রদায় জ্যামিতির আরও অন্যান্য গঠনের আবিষ্কর্ত্তা। সম্ভবতঃ পিথাগোরস মিশরীয় রজ্জুধারীগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া থাকিবেন যে যথাক্রমে ৩,৪ এবং ৫ লম্বা রজ্জু লইয়া একটী ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলে ঐ ত্রিভুজটী একটী সমকোণী (right-angled) ত্রিভুজ হয়। এইজ্ঞান অবলম্বনে অতঃপর সংখ্যাগণনা শিক্ষা হইতে তিনি সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে ৯ এবং ১৬ অর্থাৎ পর পর দুইটী বাহুর বর্গরাশি যোগ করিলে ২৫ অর্থাৎ তৃতীয় বাহুটীর বর্গরাশি হয়। স্বভাবতঃই অন্যান্য সমকোণী ত্রিভুজ ক্ষেত্র অবলম্বনেও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে উপরোক্ত সম্বন্ধ তাহাদের পক্ষেও প্রযোজ্য কিনা। পিথাগোরস তাঁহার উপপাদ্যটী যে কোন্ পদ্ধতিতে প্রমাণ করিয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সমভুজ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রগুলির কর্ণরেখা (diagonal) টানিয়া ক্ষেত্রগুলিকে ছোট ছোট ত্রিভুজে বিভক্ত করিয়া সহজ অঙ্কন প্রথায় তিনি এই উপপাদ্যটী প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই ছোট ছোট ত্রিভুজ ক্ষেত্রগুলির আয়তন সব সমান। মনে হয় সমকোণী ত্রিভুজ ক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐ সাধারণ নিয়মটী এইভাবে গঠিত হইয়াছিল—প্রথমতঃ একটী সমকোণী ত্রিভুজের তিনটী বাহু যথাক্রমে ৩,৪,৫ লইয়া দেখা গেল যে দুটী বাহুর বর্গরাশির সমষ্টি তৃতীয় বাহুটীর বর্গরাশির সমান। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা দ্বারা

দেখা গেল যে এই নিয়মটী সকল আকারের সমকোণী ত্রিভুজ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং তৃতীয়তঃ ইহা হইতে সমকোণী ত্রিভুজ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম গঠিত হইল।

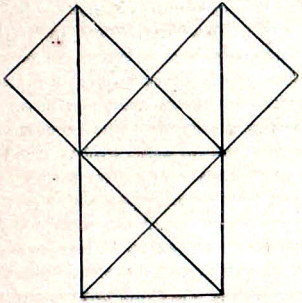

সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রাদির নিয়মিত গতিবিধি, সঙ্গীতের তানলয় ইত্যাদি নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল ব্যাপারেই সংখ্যার উপর বিশেষ অর্থ আরোপ করা পিথাগোরস-সম্প্রদায়ের মূল নীতি ছিল। কথিত আছে একদিন পিথাগোরস কিরূপে সুর গণনা করা যায় তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। সহসা একটী কামারশালার নিকট দিয়া যাইবার কালে কামারের হাতুড়ির বার বার আঘাতে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন যে ঠিক নিয়মিত সময় অন্তর হাতুড়ির আঘাতগুলির সহিত সঙ্গীতের তালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে কম্পমান তন্ত্রীর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করিলে তাহা হইতে বিভিন্ন সুর নির্গত হয়। এই সকল পরীক্ষার জন্য তিনি 'একতারা' বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন। কথিত আছে পদার্থবিজ্ঞানের উহাই প্রথম যন্ত্র।

বিবিধ

সুসংবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বিগত একশত বৎসরে জগতের রূপ আশ্চর্য্যরকমে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত নূতন ভাবধারার আমদানি হইয়াছে, গবেষণা ও পরিমাপ-প্রণালীর উন্নতি সাধিত হওয়ায় এত অধিক তথ্যসংগৃহীত হইয়াছে যে আজিকার জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পুঞ্জীভূত তত্ত্বগুলি অনুধাবন করিয়া উঠা দুঃসাধ্য। জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন নিত্য নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, সমাজ-জীবনে তেমনি নূতন নূতন ভাবধারার প্রচলনে এক চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল পূর্ব্বেও সমাজের তদানীন্তন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিভাবকগণ তাঁহাদের অধীনস্থ তরুণ যুবকযুবতীদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী কোন না কোন কাজের জন্য গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় সেরূপ করিতে গেলে অনেক সময় নিরাশ হইতে হয়। চতুর্দ্দিকের এই জটিল অবস্থার মধ্যে নানাপ্রকার মত ও পথের সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া নানা প্রকৃতির লোক জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। একই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ, সহস্র রকমের বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের পথ সত্য সত্যই যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কিভাবে আপামরজনসাধারণের মধ্যে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের প্রচার করা যাইতে পারে, জগতের অনেক মনীষী বর্ত্তমানে তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া যাহাতে জনসমাজের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাও যুগে যুগে একেবারে না হইয়াছে এমন নহে। এ সমস্ত পুস্তক 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে এরূপ 'এনসাইক্লোপিডিয়া' রচনার চেষ্টা প্রায় ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সিস বেকন প্রভৃতিও বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যসমূহ এরূপভাবে একত্রে সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ডিডারট (Diderot), দা এলেম্বার্ট (D' Alembert) প্রভৃতির এরূপ গ্রন্থ রচনার মূলে বেকনের প্রেরণা কম ছিল না। ফ্রান্সেও এরূপ গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং 'ফরাসী এনসাইক্লোপিডিয়া' উক্ত দেশের শিক্ষোন্নতির পথে কম সাহায্য করে নাই। 'রিফর্ম্ম বিল' যে যুগে পাশ হয়, সে সময় পুনরায় জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাবধারা প্রচারের এক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় এবং তাহারই ফলে 'পেনি সাইক্লোপিডিয়া'র জন্ম।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যেরূপ দ্রুত প্রসার হইতেছে, তাহাতে আধুনিক যুগোপযোগী এরূপ 'এনসাইক্লোপিডিয়া' গ্রন্থ প্রস্তুতের আশু প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে। সুবিখ্যাত মনীষী এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ সম্প্রতি এরূপ একটি গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা দিয়াছেন। পৃথিবীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তথ্যরাশি হইতে প্রকৃত জ্ঞানসংগ্রহ ও গ্রথিত করিয়া একখানা 'ওয়ার্ল্ড্ এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রস্তুত করিবার এই মৌলিক পরিকল্পনা উক্ত মনীষীর অনন্যসাধারণ প্রতিভারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তিনি বলেন প্রতি বিষয়ের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা লিখিত সে সমস্ত বিষয় পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলে যে অমূল্য গ্রন্থ সৃষ্টি হইবে, তাহা জগতের চিন্তাক্ষেত্রে এক অপরিমেয় সুসংবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। তিনি বলেন—"This World Encyclopaedia should be the mental back-ground of every intelligent man in the world. It should be alive and growing and changing continually under revision, extension and replacement from the original thinkers in the world everywhere. Every University and research institution should be feeding it." এই গ্রন্থ রচনার আদর্শ অতি উচ্চ হইলেও এই আদর্শে পৌছান একেবারে অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যার সহিত সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ মনীষিবৃন্দের সহযোগিতায় এরূপ গ্রন্থ রচিত হইলে আদর্শ সফল হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে বিশ্বের পরম উপকার সাধিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মনে হয় এইরূপ 'ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপিডিয়া' তিনটি বিভিন্ন ভাগে রচিত হইলে তাহা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। উহার এক প্রস্থ গ্রন্থ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা-নিরত কর্ম্মী ও বিশেষজ্ঞগণের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লিখিত হওয়া আবশ্যক। অপর ভাগ আপামরজনসাধারণের বোধগম্য সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের এরূপ একটি বিবরণী (bibliography) থাকা দরকার, যাহা একাধারে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে। এইচ, জি, ওয়েল্‌সের পরিকল্পনানুযায়ী এরূপ বিরাট ও নিখুঁত গ্রন্থ রচিত হইলে তাহার মূল্য সমাজ-জীবনেও কম হইবে না। জগতের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংস্থাপিত সম্পর্কস্থাপন দ্বারা মানবজীবনের বহু সমস্যার সমাধানেও উহা কম সহায়ক হইবে না। ওয়েল্‌স্ বিশেষ জোরের সহিত বলেন,—"Without a World Encyclopaedia to hold men's minds together in something like a common interpretation of reality, there is no hope whatever of anything but an accidental and transitory alleviation

of any of our world troubles. As mankind is, so it will remain, until it pulls its mind together. And if it does not pull its mind together then I do not see how it can help but decline."

পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেটের নূতন ব্যবহার

পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগ সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে (oxidising agent)। উহার সংগঠনে অক্সিজেনের অনুপাত বেশী থাকায় উহা সহজেই অন্য পদার্থকে তাহার খানিক পরিমাণ অক্সিজেন বিলাইয়া দিতে সমর্থ হয়। জমির মধ্যে 'হিউমাস্' নামে একরূপ সার পদার্থ রহিয়াছে। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির উহা একটি প্রধান সহায়। তবে 'হিউমাস্' (humus)-এর দ্বারা কোনরূপ কাজ পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহা যাহাতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে (decompose) তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াও আবার নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় সাধিত হইলেই জমির উর্ব্বরতাসাধনে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। 'হিউমাস্'-এর সহিত অক্সিজেনের সংযোগসাধন করাইয়া প্রয়োজনানুরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নিমিত্ত পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট ব্যবহার করা চলে কি না কিছুদিন যাবৎ এরূপ একটা প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচিত হইতেছিল। 'রয়াল হর্টিকালচারেল সোসাইটি' এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া সম্প্রতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ কাজে পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট দ্বারা বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। প্রতি এক গ্যালন জলে এক আউন্সের ৮ ভাগের এক ভাগ পরিমিত পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া সেই জল ঘাসের উপর সিঞ্চন করিয়া দেখা যায় উহাতে ঘাসের বৃদ্ধিও যেমন ভাল হয়, উহার সবুজ আভাও তেমনি বাড়িয়া থাকে। তদুপরি ঘাসের মধ্যে 'চাটা' প্রভৃতি কীট বা শেওলা (moss) থাকিলে তাহাও ইহা দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই প্রণালীতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি

গৃহস্থ ঘরের ব্যবহারোপযোগী এক নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তাহাদের প্রচলন সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত বাতির 'বাল্‌ব' ৮০ এবং ১২৫ 'ওয়াটের' হইবে এবং উহাতে কোনরূপ 'ফিলামেণ্ট' থাকিবে না। উহা অনেকটা 'ডিস্‌চার্জ্জ বাল্‌বের' (discharge bulb) ন্যায় হইবে। ২৩০ ভোল্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত উহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষিত হইবে এবং প্রত্যেক বাল্‌বের অভ্যন্তর ভাগে কোয়ার্টজনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র ডিস্‌চার্জ্জ বাতি

বসান থাকিবে। এই বাতির ভিতরটা পারদ বাষ্প (mercury vapour) দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। এরূপ বাতি সুইচ টিপিয়া দেওয়া মাত্রই জ্বলিয়া উঠিবে না। উহার আলোকের বিকাশ হইতে একটু সময় লাগিবে। যখন উহা জ্বলিয়া উঠিবে তখন দেখা যাইবে, এরূপ উজ্জ্বল শুভ্র আলো বর্ত্তমানের সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্‌ব হইতে কখনও পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে পারদ বাষ্পভরা ক্ষুদ্র ডিসচার্জ্জ বাতিটিকে ঘিরিয়া যে বালব বিরাজ করে, তাহার অভ্যন্তর ভাগের উপরে স্বদীপক (fluorescent) গুণবিশিষ্ট একপ্রকার পদার্থের একটা প্রলেপ দেওয়া থাকিবে। পারদ বাষ্প দ্বারা যে সকল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতে পারে না, এই ব্যবস্থার দ্বারা তাহা বিশেষভাবে সংশোধিত হইয়া থাকে এবং সকল প্রকার আলোকরশ্মি মিশিয়া এরূপ শুভ্র আলোর উৎপত্তি সম্ভবপর করিয়া তুলে। এইরূপ নূতন ধরণের বাতি প্রচলন দ্বারা বৈদ্যুতিক আলোর ইতিহাসে যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোটরগাড়ী নির্ম্মাণে গোল আলুর ব্যবহার

গোল আলুর মধ্যে জলের পরিমাণ খুব বেশী। তাই গলিত ধাতুর শোধনকার্য্যে উহার ব্যবহারে আশ্চর্য্যজনক ফল লাভ করা যায়। ফোর্ড কোম্পানী তাহাদের কারখানায় শ্বেত ধাতুর (white metal) স্ফুটনার্থে বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণ গোল আলু ব্যবহার করিয়া থাকেন। গোল আলু একটি দণ্ডের মাথায় বাঁধিয়া দিয়া উত্তপ্ত ধাতু মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যায় উহাতে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। ধাতুমধ্যস্থিত ময়লাসমূহ (impurities) নির্গত হইয়া উপরিভাগে যাহাতে উঠিতে পারে, তজ্জন্য এরূপ বুদ্বুদ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। আলুর সংগঠনে জলের ভাগ খুব বেশী; উহা গলিত ধাতুর মধ্যে ক্ষুদ্র রকমের প্রজ্বলন (explosion) সৃষ্টি করিয়া ধাতুর শোধনকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে এবং ধাতুর ময়লাগুলিকে বাহির করিয়া আনে। যে গোল আলুকে আমরা খাদ্য বলিয়াই বিশেষভাবে জানিতাম, তাহার এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় উহার চাহিদা অবশ্যই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

পিকিনে আবার নরকপাল প্রাপ্তি

চীনদেশের অন্তর্গত পিকিনের নিকটবর্ত্তী চৌকৌতিয়নের (Choukoution) প্রকৃতগুহায় নরকপাল আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে বৈজ্ঞানিক মহলে উহা লইয়া বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত *Sinanthropus pekinensis*-এর আরও পাঁচটি নরকপাল (skulls) পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে সমস্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অনেকটা অল্পবয়স্ক লোকের কঙ্কাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এবারের কঙ্কাল তেমন নহে। উহা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের মানুষের কঙ্কাল বলিয়া

বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সমস্ত কঙ্কালে আদিম মানুষের মুখের অনেক অংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে প্রাপ্ত কঙ্কাল হইতে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমানের কঙ্কাল সম্পর্কিত জ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইলে আদিম মানুষ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত সিনোজয়িক রিসার্চ্চ লেবরেটরীর (Caenozoic) অধ্যক্ষ এফ, উইডেনরিক্ (Weidenreich) পিকিনে নরকপালের প্রথম আবিষ্কারের পর হইতেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন যে পিকিনের এই মানুষ যবদ্বীপে আবিষ্কৃত 'পিথেকানথ্রপাস্' এবং 'নিয়েনডারথেল' মানবের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। পিকিনে পর পর যে কয়টি নরকপালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে অধ্যাপক উইডেনরিকের অভিমতই সমর্থিত হইবে বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক উইডেনরিক্ যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা আশা করি উহাতে তিনি সকলের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

অগ্নিসহ কাঠ ও কাগজ

সাধারণ কাঠ, ওয়ালবোর্ড, কাগজ প্রভৃতি যাহাতে অগ্নিসহ (fireproof) করা যায়, সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্ত্তৃক তাহার এক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কাঠ প্রভৃতিকে এরূপভাবে অগ্নির হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার গঠন-মূলে রহিয়াছে 'মনএমোনিয়ম ফসফেট' (monammonium phosphate); এই পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হওয়ার উপরেই সমস্ত গুণ নির্ভর করে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঠ প্রভৃতি অগ্নির হাত হইতে কতটা রক্ষিত হইতে পারে, সম্প্রতি তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ব্রিটীশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন্ কর্ত্তৃক অগ্নিসহ পদার্থের যে মান নির্ণীত হইয়াছে, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেইরূপ মান রক্ষা করাও সম্ভবপর হইবে বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, আগুন লাগিলে ঘরের চৌকাঠ, কবাট প্রভৃতি কাঠের জিনিষই প্রথমতঃ আগুনের ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। সুতরাং কাঠ প্রভৃতির এরূপ দাহ্য গুণ হ্রাস করিয়া যাহাতে অগ্নিদাহের শঙ্কা নিবারণ করা যায়, তজ্জন্য নানাবিধ পরীক্ষাকার্য্য অনেক দিন যাবৎ চলিতেছে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থটি কাঠের জিনিষে মাখাইয়া দিলে কাঠে যেমন আগুন ধরিতে পারে না, তেমনি রাসায়নিক দ্রব্যটি আগুনের আঁচে এমন কোন পদার্থে বিশ্লিষ্টও হয় না যাহা আবার প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে।

কাগজপত্র অগ্নিসহ করিতে হইলে কাগজ প্রস্তুত করিবার সময়েই ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটি তরল অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য কাগজ প্রস্তুতের পরেও উহা

ব্যবহার করিয়া কাগজকে অগ্নিসহ করা যায়। এই প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে কাগজনির্ম্মিত লণ্ঠন, ঝাড় প্রভৃতিও ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে। কাঠ প্রভৃতির ব্যবহারোপযোগিতাও যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কচুরিপানা হইতে রাসায়নিক দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা

কচুরিপানার যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি (প্রকৃতি, হেমন্ত সংখ্যা, ১৩৪২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ কে. সেন কচুরিপানার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের রাসায়ন-শাখা কর্ত্তৃক কচুরিপানা হইতে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ পানা হইতে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত হইতে পারে। কচুরিপানা শোধন করিলে উহার উদ্বায়ী অংশ হইতে ফারফিউরাল (furfural), এসেটিক এসিড, এসিটোন এবং সুরাসার প্রভৃতি পাওয়া যায়। অবশিষ্টাংশ (residue) হইতে পোটাসিয়ম ক্লোরাইড, এবং অল্প পরিমাণ গাঁজনশীল (fermentable) শর্করাও উদ্ধার করা সম্ভবপর। উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত হইবার পরেও কচুরিপানার যে শাঁস বা তন্তুগুলি পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে জলসিক্ত করিয়া এবং পেষণ করিয়া চাপের প্রভাবে তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই সমস্ত জিনিষ পালিশ করিলে খুব চক্‌চকে হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ কচুরিপানার আরও বহুবিধ ব্যবহারপ্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। আমাদের দেশে ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে কচুরিপানা যে ভাবে অধিবাসিগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাতে উহার যথোপযুক্ত ব্যবহারপ্রণালী আবিষ্কৃত হইলে জনসাধারণ উহার অত্যাচারের হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইবে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আইন করিয়া কচুরিপানা জল হইতে তুলিয়া ধ্বংস করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদিগকে বাধ্য করা হয়। কচুরিপানা হইতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করা সুবিধাজনক হইলে এইরূপ উত্তোলনের কাজেও তাহা প্রেরণা জাগাইবে বলিয়া মনে হয়। কচুরিপানা হইতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানাসমূহে পানা সরবরাহ করিবার জন্য যে প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে, তাহাতে দেশের খালবিলসমূহও এই পানার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

রঙীন এলুমিনিয়ম

এলুমিনিয়ম ধাতুটিকে বিভিন্ন রং-এ রঞ্জিত করিবার প্রচেষ্টা আজকাল অনেক দেশে দৃষ্ট হয়। বার্ম্মিংহাম্ নগরের একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এরূপ কাজে বিশেষভাবে

আত্মনিয়োগ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে যে বৈদ্যুতিক প্রণালীতে এলুমিনিয়ম রং করা হইতেছে, তাহা ক্রোমিয়ম প্লেটিং করার ন্যায় এলুমিনিয়ম দেহে শুধু অস্থায়ী রং-এর প্রলেপ বুলায় না, পরন্তু উহাতে যে পাকা ও স্থায়ী রং হয়, তাহা আলো বা তাপ কোন কিছুর প্রভাবেই মলিন হয় না। যে রং ব্যবহৃত হয় দেখা গিয়াছে উহা এলুমিনিয়ম ধাতুর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায়। এরূপ রঞ্জিত এলুমিনিয়ম ৫০০ ভোল্ট পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহ রোধ (insulated against) করিতে পারে এবং কখনও উহাতে মরিচা পড়ে না।

আইনষ্টাইনের নূতন আবিষ্কার

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন আবার এক নূতন আবিষ্কারের কথা জগৎকে শুনাইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশ্বজগৎকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আবার গণিতের জটিল তথ্যাদি হইতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, নূতন একরূপ তরঙ্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোড়িত করিয়া থাকে। তিনি এই তরঙ্গের নাম দিয়াছেন, gravitational বা মাধ্যাকর্ষী তরঙ্গ। বিরাট ব্যোমে ইহাদের উৎপত্তি; ইহারাই ধূমকেতু, গ্রহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে ও উহাদের কক্ষচ্যুতি ঘটাইয়া থাকে। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কার হইতে মনে হয়, পৃথিবীর ন্যায় সুবৃহৎ জড়-দেহগুলি হইতে একরূপ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই আলোড়ন তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই মাধ্যাকর্ষী তরঙ্গ। এইরূপ তরঙ্গের গতি আলোকের গতিবেগের সমান, প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। আইনষ্টাইন নিজে মনে করেন, এরূপ আবিষ্কারের মধ্যে চাঞ্চল্যকর তেমন কিছুই নাই। জ্যোতিষ্কিদ্‌গণের সুবিধার্থে এবং তাঁহার আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ বা সাম্যবাদের সমর্থনের নিমিত্তই তিনি এইরূপ তরঙ্গের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

মেষের পশম ছাড়াইবার অভিনব উপায়

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় থেলিয়ম মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ গ্রহণ করিলে চুল উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে মেষের পশম না ছাঁটিয়া উপরোক্ত ঔষধের সাহায্যে ছাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই মেষের দেহের পশমগুলি আল্‌গা হইয়া যায় এবং পরে হস্ত দ্বারা সহজেই ঐ সমস্ত পশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার অধ্যাপক এন, এ, ইলজিন সম্প্রতি এই সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। যে সমস্ত ভেড়ার দেহ মোটা ও সরু নানাবিধ পশমে আচ্ছাদিত থাকে, দেখা যায় বৎসরে একবার করিয়া তাহাদের দেহে গায়ের লোম ঝড়িয়া পড়িবার মত একরূপ স্বাভাবিক রস বা মাল্ট-এর (moult)

উৎপত্তি ঘটে। মেরিণো প্রভৃতি সূক্ষ্ম পশমবিশিষ্ট মেষের এরূপ মোল্ট উৎপাদিত হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সঙ্কর জাতীয় ভেড়ায় পশমত্যাগের অনুকূল এরূপ স্বাভাবিক রস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। খেলিয়ম ব্যবহারে মেরিণো জাতীয় মেষে কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত মেষে উপরোক্তরূপ স্বাভাবিক মোল্ট উৎপন্ন হয় না, তাহাতেও পশমত্যাগের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন পশুশালায় উক্ত উপায়ে মেষের পশম ছাড়াইবার জন্য বহু পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। তবে পরীক্ষার সময় অধিক মাত্রায় খেলিয়ম ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে মেষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সুতরাং পশম ছাড়াইবার নিমিত্ত এই প্রণালী ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইবার পূর্বে ঔষধের ঠিক মাত্রা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন।

বিমানপোত নির্ম্মাণে মিশ্রিত ম্যাগনেসিয়ম ব্যবহার

বিমানপোত নির্ম্মাণকালে উহা যত হাল্কা হয় তৎপ্রতি নির্ম্মাতাগণ বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ফলে এরূপ কাজের জন্য এলুমিনিয়ম অপেক্ষাও হাল্কা ধাতুর সন্ধান হইতেছে। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীতে এ সম্পর্কে যে সমস্ত পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে, উক্ত লেবরেটরীর ধাতুবিদ্যা বিভাগের সুপরিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ সি, এইচ, ডেস্ (Desch) বিগত জানুয়ারী মাসে রয়াল এরোনটিকাল সোসাইটির এক সভায় তাহা বর্ণনা করেন। পরীক্ষায় দেখা যায় ম্যাগনেসিয়ম খুব হাল্কা হইলেও উহা তত দৃঢ় নহে। কিন্তু অন্য কয়েকটি ধাতুর সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া লইলে বিমানপোত নির্ম্মাণে ঐরূপ মিশ্রিত ধাতু বেশ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ম্যাগনেসিয়মের সহিত এলুমিনিয়ম এবং ক্যাডমিয়মের সংযোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুফল লাভ হয়। অল্প পরিমাণে এরূপ মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত করিতে ক্যালসিয়ম, সিরিয়ম, নিকেল, কোবাল্ট এবং ম্যাঙ্গানিজও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ ডেস্ বলেন ম্যাগনেসিয়ম মিশ্রিত এরূপ ধাতু প্রস্তুত করা তেমন কঠিন নহে, কারণ গলিত ম্যাগনেসিয়মে অধিক গ্যাস দ্রবীভূত হয় না, ফলে সমস্ত মিশ্রিত পদার্থটি জমাট বাঁধিবার সময় গ্যাস উবিয়া গিয়া উহা তেমন রন্ধ্রবহুল (porous) হয় না। শুধু ময়লা কাটিয়া লইবার জন্য উপযুক্তরূপ দ্রাবক ইন্ধন (flux) ব্যবহার করিতে হয় এবং তরল অবস্থায় ঢালিবার সময় যাহাতে উহা বায়ুর সম্পর্কে তেমন আসিতে না পারে তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ম্যাগনেসিয়ম মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মাণের বিবিধ কৌশল বর্ত্তমানে বেশ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ মিশ্রিত ধাতু নির্ম্মাণে সামান্য পরিমাণ রৌপ্য ব্যবহার করিলে খরচ একটু অধিক পড়িলেও তাহাতে যে ধাতুর উদ্ভব ঘটে, বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতে সূর্য্যরশ্মিবিকীরণ সম্পর্কে গবেষণা

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যের কি পরিমাণ আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কলিকাতায় বিকীর্ণ হয় এবং জীববিজ্ঞানের দিক হইতে এরূপ বিকীর্ণ রশ্মি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, এতৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ এ, সি, উকীল, অধ্যাপক পি, এন, ঘোষ, মিঃ এম, কে, সেন তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ ফল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের মুখপত্রে প্রকাশিত করেন। উহারা এ সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্য করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় কলিকাতায় সূর্য্যালোকের জীববিজ্ঞাননমত কার্য্যকরী আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির তীব্রতা জুন মাসে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যদিও জুলাই মাসে উহার সর্ব্বোচ্চ তীব্রতা দেখা যায়। মে মাসে এবং জুলাই মাসে উহার তীব্রতা দ্রুত হ্রাস পাইয়া থাকে। মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তীব্রতা কম দেখা যায়। মে হইতে সেপ্টেম্বর মাসের অপরাহ্ন সময়ে এরূপ রশ্মির তীব্রতা প্রাতঃকালের তুলনায় অধিক হইয়া থাকে। শীতকালের সকালবেলায় আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তীব্রতা-হ্রাস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্যালোকের এই কার্য্যকরী রশ্মির তীব্রতা ভারতের কোথায় কিরূপ, বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনায় তাহার পরিমাপ বিশেষভাবে প্রয়োজন। উপরোক্ত গবেষকগণ তাঁহাদের আলোচ্য গবেষণায় এ বিষয়ের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

নোবেল পুরস্কার বিতরণে জার্ম্মাণির অসন্তোষ

গত বৎসরের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার হের ফন্ ওসিয়েট্‌স্‌কিকে (Herr. von Ossietzky) দেওয়ার ফলে জার্ম্মাণির রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলার বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ওসিয়েট্‌স্‌কি নোবেল কমিটি কর্ত্তৃক শান্তিবাদী বলিয়া বিবেচিত হইলেও জার্ম্মাণির প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া তিনি জার্ম্মাণির রাষ্ট্রকর্ণধারগণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছেন। এই কারণেই নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তে হের হিটলার সুখী হইতে পারেন নাই। বিগত জানুয়ারী মাসে রিস্‌ট্যাগের নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জার্ম্মাণদিগকে ভবিষ্যতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া এক ফতোয়া জারী করিবার বিষয় উল্লেখ করেন। এইরূপ আদেশ-জারীর ফলে সুইডেনেও একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুইডিস্ নোবেল কমিটি মনে করেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে জার্ম্মাণিরা নিজেরাই বিশ্ববিশ্রুত এক সম্মানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। প্রথম নোবেল পুরস্কার ১৯০১ সালে প্রদত্ত হয়। সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় একচতুর্থাংশ পুরস্কার জার্ম্মাণ নাগরিকগণই লাভ করিয়াছেন। বিগত ১০ বৎসরে একচল্লিশটি পুরস্কারের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে বারটি পুরস্কারলাভের সম্মান জার্ম্মাণগণই পাইয়াছেন। হের হিটলার অবশ্য শিল্পে ও

বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য জাহ্মাণগণকে পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত ১ লক্ষ মার্ক মূল্যের তিনটি বাৎসরিক পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। উহা 'জাহ্মাণ ন্যাশনাল প্রাইজ' বলিয়া অভিহিত হইবে। সে যাহাই হউক, বিশ্বের দরবার হইতে আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া হের হিটলার জাহ্মাণদিগের উপর যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে সকলেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

মদ্যপান ও মোটর দুর্ঘটনা

মদ্যপান করিয়া মোটর গাড়ী পরিচালনার ফলে মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার কথা প্রায়ই শুনা যায়। আমেরিকায় মোটর দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় সেখানে অধিকাংশ স্থলে সুরাপানের ফলেই মোটরচালকগণ এরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইয়া থাকে। অল্প পরিমাণ মদ্যপান করিলেও মোটর চালকের অজ্ঞাতসারেই তাহার মনে খুব জোরে মোটর চালাইবার একটা তীব্র প্রবৃত্তি জন্মে। অতিরিক্ত গতিবেগ-বৃদ্ধিই বেশীর ভাগ মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া জানা যায়। বৈজ্ঞানিক উইড্‌মার্ক (Widmark) প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনে সুরা ও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, যাহাদের দেহমধ্যস্থ রক্তের হাজার ভাগে এক ভাগ করিয়া সুরাসার বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ হইতে ৬৫ জন ব্যক্তিই নেশায় অভিভূত হয়; সুরাসারের পরিমাণ ১·৭ ভাগ হইলে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ হইতে ৮৮ জন ব্যক্তি ঐরূপ অভিভূত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির হাজার ভাগ রক্তে ২ ভাগ পরিমিত সুরাসার থাকে, তাহারা সকলেই নেশার ঝোঁকে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ডাঃ এইচ, এম, ভার্ণন 'সোসাইটি ফর দি ষ্টাডি অব ইনএব্রাইটী' বা সুরাপানজনিত মত্ততাপরীক্ষা পরিষদের এক সভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সুরাপান করিয়া গাড়ী চালানর ফলে যে সমস্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মোটর চালাইবার কয়েক ঘণ্টাকাল পূর্ব্ব হইতেই সুরা পানে বিরত থাকা প্রয়োজন; গাড়ী চালাইবার সময় কোনরূপ মদ্য পান কখনই সঙ্গত নহে। একবার সুরাপান করিলে রক্ত হইতে তাহার ক্রিয়া অপসারিত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। সুতরাং মোটর দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পে গাড়ীচালকদের পান সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের মাছ

কিছু দিন হয় সিঙ্গাপুর র‍্যাফল্‌স্ মিউজিয়ম হইতে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে সিঙ্গাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জলচর প্রাণী সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। উহাতে র‍্যাফল্‌স্ মিউজিয়মে সংগৃহীত কতকগুলি মৎস্যের

নামের তালিকা এবং মলয়-প্রণালী হইতে প্রাপ্ত এগার জাতির (species) নূতন মাছের বর্ণনা রহিয়াছে। এই অঞ্চল লোহিত সাগর, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল এবং পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে এই অঞ্চলের মৎস্যাদি প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করিয়া থাকে। চীনদেশের ও ভারতবর্ষের মৎস্যসমূহ এই স্থলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে ইহাও দেখা যায়, যে সমস্ত মৎস্য এতাবৎকাল শুধু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা হইত, সিঙ্গাপুর ও জহোর প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রনিম্নস্থ শৈলশ্রেণীতে বা খাড়ীতেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রশান্ত সাগরের সঞ্চরণশীল মৎস্যসমূহ সিঙ্গাপুরের নিকট দিয়া প্রত্যাঘাত করিয়া থাকে; ফলে উহার খাড়ী, নালা ও সমুদ্রনিম্নস্থ শৈলভূমি নানা প্রকার মৎস্যাদিতে সমাচ্ছন্ন হয়। উক্ত মিউজিয়ম হইতে প্রকাশিত বিবরণীতে *Crustacea* প্রভৃতি এবং *Grapsidae* বংশীয় সামুদ্রিক কাঁকড়া সম্পর্কেও অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মিঠা জলের মাছের মধ্যে জহোরে প্রাপ্ত *Palæmon* (*Parap.*) *trompi* de Man সম্পর্কে অনেক বিষয় উক্ত বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায়। এযাবৎকাল উহা কেবল বর্ণিওদ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যাইত বলিয়াই মনে করা হইত। *Palæmon pilimanus* de Man যে রকম জলে বাস করে উহাও সেইরূপ জলেই বাস করিয়া থাকে। উহার ডিমগুলি বেশ বড় হয়, এবং সংখ্যায়ও খুব বেশী হয় না। উহার জীবনেতিহাস সম্পর্কে অবশ্য আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ধারা

সুপ্রসিদ্ধ কৃষিবিশেষজ্ঞ স্যার জন রাসেল কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা পরিভ্রমণে আসিলে সায়েন্স এসোসিয়েসনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এই সর্ব্বপ্রথম "জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদক" তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়। এতদুপলক্ষে স্যার জন রাসেল এসোসিয়েসনে যে বক্তৃতা করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া স্যার জন রাসেল বলেন শেষোক্ত বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেশ ও সমাজের কাজে লাগাইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসাধকগণ তেমনই প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেন। উনবিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞানের সংগঠন যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময় বিবিধ প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ বিশ্লেষণের নিমিত্ত নানাবিধ সাধারণ সূত্র, মতবাদ ও নীতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাধারণ কয়টি নিয়মে পরিচালিত হয় বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। এই সমস্ত নিয়মকানুন অতি সরল ছিল এবং সহজেই তাহা বোধগম্য হইত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এমন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল যে উনবিংশ

শতাব্দীতে যে সমস্ত ধারণা বা মতামত প্রচলিত ছিল, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত হইল। পরীক্ষায় দেখা গেল যে উহাদের কতকগুলি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছিলেও উহারা নিছক সত্য নহে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিশেষভাবে সূক্ষ্মদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। নানারূপ পরিমাপ-প্রণালী সম্পর্কে উহা বিশেষ আগ্রহান্বিত। ফলে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় যে জটিলতা আসিয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই হিসাবে অধিকতর সহজ ছিল। যে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠিতে তেমন অসুবিধা হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতিতে ভ্রান্তি-পরিমাণের প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভুলভ্রান্তির আলোচনা হইতে কিভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে স্যার জন রাসেল তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। পূর্ব্বে অনেক ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করিবার প্রণালীও বর্ত্তমানে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। গাণনিকোর সংখ্যা হইতে ফলাফল বিচার করিবার পদ্ধতি আধুনিক যুগে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য একত্র প্রণালী দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধারণায় পৌঁছিতে বৈজ্ঞানিকগণকে গাণনিক্য বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতায় আধুনিক ধরণে পরিচালিত একত্র একটি ষ্ট্যাটিষ্টিকাল লেবরেটরী সংগঠন করিয়াছেন জানিয়া স্যার জন রাসেল বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তরুণ বৈজ্ঞানিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি নানা সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞানের মনীষীদিগের পুস্তকাদি যত্ন সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত মনীষিগণই বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কিভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে হয় তাহার পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সাধনায় চিন্তাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সকলের বোধগম্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক ফলাফলসমূহ প্রকাশ করিতে পারা যায় তৎপ্রতি বিজ্ঞানসেবিগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্যার জন বলেন, অনেক সময়ই দেখা যায় বিজ্ঞানের ছাত্রগণ ভাষা আয়ত্ত করিবার দিকে তেমন মনোযোগী হন না, ফলে নিজের ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এই কারণেও আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান তত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং এজন্য কেবল জনসাধারণের উপর সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ পূর্ব্বেও যেরূপ উজ্জ্বল ছিল, এখনও তাহা তেমনই রহিয়াছে। জ্ঞানভাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা দ্বারা ভবিষ্যতে যেমন অধিকতর আবিষ্কারের পথ সুগম হইবে, তেমনি সমাজের অনেক প্রত্যক্ষ সমস্যারও সমাধান সম্ভবপর হইবে।

পরলোকে দেওয়ান বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার

দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত পালঘাটের লক্ষ্মীনারায়ণপুরমে তাঁহার নিজ বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠ সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। দেওয়ান বাহাদুর জাতিবিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৯২০ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ তাঁহারই গঠিত এবং ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত এই বিভাগ পরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করেন। মহীশূরের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ সম্পর্কে তিনি যে সকল মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ান বাহাদুর আরও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। জাতীয় বিজ্ঞান মহাসভার প্রারম্ভ হইতেই তিনি ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পাঁচ বার তিনি এই মহাসভার নৃতত্ত্ব-শাখার সভাপতিপদে বৃত হন। মহাসভার বিগত অধিবেশনেও তিনি ঐ শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে ডাঃ আয়ার ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হন এবং অক্সফোর্ড, রোম, ফ্লোরেন্স্, বার্লিন, ব্রেস্‌লো, হেল, কলোন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে লণ্ডনে যে নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি যোগদান করেন এবং জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব শাখার অন্যতম সহসভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে দেওয়ান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। জার্ম্মাণির ব্রেস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ বৎসরই তিনি এম-ডি (Hony. Dr. of Medicine) উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর ডাঃ আয়ার ইটালীর অধ্যাপক সিপ্রিয়ানির (Cipriani) সহিত একত্রে কুর্গগণের জাতিবিজ্ঞান সম্পর্কে বিবিধ গবেষণায় নিরত ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু নৃতত্ত্ব গবেষণা পরিষদের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এনথ্রোপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একজন 'করেস্‌পণ্ডিং' সদস্য ছিলেন। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং বাঙ্গালোর একাডেমি অব সায়েন্সের গঠনাবধি তিনি উহাদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এনথ্রোপলজি' নামে যে বৈজ্ঞানিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ডাঃ আয়ার অতি অমায়িক ও সরল স্বভাব ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণের অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। তিনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান। নৃতত্ত্বের অনেক বিষয়ে তাঁহার মতই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইত। দেওয়ান বাহাদুরের মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্র হইতে একজন কৃতী লোকের তিরোধান হইল।

পরলোকে দেবদেব মুখোপাধ্যায়

জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বিভাগের টেক্‌নিক্যাল্ এসিষ্টাণ্ট দেবদেব মুখোপাধ্যায় বিগত ২১শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল। ভারতের উদীয়মান তরুণ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম দেবদেব বাবুর অকাল মৃত্যু বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক। দেবদেব বাবু বাল্যকালে তাঁহার জন্মভূমি খড়দহের স্কুলেই পড়াশুনা করেন। পরে আন্দুল স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজ হইতে প্রাণিবিজ্ঞানে অনার্স সহ বি-এস-সি পাশ করেন এবং ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস-সি পাশ করিবার পর জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বিভাগে অন্যতম সহকারীরূপে কার্য্য গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার অতিশয় আগ্রহ ছিল এবং উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিবার বৎসর কাল মধ্যেই তিনি *Pugheaded* নমুনার Catfish সম্পর্কে তাঁহার প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি নিজে অথবা তাঁহার উন্নতন কর্ম্মচারীগণের সহযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বিবিধ প্রাণী সম্পর্কে বহু গবেষণা করেন।

দেবদেব বাবুর গবেষণাকার্য্যে একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত। তিনি এ পর্য্যন্ত যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় লাভ করা যায়। সম্প্রতি তিনি 'ম্যালেরিয়া সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র ব্যবহারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের মিঠা পানির মাছ সম্পর্কে এক বিবরণী (Bulletin) প্রস্তুতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন বিশিষ্ট তরুণ কর্ম্মীর অভাব হইল। প্রাণিবিজ্ঞান, বিশেষতঃ মৎস্যবিজ্ঞান, যে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের, প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি 'প্রকৃতি'র একজন হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং আজীবন তাঁহার রচিত গবেষণাপূর্ণ ও সুচিন্তিত বাংলা প্রবন্ধাদি 'প্রকৃতি'তে প্রকাশ করিয়া তিনি ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন প্রকৃত স্নেহশীল, বিজ্ঞোৎসাহী অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছি। যিনি দেবদেব বাবুর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা

এই তরুণ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের অকাল মৃত্যু দেশের পরম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন।

প্রকৃতির ত্রয়োদশ বর্ষশেষ

কালস্রোতে আর একটি বর্ষ মিলাইয়া গেল, ভগবানের ইচ্ছায় 'প্রকৃতি' তাহার জীবনের ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একবার আমাদের পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকবর্গকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আগামী বৎসর তাঁহাদের নিকট আরও অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিব এই আশায় আমরা নূতন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লইয়া কার্য্যে ব্রতী হইব।

মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া 'প্রকৃতি' প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন আজ সকলে একবাক্যে তাহা স্বীকার করিতেছেন। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে পদে পদে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। জগতের বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে তাহার কাহিনী বাংলা-ভাষায় প্রচার করিবার নিমিত্ত 'প্রকৃতি' যে সাধনা ও ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে বাঙ্গালী ভাইবোনদের সহযোগিতায় তাহা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক আজ পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনাই করিতেছি।

সংবাদ চয়ন

নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব

আগামী ১২ই মে তারিখে মহামান্য ভারতসম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠানের সহিত লণ্ডন নগরীতে সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও নানারূপ উৎসব আমোদের ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা নব রাজদম্পতিকে তাঁহাদের এই অভিষেক উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে শান্তিতে রাজকার্য্য পরিচালনা করুন ভগবৎচরণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শর্করা শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা

শর্করা শিল্প সম্পর্কে ধারাবাহিক শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত সম্প্রতি কানপুরে 'ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি' নামক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১১ই মার্চ্চ তারিখে রাজকীয় কৃষি-গবেষণা-পরামর্শ-সমিতির সহসভাপতি স্যার ফ্রাঙ্ক নোয়েস উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আগামী জুলাই মাস

হইতে যথারীতি শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি বা এডভাইসরি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। আমরা উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ

সম্প্রতি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একটি নূতন ব্লকের উদ্বোধন হইয়াছে। এই নবনির্ম্মিত ব্লকের নাম বাংলার বর্ত্তমান গবর্ণরের নামানুসারে 'স্যার জন এণ্ডারসন ক্যাজুয়েলটি ব্লক' রাখা হইয়াছে। উহাতে নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিগণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এরূপ একটি 'ব্লক' প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং তদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ হইতে ইহা নির্ম্মিত করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বাংলার গবর্ণর এই ব্লকের ভিত্তি স্থাপন করেন। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার এরূপ ব্যবস্থা বিশেষ যুগোপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের নূতন অধ্যাপক

কলিকাতা করপোরেশনের শিক্ষাসচিব শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিৎ এবং এসম্পর্কে তিনি বহু গবেষণা করিয়াছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার নৃতত্ত্বশাখার সভাপতি পদেও তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকাল জয়যুক্ত হউক।

পূর্ব্ব-প্রাচ্যের বন্য জন্তুর সন্ধানে অভিযান

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এবং স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে সুমাত্রার দিকে এক অভিযান যাত্রা করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব-প্রাচ্যে যে সমস্ত বন্য জন্তু আছে, তাহাদের সন্ধান ও সংগ্রহ করা এবং তৎসম্পর্কিত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য আহরণ করা। এই সমস্ত সংগৃহীত জন্তু ওয়াশিংটনস্থিত সুবিখ্যাত প্রাণী-শালায় রক্ষিত হইবে। ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কের ডিরেক্টর ডাঃ উইলিয়ম ম্যানের পরিচালনায় এই অভিযান কার্য্য করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পাখীর সন্ধানে অভিযান

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পক্ষিতত্ত্ববিৎ কর্ণেল রিচার্ড মিনার্টস্‌হেগেনের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে এক অভিযাত্রী দল তাঁহারই পরিচালনায় পাখীর সন্ধানোদ্দেশ্যে এক অভিযাত্রী দল

সংগঠিত হইয়াছে। কর্ণেল মিনার্টস্‌হেগেন *mallophaga* সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাখীসংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। অভিযাত্রী দল হায়দরাবাদ, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে এবং নেপালের অন্তর্গত কাটামুণ্ড এবং সিক্কিমের মনচর হ্রদেও পাখীসংগ্রহ করিবেন। আফগান সরকার হইতে অনুমতি লইয়া তাঁহারা আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানেও পাখীসংগ্রহার্থে যাইবেন। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নজীববিদ্যাবিৎ ডাঃ বীরবল সাহনিও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রত্নজীববিদ্যা সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যও তাঁহারা সংগ্রহ করিবেন এবং উহা হেগেনার-প্রবর্ত্তিত মহাদেশের সঞ্চলন মতবাদের উপরেও বিশেষ আলোকসম্পাত করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এভারেষ্ট অভিযানে তিব্বত সরকারের অনুমতি লাভ

এক দল ব্রিটীশ অভিযাত্রী ১৯৩৮ সালে পুনরায় এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তিব্বত সরকারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়েরা এভারেষ্ট শৃঙ্গ সম্পর্কে সাধারণতঃ বিশেষ ধর্ম্মভাব পোষণ করিয়া থাকে। এই কারণে অনুমতি পাওয়া বিষয়ে সন্দেহের আশঙ্কা ছিল। সম্প্রতি কিছু দিন হয় লাসাস্থিত ব্রিটীশ মিশন হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, তিব্বত সরকার অভিযাত্রী দলকে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই অনুমতি দান সম্পর্কে তাঁহারা যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কৌতুকপ্রদ। প্রকাশ যে ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে উপরোক্ত ব্রিটীশ মিশন এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন এবং উহাতে তিব্বত সরকারের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। ইহারা মিশনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মিশন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে নববর্ষের উপহারস্বরূপ একটি সুদৃশ্য মুখ-বন্ধ প্যাকেট প্রদান করেন। প্যাকেট খুলিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে ১৯৩৮ সালের এভারেষ্ট যাত্রীদের জন্য অনুমতি পত্র রহিয়াছে।

নব-প্রস্তর যুগের বাসনপত্র ও লৌহযন্ত্র

ত্রিবেন্দ্রাম হইতে ৩৮ মাইল দূরে দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত ভেল্লিমালাই নামক স্থানে নবপ্রস্তর যুগের (neolithic) নানাবিধ মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসনপত্র এবং লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রাদি ভূগর্ত্ত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুইটি শবের ভস্মাধার (burial urns) ভগ্নাবস্থায় মাটির নীচে হইতে বাহির করা হইয়াছে। উহার একটির মধ্যে কুঠারের আকারে নির্ম্মিত দুইটি লৌহযন্ত্রও বাহির হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের চীফ্ আর্কিওলজিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপরোক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া অনুরূপ আরও কয়েকটি শবাধারের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। শীঘ্রই ঐ স্থানে খনন কার্য্য সুরু করা

হইবে। যে সমস্ত লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা ত্রিবেন্দ্রাম মিউজিয়মের প্রাগৈতিহাসিক বিভাগে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি অনার্স পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে বিমানবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং আগামী জুলাই মাসে নূতন বৎসর আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রকাশ যে ১৯৪১ সালে সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

অধ্যাপক আর্কুহার্টের বিদায়গ্রহণ

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাঃ ডব্লিউ, এস, আর্কুহার্ট তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। আধুনিক যুগে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ডাঃ আর্কুহার্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলাররূপে এবং দীর্ঘকাল উহার সিণ্ডিকেটের সদস্য রূপে ডাঃ আর্কুহার্ট যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা বিচার করিবার সময় এখন পর্য্যন্ত না আসিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার পরিত্যক্ত স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবে না। এরূপ অমায়িক ও ছাত্রবৎসল শিক্ষক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আশা করি ডাঃ আর্কুহার্ট স্বদেশে চলিয়া গেলেও এদেশবাসী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাব্রতীগণের অন্তরে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন জাগিয়া থাকিবে। ডাঃ আর্কুহার্ট তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

হুগলী কলেজের নাম পরিবর্ত্তন

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম বাংলা সরকার আগামী ১লা আগষ্ট হইতে হুগলী কলেজের নাম 'হুগলী মহসিন কলেজ' রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সত্যব্রত, ত্যাগী পুরুষ মহম্মদ মহসিনের প্রদত্ত অর্থেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল; এত দিন পরে কলেজের নামের সহিত এই মহাত্মার নাম সংযোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাংলা সরকার সঙ্গত কাজই করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডি-এস্-সি

শ্রীযুত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এস্-সি মহাশয়কে এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্-সি উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধের নাম "Anorthosites of Bengal"। আমরা এই নূতন বৈজ্ঞানিককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।